শিব্রাম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

SIBRAM RACHANABALI
by
Sibram Chakraborty

First Punascha Edition

Price : Rupees Seventy only

ISBN : 81-7332-280-2

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ

পুনশ্চ, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং উটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন,
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার

করকমলেষু—



ভূমিকা

ভূমিকা লেখা কেন? পরিচয় দেবার জন্যে?

তাই যদি হয় তাহলে শিবরাম চক্রবর্তীর কোনো পরিচয় দেবার দরকার আছে কি?

অক্ষর পরিচয় যাদের আছে, অর্থাৎ বাংলা হরফটা যারা পড়তে পারে এমন সাত থেকে সাতাশি বছরের কারুর কাছে শিবরাম চক্রবর্তীকে কি চিনিয়ে দিতে হয়!

দীপাবলির রাতে আলোর মালা আর বাজির বাহার দেখিয়ে দিয়ে বলতে হয়, দেখো কি জ্বলছে!

দীপাবলির রাতের আলোর মালা আর বাজির বাহারের সঙ্গে শিবরামের তুলনা করাটা নেহাত অকারণ নয়। তার একটা মানে আছে।

শিবরাম চক্রবর্তী যে এক নয় অনেক এই খবরটা কারুর কারুর হয়তো জানা নেই।

এক শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রথম বয়সে কবি হিসেবে জেনেছিলাম। তখনকার দিনেই পাঠকদের চোখ-কপালে-তোলা নামের কবিতার বই-এ তেমনি নিয়ম-ভাঙা কবিতা বার করে সে সকলকে চমকে দিয়েছিল।

আরেক শিবরাম চক্রবর্তী হল প্রবন্ধকার। যেমন তেমন প্রবন্ধ নয়। যা সে লিখেছে তাতে পণ্ডিচেরী থেকে মস্কো পর্যন্ত সাড়া পড়ার মশলা।

কবিতা আর গল্প শিবরাম চক্রবর্তীর হাত থেকে এখনো মাঝে-সাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু আরেক শিবরাম চক্রবর্তী একেবারে আমাদের কাছে হারিয়ে গেছে।

সে শিবরাম চক্রবর্তী নাট্যকার। বাংলা নাটক যখন ছক-কাটা বাঁধা রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে শিবরাম চক্রবর্তী তখন দারুণ দুঃসাহসে সম্পূর্ণ নতুন ভাবনা আর নতুন চালের নাটক লিখে বাংলা নাটকের বদ্ধজলায় বাঁধ-ভাঙা স্রোত বইয়েছিল। শিবরামের তখনকার লেখা নাটকের নাম শুনলেই কান খাড়া করতে হয়। একটির নাম ছিল, 'চাকার নীচে' আরেকটির 'যখন তারা কথা বলবে'।

এ সব শিবরামকে কিন্তু এক শিবরামই একেবারে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে।

সে শিবরাম হাসির গল্প লেখে।

সে হাসির গল্প কি রকম কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। সে গল্পের তলায় শিবরামের নামটা দেওয়াও বাহুল্য। এমন সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের মার্কামারা সে সব

গল্প যে প্রথম লাইন পড়লেই কার লেখা তা বুঝতে দেরি হয় না। আর সবটা পড়েও মুখ গোমড়া করে যদি কেউ থাকতে পারে তাহলে সে-ই যাদুঘরে থাকবার যোগ্য।

এ রকম গল্প শিবরাম তো একটা আধটা লেখেনি। আজ কমপক্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সে হাসির গল্প লিখছে। সেই যে কোন সেকালে তার কলম থেকে 'দেবতার জন্ম' হয়েছিল তারপর থেকে সে-কলম থেকে হাসির ফোয়ারা অবিরাম উথলে উঠছে। এতদিনেও তার তোড় এতটুকু কমেনি।

কত গল্প যে সে লিখেছে তা তার গল্পের এই সংগ্রহ থেকেই জানা যাবে। ঠাস বুনোন ছাপা রীতিমতো মোটা কটা খণ্ডে তা কুলোয় তাই দেখি!

এত গল্প লিখেও আগাগোড়া সেই এক তার আর ধার, সেই হাসির ঝলমলানি আর ভাষার ঝকমকানি বজায় রাখা একেবারে পয়লা নম্বরের জাত-লিখিয়ে ছাড়া আর কারুর সাধ্য নয়।

হাসির গল্প অনেকেই লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকেরাও হাসির গল্পের পাড়া অচ্ছুত বলে এড়িয়ে যাননি।

কিন্তু নিছক হাসির গল্প লিখিয়ের সংখ্যা আমাদের ভাষায় খুব বেশি নয়। আমাদের বরাতজোর এই যে হাতে গোনার মতো কজন মাত্র এরকম লেখক পেলেও যাদের আমরা পেয়েছি সবাই একেবারে অদ্বিতীয় অনন্য। ত্রৈলোক্যনাথ মুখুজ্যে, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী, নাম গুনতে গিয়ে এখানেই থামতে হলেও এঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের এলাকায় একেশ্বর। আর শিবরাম চক্রবর্তীকে ছোটোদের হাসির গল্পের রাজ্যের রাজচক্রবর্তী বললে কিছু ভুল হয় কি?

শিবরাম চক্রবর্তীর মাপের লেখকদের অসামান্যতার প্রধান লক্ষণ কি? লক্ষণ এই যে গল্পের দুনিয়া তাঁরা অমর কিছু চরিত্র দিয়ে ভরে দেন। পঞ্চানন হারাধন হর্ষবর্ধন গোবর্ধন থেকে, প্রিসিলা ডলুমাসি ইতু ইত্যাদিরা গল্পের অমরাবতীর আদমশুমারি থেকে কোনোদিন বাদ পড়বে কি?

সব শেষে একটা কথা না বললে নয়।

শিবরাম কোথাও কোথাও লিখেছে যে আমার কাছেই নাকি গল্প লেখার হদিস তার পাওয়া।

কথাটা যে আমার প্রতি তার পক্ষপাতের আতিশয্য, তার যে কোনো লেখাই তার প্রমাণ।

মাছকে কি সাঁতার শেখাতে হয়?

কিছু যদি আমি করে থাকি তাহলে তাকে জলে ঠেলে দিয়েছি মাত্র।

পরিচয়

যে কোনো কারণেই হোক হাসির লেখা ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হতে বসেছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও। এর একটা কারণ, হয়তো অতিমাত্রায় কলকারখানার প্রসার হওয়ায় জড়বাদী জগতে হাসির অবকাশ বিশেষ নেই, তাই ধীরে ধীরে হাস্যরসের অবলুপ্তি ঘটছে।

অথচ, অন্য কোনো দেশের কথা থাক, এই বাংলাদেশে হাসির অভাব কখনো ঘটেনি, অন্নের অনটন ঘটেছে, মহামারীর আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু জননীরা দুষ্টু খোকাকে ঘুম পাড়ানোর সময় বর্গীদের কীভাবে খাজনা দেবেন তা ভেবে আকুল হয়েছেন। কারণ, সব ধান বুলবুলিতে খেয়ে গেছে। সামান্য কথা, কিন্তু গভীর অর্থে ভরা—আর তার ফলেই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি, সাধারণ পল্লীর মানুষ, চাষি, নিরক্ষর মেহনতী মানুষ, সকল শ্রেণীর বাঙালির মুখে মুখে কেমন সহজ সরস কথা। ইদানীং অবশ্য সে সব বিরল হয়ে এসেছে। এখন সবাই যেন মারমুখো, রসিকতা বুঝতে না পারা এবং করতে না পারাটা একটা ব্যাধি-বিশেষ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং সুরসিক ছিলেন, তাই তিনি রঙ্গভরা বঙ্গদেশ বলতে পেরেছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তীকে আমি প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে জানি। তাঁর জীবনটা যে ফুলে ফুলে ভরা নয় এটা তাঁর অন্তরঙ্গ মহলের সকলের জানা। ইদানীং তিনি "ঈশ্বর, পৃথিবী ও ভালোবাসা" ও 'ভালোবাসা, পৃথিবী ও ঈশ্বর' নামক দুখানি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় অনেকখানি দিয়েছেন। তবে এই আত্ম-পরিচয়ের মধ্যেও তাঁর মুখের হাসি চোখের জলকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

এসব কথা এখন থাক, কারণ ধীরে ধীরে শিবরাম চক্রবর্তীর সমগ্র সাহিত্য কর্মের পরিচয় দিতে হবে, স্বাদ গ্রহণ করতে হবে আরো মন্থর ভাবে, তবেই পাওয়া যাবে প্রকৃত পরিচয়।

শিবরাম পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছেন। লিখছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সাংবাদিক মন্তব্য। অজস্র রচনা। এইসব রচনার ভিত্তি কিন্তু রঙ্গরস নয়, তার প্রমাণ তাঁর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী', 'যখন তারা কথা বল্‌বে', 'চাকার নীচে' এবং 'মানুষ' ও 'চুম্বন' নামক দুটি কবিতার বই। পরবর্তী খণ্ডে সে সব গ্রন্থাদি সংযোজিত হবে। একজন লেখকের সামগ্রিক বিচার তাঁর সমগ্র রচনায়।

শিবরাম কীভাবে এবং কেন হাসির গল্প লিখতে শুরু করলেন তা বোধ হয় কোনো জায়গায় বলেননি। কিন্তু সরসতা ছিল তার অন্তরে, আর এই আশ্চর্য রসজ্ঞান তাঁকে বাঁচিয়েছে। উদ্ধার করেছে নাগরিক জীবনের কলুষিত আবহাওয়া থেকে, তিনি তাই সকল প্রকার আবিলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, মুক্তারামে তিনি প্রায় সারা জীবন কাটালেন মুক্ত আরামে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র হাতিয়ারের জন্য, তার নাম হাস্যরস।

একদা শিবরাম শুধু বড়োদের লেখাই লিখতেন। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে, অর্থাৎ সাহিত্যিক জীবনের সেই উন্মেষকালে, তিনি লিখেছেন গল্প, যেমন 'দেবতার জন্ম', লিখেছেন নাটক যেমন 'চাকার নীচে', 'যখন তারা কথা বলবে' এবং 'মানুষ' ও 'চুম্বন' নামক কবিতার বই। যা লিখেছেন, যখন লিখেছেন, তখনই তা 'সেনসেসনের' সৃষ্টি করেছে। 'চাকার নীচে' এবং 'যখন তারা কথা বলবে' এই দুটি নাটিকা প্রকাশের পর সম্পাদক ও লেখক মহলের প্রতিক্রিয়া আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনই প্রত্যক্ষ করেছি 'মানুষ' ও 'চুম্বন'-এর সাফল্য।

তবু একদিন তিনি ছোটোদের কথা লিখতে বসলেন। তিনি সবিস্তারে একাধিকবার বলেছেন কি সূত্রে ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। শিবরাম স্বয়ং শিশু। শিশু ভোলানাথ কথাটি যেন তাঁর বিশেষণ, তাই তাঁর অজস্র শিশু বন্ধু। জগৎ পারাবারের তীরে যেসব শিশুরা খেলা করে কে তাদের বন্ধু? শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি কারো কাকা, কারো মামা। অজস্র তাঁর ভাইপো আর ভাগনের দল। এদের অনেকগুলি তাঁর দেখা, অনেককে তিনি চাক্ষুষ দেখেননি। কিন্তু এদের কথা ভেবেই, এদের জন্যই তিনি লিখেছেন ছোটোদের লেখা।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গোয়েন্দা কাহিনী কিংবা এ্যাডভেঞ্চার বা বেদ-পুরাণের কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ না করে হাসির কথাই বলতে বসলেন।

আর এই হাসির হাওয়া প্রবাহিত হল তাঁর সকল রচনায়, তাঁর চলনে-বলনে, তাঁর আচার আচরণে, প্রতিদিনের জীবনে। তাঁর জীবনটা আসক্তির নয়, অনাসক্তির। তিনি ঘরের মানুষ নন, পরের মানুষ। তাঁর গান পথ চলার গান। অনেক সময় হ্যামেলিন শহরের সেই পায়েড-পাইপারের কথা মনে হয়, বাঁশি বাজিয়ে সে সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নদীর প্রান্তে। শিবরাম যেন সেই হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা, তাঁর বংশী রবে আমরা সবাই আত্মহারা হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছি। তিনি কিন্তু কুত্রাপি বলেননি—মামনুসর। এ তাঁর চরিত্রবিরুদ্ধ। তিনিই যেন সবাইকে অনুসরণ করার জন্য সদাই প্রস্তুত। এঁরই নাম শিবরাম চক্রবর্তী, লেখক, পাঠক, সাধারণ মানুষ, সকলের তিনি আপনজন, পরমপ্রিয় মানুষ।

শিবরামের গল্প পড়া সহজ। পড়ে হাসাও হয়ত সহজ। কিন্তু সহজ কথা সহজে লেখা যায় না। সেই লেখা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন তার বিচার বিশ্লেষণ।

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসরসিক সাহিত্যিকদের তালিকায় শিবরামের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তেমনই আবার তাঁর পরে আর কারো নাম নেই। তিনিই যেন শেষতম প্রতিনিধি।

দীর্ঘকাল তিনি আসর জমিয়ে বসে আছেন। স্বীয় মহিমায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি একক এবং অনন্য। বিদেশি সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশে আছে, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শিবরাম নিজস্ব ভঙ্গির জন্যই অনন্যসাধারণ। তাঁর সঙ্গে কারো মিল নেই। মার্ক টোয়েন, উডহাউস, চেস্টারটন, জেমস থারবার, জেরোম কে জেরোম এইসব রস সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর মিল নেই, তবু তিনি তাঁদের সগোত্র। তাঁর মিল আছে চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে আর আর্মেনিয়ান লেখক উইলিয়াম সারোয়ানের সঙ্গে আঙ্গিকের দিক থেকে। দুঃখের বিষয় শিবরামের রচনাবলির অনুবাদ হয়নি। অন্য ভাষায় অনুবাদ করাও কঠিন, তা যদি করা যেত শিবরামের পক্ষে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা কঠিন হত না।

বাংলা রস সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ সাহিত্যের ইতিহাসে শিবরামের যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করবেন। আমি শিবরামের দীর্ঘকালের গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং ভক্ত পাঠক। তাঁর সকল প্রকার এবং সমগ্র রচনাই পাঠ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনেক রচনা বার বার পড়েছি তবু কখনো ক্লান্তি জাগেনি মনে। শুধু কি আমি, আমি লক্ষ করে দেখেছি ছোটোদের মনে শিবরাম কি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছেন। তারা 'শিবরাম' পেলেই পড়তে বসে। যে কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। আসলে শিবরাম সেই কৌশল জানেন, সেই আশ্চর্য চাবিকাঠি তাঁর হাতে যা দিয়ে সকল মনের দুয়ার খোলা যায়। তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য কোথায়? রহস্য একটা আছে নিশ্চয়ই। শিবরাম যে বস্তু লিখে থাকেন তা গতানুগতিকতামুক্ত, এমন সব জায়গা থেকে গল্প আমদানি করেন যে জগৎ অনাবিষ্কৃত। তাঁর হাসির গল্পের কোথাও স্থূলরসের উদার পরিবেশন নেই। পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত সরসতা শিবরামের সরস রচনাবলির প্রাণশক্তি।

পরিহাসরসিক ও ব্যঙ্গরচনায় একজন সুদক্ষ শিল্পী হিসাবে শিবরাম পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য রচনার অন্য বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কুশলী ডুবুরির মতো শিবরাম ডুব দিয়েছেন জীবনের গভীরে আর তারপর উঠে এসেছেন মণি-মুক্তায় দুটি হাত পূর্ণ করে।

যে জীবন চল-চঞ্চল, গতি-উচ্ছল, আনন্দ বেদনা, হাসি ও অশ্রুতে ছল ছল সেই মায়ারস অভিষিক্ত সরসতাই শিবরামের প্রধান হাতিয়ার।

ছোটোদের এবং বড়োদের দুই শ্রেণীর পাঠকের জন্যই তিনি হাসির গল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্য প্রচণ্ড। কিন্তু একথা চিন্তা করলে অন্তরে বিস্ময় জাগে তিনি কেমন অবলীলায় ছোটোদের এবং বড়োদের হাসির খোরাক

সরবরাহ করেছেন। এই যে মিল, এই মিলের জন্যই শিবরাম পাঠক সমাজের কাছে এত প্রিয়। শিশুদের জন্য রচিত গল্পগুলিও বয়স্করা মন দিয়ে পড়ে থাকেন এ আমি দেখেছি। লেখক হিসাবে এ তাঁর পরম প্রাপ্তি।

হাসির গল্পের গোত্র যে আলাদা শিবরাম সে বিষয়ে সচেতন। তিনি বলেছেন—

"হাসির গল্প লিখিয়েও জীবনকে দ্যাখে, জীবন থেকেই নিজের লেখার উপাদান নেয়, কিন্তু তার জীবনদর্শন ঠিক সোজাসুজি নয়, তির্যক। এবং তার দেখানোর কায়দাটাও একটু বুঝি বাঁকানো। রসদৃষ্টির মতো তার রসদৃষ্টিও স্বতন্ত্র, কলাকারুর ধারাও পৃথক। সব কিছুই তার কৌতুকের কোণ থেকে গভীর অশ্রুর সমুদ্র থেকে তার হাস্যোচ্ছ্বাস উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই 'অশ্রুতপূর্ব' কীর্তি যখন কাহিনীর বেলাভূমিতে গড়িয়ে যায়, তখন তা হাসির ঢেউ।"

এই ব্যাখ্যার মধ্যে লেখক সমস্তই খুলে বলেছেন।

প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি অনেকেরই হয়তো জানা, অনেকের কাছে হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ের মতো মনে হবে। কারণ, অল্প বয়সে যাঁরা এসব কাহিনী পড়েছেন, আজ পরিণত বয়সের পরিণত মন নিয়ে পড়ে এর ভিতর পাওয়া যাবে নতুন এক স্বাদ। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। সব গল্পগুলি আবার পড়লাম, আবার হাসলাম, শিবরামের লিপিচাতুর্যের প্রতি মনে মনে ঈর্ষা বোধ করলাম, আর সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃখও মনে জাগল, হায় এত কিছুর অনুকরণ হয়, শিবরামের অনুকরণে বা অনুসরণে নতুন লেখক সলজ্জ সম্ভ্রমে দূরে রইলেন কেন।

আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে তরুণ শিবরাম রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

"জীবন লভিল সবে তোমার জীবনে,
মৃত্যু নাই, মিথ্যা নাই, নাই অন্ধকার,
রবির আলোক হল ভুবনে উদার।
হে কবি, হে নবীন তপন,
স্বপ্ন যে তোমার সত্য,
সত্য তাই তোমার স্বপন।"

এই কথাগুলি কি শিবরাম সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য নয়?

শিবরাম রচনাবলীর সামগ্রিক প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে তাই এক আনন্দ সংবাদ, এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বেহালা
কলকাতা-৭০০ ০৩৪



সনমস্কার নিবেদন

ছোটোদের রচনাবলির এই প্রথম খণ্ডে আমার সববের গোড়ার দিকের লেখা গল্প কাহিনীর প্রায় সবগুলিই স্থান পেয়েছেঃ যেমন, পঞ্চাননের অশ্বমেধ, শুঁড়ওয়ালা বাবা, কালান্তক লালফিতা, মন্টুর মাস্টার, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি—এইসব বইয়ের গল্পগুলি এবং রামধনু পত্রিকায় উপন্যাস-আকারে ধারাবাহিক প্রকাশিত হর্ষবর্ধনদের কাহিনী—কলকাতার হালচাল ইত্যাদি। সেই সঙ্গে , একটি প্রবন্ধ, চারটি নাটিকা—বেতননিবারক বিছানা, মামা ভাগ্নে, ভোজবাজি, তোতলামি সারানোর ইস্কুল; এবং তাছাড়াও ছোটোদের কতকগুলি ছড়া আর কবিতা।

গত অর্ধ শতাব্দী, বোধকরি তারও বেশি কাল ধরে আমি কতো যে যে লিখেছি তার ইয়ত্তা হয় না! এতাবৎ নেহাৎ কম লিখিনি, সত্যি বলতে, ছোটোদের জন্যে লিখে লিখেই এতকাল ধরে টিকে রয়েছি। বলতে গেলে আমার বই কিনে কিনে বাংলার ছেলে-মেয়েরাই আমায় খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে বর্তে রেখেছে। তাই আজ জীবনের শেষ পাদে, এই অন্তিমকালে পৌঁছে সাধ হল যে ছোটোদের জন্যই লেখা তাদের জিনিসগুলি যেন তাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাধ হলেই তো আর সাধ্য হয় না। এবং এই অথর্ব দশায় তা প্রায় অসম্ভবই বোধহয়। তামাম বাংলা মুলুক জুড়ে বাঙালিদের ঘরে ঘরে সেকালের আমার লেখাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার এখন পাত্তা পাওয়া সহজ নয়। সেযুগের বেশির ভাগ বইয়েরই পুনর্মুদ্রণ হয়নি, ছিঁড়ে খুঁড়ে কে কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে! তাদের উদ্ধার করে কে!

এমন কালে আমার ভাগনে শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যে ইতিমধ্যেই আমার নামলাঞ্ছিত এক বইয়ের দোকান ফেঁদে বসেছিল কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে, এই কাজ সম্পন্ন করতে আমার সাহায্যে এগিয়ে এল আর তার সহায় হল তার ভাইপো আমার নাতি শ্রীমান পলি (বিশ্বজিৎ) বন্দ্যোপাধ্যায়—তাদেরই যুগপৎ উদ্যম আর প্রয়াসে বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে এই বই (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ পেল। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এবং আরো অনেকের কাছে যে আনুকূল্য পেয়েছি তাও এখানে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবার।

শিবরাম চক্রবর্তী

সূচিপত্র

কবিতা

পঞ্চাননের অশ্বমেধ

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা না হলে সে হয়তো একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসতো। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে অমনি মেরে ফেলা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কি না, তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও,—সবদিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাত তা কেবল লেজের ও আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এক কালে অবশ্য ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোনো কাজেই লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকা একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারী পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারি চিঠি, কখন কি খায় স্থির নেই। সেদিন তো কাশ্মীরি শালের আধখানাই প্রায় সাবাড় করে বসল। তা ছাড়া রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুর মতো প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ কিংবা বেগুন ভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ে মেটে বাড়ি পঞ্চাননদের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নির কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুন ভাজা না দিয়ে? বেগুন ভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেট ভরে বেগুন ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নি বেগুন না ভেজে, বোধ হয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনি ভাজছিলেন। গন্ধ পাবামাত্র ঘোড়াটা সেখানে হাজির। দু-একবার সে গিন্নির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ!

সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নি কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনি আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি আর পঞ্চাননের চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ভাটপাড়া সে যাবেই।

গিন্নিকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আশকারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তার পরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য আনানো পঞ্চাননের টর্চ লাইটটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুনি নয়, তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন তো অগ্নিশর্মা। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও আক্কেল বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি?

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে চিঁহিঁহিঁ! অর্থাৎ—যা বল তাই বল!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্য কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোটো ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।

পঞ্চানন ভেবে দেখল, একথা বেশ। ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ না।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ আয়োজনের মুখেই ন-মেয়ে রাধারানি বলল, বাবা করছ কি! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারির মধ্যে এসে ঢুকবে যে।

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, একটা ভাবনার কথা বইকি। ঘোড়াটার যে-রকম বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত। —কিন্তু পঞ্চানন, কি হচ্ছে?

—এই ভাই, ট্রেন্ করছি ঘোড়াকে।

—তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে।

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে, আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

—তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুল গেছ! আমাদের পাড়াই মাড়াও না দু বছর থেকে—ব্যাপার কি?

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল, কীসের দেনা!

—সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলাম বটে! মনে ছিল না ভাই।

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই হিসেবি, একথা পঞ্চানন জানতো। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এত বেশি হিসেবি হয়ে উঠবে যে, চার আনা পয়সার কথা দু বছর

ধরে মনে করে রেখে ভিন গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশ টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারথি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন অবাক হল।

—তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হল তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে; নিজে গিয়ে দেখতে পার একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।

—কি যে বল তুমি? সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এত দূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মার কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো। আর বলগে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনি ভাজতে। বেগুনি দিয়ে তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ লাগে হে! তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা—

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল, তা হবেখন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই ভাই।

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বলল, চার আনা নেই কি রকম?

—আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।

—অ্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই ওই বাজারে ওই পাই পাইয়া কে পাইয়ে দেয়! কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমনকি সহজ, তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবি, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তা কে জানতো? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠ-হাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না। বস, জিরোও, গল্প কর—অনেকদিন পরে দেখা।

—হ্যাঁ, বসব বইকি! বেগুনি ও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো?

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বলে, এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এমন পরিশ্রম করা কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখ না কেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।



জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃকপাত করে জবাব দেয়, বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না। কিন্তু মনের মতো ঘোড়া পাই কোথায় ?

—কী রকম মনের মতো শুনি ?

—এই ধর খুব তেজি হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে ? এবং হাড় ভাঙলে কি আর তা জোড়া লাগবে এই বয়েসে ?

—তা সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায় ? কিনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজি ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপ, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এত বিনয়ী, এরকম নম্র স্বভাব— মানে সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়ার।

—তা ভাই, তোমার এই ঘোড়াটির মতো শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায় ? আমি তো আর তোমার মতো ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কত দিয়ে কিনেছিলে ?

—দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনেরো টাকায়।

—তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাও-না কেন ? তোমার তো এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট—ধরো।

—না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।

—আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ নাই বা করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই জোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হত না কি?

পঞ্চানন হাসি চেপে আমতা আমতা করে বলে, তা তুমি যখন এত করে বলছ। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম না হয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

—ভালোই হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলাম পথে তো তোমার বাড়ি পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো? ইজ্জত থাকত না।

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল, হাঁটছে বলে মনেই হয় না; অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুশি। নিশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল এতদিনে! আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলাম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তো। পৌনে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হত।

কেবল গিন্নি একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন- -খেতে পেত না বেচারা, তাই ও রকম ছোঁ-ছোঁ করতো! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কি খায়—সে-সব ও কখনো চোখে দেখেনি। টর্চ খাবে, বেগুনি খেতে চাইবে, তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালা

পঞ্চানন বলল, তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়োলোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ি। আমরা গরিব মানুষ; নিজেদেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার খানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার তিন গুণ সময় লাগল জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারী খুশি। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় তিনি টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাত হল না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তাঁর ইঙ্গিত, না কান দিল তাঁর সাধ্যসাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নামতে হল, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিংবা তিনি একটুও জখম হননি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি 'হ্যালো মিস্টার বোস' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে

নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানা দেবার হুকুম হল আরদালির উপর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে এক বিরাট আওয়াজ এল—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি ব্যাপার? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চমকে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনো শোনেননি। এমনকি, যে ঘোড়া ডার্বি জিতেছে, সেও এ রকম উচ্চধ্বনি করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

ঘোড়ার সামনে দু বালতি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা সেসব স্পর্শও করেননি। সে বোধহয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বালতির দিকে তাকাচ্ছে আর তার ভিতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে ঠেলে উঠছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যাবে সবাই দারুণ ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হল না কাউকে। চিঁ হিঁ হি হি হি হি!

হাসতে হাসতেই মারা গেল ঘোড়াটা।

কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা

বড়দির আদুরে খোকাকে একটি কথা বলার কারু জো নেই। বলেছ কি খোকা তো বাড়ি মাথায় করেছেই, বড়দি আবার পাড়া মাথায় করেন! প্রতিবেশিদের প্রতি বেশি রাগ আমার নেই—তাই যতদূর সম্ভব বিবেচনা করে বড়দি আর খোকাকে না ঘাঁটিয়েই আমি চলি।

কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছি, আজ সকালেই দেখি খোকা সেই দামি পাইনের ছড়িটা হস্তগত করে অম্লান বদনে চর্বণ করছে। খোকার এইভাবে ছড়িটি আত্মসাত করবার প্রয়াস আমার একেবারেই ভালো লাগল না, ইচ্ছা হল ওকে বুঝিয়ে দিই ছড়ি আস্বাদ মুখে নয়, পিঠে। কিন্তু ভয়ানকভাবে আত্মসংবরণ করে ফেললাম।

ভয়ে ভয়ে বড়দির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—দেখছ, খোকা কি করছে?

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির খাণ্ডামার্ক জবাব—কি তোমার পাকা ধানে মই দিচ্ছে? ও তো ছড়ি চিবুচ্ছে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, তা চিবুক ক্ষতি নেই, কিন্তু যত রকমের কাঠ আছে, তার মধ্যে পাইন কাঠ খাদ্য হিসেবে সব চেয়ে কম পুষ্টিকর, তা জানো কি? তাছাড়া এখন চারধারে যে রকম হুপিংকাফ হচ্ছে—

বড়দি ঝামটা দিয়ে উঠলেন—যাও যাও, তোমাকে আর বোকা বুঝাতে হবে না। সেদিন আমি একটা ওষুধের বিজ্ঞাপনে পড়লাম পাইন গাছের হাওয়ায় যক্ষ্মাকাশি পর্যন্ত সারে—যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে? পাগল!

আমার মনে বৈরাগের উদয় হল, বললাম—বেশ, আমার কথার চেয়ে বিজ্ঞাপনেই যখন তোমার বেশি বিশ্বাস তখন আজই আমি এক ডজন ছড়ির অর্ডার দিচ্ছি, তুমি রোজ একটা একটা করে খোকাকে খাওয়াও। আহার ওষুধ দুই হবে। বলে বিনা-ছড়ি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির থেকে।

জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হতে লাগল। সারা দিন আর বাড়ি ফিরলাম না। ওয়াই. এম. সি. এ-তে সকালের লাঞ্চ সারলাম, তারপর সোজা কলেজে গেলাম, সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ি বিকেলের জলযোগ পর্ব সেরে চলে গেলাম খেলার মাঠে। মোহনবাগান ম্যাচ জেতায় যে স্ফূর্তিটা হল, ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা দুই ব্রিজ খেলায় হেরে গিয়ে সেটা নষ্ট করলাম। সেখান থেকে গেলাম সিনেমায় সাড়ে নটার শোয়ে।

রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা খোলাই পেলাম। ডাকাডাকি করতে হল না, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জ্যাঠামশাই ভারী বদরাগী মানুষ। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হলে আর রক্ষে নেই। পা টিপে টিপে নিজের ঘরের অভিমুখে যাচ্ছি, বড়দি কোথায় ওত পেতে ছিলেন জানি না, অকস্মাৎ এসে আক্রমণ করলেন।

—শিবুরে, খোকা বুঝি আর বাঁচে না!

বড়দির অতর্কিত আক্রমণ, তার পরেই এই দারুণ দুঃসংবাদ—আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। —কেন, কেন, কি হয়েছে? ছড়িটা গিলে ফেলেছে নাকি?

বিপদের মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথাই আগে মনে পড়ে। ছড়িটার দুর্ঘটনা আশঙ্কা করলাম।

—না না, ছড়ির কিছু হয়নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বড়দির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—যাক, ছড়ির কোনো অঙ্গহানি হয়নি তো! বাঁচা গেছে।

—না, ছড়ির কিছু হয়নি, তবে সন্ধে থেকে খোকা ভারী কাশছে—ভয়ানক কাশছে। হুপিংকাফ হয়েছে ওর—নিশ্চয়ই হুপিংকাফ। কি হবে ভাই?

এতক্ষণে মুরুব্বি চাল দেবার সুযোগ এসেছে আমার। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললাম, তখনই তো বলেছিলাম সকালে! তা তুমি গ্রাহ্যই করলে না। তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় শুনিয়ে দিলে। এখন ঠেলা সামলাও।

—লক্ষ্মী দাদাটি, তোমাকে একবার ডাক্তার বাড়ি যেতে হবে এখুনি।

—এত রাত্রে? অসম্ভব, ডাক্তার কি আর জেগে বসে আছে এখনো? তার চেয়ে এক কাজ কর না বড়দি?

ব্যগ্রভাবে বড়দি প্রশ্ন করলেন, কি, কি?

—পাইনের হাওয়ায় যক্ষ্মা সারে, আর হুপিং সারবে না? ছড়িটা দিয়ে খোকাকে কসে হাওয়া কর না কেন?

বড়দি রোষ-কষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃকপাত করলেন—না তোমাকে যেতেই হবে ডাক্তারের কাছে। নইলে জ্যাঠামশাইকে জাগিয়ে দেবে। এই ডাক ছাড়লাম—ছাড়ি?

—না না, রক্ষে কর—দোহাই! যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে।

খোকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। হ্যাঁ, হুপিংকাফ, নিশ্চয়ই তাই, ছড়ি খেলে হুপিংকাফ হবে, জানা কথা। কি কাশিটাই না কাশছে, নিজের নাক-ডাকার আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না তাই, নইলে এই কাশির ধ্বনি কানে গেলে জ্যাঠামশাই নিশ্চয় ক্ষেপে উঠতেন। কিম্বা উঠে ক্ষেপতেন।

গেলাম ডাক্তারের কাছে—ভাগ্যক্রমে দেখাও হল। কাল সকালে তিনি খোকাকে দেখতে আসবেন। এখন এক বোতল পেটেন্ট হুপিংকাফ-কিওর দিলেন, ব্যবস্থাও

বাতলে দিলেন। বড়দিকে বললাম এই ওষুধটা এক এক চামচ তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাওয়াতে হবে।

—তিন ঘণ্টা বাদ বাদ? ওতে কি হবে? অসুখটা কতখানি বেড়েছে দেখছ না? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ালে যদি বাঁচে খোকা।

—বেশ, তাই খাওয়াও। আমি এখন ঘুমুতে চললাম।

ঘণ্টাখানেক চোখ বুজেছি কি না সন্দেহ, বড়দির ধাক্কায় জেগে উঠলাম।

—আঃ, কি ঘুমুচ্ছিস মোষের মতো? এদিকে খোকার যে নাড়ি ছাড়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠলাম—তাই না কি? যতটুকু নাড়ি জ্ঞান তাই ফলিয়েই বুঝলাম নাড়ি বেশ টন টন করছে। বড়দিকে সে-কথা জানাতেই তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, জ্যাঠামশায়ের ভয়ে চ্যাঁচাতে পারলেন না এই যা রক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম, ওষুধ খাইয়েছ?

—হ্যাঁ, দু চামচ।

—এক ঘণ্টায় দু চামচ? বেশ করেছ!

—শিবু, খোকার বুকে সেই পুলটিসটা দিলে কেমন হয়? অ্যান্টি-ফ্ল্যজিস্টিন—যেটা জ্যাঠামশায়ের নিউমোনিয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল—এখনো তো এক কৌটো রয়ে গেছে। দেব সেটা?

আমি বললাম, ডাক্তার তো পুলটিস দিতে বলেনি!

বড়দি বললেন, ডাক্তার তো সব জানে। সেটা দিয়ে দিয়ে কিন্তু জ্যাঠামশায়ের খুব উপকার হয়েছিল, আমি নিজে দেখেছি। তুই স্টোভ জ্বাল, আমি ফ্ল্যানেল জোগাড় করি।

আমি ইতস্তত করছি দেখে বড়দি অনুচ্চ চিৎকারের একটা নমুনার দ্বারা জানিয়ে দিলেন, স্টোভ না ধরালেই তিনি অকৃত্রিম আর্তনাদে জ্যাঠামশায়ের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাবেন। আমি ভারী সমস্যার মধ্যে পড়লাম—যদি বা খোকা বাঁচতো, বড়দির চিকিৎসার ঠেলায় সকাল পর্যন্ত—মানে ডাক্তার আসা পর্যন্ত—টেকে কি না সন্দেহ। অথচ বড়দির চিকিৎসায় সহায়তা না করলে আরেক বিপদ! ওদিকে খোকার মৃত্যু, এদিকে আমার অপঘাত—আমি স্টোভ ধরাতেই স্বীকৃত হলাম।

পুলটিসের হাত থেকে খোকার পরিত্রাণের একটা ফন্দি মাথায় এল। স্টোভ ধরাতে গিয়ে বলে উঠলাম—এই যা, ধরচে না তো! যা ময়লা জমেছে বার্নারে। পোকারটা দাও তো বড়দি?

—সর্বনাশ! পোকার—সে যে জ্যাঠামশায়ের ঘরে!

আমি তা জানতাম। তাহলে কি হবে? যাও তুমি নিয়ে এসগে। নইলে তো স্টোভ ধরবে না।

—বাবা! জ্যাঠামশায়ের ঘরে আমি যাব না, তার চেয়ে আমি চ্যাঁচাব।

—না, না, তোমায় চ্যাঁচাতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।

—ওই সঙ্গে, তাক থেকে থার্মোমিটারটাও এনো, জ্বর দেখতে হবে।

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম! পোকার আনি আর না আনি, থার্মোমিটারটা দেখা দরকার। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জ্যাঠামশায়ের কক্ষে ঢুকলাম, দরজা আবজানই ছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে জীবন্ত একমাত্র নাসিকা—নাসিকার কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই যদি থার্মোমিটার বাগিয়ে আনতে পারি, তাহলেই আজ রাত্রের ফাঁড়া কাটল।

কাছাকাছি এক বেড়াল শুয়েছিল, অন্ধকারে তো দেখা যায় না, পড়বি তো পড় তার ঘাড়েই দিয়েছি এক পা! সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা চেঁচিয়ে উঠেছে—ম্যাঁও!

শুনেছি বেড়ালের দৃষ্টি অন্ধকারেই ভালো খ্যালে, ওরই আগে থেকে আমাকে দেখা উচিত ছিল। আমার পথ থেকে অনায়াসেই সরে যেতে পারতো। নিজে দোষ করে নিজেই আবার তার প্রতিবাদ—আমার এমন রাগ হল বেড়ালটার উপর, দিলেম ওকে কষে এক শুট, মহামেডান স্পোর্টিং-এর সামাদের মতোন।

আমার শুটটা গিয়ে লাগল একটা চেয়ারে, সেখানেই যে সেটা দাঁড়িয়েছিল জানতাম না। পাজি বেড়ালটা এবার ঠিক নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শুটের প্রতিক্রিয়া থেকে কোনো রকমে আমি টাল সামলে নিলাম, কিন্তু চেয়ারটা চিতপাত হল।

এই সব গোলমালে নাসিকা গর্জন গেল থেমে, কিন্তু আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হল সেই সঙ্গে। ভাবলাম, না, হামাগুড়ি দিয়ে চার-পেয়ের মতো চলি, তাতে ধাক্কাধুক্কি লাগবার ভয় কম, সাবধানেও চলা যাবে, জ্যাঠামশায়ের নিদ্রা এবং নাসিকা গর্জনের হানি না ঘটিয়ে নিঃশব্দে থার্মোমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। একটু পরেই আবার নাক ডাকতে লাগল—আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে হামাগুড়ি প্র্যাকটিস শুরু করলাম।

প্রথমেই একটা বস্তুর সংঘর্ষে দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেল—হাত দিয়ে অনুভব করলাম ওটা চেয়ার। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে—সুবিধার দিক এবং অসুবিধার দিক; অন্ধকারে হামাগুড়ি অভিযানে পা সামলানো যায় বটে, কিন্তু মাথা বাঁচানো দায়। যাক, গোল টেবিলটা এতক্ষণে পেয়েছি, এবার হয়েছে, ঘরের মধ্যিখানে পৌঁছে গেছি—এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলেই সেই তাক—যেখানে থার্মোমিটার আছে। না তাকালেও পাবো।

অনেকটা তো গুড়ি দেওয়া হল—কিন্তু তাক কই? ভালো করে তাক করতে গিয়ে টেবিলটাকে পুনরাবিষ্কার করলাম—এবার মাথা দিয়ে—এবং রীতিমতন ভড়কে গেলাম! একি, এখনো আমি ঘরের মধ্যিখানেই ঘুরছি? আহত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়?

নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করলাম। এই তো টেবিল—এই একটা চেয়ার এটা? এটা জ্যাঠামশায়ের পিকদানি—ছিঃ। যাকগে, হাতে সাবান দিলেই হবে—এই

তো দেয়াল, এই আরেকখানা চেয়ার ঃ এই গেল গিয়ে সোফা—এ কি? ঘরে তো একটা সোফা ছিল বলেই জানতাম, নাঃ, এবার হতভম্ব হতে হল আমাকে। যে ঘরে দিনে দশবার আসছি যাচ্ছি, তাতে এত লুকোনো সম্পত্তি ছিল জানতাম না তো! আরেকটু এগিয়ে দেখতে হল—আরো কি অজ্ঞাত ঐশ্বর্য উদ্ধার হয়। এই যে দেখছি আরেকখানা চেয়ার—ঘরে আজ এত চেয়ারের আমদানি হল কোত্থেকে! এই যে ফের আরেকটা পিকদানি—ছিছিঃ, এ-হাতটাতেও সাবান লাগাতে হল আবার! ছ্যাঃ!

নাঃ, এবার এগুতে সত্যিই ভয় করছিল। ঘরে আজ যে রকম পিকদানির আমদানি তাতে আর বেশি পরিভ্রমণ নিরাপদ নয়। দরজাটা কোন দিকে? এবার বেরুতে পারলে বাঁচি—আর থার্মোমিটারে কাজ নেই বাবা! উঠতে গিয়ে মাথায় লেগে গেল।—এ কোনখানে এলাম? টেবিলের তলায় নাকি? টেবিলটা তো ছোটো এবং গোল বলেই জানতাম—এ যে, যেখানে যত ঘুরে ফিরেই উঠতে যাই—মাথায় লাগে। ঘরের ছাদ নোটিস না দিয়ে হঠাৎ এত নীচে নেমে আসবে বলে তো মনে হয় না। তবে আমার দণ্ডায়মান হবার বাধা এই দীর্ঘ-প্রস্থ বস্তুটি কি? এটাকে নিয়ে ঠেলে উঠব, যাই থাক কপালে।

যেই চেষ্টা করা, অমনি সহসা জ্যাঠামশায়ের নাসিকাধ্বনি স্থগিত হল। ক্ষণপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর, চোর! ডাকাত! খুনে! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! খুন করলো!

ও বাবা! আমি জ্যাঠামশায়ের তক্তপোশের তলায় —কী সর্বনাশ! তাঁকে সুদ্ধ নিয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলাম! এখন ওকে অভয় দেওয়া দরকার। বোঝান দরকার চোর নয়, ডাকাত নয়, ভূমিকম্প নয়—অন্য কিছু নগণ্য কিছু। মিহি সুরে ডাকলাম—মিঁয়াও!

জ্যাঠামশাই যে খুব ভরসা পেরেছেন এমন বোধ হল না। এবার গলা ফুলিয়ে ডাকতে হল—ম্যাঁ-া-া-ও!

বড়দি হ্যারিকেন হাতে ঢুকলেন। জ্যাঠামশাই ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, দেখতো সুশী, আমার তক্তপোশের তলায় কি?

বড়দি আমাকে পর্যবেক্ষণ করে আশ্বাস দিলেন—ও কিছু না, জ্যাঠামশাই, একটা ইঁদুর, আপনি ঘুমান!

জ্যাঠামশাই সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, ইঁদুর আমার চৌকি ঠেলে তুলবে? ইঁদুরের এত জোর, একি হতে পারে?

বড়দি বললেন, ধাড়ি ইঁদুর যে।

ধাড়ি ইঁদুর! একটু আগে বেড়ালের ডাক শুনলাম যেন। বেড়াল ইঁদুর এক সঙ্গে , ওরা যে খাদ্য-খাদক বলেই আমার জানা ছিল। যাকগে, আলোটা নিয়ে যা আমার সামনে থেকে—ঘুম পাচ্ছে।



সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্যাঠামশায়ের নাসিকা-বাদ্য বেজে উঠল। বড়দির আড়াল দিয়ে আমিও বিপদ-সঙ্কুল কক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম।

বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে দেখি ভোর হতে আর বাকি নেই—সুদূর আকাশে মুক্তাভা দেখা দিয়েছে। রাত দুটো থেকে এই ভোর পাঁচটা, ওই ঘরে আমি কেবল ঘুরেছি—পায়ে মিটার বাঁধা ছিল না, নইলে জানা যেত কত মাইল মোট ঘুরলাম? তিন ঘণ্টায় তিরিশ মাইল তো বটেই!

বড়দি করুণ কণ্ঠে বললেন, তুমি তো থার্মোমিটার আনতে বছর কাটিয়ে দিলে, এদিকে দেখ এসে, খোকা কেমন করছে।

দেখেই বুঝলাম আর না দেখলেও চলে—খোকার শেষ-মুহূর্ত সন্নিকট! যে সময়ে আমি এনডিওরেনস হামাগুড়ির রেকর্ড সৃষ্টি করছিলাম, আমার ভাগনের অদৃষ্টে সেই সময়ে অন্যবিধ এন্‌ডিওরেনস পরীক্ষা চলছিল। দেখলাম, বড়দি নিজেই কোনো রকমে স্টোভ ধরিয়ে নিয়েছেন, ইতিমধ্যে দু-দুবার খোকার বুকে পুলটিস দেওয়া হয়ে গেছে। ওষুধের দিকে তাকিয়ে দেখি গোটা বোতলটা ফাঁক! 'ওষুধের কি হল' জিজ্ঞাসা করতেই বড়দি জানালেন, দশ মিনিট অন্তর এক চামচ করে খাওয়ানো হয়েছে, তবু তো কই কোনো উপকার দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, উপকার দেখা যেত যদি খোকার বদলে তুমি খেতে।

হাত টিপে দেখলাম, কিন্তু খোকার নাড়ি পেলাম না। খোকার আর অপরাধ কি, যে এক বোতল হুপিংকাফ-কিওর ওকে উদরস্থ করতে হয়েছে, তাতে কি আর ওর

নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হতে বাকি আছে? তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ফোন করলাম—আমাদের খোকা মারা যাচ্ছে।

পায়জামা-পরনেই ডাক্তার ছুটে এলেন, পরীক্ষা করে বললেন, না, মারা যাচ্ছে না। তাছাড়া এর হুপিংকাফই হয়নি। দেখি—বলে খোকার গলার কাছে সুড়সুড়ি দিতেই খোকা বেদম কাশতে শুরু করল এবং কাশির ধমক বেরিয়ে এল সূক্ষ্মতম কি একটা জিনিস। হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে ডাক্তার বললেন, এ তো পাইন কাঠের টুকরো দেখছি! খোকা বোধ হয় পাইন কাঠের কিছু চিবুচ্ছিল—তার ভগ্নাংশ ভেঙে গলায় গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বড়দি বললেন, হুপিংকাশি নয়, তাহলে এটা কি কাশি? বড়দির ক্ষোভের কারণ ছিল, সমস্ত রাত ধরে এক সঙ্গে হুপিংকাফ, নিউমোনিয়া ও সর্দিগর্মির চিকিৎসার পর সেই প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে জানলে কার না দুঃখ হয়?

আমি উত্তর দিলাম, এক রকমের কাষ্ঠ-হাসি আছে জানো তো বড়দি? এটা হচ্ছে তারই ভায়রা-ভাই—কাষ্ঠ-কাশি।

আমার ভালুক শিকার

তোমরা আমাকে গল্প লেখক বলেই জান। কিন্তু আমি যে একজন ভালো শিকারি, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। আমি নিজেই একথা জানতাম না, শিকার করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত!

(আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কোথায় কোথায় নাকি দশ-বারো বছরের ছেলেরা, দশ-বারো হাত বাঘ শিকার করে ফেলেছে। আজকের ৭ই জুলাইয়ের খবরের কাগজেই তোমরা দেখবে, একটা সাত বছরের ছেলে ন' ফিট বাঘ সাবাড় করে দিয়েছে। বাঘটার উপদ্রবে গ্রামসুদ্ধ লোকে ভীত সন্ত্রস্ত। কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ভাগ্যিস সেখানকার তালুকদারের একটা ছেলে ছিল এবং আরও সৌভাগ্যের কথা যে তার বয়স ছিল মোটে বছর সাত, তাই গ্রামবাসীদের বাঘের হাত থেকে এত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হল।

তোমরা হয়তো বলবে যে, ছেলেটার ওজনের চেয়ে বন্দুকের ওজনই যে ভারী। তা হতে পারে, তবু একথা আমি অবিশ্বাস করি না, বিশেষ করে যখন খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের চোখে দেখেছি। আমার ভালুক শিকারের খবরটাও কাগজেই দেখেছিলাম—তারপর থেকেই তো ঘটনাটায় আমার দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে। প্রথমে আমি ধারণা করতেই পারিনি যে আমিই ভালুকটাকে মেরেছি, এবং ভালুকটারও মনে যেন সেই সন্দেহ বরাবর ছিল মনে হয়, মরার আগে পর্যন্ত। কিন্তু যখন খবরের কাগজে আমার শিকার-কাহিনী নিজে পড়লাম, তখন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা আমার দূর হল। ভালুকটার সন্দেহ বোধ করি শেষ অবধি থেকেই গেছল, কেন না খবরের কাগজটা চোখে দেখার পর্যন্ত তার সুযোগ হয়নি—কিন্তু না হোক, সে নিজেই দূর হয়ে গেছে।)

সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা এবার তোমাদের বলি—আমার মাসতুতো বড়দা সুন্দরবনের দিকে অনেক জমি-টমি নিয়ে চাষ-বাস শুরু করেছিলেন। সেদিন তাঁর চিঠি পেলাম এবার গ্রীষ্মটা এধারেই কাটিয়ে যাও না, নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে, অভিজ্ঞতাও বেড়ে যাবে অনেক। সঙ্গে করে কিছুই আনতে হবে না, কেবল কয়েক জোড়া কাপড় এনো।

আমি লিখলাম—যেতে লিখেছ যাব না-হয়। কিন্তু এত কাপড় নিয়ে যেতে হবে কেন বুঝলাম না। আমার সুটকেসে তো দুখানার বেশি ধরবে না, এবং বাড়তি বোঝা বইতে আমি নারাজ। আর তাছাড়া, এই সেদিনই তো তুমি কলকাতা থেকে বারো

জোড়া কাপড় নিয়ে গেছ! এত কাপড় সেখানে কি কর? বৌদি নিশ্চয়ই ধুতি পরা ধরেননি। তোমার কাপড়েই আমার চলে যাবে—তুমি তো একলা মানুষ বাপু!

দাদা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—আর কিচ্ছু না, বাঘের জন্য।.

আমার সবিস্মিত পালটা জবাব গেল—সে কি! বাঘে ছাগল গোরুই চুরি করে শুনেছি, আজকাল কি কাপড়-চোপড়ও সরাচ্ছে নাকি? কাপড় চোপড়ের ব্যবহার যখন শিখেছে, তখন তারা রীতিমতো সভ্য হয়েছে বলতে হবে।

দাদা উত্তর দিলেন—চিঠিতে অত বকতে পারি না। আমার এখানে এসে তোমার কাপড়ের অভাব হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই—কিন্তু যে-কাপড় তোমাকে আনতে বলেছি, তার দরকার ওই পথেই। চিড়িয়াখানার বাঘই দেখেছ, আসল বাঘ তো কোনোদিন দেখনি, আসল বাঘের হুহুঙ্কারও শোননি। চিড়িয়াখানার ওগুলোকে বেড়াল বলতে পার। সুন্দরবন দিয়ে স্টিমারে আসতে দু পাশের জঙ্গলে বাঘের গর্জন শোনা যায়, শোনামাত্রই কাপড় বদলানোর প্রয়োজন অনুভব করবে। প্রায় সকলেই সেটা করে থাকেন। যত ঘন ঘন ডাকবে (ডাকাটা অবশ্য তাদের খেয়ালের উপরে নির্ভর করে) তত ঘন ঘনই কাপড়ের প্রয়োজন। তবে তুমি যদি খাকি প্যান্ট পরে আস, তাহলে দরকার হবে না।

অতঃপর, চব্বিশ জোড়া কাপড় কিনে নিয়ে আমি সুন্দরবন গমন করলাম।

আমার মাসতুতো দাদাও একজন বড় শিকারি। এ তথ্যটা আগে জানতাম না, এবার গিয়ে জানলাম। শুধু হাতেই অনেক দুর্ধর্ষ বাঘকে তিনি পটকে ফেলেছেন। বন্দুক নিয়েও শিকারের অভ্যাস তাঁর আছে, কিন্তু সেরকম সুযোগে তিনি বন্দুককে লাঠির মতো ব্যবহার করতেই ভালোবাসেন। তাঁর মতে কেঁদো বাঘকে কাঁদতে হলে বন্দুকের কুঁদোই প্রশস্ত। গুলি করা কোনো কাজের কথা নয়। কিছুদিন আগে এক বাঘের সঙ্গে তাঁর খুব হাতাহাতি হয়ে গেছল, তাঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। বাঘটার অত্যাচার বেজায় বেড়ে গেছল, সমস্ত গ্রামটার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতো ব্যাটা, এমনকি তাদের স্বপ্নের মধ্যেও এসে হানা দিত পর্যন্ত।

দাদার নিজের ভাষাতেই বলি—তারপর তো ভাই বেরুলাম বন্দুক নিয়ে। কি করি, গোটা গ্রামের অনুরোধ। ঠেলা তো যায় না, একাই গেলাম। সঙ্গে লোকজন নিয়ে শিকারে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। একবার অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম, কি বলব! বাঘ করল তাদের তাড়া, তারা এসে পড়ল আমার ঘাড়ে, মানুষের তাড়ায় প্রাণে মারা যাই আর কি! গেলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি সম্মুখে বাঘ, বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে জানলাম টোটা আনা হয়নি—আর সে বন্দুকটা এমন ভারী যে, তাকে লাঠির মতোও খেলানো যায় না। কি করি, বন্দুক ফেলে দিয়ে শুধু হাতেই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোর ধস্তাধস্তি, কখনো বাঘ উপরে আমি নীচে, কখনো আমি নীচে বাঘ উপরে—বাঘটাকে প্রায় কাবু করে এনেছি, এমন সময়ে—



আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি, বৌদি বাধা দিয়ে বললেন, এমন সময়ে তোমার দাদা গেলেন তক্তপোশ থেকে পড়ে। জলের ছাঁট দিয়ে, হাওয়া করে, অনেক কষ্টে ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। মাথাটা গেল ফেটে, তিনদিন জলপটি দিতে হয়েছিল।

এরপর দাদা বারোদিন আর বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না এবং মাছের মুড়ো সব আমার পাতেই পড়তে লাগল।

দাদা একদিন চুপি চুপি আমায় বললেন, তোমার বৌদির কীর্তি জানো না তো! খুকিকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে জাম কুড়োতে গিয়ে, পড়েছিলেন এক ভালুকের পাল্লায়। খুকি তো পালিয়ে এল, উনি ভয়ে জবু-থবু হয়ে, একটা উইয়ের ঢিপির উপর বসে পড়ে এমন চ্যাঁচামেচি আর কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে, ভালুকটা ওঁর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

আমি বললাম, ওঁর ভাষা না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছল, এমনো তো হতে পারে!

দাদা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—হ্যাঁঃ! ভারী তো ভাষা! প্রত্যেক চিঠিতে দুশো করে বানান ভুল!

বৌদির পক্ষ সমর্থন করতে আমাকে, অন্তত মাছের মুড়োর কৃতজ্ঞতা-সূত্রেও, বলতে হল, ভালুকেরা শুনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার, বক্তৃতা-টক্তৃতা ওরা তত পছন্দ করে না। কাজেই বৌদি ভালুক তাড়াবার ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন, বুঝলে দাদা?

দাদা কোনো জবাব দিলেন না, আপন মনে গজরাতে লাগলেন। বৌদির তরফে আমার ওকালতি শুনে তিনি মুষড়ে পড়লেন কি ক্ষেপে গেলেন, ঠিক ঠাওর পেলাম না। কিন্তু সেদিন বিকেলেই তাঁর মনোভাব টের পাওয়া গেল। দাদা আমাকে হুকুম করলেন, পাশের জঙ্গল থেকে এক ঝুড়ি জাম কুড়িয়ে আনতে—সেই জঙ্গল, যেখানে বৌদির সঙ্গে ভালুকের প্রথম দর্শন ঘটেছিল।

দাদার গরহজম হয়েছিল, তাই জাম খাওয়ার দরকার, কিন্তু আমি দাদার ডিপ্লোমাসি ধরতে পারলাম। আমাকে ভালুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে সুদ্ধ বিনা আয়াসে হজম করার মতলব। বুঝলাম বৌদির পক্ষে যাওয়া আমার ভালো হয়নি। আমতা আমতা করছি দেখে দাদা বললেন, আমার বন্দুকটা না হয় নিয়ে যা, কিন্তু দেখিস, ভুলে ফেলে আসিস না যেন।

ওঃ, কি কূটচক্রী আমার মাসতুতো বড়দা। ভালুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বরং আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বন্দুক ছোঁড়া—? একলা থাকলে হয়তো দৌড়ে পালিয়ে আসতে পারব, কিন্তু ওই ভারী বন্দুকের হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে দৌড়তে হলে, সেই রেসে ভালুকই যে প্রথম হবে এ বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ ছিল না, দেখলাম দাদাও তেমনি স্থির-নিশ্চয়।

দাদা জামের ঝুড়ি আর বন্দুকটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন চট্ করে যা, দেরি করিসনি। তোর খুব ভয় করছে নাকি?

অগত্যা আমায় বেরুতে হল। বেশ দেখতে পেলাম, আমার মাসতুতো বড়দা আড়ালে একটু মুচকি হেসে নিলেন। মাছের মুড়োর বিরহ তাঁর প্রাণে সইছিল না। আঃ, এই বিদেশ-বিভুঁয়ে মাসতুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ভালো করিনি। খতিয়ে দেখলাম, ওই চব্বিশ জোড়া কাপড়ই বড়দার নেট লাভ।

বেরিয়ে পড়লাম। এক হাতে ঝুড়ি, আরেক হাতে বন্দুক। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বীরের মতো দেখাচ্ছিল। যদিও একটু বিশ্রী রকমের ভারী, তবু বন্দুকে আমায় বেশ মানায়। ক্রমশ মনে সাহস এল—আসুক না ব্যাটা ভালুক, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বড়দাকেও! মাসতুতো ভাই কেবল চোরে-চোরেই হয় না, শিকারিতে-শিকারিতেও হতে পারে। উনিই একজন বড় শিকারী, আর আমি বুঝি কিচ্ছু না?

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। আসুক না ব্যাটা ভালুক এইবার! ঝুড়িটা হাতে নেওয়ায় যতটা মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাঘব হয়েছিল, বন্দুকে তার ঢের বেশি পুষিয়ে গেছে। আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বীরের মতোই। অথচ দুঃখের বিষয়, এই জঙ্গল-পথে একজনও দেখবার লোক নেই। এ সময়ে একটা ভালুককে দর্শকের মধ্যে পেলেও আমি পুলকিত হতাম।

বন্দুক কখনো যে ছুঁড়িনি তা নয়। আমার এক বন্ধুর একটা ভালো বন্দুক ছিল, হরিণ-শিকারের উচ্চাভিলাষ-বশে তিনি ওটা কিনেছিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি গাছ-শিকার করতে পারতেন। তিনি বলতেন—গাছ-শিকারের অনেক সুবিধে, প্রথমত, গাছেরা হরিণের মতো অত দৌড়য় না, এমনকি ছুটে পালাবার

বদভ্যাসই নেই ওদের, দ্বিতীয়ত,—ইত্যাদি, সে বিস্তর কথা। তা, তিনি সত্যিই গাছ-শিকার করতে পারতেন—অন্তত বাতাস একটু জোর না বইলে উপযুক্ত আবহাওয়ায় এবং গাছটাও হাতের কাছে হলে, তিনি অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করতে পারতেন—প্রায় প্রত্যেকবারই।

আমিও তাঁর সঙ্গে গাছ শিকার করেছি, তবে যে-কোনো গাছ আমি পারতাম না। আকারে-প্রকারে কিছু বড়ো হলেই আমার পক্ষে সুবিধা হত, গুঁড়ির দিকটাতেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বৃক্ষ-শিকারে যখন এতদিন হাত পাকিয়েছি, তখন ঋক্ষ-শিকারে যে একেবারে বেহাত হব না, এ ভরসা আমার ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে দেখি পাকা-পাকা জামে গাছ ভর্তি! জাম দেখে জাম্বুবানের কথা আমি ভুলেই গেলাম। এমন বড়ো বড়ো পাকা-পাকা খাসা জাম! জিভ লালায়িত হয়ে উঠল! বন্দুকটা একটা গাছে ঠেসিয়ে, দু হাতে ঝুড়ি ভরতে লাগলাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একটা খস খস শব্দে আমার চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি—ভালুক!

ভালুকটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমি যা করছি, সেও তাতেই ব্যাপৃত। একহাত দিয়ে জামের একটা নিচু ডালকে সে বাগিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে নির্বিচারে মুখে পুরছে—কাঁচা ডাঁশা সমস্ত। আমি বিস্মিত হলাম বললে বেশি বলা হয় না! বোধ হয়, আমি ঈষৎ ভীতই হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, ভালুক-দর্শনের বাঞ্ছা একটু আগেই করেছি বটে, কিন্তু দেখা না পেলেই যেন আমি বেশি আশ্বস্ত হতাম। ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্তেই আমাদের চারি চক্ষুর মিলন!

আমাকে দেখেই ভালুকটা জাম খাওয়া স্থগিত রাখল এবং বেশ একটু পুলকিত-বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। গাছে উঠতে পারলে বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু ভালুকের হাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ভালুকরা গাছে উঠতেও ওস্তাদ।

অগত্যা শ্রেষ্ঠ উপায়—পালিয়ে বাঁচা। বন্দুক ফেলে যেতে দাদার নিষেধ, বন্দুকটা বগল-দাবাই করে চোঁ চোঁ দৌড় দেবার মতলব করেছি, দেখলাম সেও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি দৌড়লেই সে যে আমার পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করবে না, আমি তা বেশ বুঝতে পারলাম। ভালুকজাতির ব্যবহার, আমার মোটেই ভালো লাগল না।

আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে। বন্দুকের বোঝা নিয়ে ভালুক দৌড়ে আমি সুবিধা করতে পারব না বুঝতে পারলাম। যদি এখনো বন্দুকটা না ফেলে দিই, তাহলে নিজেকেই এখানে ফেলে যেতে হবে। অগত্যা অনেক বিবেচনা করে বন্দুককেই বিসর্জন দিলাম।

কিছুদূর দৌড়ে ভালুকের পদশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সে আমার বন্দুকটা নিয়ে পড়েছে। ওটাকে নতুন রকমের কোনো খাদ্য মনে করেছে কি না, ওই জানে! আমিও স্তব্ধ হয়ে ওর কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলাম।

ভালুকটা বেশ বুদ্ধিমান। অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পারল ওটা খাদ্য নয়, হাতে নিয়ে দৌড়বার জিনিস। এবার বন্দুকটা হস্তগত করে সে আমাকে তাড়া করল। বিপদের উপর বিপদ—এবার আমার বিপক্ষে ভালুক এবং বন্দুক। ভালুকটা কি রকম শিকারি আমার জানা ছিল না। বন্দুকে ওর হাত অন্তত আমার চেয়ে খারাপ নয় বলেই আমার আন্দাজ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কয়েক লাফ না যেতেই পেছনে বন্দুকের আওয়াজ। আমি চোখ কান বুজে সটান শুয়ে পড়েছি—যাতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—যুদ্ধের তাই রীতি কি না! তারপর আবার দুড়ুম! আবার, আবার সেই বন্দুক-গর্জন! আমি দুরু দুরু বক্ষে শুয়ে শুয়ে দুর্গানাম করতে লাগলাম। ভালুক শিকার করতে এসে ভালুকের হাতে না 'শিকৃত' হয়ে যাই!

আমি চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট দেখছিলাম, ভালুকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার গুলিতে আমি হতাহত—অন্তত একটা কিছু যে হয়েছি, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। গুলির আঘাতে না যাই, ভালুকের আঘাতে এবার গেলাম! মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জীবনের সমস্ত ঘটনা, বায়স্কোপের ফিলমের মতো মনশ্চক্ষের উপর দিয়ে চলে যায় বলে একটা গুজব শোনা ছিল। সত্যিই তাই—একেবারে হুবহু। ছোটবেলার পাঠশালা পালিয়ে আম-শিকার থেকে শুরু করে আজকের ভালুক শিকার পর্যন্ত—প্রায় চারশো পাতার একটা মোটা সচিত্র জীবন-স্মৃতি আমার মনে মনে ভাবা, লেখা, ছাপানো, প্রুফ কারেক্ট করা—এমনকি তার পাঁচ হাজার কপি বিক্রি অবধি শেষ হয়ে গেল।

জীবন-স্মৃতি রচনার পর আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার স্মরণে এল। পরিবার আমার খুব সামান্যই—একমাত্র মা এবং এক মাত্র ভাই—সুতরাং সে দুশ্চিন্তা সমাধা করাও খুব কঠিন হল না। এক সেকেন্ড—দু সেকেন্ড তিন—চার—পাঁচ সেকেণ্ড—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু ভালুক বেটা এখনো এসে পৌঁছল না তো! কী হল তার? এতটা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লো না কি?

ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি, ওমা, সেও যে সটান চিতপাত! সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম—এ ভালুকটা তো ভারী অনুকরণপ্রিয় দেখছি। কিন্তু নড়ে না চড়ে না যে! কাছে গিয়ে দেখলাম, নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা গেছে বেচারা! বুঝলাম, দারুণ দুঃখেই সে এই করুণ কাণ্ডটা করেছে! প্রথম দিন বৌদির ব্যবহারে সে লজ্জা পেয়েছিল, আজ আমার কাপুরুষতার পরিচয়ে সে এতই মর্মাহত হয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

বন্দুক হাতে সগর্বে বাড়ি ফিরলাম। আমার জাম-হীনতা লক্ষ করে দাদার অসন্তোষ প্রকাশের পূর্বেই ঘোষণা করে দিলাম—বৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভালুকটাকে আজ নিপাত করে এসেছি! কেবল মাত্র দুটো শট—ব্যস, খতম!

দাদা-বৌদি, এমন কি খুকি পর্যন্ত দেখতে ছুটল। আমিও চললাম—এবার আর

বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম না, পাঁচজনে যাত্রা নিষেধ, পাঁজিতে লেখে। দাদা বহু পরিশ্রমে ও বৌদির সাহায্যে, ভালুকের ল্যাজটাকে দেহচ্যুত করে, এই বৃহৎ শিকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, সযত্নে আহরণ করে নিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ফলে দাদা ও বৌদির মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। আপনি আত্মদান করে ভালুকটা দাদা ও বৌদির মধ্যে মিলন-গ্রন্থি রচনা করে গেল—তার এই অসাধারণ মহত্ত্বে সে নতুন মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হল। আমার রচনায় তাকে অমর করে রাখলাম, অন্তত আমার চেয়ে সে বেশিদিন টিকবে আশা করি।

বাড়ি ফিরেই দাদা বললেন, অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা পাঠিয়ে দিই, কি বলিস? A big wild bear was heroically killed by my young brother aged—aged কত রে?

—আমার age তো তুমি জানোই!—আমি উত্তর দিলাম।

—উঁহু, কমিয়ে লিখতে হবে কি না! নইলে বাহাদুরি কীসের! দশ-বারো বছর কমিয়ে দিই, কি বলিস?

কিন্তু দশ-বারো বছর কমিয়েও আমার বয়স যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি আনা গেল না (সাতে দাঁড় করানো তো দুঃসাধ্য ব্যাপার!)—তখন বাধ্য হয়ে 'young' এই বিশেষণের উপর নির্ভর করে, আমার বয়সাল্পতাটা পাঠকের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া হোল।

সেদিন আমার পাতে দু-দুটো মুড়ো পড়ল, খুকি মাকে বলে রেখেছে তার মুড়োটা কাকামণিকে দিতে। আমি আপত্তি করলাম না, ভালুকের আত্মবিসর্জনে যখন করিনি, খুকির মুড়ো বিসর্জনেই বা করব কেন? সব চেয়ে আশ্চর্য এই, আমার ঝোলের বাটির অস্বাভাবিক উচ্চতা দেখেও দাদা আজ ভ্রূক্ষেপ করলেন না!

মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ

সেবার গ্রীষ্মকালটা যেন একমাস আগেই এসে পড়েছিল, দারুণ গরমে আম-কাঁঠাল সব আগাম পেকে উঠল। কিন্তু সামার ভ্যাকেশানের তখনো ঢের দেরি। বোর্ডিং-এ আমাদের মন তো আর টেকে না! ছুটিটা এসে পড়লে হয়, বাড়ি গিয়ে বাঁচি।

আমরা সত্তর আশিজন ছেলে সুদূরবর্তী পাড়াগাঁর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলার স্কুলে পড়তে এসেছি, বাধ্য হয়ে বোর্ডিং-এ থাকি। বাধ্য হয়ে থাকা ছাড়া কি বলব, যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি—রেঙ্গুন চালের ভাত, লাল রঙের এমন হৃষ্টপুষ্ট ভাত তোমাদের অনেকে চোখেও দেখনি; তার সঙ্গে জলবত্তরলং ডাল আর এই এক টুকরো একটুখানি মাছ,—ঝোলের বর্ণনা না-ই দিলাম। এই খেয়ে দেহ যদি বা টেকে, মন টেকে না। কোথায় বাড়ি যাব, সকালে উঠেই একবাটি মুড়ি আর এক টুকরি আম নিয়ে বসব; দুপুরে আবার দুধ দিয়ে ভাত দিয়ে আমের রস দিয়ে আরেক প্রস্থ হবে—ভাবতেও জিভে জল আসে!

আমাদের মধ্যে জগা-ই হচ্ছে মাতব্বর, সে বললে, আয়, হেডমাস্টারের কাছে ছুটির দরবার করিগে!

জগা মাতব্বর, কেন না সে সবার সেরা স্পোর্টসম্যান, ফুটবল ও ক্রিকেটে সমান চৌকস; হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল থ্রোইং-এ তার জুড়ি নেই। তার প্রতি মাস্টারদের যেন একটু পক্ষপাত আছে, সে ফেল গেলেও দেখি বরাবর প্রোমোশন পেয়ে এসেছে; এখন ফার্স্ট ক্লাসে উঠে আর কিছুতেই টেস্ট-এ এলাউ হতে পারছে না। জগা বলে, জানিস, আমি পাস করে বেরিয়ে গেলে তোদের স্কুলের মুখ রাখবে কে? আর সব স্কুলের সঙ্গে কম্পিটিশন ম্যাচে তোরা কি আর জিততে পারবি—তাই আমাকে ফেল করিয়ে এমনি করে আটকে রাখছে।

আমরা তার কথা বিশ্বাস করতাম। স্বয়ং সে ছুটির দরবার করবে জেনে আশ্বস্ত হৃদয়ে আমরা সবাই তার পিছু পিছু গেলাম। হেডমাস্টার মশাই শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, কি? এখনো কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা হয়নি, এখন ছুটি? যাও যাও, পড়গে মন দিয়ে—

—বড্ড গরম পড়েছে সার—

—গরম পড়বে না তো কি? শীতকালে বড্ড শীত পড়বে, গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়বে, বর্ষাকালে ভারী বর্ষা হবে—এ তো জানা কথা। তাই বলে, পড়াশুনা

কে ছেড়ে দিয়েছে? জগা, তোমার বাড়ি কি দার্জিলিং যে বাড়ি যেতে চাইছ? সেখানে গরম পড়েনি? যাও যাও, পড়গে, সময় নষ্ট কোরো না।

জগা বিফল হল—এ রকম ঘটনা আমাদের বোর্ডিং-এর ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। ছুটি না পাওয়াতে আমাদের দুঃখ যত না হোক, জগার লজ্জা তার চারগুণ। কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলে সে নয়, বললে, ছুটি আদায় করি কি না, দ্যাখ তোরা!

রোজ সন্ধ্যায়, ছেলেরা ফুটবল খেলে মাঠ থেকে ফিরলে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে রোল-কল হত। তিনি নিজে সবার নাম ডাকতেন। সেদিন সন্ধ্যায় রোল-কলের সময় জগার সাড়া না পেয়ে তিনি ভারী চটে গেলেন; আমাকে ডেকে বললেন, শিবু, যা একটা বেত কেটে নিয়ে আয়!

ব্যাপার যতদূর বোঝা গেল তা এই, ছেলেদের মধ্যে ছুটির হুজুগ তোলার জন্য সকাল থেকেই হেডমাস্টার মশাই জগার উপর চটেছিলেন, তারপরে সে আজ স্কুল কামাই করেছে, অথচ দুপুরে হোস্টেলেও ছিল না। এখন রোল-কলের সময়েও তার পাত্তা নেইকো! আমি বেত নিয়ে হাজির হতেই, তাঁর হুকুম হল—যা, জগাকে ধরে নিয়ে আয়!

আমি ধরে আনব...জগাকে? চটেছেন বলে কি সারের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? যে-জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক, আর ফরোয়ার্ডে খেললে বিপক্ষের ব্যাকের এবং গোলকির দফা রফা, তাকে ধরে আনব কি না আমি! আর কিছু না, হাত যদি সে না-ও চালায়, কেবল যদি হাই-জাম্প আর লং জাম্পের সাহায্য নেয়, তাহলে তো ঝোপ ঝাড় খাল বিল ডিঙিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পগার পার। বিলকুল আমার নাগালের বাইরে!

কিন্তু দরকার হল না, পরমুহূর্তেই শ্রীমান জগার সাড়া পাওয়া গেল। তাকে দেখে হেডমাস্টার মশাই গর্জন করলেন—এগিয়ে এস—বলে টেবিলের উপর সপাত করে বেতটা ঝাড়লেন একবার। যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল, হেডমাস্টার মশাই যেখানে বেত ঝাড়লেন ঠিক তারই উপরে সহসা কড়িকাঠ থেকে সশব্দে একটা চাপড়া খসে পড়ল। একাশি-জোড়া বিস্ফারিত চোখ মেলে আমরা দেখলাম তা বালির চাপড়াও নয়, টালির টুকরাও না—আস্ত একটা মড়ার মাথার খুলি।

হেডমাস্টার মশায়ের হাত থেকে বেত খসে পড়ল; আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভয়ে চিৎকার করে উঠল—তারপর সব নিস্তব্ধ। কারো যেন নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

হেডপণ্ডিত মশাই প্রথম কথা কইলেন—আজ তিথিটা কি হে? ত্রয়োদশী—কই তিথি দোষ তো নেই। তবে বেস্পতিবারের বারবেলা বটে। দাও তো হে মাথার খুলিটা, ওটা আমার কাজে লাগবে।

স্কালটা হাতে নিয়ে, গম্ভীরভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেডপণ্ডিতমশাই তান্ত্রিক

মানুষ, কালী-সাধনা করেন। অমাবস্যা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে শ্মশানে তাঁর গতিবিধি আছে বলে কানাঘুষা। কে জানে, ওই খুলিটা তিনি কোন্ কাজে লাগাবেন।

ততক্ষণে হেডমাস্টার মশাই সামলে উঠেছেন, কম্পিত কণ্ঠের ভেতর থেকে তাঁর বাণী শোনা গেল—যাও সব, পড়তে বসগে, হৈ-চৈ কোরো না।

বলা বাহুল্য, আমরা হৈ-চৈ করছিলাম না, তা করবার মতো উৎসাহ তখন আমাদের কারো মধ্যেই ছিল না। নীরবে আমরা যে যার সিটে গিয়ে বই খুলে বসলাম; কিন্তু পড়ব কি, সবার বুকের মধ্যে কি রকম যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। দুরু দুরু বুকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই কি যেন আবছায়া দেখি। এক নিমেষে অত লোকজনভরা অতবড়ো বোর্ডিং যেন একেবারে ভূতের রাজত্ব হয়ে উঠল।

সে-রাত্রে আর পড়াশুনা হল না; হেডমাস্টার মশায়ের হুকুমে তাড়াতাড়ি দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছেলেরা সব শুয়ে পড়ল। আমি হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে থাকতাম, তিনি নিজের মশারি খাটানো সেরে আমার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে বললেন, আলোটা জ্বালা থাকলে কি তোমার ঘুমের খুব অসুবিধা হবে, শিবু?

—না সার।

—অন্ধকার ঘরে তুমি ভয় পেতে পারো কিনা, তাই বলছিলাম। নইলে আমার কোনো দরকার নেই। নিভিয়ে দিই তাহলে, কেমন?

—দিন তবে।

কিন্তু জ্বালানো থাকলেই যেন ভালো ছিল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাদের যেন ছায়ামূর্তি দেখতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, এই বুঝি চৌকির তলা থেকে কে পা-টা টেনে ধরে! যতদূর গোটানো সম্ভব পা-দুটো গুটিয়ে নিয়েছি, হাতের তালু আর পায়ের চেটো প্রায় আমার একাকার এখন। এইভাবে একটু তন্দ্রা আসছিল যেন, হঠাৎ কখন চিৎকার করে উঠেছি। ঘরের অপর দিক থেকে হেডমাস্টার মশায়ের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল—কি হল, কি হল শিবু?

—কার যেন হাত ঠেকল আমার কপালে।

—অ্যাঁ?

খানিকক্ষণ উভয়ের আত্মসংবরণ করতে গেল। অবশেষে বুঝতে পেরে বললাম, আমারই নিজের হাত মাস্টারমশাই।

—তাই ভালো! আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে। তুমি যে রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলে! কেবল ভয়ের কথা ভাবছ বুঝি তখন থেকে?

—না সার।

খানিক বাদে আবার হেডমাস্টার মশায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। —শিবু, কাগজের গাদাগুলো কে যেন হাঁটকাচ্ছে না?

ভয়ে আমার গলা থেকে শব্দ বেরুল না।

—বোধহয় ইঁদুর। কিছু ভেব না, ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমিয়ে পড়ব কি, খানিক বাদে যা কাণ্ড শুরু হল, তাকে ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর



কিছুই বলা যায় না। বাইরের উঠোনময় কারা যেন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কে যেন রান্নাঘরের কোণের ছাইগাদায় বসে গোঙাচ্ছে, আবার ঠিক আমাদের ঘরের বাইরেই চট-পট করে হাততালির আওয়াজ! কিয়ৎক্ষণ বাদ আমাদের জানালার খড়খড়িগুলো যখন খুলতে আর বন্ধ হতে শুরু হল, হেডমাস্টার মশাই একলাফে আমার বিছানায় এসে বসলেন!

আমি এতক্ষণ মড়ার মতো পড়েছিলাম, সার আসতে সাহস হল। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কি হবে শিবু?

আমার ততক্ষণে সাহস অনেক বেড়েছে; এমনকি তখন আমার ভয় করতেই ভালো লাগছিল। বললাম, ভয় কি সার? ভয় কীসের?

—না না, আমার আবার ভয় কি? তোমার জন্যই ভাবছি—

—আপনি আমার কাছে বসে থাকুন, তাহলেই আমার আর ভয় করবে না।

—সেই ভালো শিবু। রাত তো আর বেশি নেই, দুজনে বসে বসেই কাটিয়ে দিই।

হেডমাস্টার মশাই কতক্ষণ বসেছিলেন জানি না, আমি কিন্তু বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সারা উঠোনময় মড়ার হাড়গোড় ছড়ানো। কিন্তু সকালবেলায় হেডমাস্টার মশাইকে দেখে রাত্রের লোকটিকে আর চেনাই যায় না। তিনি ভয়ানক হাঁক-ডাক জুড়ে দিয়েছেন—এসব হচ্ছে দুষ্টু লোকের কাজ! ভূত আবার আছে নাকি? ভূত আমি মানিনে। এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি; পুলিশের কাছে বাবা চালাকি নয়, সব ধরা পড়ে যাবে।

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? পুলিশে খবর দেবেন দিন, কিন্তু ভূত নেই এ কেমন কথা? ভূত অবশ্যই আছে তবে তাকে ভয় করবার কিছু নেই, একথা আপনি বলতে পারেন বটে।

—যান যান, আপনি আর কথা কবেন না। ফি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে কী যে করেন, আপনিই তো এসব উপদ্রব টেনে এনেছেন!

অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে হেডমাস্টার মশাই, বোধ করি, থানাতে খবর দিতেই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে আমাকে ডেকে বলে গেলেন, ঘরের কোণে যত সব পুরোনো কাগজের জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে, সব সাফ করে কাগজওয়ালাদের বিক্রি করে দাওগে। নইলে ইঁদুরের দৌরাত্মে রাত্রে তো চোখ বুজবার জো নেই।

কাগজের গাদা নাড়তে গিয়ে দেখি, কী সর্বনাশ, তার তলায় এত হাড়গোড় আর মড়ার মাথার খুলি! এসব কে জড়ো করল এখানে? আমি ভয়ে-বিস্ময়ে ভ্যাবাচাকা—এমন সময়ে জগা দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকল এসে।

—খবরদার, কাগজের গাদায় হাত দিবিনে বলছি! ও বাবা, এর মধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে? যাক, কাউকে বলিসনি। বললে তোকে আস্ত রাখব না!

—এ সব কি ব্যাপার, জগাদা?

কাগজের গাদা আবার আগের মতো ঠিকঠাক করে রেখে আমার হাত ধরে জগা বলল, আয়, তোকে সব বলছি।

তার সমস্ত কীর্তি-কাহিনী ব্যক্ত করে রুমালে বাঁধা একটা জিনিস আমার হাতে দিযে বলল, এখন কথা শোন। এটা যেন দেখিসনে। হেডমাস্টার মশাই শুয়ে পড়লে আস্তে আস্তে তাঁর মশারির চালে এটা রেখে দিবি, রুমালটা খুলে নিবি অবিশ্যি। পারবি তো? যদি পারিস, তাহলে কাল থেকে আমাদের ভ্যাকেশান—একেবারে অব্যর্থ।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম—খুব পারব।

সেদিন ভোররাতের দিকে হেডমাস্টার মশাই এক দারুণ চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর আর্তনাদে, আমার কেন, বোর্ডিং সুদ্ধ সবার ঘুম ভেঙে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বললেন, শিবু, শিবু, আলো জ্বাল—শিগগির...শিগগির।

—কি হয়েছে সার?

—বলছি, আলো জ্বাল আগে। মশারির মধ্যে কে যেন—

—সে কি?

—কার সঙ্গে যেন মাথা ঠুকে গেল—

মনের ভ্রম নয় তো সার? কালকের আমার মতন?

—না—না। মাথাটা ফেটে যাবার জোগাড়—আর মনের ভ্রম! আলো জ্বাল, এঃ, কপালটা ফুলে উঠেছে একেবারে!

আলো জ্বাললাম। ততক্ষণে ঘরের বাইরে বোর্ডিং-এর ছেলেরা মাস্টাররা সবাই জড়ো হয়েছে। হেডপণ্ডিত মশাই পর্যন্ত খড়ম খট খট করে উপস্থিত। লণ্ঠন ধরে দেখা গেল মশারির চালে একটা আস্ত মড়ার মাথা!

হেডপণ্ডিত বললেন, ওমা! এ যে টাটকা দেখছি, মায় দাড়ি সমেত! কারো মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুল না; তিনিই মাথা নেড়ে আবার বললেন, হুঁ, তা তো হবেই, কাল চতুর্দশী ছিল যে! আজ অমাবস্যা আছে আবার!

চতুর্দশীতেই এই মাথা-ঠোকাঠুকি ব্যাপার, অমাবস্যাতে না জানি কি কাণ্ড হয়! ভাবতেই সবার হৃৎকম্প হল!

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, একে শনিবার, তায় অমাবস্যা! আজ একটা গুরুতর কথা বটে!

ছোটো ছেলেদের মধ্যে অনেকে কেঁদে ফেলল, দু-একজনের মূর্ছার উপক্রম হল। জগা মুখখানা অতিমাত্রায় কাঁচুমাচু করে বলল, সার, আমাদের ছুটি দিয়ে দিন, আমরা বাড়ি চলে যাই, নইলে এখানে থাকলে আমরা বাঁচব না!

হেডমাস্টার মশাই বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি। আজ সকালেই যে যার বাড়ি চলে যাও। আমিও সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরি। চতুর্দশীতে মাথা ঠুকে ছেড়ে দিয়েছে, অমাবস্যায় যদি ঘাড় ধরে মটকে দেয়! কাজ নেই!

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি কোনো মহাপুরুষ তান্ত্রিক যোগী সন্নিকটে কোথাও সাধনা করছেন, এই ভৌতিক উপদ্রব তাঁর সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠান—তাছাড়া আর কিছু না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

জগা বললে, আমারও তাই মনে হয় পণ্ডিত মশাই। কোনো মহাপুরুষ কার্যসিদ্ধির জন্য—

পণ্ডিত মশাই তার সায়-দেওয়াকে ঠাট্টা মনে করে বললেন, হ্যাঁ, তুই তো সব জানিস। তুই থাম!

ঘটোৎকচ-বধ

সেই বছরই সে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল।

যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা তার উপরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—চুলে তেলও দিত না, চিরুনিও না। রুক্ষ রুক্ষ চুলে তাকে দেখাতো ঠিক গুন্ডার মতো। নামটাও তার বিদঘুটে, সেটা মনে রাখা বা মুখে আনা সহজ ছিল না। উপাধি ছিল ঘটক, সবাই তাই ধরেই তাকে ডাকতো।

আমি বলতাম, ঘটক না ঘটোৎকচ! সেটা অবশ্য মনে মনে।

তার সঙ্গে বিবাদ করা তো বিপজ্জনক ছিলই, বন্ধুত্বও নিরাপদ ছিল না।—কি রে ভালো আছিস? বলে সে যখন বন্ধুর পিঠে বিরাশি-সিকের আদর বসাতো তখন তার জবাবে ভালো আছি জানানো নেহাত মিথ্যা কথা হত। বরং 'হ্যাঁ, একটু আগে ছিলাম' বললেই যথার্থ উত্তর হত। অকস্মাৎ অমন কিল খাওয়ার পর মানুষ কখনো ভালো থাকতে পারে?

নিঃস্বার্থভাবে চড়-চাপড় বসানো ছাড়াও তার আরও গুণ ছিল। ক্লাসের প্রায় প্রত্যেক ছেলের একটা করে অদ্ভুত নাম সে বের করেছিল। সেই নামে তাদের ডাকতো—যাকে ডাকা হত তখন সে ছাড়া আর সবাই খুব হাসতো। একদিন সে আমাকেই ডেকে বসল—কিগো লটপট সিং কি হচ্ছে?

নতুন নামে দস্তুরমতো আপত্তি ছিল আমার। বিশেষ করে এতে আমার চেহারার প্রতি কটাক্ষ ছিল, কেন না ভারী রোগা ছিলাম আমি। কাজেই আমার রাগ হয়ে গেল। বলে ফেললাম, আর তুমি কী? তুমি যে আস্ত একটি ঘটোৎকচ!

বলে ভালো করলাম না। সেটা পরমুহূর্তেই টের পেলাম। টের পেলাম নিজের পিঠে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আমি আদপেই পছন্দ করি না।

তখুনি কিন্তু আমি তার শোধ তুলেছিলাম। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে। সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজির, কিন্তু আমাদের ইংরেজির সার সেদিন স্কুলে আসেননি। ক্লাসে ভারী গোল হচ্ছিল, তাই হেডমাস্টার মশাই নিজে আমাদের ক্লাস নিতে এলেন। ঘটোৎকচ নিজের সিট ছেড়ে চলে এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশেই বসে পড়ল।

হেডমাস্টার মশাই তাকেই প্রথম প্রশ্ন করলেন, মুখে মুখে ট্রানস্লেট কর, ক্লাসে বড়ো গোল হচ্ছিল।

সে আমার হাত টিপে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, গোলের ইংরেজি কীরে? আমি চুপি চুপি উত্তর দিলাম, রাউন্ড।

—আহা সে গোল নয়...গো—ল

—কি গোল? ফুটবল খেলার গোল? সে তো জি-ও-এ-এল।

—দূর ছাই, তা নয়—

হেডমাস্টার মশাই তাড়া দিলেন, সোজা ট্রানস্লেশন, এত দেরি কীসের?

উপায় না দেখে সে বলে ফেলল—There was much rounds in the class

হেডমাস্টার মশাই এত অবাক হয়ে গেলেন যে তাকে কিছু না বলে আমাকে বললেন তার কান মলে দিতে। তার পর তাকে ছেড়ে আর সব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কান মলে দিতে দিতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, much নয়, ওটা big rounds হবে—বড়ো গোল কিনা।

সে-কথা কানে না তুলে সে বললে, যা জোরে মলেছিস, আচ্ছা, দেখব তোকে ছুটির পর।

সমস্ত ক্লাস ঘুরে আবার তার পালা এল, হেডমাস্টার মশাই তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি ওই কাপড়টি পরি,—পারবে এটা?

বড়ো রকমের ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ।

বলল এবং উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু তার পরে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মুখ নড়তে থাকে কিন্তু মুখ আর খোলে না। ভাবটা যেন এই যে এর অনেক রকম উত্তর তার জিভের গোড়ায় এসেছে, কিন্তু কোনটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না দেখে সে আমাকে একটা চিমটি কাটল, নিচু গলায় বলল, কাপড় পরা কি হবে রে?

—না, আমি বলব না। তুমি যে ছুটির পর আমাকে দেখাবে বলেছ।

—না ভাই, দেখাব না, তুই লিখে দে।

আমি তার রাফ-খাতাটা টেনে নিয়ে দেখার সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড়ো বড়ো ছাঁদে লিখলাম—কাপড় পরা—to read the cloth

সে তখন চটপট উত্তর দিল; আই রিড দ্যাট ক্লথ।

হেডমাস্টার মশায়ের বিস্ময় তখন সপ্তমে উঠেছে—আঁ? কাপড় পরার ইংরেজি তুমি জানো না; পরার ইংরেজি! পরা!

পড়ার ইংরেজি? পড়া—পড়া? ও। মনে পড়েছে—to fall!

Stand up on the bench সমস্ত ঘণ্টা থাকবে, নেমেছ কি ফাইন।—বলে হেডমাস্টার মশাই চলে গেলেন। ক্লাসসুদ্ধ সবাই ঘটোৎকচের এই দুরবস্থাটা উপভোগ করলাম। যখন তখন মুষ্টিযোগের জন্য আমরা কে না ওর উপর চটা ছিলাম?

বলা বাহুল্য, সেদিন শেষ পিরিয়ডে আমার বেজায় পেট কামড়াতে লাগল। ক্লাস-টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি, ঘটোৎকচ বইয়ের আড়াল থেকে ঘুষি দেখাল। ভাবখানা যেন এই—বড্ড ফসকে গেলি আজ। তা বলে তোর নিস্তার নেই!

তার পরদিন কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভারী ভাব হয়ে গেল। হলও খুব অদ্ভুত রকমে।

বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে একটা ছারপোকা ভারি কামড়াচ্ছিল আঙুলে, অনেক কষ্টে ওকে খুঁজে বের করে খতম করতে যাচ্ছি, সে বলে উঠল, আহা আহা, মারিস নে, মারিস নে, মরে যাবে। অমন করে বেচারাকে মারিস নে।

সহপাঠীর প্রতি যে এত নিষ্ঠুর, ছারপোকার প্রতি তার এমন মমতা! বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে কি করব একে? মাটিতে ছেড়ে দি?

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে না না, পালিয়ে যাবে যে! দাঁড়া। ...আহা বেশ ছারপোকাটি তো। কেমন মোটাসোটা! নধর নধর। বেশ চাকন চিকন! দেখতেও চমৎকার! গায়ের রঙে কালচে লাল আর লালচে কালো একসঙ্গে মিশ খেয়েছে। এ রকম আমার একটিও নেই।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—বলে কি এ?

—ছারপোকাটা দিবি আমায়? তাহলে আর তোকে মারব না। কোনোদিন না।

আমি বললাম, এক্ষুনি, এক্ষুনি। যেখানে তোমার খুশি একে নিয়ে যাও।

খুব আনন্দিত হয়ে পকেট থেকে একটা বেঁটে চেহারার গোলমুখো শিশি সে বার করল। ও বাবা! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা! লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার তো বটেই! আমার উপহারটিকে সযত্নে তার মধ্যে পুরে নিয়ে বলল—এতেই ধরে রাখি ওদের। আমার অনেক দিনের পোষা!

—পাখি, খরগোশ এসব লোকে পৌষে দেখেছি। ছারপোকা আবার কেউ পোষে না কি?

—ছারপোকার তুই কি জানিস? আমি অনেক দিন থেকে ওদের সঙ্গে মিশছি, ওদের নাড়ী-নক্ষত্র সব আমার জানা। ওদের বুদ্ধির কথা ভাবলে—

কিন্তু টিচার ক্লাসে এসে পড়ায় ছারপোকার কাহিনী মাঝখানেই তাকে থামাতে হল। সেজন্য সে ক্ষুণ্ণ হল বিশেষ।

টিফিনের সময় পাশের গ্রামের টিম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে। ওরা ভারী গোঁয়ার—হারতে থাকলেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, বল ছেড়ে অপর দলকে ধরে পিটতে শুরু করে দেয়। গত বছর আমাদের বেচারামের পা ভেঙে দিয়েছিল, তার স্কোরেই ওরা one-nill-এ হেরে যায়। তাই ওদের সঙ্গে খেলতে আমাদের উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু ঘটোৎকচ বলল, আরে এবার আমি আছি। ভয় কীসের। সব তুলো ধুনে দেব।

কিন্তু মাঠে গিয়ে ঘটোৎকচ হল গোলকিপার। আমরা বললাম, না-না, তুই আমাদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডে আয়।

সে বললে—আরে এখন কি! খেলা শেষ হোক না! তখন ধুনে দেব।

বেচারামের কথা আমার মনে পড়ল! বেচারার পা সেরেছে বটে কিন্তু জীবনে তাকে বল ছুঁতে হবে না। অবশ্য পা-ভাঙাকে আমি কেয়ার করি না, আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকা তো! কিন্তু আসছে হপ্তায় মামার বাড়ি যাব যে—। আমি প্রার্থনা

করতে লাগলাম যেন আমরা হেরে যাই, নেক গোল খেয়ে এমন ঢোল হারা হারি যে, ওরা খুশি হয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

কিন্তু হারব যে তার কোনো উপায় দেখা গেল না। ওরা বল নিয়ে এগুতেই পারে না—এগোনো দূরে থাক, নিজেদের গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুশকিল! বিপদ অনিবার্য দেখে আমি খুব সাবধানে খেলতে লাগলাম—পাছে ওদের না গোল দিয়ে ফেলি। আমাদের কেউ শুট করেছে, তাতে গোল নির্ঘাত—বাধ্য হয়ে আমাকে বল আটকে গোল বাঁচাতে হয়। কর্ণার হতে যাচ্ছে, ওদের হয়ে কর্ণারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই!

কিন্তু কপালের লেখন খণ্ডাবে কে? ভাবলাম এবার আস্তে একটা শুট করি, গোলকিপার অনায়াসেই তা আটকে ফেলবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বলটাই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওরা যেমন করে আমাকে ছেঁকে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে ব্যাকের সঙ্গে আমাকে জায়গা বদল করতে হল। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু পা বাঁচাতে হবে তো! মামার বাড়ি রয়েছে।

গোল খেয়ে ওরা একটু গোঁ করে খেলতে লাগল। দু-একবার বল নিয়ে এগিয়েও এল, কিন্তু গোল দেবার কোনো লক্ষণই তাদের দেখলাম না। দৈবাৎ যদি গোলটা শোধ হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। খেলা সেরে আমাদের ফিরতে তো সন্ধে,—হারলে ওরা কি আর আস্ত ফিরতে দেবে?



অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা শুট করল গোলের মুখে। ঘটোৎকচ ভাবল আমি শুট ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি দেখলাম এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। বলটা ছেড়ে দিয়ে ঘটোৎকচকে এমনভাবে আড়াল করলাম যে আটকাবার কোনো সুবিধাই সে পেল না।

গোল দিয়ে ওরা যা লাফাতে লাগল—সে এক দৃশ্য। দেখে আমার আনন্দ হল। তারপর শেষ দশ মিনিট দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা আমাদের চেপে রইল। কোনো রকমে আর একটা গোল খেলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাবলাম আশা সফল হবে, কিন্তু এমনি ওদের শুট করার কায়দা যে গোলে মারলে সে বল গোলপোস্টকে সেলাম ঠুকে দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না, নিজেই নিজের গোলে শুট করে দিলাম। আমিও গোল দিলাম আর খেলাও ওভার হল।

ওদের হাত থেকে তো কোনো গতিকে বাঁচলাম, কিন্তু পড়লাম ঘটোৎকচের কবলে। গোড়ায় জিতিয়ে আমিই শেষে ডুবিয়ে দেব, এমনটা ও আশা করেনি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ভাই, খেলা আর পরীক্ষা, ও-দুটোই হচ্ছে 'লাক'! পড়লে-শুনলেও কিছু হয় না, ভালো করে খেললেও নয়। এই তো তুমি এত পড় কিন্তু কাল ক্লাসে হেডমাস্টারের কাছে—! বরাত ভাই, বরাত!

কিন্তু ও কি বোঝবার ? ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে, এমন সময়ে সাঁই করে কোত্থেকে একটা ইট এসে পড়ল। তারপর আর একটা। ভেবেছিলাম জিতলে ওদের রাগ পড়বে, হয়তো সন্দেশ খাওয়াবে, কিন্তু শেষে কি না জলযোগের বদলে এই ইট-যোগ! আমরা আর কোনো দিকে না চেয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে শুরু করে দিলাম।

খানিক দূর দৌড়ে দেখি আর ইট আসছে না।, কিন্তু ঘটোৎকচ কই? সে তো আমাদের সঙ্গে নেই। তবে কি সে একাই তাদের তুলো ধুনতে লেগে গেছে না কি? যা গোঁয়ার সে—সব পারে। ফিরলাম তার খোঁজে। দেখি, সে এক গাছে উঠে বসে আছে। আমরা কোথায় ছুটে মরছি আর সে কি না নিরাপদে গাছে চেপে অবলীলাক্রমে তাদের ইট চালানো আর আমাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখছে মজা করে। আমাদের দেখে সে গাছ থেকে নামল। নেমেই আমার দিকে চেয়ে বলল, কাল ইস্কুলে এর শোধ তুলব। তারপর সমস্ত রাস্তা আর কোনো কথাই সে বলল না।

পরদিন আমি ক্লাসে গেলাম ইস্কুল বসে গেলে পরে। আমি যাবা মাত্রই ঘটোৎকচ কটমট করে আমার দিকে চাইল, তারপর টিচারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদেই সে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে নিজের জায়গায় না গিয়ে বসল এসে আমার পাশে। আমি মনে মনে কাঁপতে লাগলাম এই বুঝি কোপ বসায়।

মাস্টার মশাই ক্লাসে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু করতে পারছিল না, কিন্তু যা এক-একটা রাম-চিমটি কাটছিল তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল মাস্টার মশাই চলে গেলে ওর কিলগুলো কি আন্দাজের হবে। আত্মরক্ষার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে ওর পকেট থেকে ছারপোকার শিশিটা বার করে নিলাম। সুযোগ বুঝে ছিপি

খুলে তার অর্ধেক ছারপোকা ওর মাথায় ছেড়ে দিয়ে আবার শিশিটা তেমনি ওর পকেটে রেখে দিলাম।

একটু পরেই ঘটোৎকচ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার দারুণ চিৎকার! তার পরেই সে দু হাতে ভীষণভাবে মাথা চুলকাতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে টীচার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, হল কি তোমার?

ক্লাসের সব ছেলে অবাক হয়ে ওকে দেখছিল, বিকৃত মুখে ও জবাব দিল, ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

—চুল ছিঁড়লে কি মাথা কামড়ানো সারে? যাও, জল-খাবারের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক গে।

—মাথার ভেতরে নয়, বাইরে সার।

—বাইরে মাথা কামড়াচ্ছে, সে আবার কি? মাথার বাইরে মাথা কামড়ায়?

ততক্ষণে ঘটোৎকচ ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে তখন তার মস্তক পরীক্ষায় লাগা গেল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে বাঘ কি ভালুক কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। ছারপোকারাও ছিল অনেক দিনের উপোসী—ছাড়া পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে কামড়াচ্ছিল।

গোলমাল শুনে হেডমাস্টার মশাই এলেন, সমস্ত ক্লাস ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এলো। হট্টগোলে সেদিন ইস্কুল গেল ভেঙে, কিন্তু ঘটোৎকচের লম্ফঝম্ফ দেখে কে! ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনিও এই নতুন ধরনের মাথা-ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

অবশেষে এল নাপিত। কিন্তু মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ, তার অমন সাধের চুল—বোধহয় ছারপোকার পরেই সে ভালোবাসে চুলকে। কিন্তু চুল না গেলে প্রাণ যায়, তাই অগত্যা ন্যাড়া হতে হল তাকে।

পরদিন ঘটোৎকচকে আর চেনাই যায় না। চুলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। সে আর মুখও চালায় না, হাতও নয়। শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর গোবেচারা—একেবারে আলাদা লোক। চুলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথা কাটা গেছল।

ছারপোকার নাড়ী-নক্ষত্র সব সে জানতো, কিন্তু তবু একটা বিষয় তার জানা ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতক—যে আশ্রয় দেয়, এমনকি যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাকেও ওরা কামড়াতে ছাড়ে না, তারও সর্বনাশ ওরা করতে পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা-বোধ ওদের নেই,—এটা সে আগে জানতো না। তাই ওদের এই ব্যবহারে ওর হৃদয়ে লেগেছিল। আর হৃদয়ে আঘাত লাগলে মানুষের বুঝি এমনি হয়।

মাতুলতা

আজ ঝুনকুদের দুর্দশার কাহিনী তোমাদের বলব। ঝুনকুদের দুর্দশার কারণ তার মামা। ঠিক মামা নয়, মামার প্রতিভাই তাদের দুর্বিপাকের মূল। কিংবা মামা সম্প্রতি যে সেলাইয়ের কল কিনেছেন, সেইটা।

মামার নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ নাম হলেই তোমরা দেখবে তার এমন কোনো বন্ধু আছে যে নিতান্ত গোঁয়ার—যার সঙ্গে মিলে তার দ্বন্দ্বসমাস। যদি নেহাতই তেমন কোনো বন্ধু না থাকে, তাহলে সে নিজেই গোঁয়ার হয়ে কর্মধারয় সমাসে কাজ চালিয়ে নেয়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, ঝুনকুদের মাতুল একাধারে গোঁয়ার-গোবিন্দ।

প্রতিভা থাকার বিপদ ভয়ানক, যার প্রতিভা—বিপদ ঠিক তার নয়, বিপদ হয় পরিবারবর্গের, প্রতিভার ধাক্কা যাদের সামলাতে হয়। প্রতিভা যত বিরাট তার ধাক্কাও তেমনি দারুণ। এক, প্রতিভা থাকাই ভয়ের কথা, তার উপরে যদি আবার গোঁ থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। বরাহ অবতারে ভগবানের মধ্যে এ দুটোর সমন্বয় ঘটেছিল, যার ফলে তিনি দাঁতে করে জলমগ্ন পৃথিবীকে আকাশে তুলেছিলেন। আজকালকার গোঁ-শীল প্রতিভারাও নিজের গুঁতোর চোটে পৃথিবীকে ঊর্ধ্ব-মার্গে তুলতে চান।

যেমন ঝুনকুদের মামা। অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও গোঁ এখনো পৃথিবী ব্যাপক হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? ছোটো বীজ থেকেই তো বনস্পতি চারিদিকে ডালপালা ছড়ায়? কিন্তু পৃথিবীর দিকে মামার প্রতিভাটা ছড়িয়ে পড়লে ঝুনকুরা আশ্বস্ত হয়,—যদিও তাতে বাঁচন নেই, তবু সবাই চারিয়ে মার খেলে লাগে কম। এমনকি, ভালোই লাগে বরং।

প্রতিভার লক্ষণ কি কি, বলতে পারো? প্রথমত, সে হবে পায়োনিয়ার—একটা বিশিষ্ট অগ্রদূত। দ্বিতীয়ত, সে হবে ওরিজিনাল—তার সাধনার ধারায় থাকবে মৌলিকতা। তৃতীয়ত, তাকে পাগল বলে আর সকলের সন্দেহ হবে। বলা বাহুল্য, এই সন্দেহসূচক লক্ষণটি তার আশেপাশের লোকদের মধ্যেই প্রকাশ পাবে, তার নিজের মনে এমন কোনো সন্দেহ থাকবে না। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে গোবিন্দ যে বিলক্ষণ প্রতিভার অধিকারী তার পরিচয় সে বাল্যকাল থেকেই দিচ্ছে।

গোবিন্দ তখন নিতান্ত বালক, তার বৌদির বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব এলো। মা যখন তত্ত্ববাহক ও বাহিকাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত এবং তাঁর সমালোচনা যখন ক্রমশই হয়ে উঠছে, সেই অবসরে গোবিন্দ তার থেকে সব রকম খাদ্য-সামগ্রীর কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে একেবারে ছাদে গিয়ে হাজির। মা সেটা লক্ষ করেছিলেন,

গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন—খাবারগুলো কেমন দিয়েছে রে? পচা বোধ হয়!

ততক্ষণে গোবিন্দর পেটে গিয়ে হজম হয়ে সেগুলো পুরাতত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সাগ্রহে উত্তর দিল—না মা, খুব ভালো!

নিমকহারামি বরং করা চলে, কিন্তু সন্দেশ-হারামি? না, গোবিন্দর মন অত ছোটো নয়। মা বললেন, হ্যাঁ ভালো না ছাই!

—না মা, খুব চমৎকার। তুমি খেয়ে দেখো। কিন্তু ওই যে লম্বা লম্বা, ভেতরে সুতোওলা, ওরও একটা খেলাম। খুব খারাপ নয়, তবে মিষ্টি যেন একটু কম। চিনি দিয়ে খেতে হয়।

—অ্যাঁ? সর্বনাশ করেছে! ও খেলি কি রে? ও যে মোমবাতি!

—মোমবাতি? তা হোক, খেতে কিন্তু বেশ মা।

গোবিন্দ ছেলেবেলা থেকেই কেমন সপ্রতিভ, এই বৃত্তান্ত থেকেই তোমরা তার প্রমাণ পাবে। মাংসভুক, শস্যভুক, এমনকি বায়ুভুক, পর্যন্ত প্রাণী আছে, কিন্তু মোমভুক কোনো জীব পৃথিবীতে ছিল না। ভাবিকলের অনাগত সেই মানুষদের গোবিন্দই অগ্রদূত। কিন্তু কেবল ওই অগ্রদৌত্যই নয়, গোবিন্দর বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় ছেলেবেলাতেই পাওয়া গেছল।

জিওগ্রাফির একট, প্রশ্ন ছিল—কি করিয়া দিন এবং রাত্রি হয়, উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া বল।

পরীক্ষার খাতায় গোবিন্দ লিখল, 'যখন বাঘাটা কানের কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে এবং আমি বাঁ চোখটা আধখানা খুলে দেখি টেবিলের উপর চা আর বিস্কুট রয়েছে তখন বুঝতে পারি দিন হয়েছে। আর যখন আমরা লাট্টু ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরি তখন রাত্রি হয়।'

পরীক্ষক মশাই এই মৌলিক গবেষণার মর্ম বুঝতে না পেরে খাতার উপরে লাল পেনসিলে লিখে দিয়েছিলেন—M A D। সব বিষয়ে প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর এমনি মূল্যবান হওয়ার ফলে গোবিন্দর সে-যাত্রা আর প্রোমোশন হল না। পৃথিবীতে প্রকৃত প্রতিভাবানকে কজন বোঝে?

বাবা দূরদেশে চাকরি করতেন। সেখান থেকে গোবিন্দকে লিখলেন, পাস করেছিস তো?

গোবিন্দ সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে চিঠিতে একটা ছবি এঁকে পাঠিয়ে দিল। এবং পাছে ছবিটা বুঝতে বাবার অসুবিধা হয়, এইজন্য তার নীচে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে দিল—হাতি আঁকিলাম।

মানে গোবিন্দ হয়তো বলতে চেয়েছিল—পাস করেছি না হাতি! প্রতিভাবান লোকেরাই এমন স্পষ্টবক্তা হয়।

এ সব ইতিহাস তার ছোটোবেলার—এখন ঝুনকুদের দুর্দশার কাহিনীতে আসা

যাক। কিছুদিন আগে গোবিন্দর ধারণা হয়েছিল যে চুল ছাঁটার প্রতিভা তাঁর আছে। তারপরেই তিনি এক নাপিতের কাছ থেকে একখানা ভোঁতা কাঁচি জোগাড় করে ভাগনেদের মাথার দিকে মনোযোগ দিলেন। চুল বড়ো হোক আর না হোক, তাঁর যদি সন্দেহ হয় যে কারো চুল বড়ো হয়েছে, আর রক্ষে নেই! অমনি তিনি তার ঘাড় ধরে চুল ছেঁটে দেবেনই! এমনি কায়দার তাঁর চুল ছাঁটা যে দু পাশ কিছুতেই সমান হবে না, মাঝে মাঝে খপচানো থাকবে, এমনও হতে পারে যে সামনের দিক খুব ছোটো হয়ে গেল পেছন দিকের তুলনায়। মামার দৃষ্টি এড়িয়ে ভাগনেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কিন্তু মামা দেখতে পেলেই ধরে বসেন—আয়, তোর চুল ছেঁটে দি!

—এই সেদিন কাটালাম যে, এখনো বড়ো হয়নি মামা!

বড়ো হয়নি কি রে? আর কত বড়ো হবে! তালগাছ হবে না কি?

যদি কেউ বাইরে নাপিতের কাছে চুল ছাঁটিয়ে আসে, মামা একবার তাকালেই তা টের পাবেন। না, এ তো তাঁর হাতের নয়, তাঁর ছাঁটা কখনো এত খারাপ, এমন বিশেষত্বহীন হতে পারে না! অমনি সেই চুলকে দুরস্ত করতে তিনি পুনরায় কাঁচি ধরবেন! মানে, কিছুতেই মাথা বাঁচানোর উপায় নেই!

মাথার উপর অত্যাচার তো রয়েছেই, তার উপর গোবিন্দ সম্প্রতি একটা সেলাইয়ের কল কিনেছেন। পোশাক তৈরির ব্যাপারেও নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেবেন, আপাতত এই তাঁর বাসনা। বাজারের তৈরি সমস্ত জামা বাতিল করে তিনি নিজে ঝুনকুদের শার্ট-পাঞ্জাবি সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। প্রতিভার দস্তুরই এই যে, সে সর্বদা নতুন পথ কেটে চলে।

সৃজন-প্রতিভা জিনিসটাই মারাত্মক, বিশেষ করে খাবার-দাবার আর পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে। মামার তৈরি জামা পরতে ঝুনকুদের কান্না পায়। তাদের ক্লাসের ছেলেরা হাসে, জিজ্ঞাসা করে—কোন দোকানের ভাই? দোকানের নাম তো করতেই পারে না, মামার তৈরি বলতেও তাদের লজ্জায় বাধে।

সে-সব জামার অদ্ভুত ছিরি, অদ্ভুত ছাঁদ! কোনোটা বা সার্টের হাতা, পাঞ্জাবির ঝুল—কোনোটা পাঞ্জাবির হাতা, শার্টের ঝুল। কোনোটার বা ডান-দিকের চেয়ে বাঁ-দিকটা বেশি ঝোলা। কোনোটাতে হাত গলানো যায় না, কোনোটাতে মাথা গলানোই মুশকিল! কোনোটার আবার ঘের এত কম যে, দস্তুরমতো মারামারি করে পরতে হয়। তার উপরে বোতামের ছেঁদাগুলো এত ছোটো ছোটো যে বোতাম আঁটাই এক ধস্তাধস্তি ব্যাপার।

একদিন ঝুনকুর দিদিমা গোবিন্দকে ডেকে বললেন, আমার তাকিয়ার একটা খোল করে দিয়েছিস, বেশ করেছিস! তেলের চিটেয় তাকিয়াটা যেতে বসেছিল। কিন্তু বাছা, খোলের আবার বোতাম কেন, আর তার হাতাই বা কীসের! আমরা সেকেলে বুড়োমানুষ, জানিনে, বোধহয় আজকালকার এইটেই ফ্যাশান?

—তোমার তাকিয়ার খোল? কই আমি তো করিনি। দেখি দিকি! ...ওমা! এযে টুনকুর পাঞ্জাবি! পাজিটা তাকিয়া পরিয়ে গেছে! আচ্ছা, দেখছি হতভাগাকে!



বিনকু এসে অভিযোগ করল—মামা, আমার হাতের চেয়ে জামার হাত যে বড়ো।

ঝুনকু বলল, আমার আবার ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে লম্বা!

গোবিন্দ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছেন—নে নে, এখন হাতা গুটিয়ে পর। চিরকাল কিছু এমনি ছোটো থাকবিনে, বাড়বি তো? বড়ো হলে তখন ঠিক হয়ে যাবে।

কি করে, বেচারারা হাত গুটিয়ে পরে। একথা সত্যি, মাথায় বড়ো হলে হাতও নিশ্চয় কিছু পরিমাণে বাড়বে, কিন্তু ততদিনের অপেক্ষায় এই জামা টিকে থাকবে কিনা বলা দায়। আর তাছাড়া ডান হাত কখনো বাঁ হাতের চেয়ে বেশি লম্বা হবে কিনা তাও সন্দেহ!

ঝুনকু, বিনকু, টুনকু—তিন ভায়ের মধ্যে টুনকুই সব চেয়ে ছোটো। মামা যখন বাড়ি থাকে না, টুনকু সেলাইয়ের কল নিয়ে বসে। কলটা বেশ, চালাতে ভারী আরাম, আর কেমন আপনা-আপনি সেলাই হয়ে যায়। সে এক মজা!

টুনকু বোধহয় মামার প্রতিভার অংশ পেয়েছিল, সে টম, পুষিদের জন্য জামা তৈরি করে—এমনকি চার-পা-ওলা পেন্টুলুন পর্যন্ত। কিন্তু দেখা গেছে পোশাক পরতে তাদেরও খুব অভিরুচি নেই।

একদিন গোবিন্দ চমৎকার একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর একখানা দিশি কাপড় কিনে আনলেন। সমস্ত দিন ধরে কাপড়টা কুঁচিয়ে পাট করে রেখে মাকে ডেকে বললেন,

আজ আর রাত্রে খাব না মা! আমাদের হারাধনের বিয়ে। আজ বরযাত্রী যাব। ঝুনকু, বিনকু, টুনকু—আমার জামা-কাপড় আলনায় রইল, খবরদার কেউ হাত দিবিনে। সাবধান!

গোবিন্দ বেরিয়ে যেতেই টুনকু বলল, আয় দাদা, মামার জামাটা সেলাই করে দিই।

—সেলাই করবি কি, ও-যে সেলাই-করা।

—আরে ভালো করে সেলাই করি।

—না না, মামা বকবে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে কোঁচানো কাপড়টি পরে, হিমানি মেখে, চুলটুল আঁচড়ে, জামা পরতে গিয়ে গোবিন্দ দেখেন, জামার ভেতর দিয়ে হাত আর ঢোকে না। জোর করে গলাতে গিয়ে বগলের তলা ফেঁসে হাত বেরিয়ে পড়ল! জামার জোড়ের মুখগুলো কে সেলাই করে রেখেছে।

দারুণ ক্রোধে গোবিন্দর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল, তিনি চিৎকার করে বললেন, এ কীর্তি কার? কোন্ হতভাগার?

'কীর্তির্যস্য স জীবতি' বলে একটা কথা আছে, আরেকটা কথা আছে 'স জীবতি যঃ পলায়তে'। সুতরাং বলা বাহুল্য টুনকুর টিকি দেখা গেল না! সঙ্গে সঙ্গে ঝুনকুর এবং বিলকুরও। এদিকে হারাধন ট্যাক্সি করে এসে নীচের থেকে ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। গোবিন্দর তখন কাঁদবার অবস্থা! বিয়ে বাড়ির অত স্ফূর্তি! অমন খাওয়া-দাওয়া! তার উপর এমন সিল্কের পাঞ্জাবিটা!

জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে গোবিন্দ বলল, ভাই হারাধন! আমাকে আজ মাপ কর! হঠাৎ কেমন আমার গা-টা জড়াচ্ছে! তোমার বৌ-ভাতে কিন্তু ঠিকই যাব ভাই।

সেলাইয়ের কলটা তার বৌ-ভাতের উপহারে দিয়ে পাপ চুকোবে গোবিন্দ মনে মনে ঠিক করল।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী

দেশবিদেশ বেড়াতে তোমরা সকলেই খুব ভালোবাসো। সব ছেলেই ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের শ্রীকান্তর ভ্রমণে আনন্দ নেই, তার কাছে ভ্রমণের মানেই হচ্ছে দেড় মণ।

তার মামা ভারী কৃপণ—কোথাও যেতে হলে গোটা বাড়িখানাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কি জানি, বিদেশে কোনো জিনিসের দরকার পড়লে যদি সেটা আবার পয়সা খরচ করে কিনতে হয়! কিন্তু শ্রীকান্তর এদিকে প্রাণ যায়; সেই বিরাট লটবহর তাকেই বইতে হয় কি না! সে-সব মালপত্র গাড়িতে তুলতেও শ্রীকান্ত, গাড়ি থেকে নামাতেও শ্রীকান্ত, স্টেশনে যে কুলি নামক একজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে, একথা শ্রীকান্তকে দেখলে তার মামা একদম ভুলে যান।

কেবল কুলির কাজ করেই কি নিষ্কৃতি আছে? তাকে সারা রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির দরজায় পাহারা দিয়ে। কেন না মামার ধারণা, ওই ভাবে দরজার মুখে মাথা গলিয়ে খাড়া থাকলে সে-কামরার দিকে কেউ আর এগোয় না! এবং যে-কামরার দিকে কেউ এগোয় সেদিকে কেবল একজন নয়, সেই স্টেশনের যত ভোম্বলদাস সবাই সেই কামরাটার দিকেই ঝুঁকে পড়ে—তা তার ভেতর জায়গা থাক বা না থাক। কিছু দূরে খালি কামরা থাকলে সেদিকে তাদের যেন দৃষ্টি যায় না।

তার মামা আবার পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জারগাড়ি পেলে। যা দু-চার পয়সা বাঁচে। সময়ের আর কি মূল্য আছে বল? দু-ঘণ্টা পরে পৌঁছলে যদি দুটো পয়সা বাঁচে, তারই দাম। প্যাসেঞ্জার গাড়ি সব স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—দু-তিন মিনিট অন্তর স্টেশনা—কাজেই একটুখানি বসতে না বসতে আবার গিয়ে দরজায় দাঁড়াতে হয়। রাত্রেও ছাড়ান নেই—কেন না তখন যাতে কামরাতে স্থান-বাহুল্য না কমে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখার দরকার। তার মামা আয়েশি লোক, সারা রাত তিনি গাড়িতেও বাড়ির মতো আরাম চান—তখন যদি অনাহুত কেউ এসে তাঁর জায়গা জুড়ে বসবার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙাতে চায়, তাহলে যে কি দুর্ঘটনাই ঘটে তা শ্রীকান্ত ভেবে পায় না। কাজেই রিজার্ভ-কামরার নোটিস বোর্ডের মতো তাকে গাড়ির দরজায় লটকে থাকতে হয়।

এই সব নানা কারণে ভ্রমণে শ্রীকান্তর সুখ নেই, শখও নেই। কিন্তু না চাইলেও অনেক জিনিস আপনি আসে। হাম হোক, কে আর চায়? কিন্তু হামেশাই তা হচ্ছে। ফেল হতে আর কোন ছেলের বাসনা, তবু কাউকে না কাউকে ফেল হতেই হয়।

যেমন আজ তাকে যেতে হচ্ছে। ছ্যাকরা গাড়ির ছাদে যা জিনিস ধরে তার চার গুণ চাপানো হয়েছে, গাড়ির মধ্যে শ্রীকান্ত, তার মামা এবং মামি, আর মামাতো বোন টেঁপি। কিন্তু তারই ফাঁকে গাড়ির ফোকরেও মালের কিছু কমতি নেই,—জলের কুঁজো, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হাতব্যাগ, ছাতা, পানের ডিবে, খাবারের চাঙ্গারি, টুকরো-টাকরো কত কি? কিন্তু এগুলোর জন্য শ্রীকান্তর ভাবনা নেই, কেন না এসব টেঁপির ভার—পানের ডিবে মামিমা সামলাবেন আর খাবারের চাঙ্গারি মামা। কিন্তু গাড়ির ছাদে বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানার লাগেজ আর কাপড়-চোপড়ের বিপুলকায় হোলড-অল—ওসব এখন থেকেই যেন শ্রীকান্তর ঘাড়ে চেপে বসেছে।

শিয়ালদহ পৌঁছেই মামা সর্বাগ্রে নামলেন। নেমেই বললেন, ওগো হাতপাখাটা দাও তো! শ্রীকান্ত, মোটঘাট সব নামা। ও বাপু কোচম্যান, তুমি একটু ধর, বুঝলে? আমি টিকিটগুলো কেটে আনি।

গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কুলি এসে জুটেছিল, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাল নামাতে গেল। মামা টিকিট কাটতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কুলিদের এই অযাচিত কর্মস্পৃহা দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। বাধা দিয়ে বললেন, কি, তোমরা মাল নামাবে না কি? আবদার তো কম নয়! কেন, আমাদের কি হাত পা নেই?

একজন কুলি শ্রীকান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, ওই বাচ্চা ছেলে, ওকি সেকবে বাবু?

কেন সেকবে না শুনি? ওদের বয়সে আমরা লোহা হজম করেছি। শ্রীকান্ত, সব চটপট নাবিয়ে ফেল, ও ব্যাটাদের ছুঁতে দিসনে। যাও, যাও, একি রুটি সেকা? এখন থেকেই ওকে সব শেকতে হবে। তোমরা সব যাও।

বলে যেভাবে মাছি তাড়ায় সেইভাবে কুলিদের তাড়াবার একটা চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা নড়ল না দেখে বললেন, দেখ বাপু মালে হাত দিও না, পয়সা পাবে না আগেই বলে দিচ্ছি।

এই কথা বলে টিকিট কিনতে চলে গেলেন। শ্রীকান্তর ইচ্ছা হল একবার বলে যে লোহা হজম করা যদিবা সম্ভব হয়, সেই লোহা বহন করা তত সহজ নয়। কিন্তু বলেই বা কি লাভ, সমালোচনা করলে তো লোহার ওজন কমবে না—এই ভেবে সে আস্তে আস্তে বাক্স-পেঁটরা, বাসনের ছালা, বিছানার লাগেজ, সুটকেস, মায় জলের কুঁজোটি পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের একাংশে স্তূপাকার করতে লাগল।

টিকিট কিনে মামা ছুটতে ছুটতে ফিরলেন—বললেন, গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই রে, মোটে আট মিনিট বাকি। শ্রীকান্ত, এই সামান্য কটা জিনিস প্ল্যাটফর্মের নিতে তোর কবার লাগবে? বার তিনেক, বোধহয়? বার তিনেক হলে ফি বারে দু মিনিট—মোট ছ মিনিট, বাড়তি থাকে আরো দু মিনিট, খুব গাড়ি ধরা যাবে। টেঁপি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে মালপত্রগুলো আগলা, শেষবারে শ্রীকান্তর সঙ্গে আসবি। আমি

আর তোর মা এগোলাম। একটা খালি দেখে কামরা দেখতে হবে তো। শ্রীকান্ত, তুই ট্রাঙ্কটা মাথায় নে, তার উপরে ছোটো সুটকেসটা চাপিয়ে দিচ্ছি, পারবি তো? বিছানার লাগেজটা বাঁ বগলে নে, আর ডান হাতে বড়ো সুটকেসটা। বাঁ হাতে লণ্ঠন দুটো ঝুলিয়ে নিস, তাহলেই হবে। দ্বিতীয় বার বাসন-কোসনের থলেটা আর তোর মামির তোরঙ্গ টা নিবি। দৌড়ে যাবি আর দৌড়ে আসবি—নইলে গাড়ি ফেল হয়ে যাবে, বুঝেছিস? আমি এগোই ততক্ষণ।

তিনি তো এগোলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখেন শ্রীকান্তর দেখা নেই। তিনি আশা করেছিলেন যে শ্রীকান্ত তাঁর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। ফিরে এসে দেখেন, শ্রীকান্ত মালপত্রের বোঝা নিয়ে একেবারে যেন চিত্র-পুত্তলিকা!

—কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? গাড়ি ফেল করবি না কি?

—কি করব আমি, এগোতে পাচ্ছি না যে। বড্ড ভারি হয়েছে মামা, টেঁপিকে বললাম তুই পেছন থেকে ঠেলে ঠেলে দে, আমি চলতে থাকি, তা ও—

—বারে! বাবা আমায় এখানে জিনিস আগলাতে বলল না? আমি ওকে ঠেলতে ঠেলতে যাই আর এদিকে সব চুরি হয়ে যাক। তোমার আর কি, জিনিস কমে গেলে তোমাকে তো আর বইতে হবে না!

মামা বললেন, তাই তো, ভারী মুশকিল হল দেখছি।

একটা কুলি এবার সাহসভরে এগিয়ে এসে বলল, খোকাবাবু সেক্‌বে কেনো? সোব ফেলে ভেঙে চুরমার হোবে। আর ইদিকে টিরেনভি ছোড়ে দিবে।

তাই তো! ভারী মুশকিল!

কুলি করলে তো নগদ লোকসান, এদিকে জিনিস ফেলে ভাঙলেও ক্ষতি, গাড়িরও সময় নেই—কিন্তু ভাববার আর সময় কই? কাজেই বাধ্য হয়ে মামাকে দুটো কুলি করতে হল। আধঘণ্টা আগে বেরুলে এই অপব্যয়টা হত না। শ্রীকান্তই পাঁচ-ছবারে কম কম করে গাড়িতে মালগুলো তুলতে পারত? যাকগে, আর উপায় কি?

অতঃপর একটা দেখবার মতো দৃশ্য হল। দুটো কুলি আগে আগে, তাদের মাথায় দুটো বড়ো বড়ো তোরঙ্গ। একজনের বগলে বিছানার লাগেজ, আরেক জনের বগলে বাসনের থলে। মামি নিয়েছেন জলের কুঁজো আর টেঁপি নিয়েছে পানের বাটা। মামার এক হাতে একটা ছোট্ট হাতব্যাগ, অন্য হাতে তালপাখা—তারই ভারে মামা কাতর; এতই ঘেমে উঠেছেন যে, ওরই ফাঁকে তালপাখার হাওয়া খেতে হচ্ছে তাঁকে।

সব শেষে চলেছে শ্রীকান্ত—একেবারে কুঁজো হয়ে। বাড়তি ট্রাঙ্কটা তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। শোভাযাত্রাটা দেখবার মতো।

গাড়িতে উঠেই মামা লম্বা করে বিছানা পেতে ফেলেছেন। এতক্ষণ গুরুতর পরিশ্রম গেছে, সেজন্য যথেষ্ট বিশ্রাম দরকার। চলতি গাড়ির ফাঁকা হাওয়া গায়ে লাগতেই

তিনি আরামে চক্ষু বুজে বললেন, আঃ, এতক্ষণে দেহটা জুড়োল। গোটা গাড়িটা ভর্তি, কিন্তু এ কামরাটা খুব খালি পাওয়া গেছে; কারু চোখে পড়েনি বোধহয়।

বিচিত্র লটবহরে ওই ছোট্ট কামরার প্রায় সমস্তটাই ভরে গেছল, তরই একধারে বসে শ্রীকান্ত তার পীড়িত ঘাড়ের শুশ্রূষা করছিল। তার অবস্থাটা বুঝে মামি বললেন, বড্ড লেগেছে না কি রে?

অপ্রতিভ হয়ে শ্রীকান্ত ঘাড়ে হাত বুলানো বন্ধ করল—না, মামিমা। মামা বললেন, ওয়েট লিফটিং একটা ভালো এক্সারসাইজ। এতে ওর ঘাড় শক্ত হবে। সেটা দরকার। এর পরে ওর বৌ-এর বোঝা রয়েছে না?

বৌ-এর, না, বইয়ের—কীসের বোঝা বললেন মামা, বোঝা গেল না সঠিক।

মামি বললেন, তোমার যেমন। যাচ্ছি তো ক'দিনের জন্য বিয়ের নেমন্তন্নে। এত মালপত্র নিয়ে বেরুনো কেন? কী কাজে লাগবে এসব?

মামা বললেন, যাকে রাখ সেই রাখে, কথাটা জান তো? সব জিনিসই কাজে লাগে, কাজের সময় তখন পাওয়া না গেলেই মুশকিল।

মামি বললেন, মদনপুরে গাড়ি তো দাঁড়ায় মোটে এক মিনিট। বোধ হয় এক মিনিটও দাঁড়ায় না। তার মধ্যে কি এই লটবহর নিয়ে নামা যাবে? দেখো, তখন কী ফ্যাসাদে পড়। বাক্স-পেঁটরা সব গাড়িতেই থেকে যাবে দেখছি।

মামা বললেন, কি জানো গিন্নী, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কিচ্ছু ভেব না তুমি।

মামার কথায় শ্রীকান্তর হৃৎকম্প হল, কেন না মদনপুর স্টেশনে যেখানে এক মিনিট মাত্র গাড়ি থামে কিংবা তাও থামে না, সেখানে ভগবানের জায়গায় নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে কল্পনা করতে পারল না। এই বিরাট এবং বিচিত্র লটবহর তাকেই গাড়ি থেকে নামাতে হবে। তাহলেই তো সে গেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—শ্রীকান্তর সারা শরীর রি রি করে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দমদমে গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গি যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। মামার এবং মালপত্রের বহর দেখে তারা একেবারে হতভম্ব। অবশেষে তাদের একজন ভাঙা বাংলায় মামাকে বলল, টোমরা এ গাড়িতে কেনো বাবু? এটা সাহেবডের জন্যে—দরজায় নোটিস দেখ নাই, 'for Europeans only' টোমাডের নামিটে হবে।

সবেমাত্র আয়েশ করছেন, নামার কথায় মামার মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কেনো নামটে যাব? আমরাও টোমাডের মটই খাঁটি ইউরোপিয়ান আছি। চাহিয়া ডেখ, টোমাডের ও আমাডের গায়ের রঙ একপ্রকার।

—অল রাইট। ডেখি তোমরা নামিবে কি না? বলে তারা নেমে গেল এবং পরবর্তী স্টেশনে একজন রেল-কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এল।

কর্মচারীটিও এসে নামতে অনুরোধ করলেন।

মামা বললেন, সমস্ত গাড়ী ভর্তি, কেবল এইটা খালি ছিল, কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমরা এই কামরায় উঠেছি। অন্য কোথাও বা উঁচু ক্লাসে আমাদের জায়গা করে দিন, এখুনি আমরা নেমে যাচ্ছি।

'আচ্ছা দেখছি জায়গা' বলে কর্মচারীটি নেমে গেলেন, ফিরিঙ্গীরা গাড়িতেই রইল। শ্রীকান্তর ভয় হল পাছে কর্মচারীটি অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে পান, তাহলে তো এখুনি তাকে ভগবানের অবতার হয়ে আবার এই লটবহর বওয়া-বওয়ি করতে হবে।

কিন্তু কর্মচারীটি আর ফিরলেন না, গাড়িও ছেড়ে দিল। কেবল ফিরিঙ্গিরা নিজেদের মধ্যে গজরাতে লাগল। মামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু মামি বললেন, কাজ নেই বাপু, পরের স্টেশনে চল আমরা অন্য কামরায় যাই।

—হ্যাঁঃ, কোথাও খালি রয়েছে না কি?

—না থাকে, পরের গাড়িতে যাব না হয়।

—পাগল!

সবই তো পরের গাড়ি মামিমা, কোনটা আমাদের নিজেদের গাড়ি? বলল শ্রীকান্ত। আবার ওঠা নামার ঝক্কি বওয়ার দায় এড়াতে বলতে হল তাকে।

—যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। সাহেবদের গাড়ি যে! মামিমা কন।

—হ্যাঁ, ধরলেই হল! তুমি চুপ করে থাক, ব্যাটারা বাংলা বোঝে—তুমি ঘাবড়ে গেছ জানলে আরো লাফাবে।

অগত্যা মামি চুপ করলেন।

খানিক বাদেই বারাকপুর এল। গাড়ি দাঁড়াতেই ফিরিঙ্গিগুলো একজন সাহেব কর্মচারীকে ডেকে আনল। তিনি এসে বললেন, বাবু, টোমাডের নামিটে হইবে—যাহাডের সাহেবি ড্রেস, এ কামড়া কেবল টাহাডিগের জন্য!

মামা বললেন, তা একথা আগে বলনি কেন সাহেব? আমাডেরো সাহেবি পোশাক আছে। আমাদের সময় দাও, আমরা এখুনি সাহেব বনে যাচ্ছি। ওগো, ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

অগত্যা সাহেব কর্মচারীটি চলে গেল। মামার সত্যিই কিছু সাহেবি পোশাক ছিল না, একটা চাল মারলেন মাত্র, এদিকে গাড়িও বারাকপুর ছাড়ল।

অতঃপর ফিরিঙ্গিরা আর কোনো উপায় না দেখে এদের তাড়াবার ভার নিজেদের হাতে নিল। পরস্পর পরামর্শ করে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে মামি দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলেন। মামারও যে একটু ভয় না হল এমন নয়। মামী বললেন, হ্যাঁ গা, কামড়ে দেবে না তো?

মামা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বললেন, কি জানি!

কামড়াবার কথা শুনে টেঁপি একেবারে বাবার বিরাট পরিধির পেছনে এসে আশ্রয় নিল!

মামা বললেন, ভালো ফন্দি মাথায় এসেছে। শ্রীকান্ত তুই কুকুর ডাকতে পারিস?

—বেড়ালের ডাক খুব ভালো পারি মামা। ডাকব? ম্যা?

—না, না, বেড়াল ডাকতে হবে না। মাঝে মাঝে তুই কুকুরের মতো ডাক দিখি!

শ্রীকান্ত ডাকল—ঘেউ ঘেউ।

—আর একটু জোরে।

—ঘেউ ঘেউ ঘেউউ।

সহসা কুকুরের ডাক শুনে ফিরিঙ্গিরা সব চুপ। শ্রীকান্ত আবার ডাকল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ—

একজন জিজ্ঞাসা করল, ও রোকম ডাকছে কেনো সে? তার কী হোয়েছে?

মামা গম্ভীরভাবে বললেন, ও কিছু নয় সাহেব। দশ বারো দিন হল ওকে একটা পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে Bitten by a mad dog—বুঝলে?

ফিরিঙ্গিরা যেন লাফিয়ে উঠল। —অ্যাঁ? হাইড্রোফোবিয়া! একথা আগে বলো নাই কেন? ওটো কামড়াইটে পারে?

মামা বললেন, না না, কামড়াইবে না। সে ভয় নাই।

বলতে বলতে নৈহাটি এসে পড়ল। ফিরিঙ্গিরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করে সেই কামরা থেকে পিটটান দিল।

'যাক, বাঁচা গেল' বলে মামা যেই মাত্র না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, অমনি আরেকজন ফিরিঙ্গি যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। সে কোনো উচ্চবাচ্য না করে এককোণে গিয়ে বসল, মামাদের দিকে তাকালও না। মামা বললেন, দাঁড়াও। তোমাকেও ভাগাচ্ছি পরের স্টেশনে। শ্রীকান্ত, গাড়ি ছাড়লেই—বুঝেছিস?

যুবকটি ডিটেকটিভ নভেল বের করে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠে মামাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি? কি হয়েছে ওর?

সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে মামা বাংলাতেই জবাব দিলেন—ও কিছু না, জলাতঙ্ক—যাকে তোমরা হাইড্রোফোবিয়া বল।

—ওঃ! তাই না কি? ওতে ওর উপকার হবে।

বলে ছোকরা আবার বইয়ে মন দিল। তার নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব দেখে মামার পিত্ত জ্বলে গেল। তবু তিনি বললেন, তোমাকে সাবধান করা আমার কর্তব্য। কি জানি, যদি কামড়ে দেয়, বলা তো যায় না। তখন তোমাকেও ওই রোগে—

যুবকটি মৃদু হেসে বলল, আহা, না না! যে কুকুর ডাকে সে কি আর কামড়ায়?

অগত্যা মামা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন এবং শ্রীকান্তও ডাক ছেড়ে দিল। তাকে কুকুর বলাতে সে মনে মনে এমনই চটেছিল যে, তার ইচ্ছা করছিল এখুনি গিয়ে ফিরিঙ্গিটাকে কামড়ে দেয়।

কাঁচরাপাড়ায় গাড়ি থামতেই যুবকটি মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখছিল। তার পরিচিত



বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করতেই সেই পুরাতন দল এসে উপস্থিত। তারা তাকে ওই কামরায় দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি নিরাপদে আছ তো? ওখানে যে মারাত্মক হাইড্রোফোবিয়া!

—সে আমি সারিয়ে দিয়েছি।

—সারিয়ে দিয়েছ কি রকম?

তখন মামার চাল যুবকটি বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিল—সে কামরায় ঢুকেই ছেলেটিকে জল খেতে দেখেছিল, জলাতঙ্ক রোগে যা কখনো সম্ভব নয়। তখন শ্রীকান্তর ভারী রাগ হল তার মামার উপর জলাতঙ্ক রোগে জল খেতে নেই একথা কেন তাকে তিনি আগে বলেননি। তাইতে তাকে এমন অপদস্থ হতে হল! কুক্কুর না হবার অপমান সইতে হল এমন!

এইবার ফিরিঙ্গীরা আবার সেই কামরায় জাঁকিয়ে বসল এবং স্পষ্ট ভাষায় মামাকে জানাল যে এবার তাঁকে নামতেই হবে এবং এর পরের স্টেশনেই।

অসহায়ভাবে মামি বললেন, ওগো, কি হবে তাহলে?

মামা বললেন, কিছু ভেব না গিন্নী! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

ভগবানের নাম শুনে শ্রীকান্তর নিজেকে মনে পড়ল এবং ঘাড়ের ব্যথাটা এতক্ষণে কতটা মরেছে জানবার জন্য সে একবার ঘাড়টাকে খেলিয়ে নিল।

পরের স্টেশন আসতেই মামা বললেন, এখানে তো হয় না, পরের জংশনে না

হয় বদলানো যাবে। এখানে তো মিনিট খানেক মাত্র গাড়ি থামে। এত মালপত্তর আমাদের!

—না, টা হইবে না। এখানেই টোমাকে নামিটে হইবে।

তখন তারা সবাই মিলে মামার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেস-এ হাত লাগাল।

—ডেখি, টুমি কেমন না নাম। এই বলে একজন বাসনের থলেটা নামিয়ে দিয়ে বলল—Here you are. আর এই নাও টোমার জলের পিচার!

কুঁজের জাত যাওয়ায় মামিমা হায় হায় করতে লাগলেন। ততক্ষণে দুজন মিলে ধরাধরি করে ভারী ট্রাঙ্কটা নামিয়ে ফেলেছে। মামা তখন ব্যাঙ্কের উপরের আরো ভারি হোলড অলটা ওদের দেখিয়ে দিলেন। একজন গিয়ে সেটা নামাল।

মামা বললেন, বেঞ্চির তলায় ওই তোরঙ্গটা—ওই যে।

একজন সেটা নামিয়ে বলল, এই নাও, টোমার টুরঙ্গ।

মামা সংশোধন করে দিলেন—তুরঙ্গ নয়, তোরঙ্গ। সর্বশেষ বুদ্ধিমান যুবকটি ছোটো হাতব্যাগটা মামাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, গুডবাই, মিস্টার!

মামা এতক্ষণ পুলকিত হয়ে ওদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন।। এইবার বললেন, ইহাই মদনপুর—এইখানেই আমরা নামতাম। অতএব গুডবাই মিসটারস এবং থাঙ্কস।

মণ্টুর মাস্টার

বি. এ. পাস করে বসে আছে মিহির, কী করবে কিছুই স্থির নেই। এমন সময়ে দৈনিক আনন্দবাজারে একটা বিজ্ঞাপন দেখল কর্মখালির। কোনো বনেদি গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য একজন বি. এ. পাস গৃহশিক্ষক চাই—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবেক, তাছাড়া বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনটা পড়েই লাফিয়ে উঠল মিহির, এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল সে খাওয়া-থাকাটা অমনিই হবে, তাছাড়া ত্রিশ টাকা মাস-মাস—কিছু কিছু বাড়িতেও পাঠাতে পারবে, এম. এ-টাও পড়া হবে সেই সঙ্গে, সিনেমা ফুটবল-ম্যাচ দেখার মতো পকেট-খরচারও অভাব হবে না।

একবার তার মনে হল এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন দেখেছে সে—ওই আনন্দবাজারেই। হ্যাঁ, প্রায়ই সে দেখেছে। গত বছরও দেখেছিল, তখনই তার ইচ্ছা হয়েছিল একটা আবেদন করে দেয়, কিন্তু তখনো সে বি. এ. পাস করেনি। খুব সম্ভব ছেলেটি একটি গবাকান্ত—তাই বেতন ভারী দেখে কেউ এগোলেও ছেলে আবার তার চেয়ে ভারী দেখে পিছিয়ে পড়ে।

সে কিন্তু পেছোবে না, প্রাণপণে পড়াবে ছেলেটাকে—পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয়—তার জন্য গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশি কথা কি, মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়।

ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগনা দিচ্ছেন নাকি?

বিকেলেই মিহির সেই ঠিকানায় গেল। বি. এ-র. সার্টিফিকেটটা সঙ্গেই নিয়ে গেছল কিন্তু ভদ্রলোক তা দেখতেও চাইলেন না, কেবল মিহিরকে পর্যবেক্ষণ করলেন আপাদমস্তক। মিহিরই যেন মিহিরের সার্টিফিকেট, মিহির খুশিই হল এতে।

অবশেষে ভদ্রলোক বললেন, তোমার জামাটা একবার খোল তো বাপু?

মিহির ইতস্তত করে। জামা খুলতে হবে কেন? বুঝতে পারে না সে।

—আপত্তি আছে তোমার?

—না, না। মিহির জামাটা খুলে ফেলে। ত্রিশ টাকার জন্য জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও সে রাজি।

—তুমি একসারসাইজ করঞ্জ?

—এক আধটু।

—বেশ বেশ। ভদ্রলোককে একটু চিন্তান্বিত দেখা যায়। মিহির ভাবে, এক্সারসাইজ করার অপরাধে চাকরিটা খোয়াল না তো? নাই বলতো কথাটা, কিন্তু কি করেই বা সে জানবে যে ভদ্রলোক এক্সারসাইজের উপর এমন চটা। কিন্তু এও তো ভারী আশ্চর্য, সে গ্রাজুয়েট কি না, কোন বছরে পাস করেছে এসবের কিছুই তিনি জিজ্ঞেস করছেন না।

—আর একটা কথা খালি জিজ্ঞাসা করব তোমায়।

মিহির পকেটের মধ্যে সার্টিফিকেটটা বাগিয়ে ধরে—এইবার বোধ হয় সেই প্রশ্নটা আসবে! আর সে উত্তর দিয়ে চমৎকৃত করে দেবে যে বি. এ-তে সে ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিস্টিঙ্কশন পেয়েছে।

ভদ্রলোক মিহিরকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার শরীরটা নেহাত মন্দ নয়। ওজন কত তোমার।

ওজন? আকাশ থেকে পড়ে মিহির—অবশেষে কি না এই প্রশ্ন—তা প্রায় দু মণের কাছাকাছি!

—বেশ বেশ। কিছুদিন টিকতে পারবে তুমি, আশা হয়। কি বলিস মন্টু, তোর এ মাস্টার মশাই কিছুদিন টিকে যাবে, কি মনে হয় তোর?

মিহিরের ছাত্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে সায় দিল—হ্যাঁ বাবা, এ মাস্টার মশায়ের গায়ে অনেক রক্ত আছে।

ভদ্রলোক অবশেষে তাঁর রায় প্রকাশ করলেন—কিছুদিন টেকা আশার কথা, বেশ কিছুদিন টেকাটাই হল আশঙ্কার। যাক, সবই শ্রী ভগবানের হাত—

মন্টু বাধা দিল—ভগবানের হাত নয় বাবা, শ্রী ছার—

—চুপ! কথার উপর কথা কস কেন? কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না তোর। হ্যাঁ, দেখ বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে এটিকেটও একে শেখাতে হবে। পিতামাতা গুরুজনদের কথার উপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এই সব মহৎ দোষ সারাতে হবে এর। বেশ, আজ থেকেই ভর্তি হলে তুমি। ত্রিশ টাকাই বেতন হল, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা শর্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমনকি একদিন কম হলেও একটা টাকাও পাবে না তুমি। পাঁচ দিন দশ দিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটার ছেড়ে চলে গেছে, সে-রকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না, সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি—

মন্টু বলল, একজন কেবল বাবা উনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন—আরেকটা দিন যদি কোনো রকমে থাকতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

—থাম তুই। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসোগে। আজ সন্ধ্যা থেকেই ওকে পড়াবে। মন্টু, যা, মাস্টার মশায়ের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর ছোট্টুরামকে বলে দে বেতন-নিবারকে মাস্টার মশায়ের বিছানা পেড়ে দিতে।

আগাগোড়াই অদ্ভুত ঠেকছিল মিহিরের, কিন্তু ত্রিশ টাকা—এক সঙ্গে ত্রিশ টাকা মাসের পয়লা তারিখে পাওয়াটাও কম বিস্ময়ের নয়। চিরকাল মাস গেলে টাকা দিয়েই

সে এসেছে—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজওয়ালার টাকা; এই প্রথম সে মাস গেলে নিজে টাকা পাবে। এই অনির্বচনীয় বিস্ময়ের প্রত্যাশায় ছোটোখাটো বিস্ময়গুলো সে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

সন্ধ্যার আগেই সে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরল। বেশ ঘরখানি দিয়েছে তাকে—ভারী পছন্দ হল তার। এমন সাজানো গোছানো ঘরে এর আগে থাকেনি কখনো। একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল—পুরোনো হোক, বেশ পরিষ্কার। একটা ছোটো বুককেসও আছে—তার বইগুলি সাজিয়ে রাখল তাতে। আর একধারে পড়াশুনার টেবিল, তার দু ধারে দুটো চেয়ার—বুঝল, এই ঘরেই পড়াতে হবে মন্টুকে। সব চেয়ে সে চমৎকৃত হল নিজের বিছানাটা দেখে।

ঘরের একপাশে একখানা খাট, তাতেই তার শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-দেওয়া, তার উপরে তোশক, তার উপরে ধব ধব করছে সদ্য পাট-ভাঙা বোম্বাই চাদর। ভারী ভদ্রলোক এরা,—না, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়, যথার্থই এরা মহৎ লোক।

সত্যিই খাটে শোবার কল্পনা তার ছিল না। জীবনে কখনো সে গদি মোড়া খাটে শোয়নি। আনন্দের আতিশয্যে সে তখনই একবার গড়িয়ে নিল বিছানায়। আঃ, কী নরম! আজ খুব আরামে ঘুমানো যাবে—খেয়ে দেয়ে সে তো এসেছেই, আজ আর কোনো কাজ নয়, এমনকি মন্টুকে পড়ানোও না, আজ খালি ঘুম! তোফা একটা ঘুম বেলা আটটা পর্যন্ত।

মন্টু এল বই-পত্র নিয়ে। মিহির প্রস্তাব করল, এসো, খাটে বসেই পড়াই।

—না সার, আমি ও-খাটে বসব না!

মিহির বিস্মিত হল, কেন? এমন খাট!

—আপনি মাস্টার মশাই গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।

—ওঃ তাই? তা হলে চল, চেয়ারেই বসিগে। ক্ষুণ্নমনে সে চেয়ারে গিয়ে বসল—কিন্তু যাই বল, বেশ বিছানাটি তোমাদের। ভারী নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে। ...দেখি তোমার বই। ...Beans! ...বিন্‌স মানে জানো?

মন্টু ঘাড় নাড়ে। তার মানে সে জানে না।

—Beans মানে বরবটি। বরবটি এক রকম সবজি—তরকারি হয়, আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেনটেন্স কর দেখি। পারবে?

মন্টু ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। তারপর অনেক ভেবে বলে—I had been there.

মিহির অত্যন্ত অবাক হয়—এ আবার কি! উঃ, এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো কেন সব মাস্টার পালিয়ে যায়। গবাকান্ত বলে গবাকান্ত। মরিয়া হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে কি হল?

মন্টুও কম বিস্মিত হয় না—তার মানে তো খুব সোজা সার। আপনি বুঝতে

পারছেন না? সেখানে আমার বরবটি ছিল। আই হ্যাড বিন দেয়ার—আমার ছিল বরবটি সেখানে...সেইটাই ঘুরিয়ে ভালো বাংলায় হবে সেখানে আমার—।

—থাম থাম, আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না তোমাকে। আই হ্যাড বিন দেয়ার মানে—আমি সেখানে ছিলাম।

মন্টু আকাশ থেকে পড়ে—তবে যে আপনি বললেন বিন মানে বরবটি? তাহলে, আমি সেখানে বরবটি ছিলাম—বলুন।

মিহির সন্দেহ প্রকাশ করে,—খুব সম্ভব তাই ছিলে তুমি। Bean আর Been কি এক জিনিস হল? বানানের তফাত দেখছ না? এ been হল be-ধাতুর form—

বাধা দিয়ে মন্টু বলে, হ্যাঁ বুঝেছি সার, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ কি না এ-been হল মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি আর ফর্ম মানে চেহারা! আমি জানি।

বিস্ময়ে হতবাকমিহির শুধু বলে, জানো তুমি?

—হ্যাঁ, আজ সকালেই জেনেছি। আপনি চলে যাবার পর বাবা বললেন, তোর নতুন মাস্টার মশায়ের বেশ ফর্ম তখনই জেনে নিলাম।

মিহির কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বললে, আমার চেহারা মৌমাছির মতো? জানতাম না তো। কিন্তু সে-কথা যাক, যে beans মানে বরবটি, তা দিয়ে সেনটেন্স হবে এই রকম—Peasants grow beans অর্থাৎ চাষিরা বরবটি উৎপন্ন করে, বরবটির চাষ করে। বরবটি ফলায়। বুঝলে এবার?

মন্টু ঘাড় নেড়ে জানায় বুঝেছে।

—অতটা ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মতন। বেশ, বুঝেছ যদি, এই রকম আর একটা সেনটেন্স বানাও দেখি বিন্‌স দিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে মন্টুর মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বার হয় না। মিহির হতাশ হয়ে বলে, পারলে না? এই ধর যেমন, our cook cooks beans, আমাদের ঠাকুর বরবটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক কথাটার দু রকম ব্যবহার পাচ্ছ, একটা নাউন, আরেকটা ভার্ব। আচ্ছা, আর একটা সেনটেন্স কর দেখি।

এতক্ষণে বিন্‌স ব্যাপারটা বেশ বোধগম্য হয়ে এসেছে মন্টুর। সে এবার চটপট জবাব দেয়—We are all human beans

—অ্যাঁ? বল কি? আমরা সবাই মানুষ-বরবটি? বরবটি মানুষ?

—কেন? বাবাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে হিউম্যান বিন্‌স।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মিহির। অর্থাৎ বসে তো সে ছিলই, মাথায় হাতটা দেয় কেবল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস এই ছেলেকেই পড়াতে হবে তাকে? ওঃ, এইজন্যই মাস্টাররা টিকতে পারে না? কি করে টিকবে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়। রোজই যদি এ রকম ধস্তাধস্তি করে দু বেলা ওকে পড়াতে হয়, তাহলেই তো সে গেছে। তাহলে তাকেও পালাতে হবে টুইশানির মায়া ছেড়ে, ত্রিশ টাকার মায়া কাটিয়ে, নরম গদির আরাম ফেলে—



নাঃ, সে কিছুতেই পালাচ্ছে না। একজন ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল আর এক দিন টিকতে পারলেই ত্রিশ টাকা পেত, কিন্তু একটা দিনের জন্য এক টাকাও পেল না। বোধ হয় তার কেবল পাগল হতেই বাকি ছিল—পাগল হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছে। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত। কিংবা পাগল হয়েই সে পালিয়ে গেছে হয়তো, নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোনো সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো? কী সর্বনাশ! ভাবতেও তার হৃৎকম্প হয়।

সে কিন্তু চাকরিও ছাড়বে না, পাগলও হবে না, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মন্টু যা বলে বলুক—না পড়ে না পড়ুক—বোঝে বুঝুক, না বোঝে না বুঝুক—মন্টুকে সে বই খুলে পড়িয়ে যাবে—এই মাত্র; ওকে নিয়ে মোটেই সে মাথা ঘামাবে না। আর মাথাই যদি না ঘামায় পাগল হবে কি করে? নির্বিকারভাবে সে পড়াবে—কোনো ভয় নেই তার।

তার গবেষণায় বাধা পড়ে, মন্টু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—বেতন-নিবারক বিছানা—এর ইংরেজি কি হবে সার?

—বেতন-নিবারক বিছানা আবার কি?

—সে একটা জিনিস। বলুন না, ওর ইংরেজিটা জেনে রাখা দরকার।

—ও রকম কোনো জিনিস হতেই পারে না।

—হতে পারে না কি, হয়ে রয়েছে। আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরেজি। সেই কথা বলুন।

—ওর ইংরেজি হবে পে-সেভিং বেড **(Pay-Saving Bed)**।

মন্টু সন্দেহ প্রকাশ করে—শেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টু রাম আমাদের চাকর, সে বেতন কামায়, বেতন-নিবারককে শোয় না তো সে। তাকে অনেকবার অনেক করে বলা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। সেইজন্যই তো এ-চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারী দুঃখ করেন তাই।

কী সব হেঁয়ালি বকছে ছেলেটা? মাথা খারাপ না কি এর? অ্যাঁ? যাক, ও সব ভাববে না সে। সে প্রতিজ্ঞাই করেছে—মোটেই মাথা ঘামাবে না এদের ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারবে না—নির্ঘাৎ পাগল হতে হবে। আজ আর পড়ানো নয়, অনেক পড়ানো গেল, কেবল মাথা কেন, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে তার ধাক্কায়। আজ এই পর্যন্তই থাক। মন্টুকে সে বিদায় দিল।—যাও আজকের মতন তোমার ছুটি।

এইবার একটা তোফা নিদ্রা—নরম গদির বিছানায়। দু দুবার বৌবাজার আর বাগবাজার করেছে আজ, অনেক হাঁটাচলা হয়েছে—ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। আজ রাত্রে সে খাবে না বলেই দিয়েছে—এক বন্ধুর বাড়িতেই খাওয়াটা সেরেছে বিকেলে। ব্যস, সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।

নরম বিছানায় সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে আরামে মিহিরের চোখ বুজে এল—আঃ! নিদ্রার রাজ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে সে, এমন সময়ে তার মনে হল সর্বাঙ্গে কে যেন এক হাজার ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল এক সঙ্গে। আর্তনাদ করে মিহির লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। বাতি জ্বেলে দেখে, সর্বনাশ—সমস্ত বিছানায় কাতারে কাতারে ছারপোকা...ছারপোকা আর ছারপোকা! হাজারে হাজারে, লাখ-লাখ—গুনে শেষ করা যায় না। শুধুই ছারপোকা।

এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে সে বুঝল...বুঝতে পারল কেন মাস্টাররা টেকে না। ও বাবাঃ! কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও আছে তার সাথে। ঘরে বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক পারবে কেন—তবু যে ভদ্রলোক উনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না—ছেড়ে পালাতে হল যাঁকে তিনি একজন শহিদ পর্যায়ের, সন্দেহ নেই। ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো—নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন, বেশ রসিক লোকও বটেন তিনি! মায়া দয়া নেই একটুও, একেবারে অমায়িক।

ভীতি-বিহ্বল চোখে সে ছারপোকা-বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রইল। গুনে শেষ করা যায় না—ওকি মেরে শেষ করা যাবে? আর সারা রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারবে তো ঘুমোবে কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই আজ কাটাতে হল গোটা রাতটা!

আলো দেখা মাত্র ছারপোকাদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেছল—দু-তিন মিনিটের মধ্যে তারা কোথায় আবার মিলিয়ে গেল। মিহির ভাবল—বাপ্‌স, এরা রীতিমতো শিক্ষিত দেখছি! যেমন কুচকাওয়াজ করে এসেছিল তেমনি কুচকাওয়াজ করে চলে গেল—আধুনিক যুদ্ধের কায়দা-কানুন সব এদের জানা দেখা যাচ্ছে। কোথায় গেল ব্যাটারা?

সদ্য পাট-ভাঙা ধব ধবে চাদরের এক কোণ তুলে দেখে তোশকের গদির খাঁজে খাঁজে থুক থুক করছে ছারপোকা—অন্যধারেও তাই। আর বেশি সে দেখল না, কি জানি এখন থেকেই যদি তার মাথা খারাপ হতে থাকে। চেয়ারে গিয়ে বসল, কিন্তু ভয়ে আলো নিবোল না—কি জানি যদি ব্যাটারা সেখানে এসেও তাকে আক্রমণ করে। বলা যায় না কিছু।...

পরদিন মন্টুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ ঘুম হয়েছিল রাত্রে?

—খাসা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভালো। জীবনের বিলাসই হল গিয়ে ঘুম।

—আর ব্যাসন হল বেগুনি? না বাবা?

—তা তোমার ঘুমটা বোধহয় বেশ জমাট? ঘুমিয়ে আয়েশ পাও খুব?

—আজ্ঞে, সে-কথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছলাম কিন্তু মোটেই তা টের পাইনি।

—বল কি?

—আমাদের বাড়ি বর্ধমানে। শুনেছেন বোধহয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার যো নেই। একদিন পাশের বাড়িতে কি খুব দরকারে ডেকেছিল আমাকে, কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা। যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়ল, কিন্তু তখন অনেক রাত হয়ে গেছে, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা-টরজা বন্ধ করে তারা শুয়ে পড়েছে ততক্ষণ। আমি করলাম কি, সে রাত্রে আর মশারি খাটালাম না! পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল মশাই, বলব কি, দেখি পাশের বাড়িতেই শুয়ে রয়েছি।

দারুণ বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক—কি রকম?

—মশায় টেনে নিয়ে গেছে মশাই! সেইজন্যেই তো মশারি খাটাইনি। রাত-বিরেতে অনায়াসে পাশের বাড়ি যাবার ওইটেই সহজ উপায় কি না!

ভদ্রলোক বেজায় মুষড়ে পড়লেন যেন—মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি তখন কীসে আর কী করবে তোমার! তুমি দেখছি টিকেই গেলে এখানে।

মিহির বলল, আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে। কয়েকটা টাকা আমাকে দিতে হবে আগাম। ছারপোকার অর্ডার দেব।

—ছারপোকার অর্ডার! কেন? সে আবার কি হবে?

—ও, আপনি জানেন না বুঝি? ছারপোকার মতো এমন মস্তিকের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধি আর নেই। বিলেতে রীতিমতো ছারপোকার চাষ হয় এইজন্যে। গাধা ছেলে সব দেশেই আছে তো, তাদের কাজে লাগে। একটু থেমে সে আবার বললে, আমার এক বন্ধু তো এই ব্যবসাতেই লেগে পড়েছে—রেলগাড়ির ফাঁকফোকর থেকে সব ছারপোকা সে টেনে বার করে নেয়।

সাগ্রহে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন কি রকম, কি রকম? বিলেতে ছারপোকার চাষ

হয়? দাম দিয়ে কেনে লোকে? আমদানি রপ্তানি হয়, তুমি জানো? আমি বেচতে পারি, হাজার হাজার, লাখ লাখ—যত চাও।

—বেচুন-না। আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজে লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের ভারী উপকারী—একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এমনি করে মাথায় টিপে মারতে হয়, এই রকম হাজার হাজার লাখ লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক ব্রেন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন,—বি. এ. পাসের সময়ে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল না হয়ে আর যাই না। এমন সময়ে এক বিলিতি কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়া গেল, অমনি সমস্ত বাসা খুঁজে যার বিছানায় যা ছারপোকা ছিল, সব সদ্ব্যবহার করলাম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকি তারপর ফল যা পেলাম নিজের চোখেই দেখুন, আমার কাছেই আছে, বি. এ. পাস করলাম উইথ ডিস্টিঙ্কশন—ফাস্ট ক্লাস উইথ...

কাল থেকেই সে ব্যগ্র হয়েছিল,—এখন সুযোগ পেতেই সার্টিফিকেটখানা মন্টুর বাবার মুখের সামনে মেলে ধরল। ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল বিস্ময়ে—সত্যিই তো! একটা কথাও মিথ্যে নয়, Passed with Distinction—লেখাই রয়েছে। বটে, এমন জিনিস ছারপোকা! কে জানতো গো!

পয়সা খরচ করে ছারপোকা কিনতে হবে না, তোমার বিছানাতেই রয়েছে—হাজার হাজার লাখ লাখ, যত চাও। তোমার ভয়ানক ঘুম বলে জানতে পারনি।

—এতক্ষণ কেন বলেননি আমায়? অনেকখানি ব্রেন করে ফেলতাম। এ বেলা আমার নেমন্তন্ন আছে ভবানীপুরে, এখনই বেরোতে হবে নইলে এক্ষুনিই, যাক,—দুপুরে ফিরেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার করব। তার পরে পড়াতে বসব মন্টুকে।

মিহির চলে গেলে পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়। অবশেষে মন্টুর বাবা বললে, ছারপোকার সঙ্গে যে ব্রেনের সম্বন্ধ আছে, অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে আমার। ছারপোকার ব্রেনটা একবার ভাব দিকি অবাক হয়ে যাব তুই। ঘুচ করে এসে কামড়েছে, তক্ষুনি উঠে দেশলাই জ্বাল, আর দেখতে পাবি না তাকে, কোথায় যে পালিয়েছে, তার পাত্তা নেই। মানুষ যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে, এ পর্যন্ত ওদের জানা। এটা কি কম ব্রেন? আর এ ব্রেন তো ওদের ওই রক্তেই, কেননা মাথা তো নেই ওদের, গায়েই ওদের সব ব্রেন। ঠিক বলেছে মিহির। তুই কী বলিস মন্টু?

—হ্যাঁ বাবা।

—তারপর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও কম নয়। ছারপোকা বিস্তারের সাথে সাথে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে বাসে সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেমনি হু হু করে খবরের কাগজের কাটতিও বেড়ে গেছে। এই সেদিন বায়স্কোপে আমাদের সামনেই সাড়ে চার আনার সিটে একটা কুলি বসেছিল, তোর মনে পড়ে না মন্টু?

—হ্যাঁ—বাবা।

—সে তো লেখাপড়া কিছুই জানে না। দু মিনিট না বসতেই দু পয়সা খরচা করে

একখানা আনন্দবাজার কিনে আনল সে। এতে শিক্ষার বিস্তার হলো না কি? মন্টু, কি বলিস তুই?

—হ্যাঁ বাবা।

—চল তবে এক কাজ করিগে। তোর মাস্টার মশাই ফেরার আগেই আমরাই ছারপোকারগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি। ব্রেন তো তোরও দরকার, আর আমারও—মেমারিটাও দিন দিন কেমন যেন কমে আসছে। সেদিন শ্যামবাবুকে মনে হল গোবর্ধনবাবু আর গোবর্ধনবাবুকে মনে হল হারাধনকান্ত! এ তো ভালো কথা নয়রে মন্টু। কি বলিস তুই?

—হ্যাঁ বাবা।

সন্ধের পরে ফিরল মিহির। কাল সারা রাত ঘুম নেই, তার পর আজ সমস্ত দিন বন্ধুদের আড্ডায় তাস পিটে এতই ক্লান্ত হয়েছে যে ঘুমোতে পারলে বাঁচে। আজ সে আলো জ্বালিয়েই শোবে—আলো দেখে যদি না আসে ব্যাটারা। এখন 'নমো নমো' করে মন্টুকে খানিকক্ষণ পড়ালেই ছুটি।

মন্টু বই নিয়ে আসতেই গোটা ঘরটায় একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

—নতুন ধরনের এসেন্স-টেসেন্স মেখেছ না কি কিছু? ভারী গন্ধ আসছে তোমার গা থেকে। মিহির জিজ্ঞাসা করল।

—গা নয় সার, মাথার থেকে।

—কীসের গন্ধ? বেজায় খোশবাই দিচ্ছে।

—ছারপোকার! আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দুজনে মিলে 'বেতন-নিবারকে'র যতো ছারপোকা ছিল সব শেষ করেছি! ছোট্টুরামকেও বলা হয়েছিল কিন্তু সে-ব্যাটা মোটেই ব্রেন চায় না। বলে যে বিরেনসে কেয়া কাম? আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায়। —হি-হি-হি!

—অ্যাঁ? —সিংহনাদ করে মিহির চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে পড়ে সটান চিৎপটাং। মন্টু তো হতভম্ব। দারুণ সেই চিৎকার শুনে মন্টুর বাবা ছুটে আসেন। —কি হয়েছে রে মন্টু, কি হল?

ছারপোকা নেই শুনে মাস্টার মশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

তা তুই বলতে গেলি কেন? বারণ করলাম না তোকে? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোক...

—আমি কি করে জানব যে উনি অমন করবেন। আমি কিচ্ছু বলিনি। উনি কি করে গন্ধ পেলেন উনিই জানেন। মুখে জল ছিটোলে জ্ঞান হয় শুনেছি, ছিটোব বাবা?

অজ্ঞান অবস্থাতেই মিহিরের গলা থেকে বেরোয়—উঁহুঁ।

মন্টুর বাবা বলেন, কাজ নেই। জ্ঞান হলে যদি কামড়ে দেয় তখন?

মিহির তার শোক সামলে উঠল পরদিন সাড়ে আটটায়। ষাঁড়ের মতন সারা রাত এক নাগাড়ে নাক ডাকাবার পর।

আমার বাঘ শিকার

মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড়ো বড়ো কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ওই দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেছি।

মহারাজ বললেন, বাঘ-শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে?

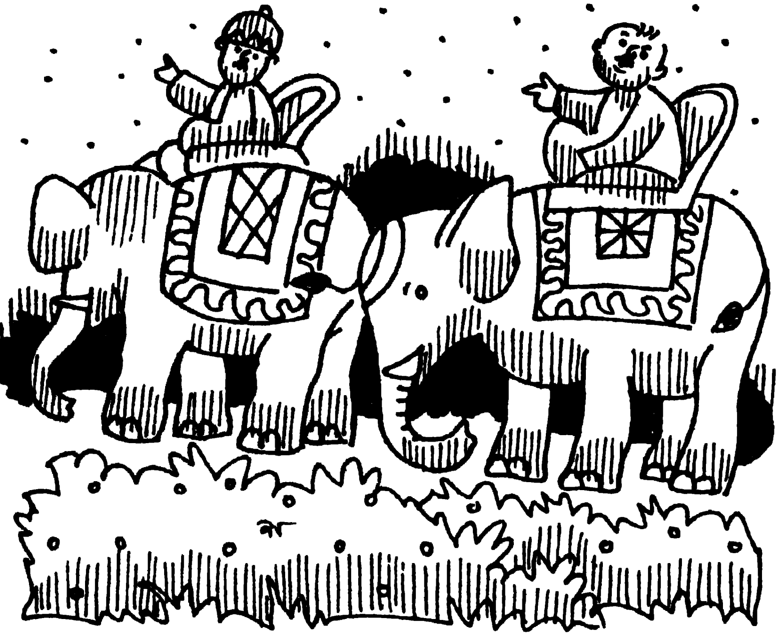
'না' বলতে পারলাম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্বচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে বসবে; তবু মহারাজার আমন্ত্রণ কি করে অস্বীকার করি? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, চলুন, যাওয়া যাক। ক্ষতি কি?

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের জন্যে এবং জঙ্গল বাঘের জন্যে বিখ্যাত। এর পরে তিনি কোথাকার মহারাজা, তা বোধহয় না বললেও চলে। বলতে অবশ্য কোনো বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেন না রাজামহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম-মহরম আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজারদর হয়তো একটু বাড়তোই। কিন্তু মুশকিল এই, টের পেলে মহারাজ হয়তো আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবি আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। মহারাজা না পড়ুন, মহারাজকুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না, এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে গুন্ডাপাড়ায়, কোনো মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে দেবে। অতএব সব দিক ভেবে স্থান, কাল, পাত্র চেপে যাওয়াই ভালো।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার-যাত্রা তো বেরোল। হাতির উপরে হাওদা চড়ানো, তার উপরে বন্দুক হাতে শিকারিরা চড়াও—ডজনখানেক হাতি চার পায়ে মশ মশ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতিতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র মন্ত্রিদের হাতি; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতিতে মশগুল হয়ে স্বয়ং মহারাজা; তার পরের হাতিটাতেই একমাত্র আমি এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতিআরো গোটা কয়েক হাতি। তাতে অপাত্র-অমিত্ররা। হাতিতে হাতিতে যাকে বলে ধূল পরিমাণ! এত ধুলো উড়ল যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।



জঙ্গল ভেঙে চলেছি। বাঁধা রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ,—এখন আর মশ মশ নয়, মড় মড় করে চলেছি। এই 'মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে!' ভেবে না পেয়ে হতচকিত শেয়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালির দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখিদের কিচির-মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে চলেছি। হাতিরা কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোনো বাঘের ধড় দূর থাক, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর কীসের শোরগোল শোনা গেল। কোত্থেকে একদল বুনো জংলি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কি করছিল কে জানে! মহারাজা হয়তো বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে হাত-তি হাত-তি বলে চেচাঁতে লাগল।

হাত-তি তো কি? হাতি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ—হাতি কি কখনো দেখনি না কি? ও নিয়ে অমন হৈ চৈ করবার কি আছে? হাতির কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্ফঝম্ফ আমার ভালো লাগে না। হাতিরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি? হাতি বলে কি মানুষ নয়? হাতিরও তো মানমর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে!

মহারাজাকে কথাটা আমি বললাম। তিনি জানালেন যে, আমাদের হাতির বিষয়ে ওরা উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতি এদিকেই তাড়া করে আসছে, সেই কথাই

ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে! এবং কথাটা খুব ভয়ের কথা। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাতি এবং হাওদা সমেত সবাইকে আমাদের দলে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে।

তৎক্ষণাৎ হাতিদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল। কথায় বলে হস্তি-যূথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো-ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক কোনো রকমে তো হাতির পাল ঘুরল, তারপরে এল পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতি চালিয়ে যাবার সময় মহারাজ বলে গেলেন, খবরদার! হাতির থেকে একচুল যেন নড় না। যত বড়ো বিপদই আসুক, হাতির পিঠে লেপটে থাকবে। দরকার হলে দাঁতে কামড়ে, বুঝেছ?

বুঝতে বিলম্ব হয় না। দূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহণধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন হন করতে করতে এগিয়ে আসছে। আরো—আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠেছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতিরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতিটা কিন্তু চলতে পারে না। পদে পদে তার যেন কীসের বাধা! মহারাজার হাতি এত দূর এগিয়ে গেছে যে, তার লেজ পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতিরাও যেন ছুটতে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতিটার হল কি। সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোনো রকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতিরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতির পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরাল হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েছে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও সে-ই তখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে! তোমার হাতি চলছে না কেন? জোরসে চালাও। দেখছ কি?

—জোরে আর কি চালাব হুজুর? তিন পায়ে হাতি আর কত জোরে চলবে বলুন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে।

—তিন পা। তিন পা কেন? হাতিদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবশ্য, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার পা দেখেই উঠেছিলাম বলে যেন মনে হচ্ছে। অবশ্য, ভালো করে ঠিক খেয়াল করিনি।

—এর একটা পা কাঠের যে! পেছনের পা-টা। খানায় পড়ে ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতিটাকে মারতে রাজি হলেন না, সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রঙ বার্নিশ যে ধরবার কিছু জো নেই। ইস্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা কি না!

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতির পা-ই নয়, আমার গলাও সেইসঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া

হাতিই নয়, দুগ্ধপোষ্য একটা খুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন!

—কাঠের হাতি নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কি করে চালাবে? আমি অবাক হয়ে যাই।

বার্লি আমার নাম, সে সগর্বে জানাল,—আর আমি হাতি চালাতে জানব না?

—বার্লি? ভারী অদ্ভুত নাম তো!—আমার বিস্ময় লাগে।

—আমি সাবুর ভাই। সাবু আমেরিকায় গেছে ছবি তুলতে।

—তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল। না বলে আমি পারলাম না।—গেলে ভালো করতে।

শোনবামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কি না কে জানে, তৎক্ষণাৎ সে হাতির ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশেই কি না কে বলবে, দে ছুট! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া।

আমি আর আমার হাতি, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম। আর পেছন থেকে তেড়ে আসছে পাগলা হাতির পাল। তেপায়া হাতির পিঠে নিরুপায় এক হস্তিমূর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার মতো আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছপালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধুলোর ঝড়! তার ঝাপটায় আমার দম আটকে গেল একেবারে।

মহারাজার উপদেশ মতো আমি এক চুল নড়িনি, হাতির পিঠে লেপটে সেঁটে রইলাম! হাতির পাল যেমন প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতির পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল! নীচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও-মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কি দৃশ্য! লম্বা চওড়া বেঁটে খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাত হয়ে শুয়ে! কর্তা, গিন্নি, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পুরো একটি ব্যাঘ্র পরিবার! হাতির তাড়নায়, হয়তো বা তাদের পদচারণায়, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোনও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়। কিন্তু এই বিভুঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা, আমার জানা নেই। তাছাড়া, বাঘের চৈতন্য-সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত কি না, সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কি, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটাকতক টেনে ছিঁড়ে এনে বাঘগুলোকে একে একে সব পিছমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটলি বানিয়ে ফেলা হল—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতিটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে ধরে নিজের পিঠের

উপর চালান দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠলাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হল।

পাঁচ-পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাতে দিয়ে দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে এক সঙ্গে এতগুলো শিকার নিজের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ফেরা—এ কি কম কথা?

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্চা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন অতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারংবার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হল। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত পা বাঁধা—বন্দী নেহাত! নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লির মতো একবার চোখ কচলে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করতো।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি, এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষেও যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—এতগুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কুছ নেই—বহুৎ তাজ্জব কি বাত...!

আরে হাতিয়ার নেই, তো কী, হাত তো ছিল? বাধা দিয়ে বলতে হলো আমায়। আর, তোমার হাতির পা-ই তো ছিল হে! তাই কি কম হাতিয়ার? বাঘগুলোকে সামনে পাবামাত্রই, বন্দুক নেই টন্দুক নেই করি কি, হাতির কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু হাতে তাই দিয়েই এলোপাতাড়ি বসাতে লাগলাম। ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা! হাতির পদাঘাত—সে কি কম নাকি? অবশ্য, তোমাদের হাতিকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বলবামাত্র পেছনের পা দান করতে সে পেছ-পা হয়নি। আমিও আবার কাজ সেরে তেমনি করেই তার ইস্ট্রাপ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস, তুমি হাতিটার কেঠো পায়ে-র কথা বলেছিলে আমায়...!

অম্লান বদনে এত কথা বলে হাতির দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। হাতিরা ভারী সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং নিরামিষাশী তো বটেই, তাদের মতো সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্তি নয়, ও যেন রীতিমতো অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে-কী বলব! বলা বাহুল্য, তারপর আমি আর ওর ত্রিসীমানায় যাইনি।

হাতিরা সহজে ভোলে না।

তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ

তোমাদের কারো ওদিকে ঝোঁক আছে কি না আমার জানা নেই, তবে আমি—সত্যি কথা বলতে কি—তারে চড়তে একেবারেই ভালোবাসিনে। চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না; তাছাড়া, (টেলিগ্রাফেরই বল আর সার্কাসেরই বল) যেসব পোস্টের উপরে সাধারণত তার খাটানো হয়, মাটির থেকে তার বেশ উচ্চতা থাকে। আর, এই কারণে প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা। তারে চড়ার ফ্যাসাদ এনতার!

কিন্তু এককালে, টেলিগ্রামের মতো, তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল। আমি সার্কাস ছেড়েছি, তা খুব বেশি দিনের কথা নয়। তারের খেলা দেখানোই ছিল তখন আমার রোজকার কাজ এবং রোজগারের কাজ—ঐ উপায়েই আমার দিন গুজরান হত। কিন্তু একদা তর-যোগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ফলেই দারুণ বিরক্ত হয়ে সার্কাস আমি ছেড়ে দিলাম। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনো আমার—, কিন্তু সে-কথা থাক।

তোমরা হয়তো অনুমান করছ আমি পড়ে গেছলাম? উঁহু, মোটেই তা নয়। পড় পড় হয়েছিলাম, কিন্তু পড়িনি। কিন্তু না পড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভালো। আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবাল বৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকেরাই এক বাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন একথা অস্বীকার করব না। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সেই খেলাটা আর একবার দেখতে চেয়েছিলে। আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিনেরও টিকিটও হয়তো কিনে থাকবে, কিন্তু সে-খেলা দেখাতে আমি আর রাজি হইনি। তারপর কোনো খেলাই আমি আর দেখাইনি, তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আঃ, সেই জুতো জোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমার তার-পথের সহযাত্রী, আমার বিপজ্জনক সহচর সেই জুতো জোড়া—তাদের সহায়তায়, এমনকি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম! কত বার সত্যি-সত্যিই তারা আপদ-বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু -বিপদ থেকে যে বাঁচায়, প্রয়োজন হলে এবং প্রয়োজন না হলেও, সে-ই যে বেশি বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হল। সার্কাস ছাড়ার পর আমি আর তাদের মুখদর্শনও করি না। ছুড়ে ফেলে দিয়েছি তাদের। কোথায় ফেলেছি মনে নেই, আমারই ঘরের আনাচে-কানাচে, দেরাজ-আলমারির পেছনে-টেছনে কোথাও হবে। আমার দৃষ্টির সম্মুখসীমার বাইরে।

কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে-কথা বলব না—কিন্তু হ্যাঁ, তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তার পর। আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে। কিন্তু মানুষ যা চায় না তা-ই এসে তার ঘাড়ে চড়ে—তাকে নাচায়! সেই কথাই আজ তোমাদের বলব।

আমাদের বাসার সামনে সুহৃদদের বাড়ি—সেই সুহৃদ, ক্রিকেট খেলায় যার জোড়া মেলে না। কিন্তু খেলধুলার কথা নয় কোনো, কথা হচ্ছে এই, আমাদের তেতলার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাদের বাড়ির গা ঘেঁসে গেছে একটা জিনিস। আর কিছু নয়, এক টেলিফোনের তার।

সেদিন সকালে উঠে দেখলাম একটা ঘুড়ি কোত্থেকে সেই তারে এসে আটকেছে। রঙিন ঘুড়ি, বেশ চৌকোনো, তারে বেধে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি। বাল্যকাল এবং সার্কাস-কাল। দুইই যুগপৎ মনে পড়ল আমার।

দুয়ের যোগাযোগ হলে তো কথাই ছিল না। সেই মার্কামারা জুতো জোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সটান ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণ ওড়াতেই আরম্ভ করে দিতাম হয়তো।

ইত্যাকার চিন্তা করছি এমন সময়ে নীচের রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে—মশাই, ও মশাই!

রাস্তার দিকে তাকাই। এমন কেউ না, আমারই জনৈক বালক-প্রতিবেশী।

রঙচঙে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পড়তে বসেছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে ঘুড়িটা চোখে পড়ল—বই ফেলে এসেছে, কিন্তু মই নিয়ে আসেনি। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, মই না আনার মূর্তিমান কারণ নাকি আমি।

—ঘুড়িটা আমায় পেড়ে দিন না মশাই!

—কি করে পাড়ব? নাগালের বাইরে যে! হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম। আমার দোতলার বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান।

—আপনি তারের উপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন। ছেলেটি আবদার ধরে।

—বাঃ, পড়ে যাব না? দেখছ তো কত উঁচুতে? ওখান থেকে পড়লে কি বাঁচব আর? সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা যতদূর সম্ভব ওর দিব্য দৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—একদম ছাতু একেবারে, বুঝেছ, তারপর আর দেখতে-শুনতে হবে না।

—বাঃ, আপনি পড়বেন কেন? আপনি আবার পড়েন না কি?

—পড়াশোনা করি না তা বটে! কিন্তু তাই বলে কি উলটে পড়ি না? তিনতলার থেকে পড়িনা না একেবারে?

সে শুনতেই চায় না—তারে চড়তে পারেন যে আপনি!

—বটে? তারে চড়তে পারি? বল কি! এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায়?

হুম, মামার কাছে শুনেছি আমি। মামা বলেন, আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন।

মামার কাছে যে শোনে তাকে থামানো সহজ নয়। আমি বলি—তুমি এক কাজ কর, তোমার মামার ঘাড়ে চড়ে দেখ না, যদি নাগাল পাও। পেয়ে যাও যদি?

এ পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে, তার মামা না কি ভারী বেঁটে। অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দিই—ঘুড়ি ওড়াবে, তোমার একটা ঘুড়ি চাই, এই তো? এই পয়সা নাও, ঘুড়ি কেনগে।

অনটি পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যয়। খানিক বদে আর একটি ছেলে—তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার—দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির উপর নজর দিয়ে তার ঠিক নীচেই এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমাকে ঘুড়িটা দেবেন?

—স্বচ্ছন্দে। তুমি নিয়ে যেতে পার, আমার কোনো আপত্তি নেই।

—আমি কি করে পাড়ব? আমি কি তারে চড়তে জানি? ছেলেটি জবাব দেয়।

ও বাবা! এও তারে চড়ার কথা বলে যে! ভয়ে ভয়ে বলি—তা আমিই কি আর চড়তে জানি?

—বাঃ, আপনি জানেন না আবার! চড়ে চড়ে কত তার ক্ষইয়েই ফেললেন! সবাই তো বলে! আপনি আমায় পেড়ে দিন।

—এককালে পারতাম বটে। স্বীকার করতে আমি বাধ্য হই—কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন—যদি পড়েই যাই?

পড়বেন না, ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে—কিছুতেই পড়বেন না, বলছি আমি। আপনি পারবেন—হ্যাঁ।

তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে। আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না—সে-কথা কি বলা যায়? পড়ে গিয়ে পা ভাঙব শেষটায়?

ভাঙে যদি আমি দায়ি। ও আমাকে ভরসা দেয়।

পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা একবার ভাবি। পা-ই যদি ভাঙে, তুই ভেঙে ক্ষান্ত হবে কি না কে জানে? মাথার উপর দিয়েও চোটটা যেতে পারে। তেতালা থেকে পড়বার সময় বেতালা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি—সাধারণ মানুষের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকার কথা নয়। ছেলেটার শিরোদেশ থেকে ঘুড়ির উড়ন্ত দূরত্ব (অথবা দূরন্ত উড়ত্ব) পর্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নিই। পর্যালোচনা করে দেখি।

—আপনি অত ভীতু কেন? সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায়।

আমি লজ্জিত হই, কিন্তু সাহসী হতে পারি না। —ভয় আমার নেই, তবে কি জানো, কদিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা—

ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না—তাহলে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন। ঘুড়ি আমি কিনেই নেব।

—ও, তাই বল। জোর করে একটু হাসি—সে-কথা মন্দ না।

আনিটা হস্তগত হবামাত্র ছেলেটা অস্তগত হয়।

নাঃ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়—এখুনি হয়তো আবার কার ভাগনে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে। অনেক ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়। এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। রাস্তার সীমান্তে

একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করি। অতদূর থেকেই আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধহয়—ছেলেটা দৌড়তে শুরু করে দেয়। পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক পৌঁছয়—মশাই, ও মশাই!

ডাক পাড়তে পাড়তে সে আসে। কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয় (আমি তো কি ছার, ভগবান পর্যন্ত করে থাকেন বলে শোনা গেছে)। —কি খবর তোমার? বলে ফেল চট্‌পট্‌।

—ওই ঘুড়িটা আমায় দিন না। ছেলেটা হাঁপাতে থাকে।

ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব? এবার আমি সত্যি সত্যিই চটে গেছি।—কার ঘুড়ি যে, আমি জানিও না।

—তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন। ছেলেটা স্পষ্টবক্তা এবং বেশি কথা বলতে ভালোবাসে না।

অগত্যা ওকেও একটা আনি ছুঁড়ে দিই। তিন-তিনটা আনির বাজে খরচে মনটা খচ খচ করতে থাকে।

টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতেই নীচের থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজ আসে—অগাস্টাস সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ্বরবাবু কি বাসায় আছেন?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই—আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছি। কি দরকার বলুন? ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকিয়ে নিই, এঁরও যেন ওর উপরেই নজর—এই রকম একটা আশঙ্কা হতে থাকে।

তা, তারেশ্বরবাবু—ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেন।

(তারের ঈশ্বর ইতি তারেশ্বর; সার্কাস থেকে এই নাম পাওয়া আমার। যে-লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাত তার নাম হয়েছিল ঘোড়েল। এ নিতান্ত মন্দ না, নাম-কে-নাম খেতাব-কে-খেতাব!)

তারেশ্বরবাবু, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন। ভদ্রলোকের হাতের কাজ চলতেই থাকে। দেখুন, আমার ভাগনেরা আবদার ধরেছে—

বাক্যটা অমি সংক্ষিপ্ত করে আনি—কিন্তু তাদের তো আমি—

—হ্যাঁ, তারা কিনছিলও বটে। আমিই সেই মনোহারি দোকানে দাঁড়িয়ে। আমিই বারণ করলাম, বললাম, ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিস কেন? আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়া-প্রদর্শক তারেশ্বরবাবু রয়েছেন—

আমি তাঁকে বাধা দিই—তারেশ্বর হতে পারি কিন্তু তারকেশ্বর তো নই—সবার প্রার্থনা সব প্রার্থনা পূর্ণ করা কি সাধ্য আমার?

তিনি আমার কথায় কানই দেন না, বলে চলেন—তাঁকে বললেই তিনি একটু কষ্ট করে দু-পা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এখুনি তার থেকে খুলে এনে দেবেন। তাঁর কাছে ও তো এক মিনিটের মামলা, পা বাড়ালেই হল। আমিই ওদের কিনতে বাধা দিলাম। সেই পয়সায় ওদের চকোলেট কিনে দিয়েছি।

প্রমাণস্বরূপ, তাঁর নিজের শেয়ারের চকোলেট আমাকে দেখালেন; দেখিয়েই মুখে

পুরে দিলেন। তার পরে প্রসন্ন মুখে বললেন, ও পাড়তে আপনার কতক্ষণ আর ? এক মিনিটের ব্যাপার! তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের।

এর আর কি জবাব দেব আমি? বিরসবদনে চেয়ারে এসে বসি। একটু পরেই অনতিপূর্বপরিচিত সেই দুই ভাগনে, তাদের তিন বোন, ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলে-মেয়ে এবং অপোগন্ড-কোলে একজন ঝি—এই চৌদ্দজন, এক বিরাট শোভাযাত্রা করে এসে হাজির।

একাদিক্রমে সকলের দিকেই দৃক্‌পাত করি। এরা সবাই-ই কি ওই একমাত্র ঘুড়িটার প্রত্যাশী? জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তাই বটে! অনন্যোপায় হয়ে পকেট ঝেড়ে-ঝুড়ে খুচরা-খাচরা যা ছিল সব বার করতে হয়। প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাধলে লোকে প্রথমত পয়সাই বার করে, প্রাণ সহজে বার করতে চায় না! পয়সা-বিয়োগ বরং সহ্য যায়, প্রাণ-বিয়োগের শোক একেবারে অসহ্য।

—দেখ, কদিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই, নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলেই খুশি হতাম।

ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই। জন্ম-খঞ্জের চেয়েও আমার পায়ের অবস্থা যে অধুনা বেশি খারাপ, হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝতে ওদের দেরি হয় না।

—দেখছ তো, এমনিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাঁচ লাগছে। তার উপরে তারেব উপর দিয়ে চলতে হলেই—বুঝতে পারছ।

ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে। সবাই বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন।

—তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি, ঘুড়ি তোমরা কিনে নাও গে, কেমন?

দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গররাজি নয়! পরের দুঃখ এরা বোঝে। প্রত্যেকের হাতেই চারটে করে পয়সা দিই।

অবশেষে ঝি-ও দেখি হাত বাড়ায়।

—য়্যাঁ? তুমিও ওড়াও না কি ঘুড়ি? আমি ঈষৎ অবাক হই,—বটে? তোমারও ওই বদ অভ্যেস আছে?

এক গাল হেসে মাথা নেড়েই ঝি তার জবাব দেয়, বাক্যব্যয়-বাহুল্য করে না।

অগত্যা ঝিকেও একটা আনি দিই; এবং ওর কোলের অপোগণ্ডটাকেও দিতে হয়। কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর সখ থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল—ওই বা কেন বাদ যাবে একলা?

আমারই চৌদ্দটি আনির তেরটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাকস্থ হয়—আমি অম্লান বদনে সহ্য করি। কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখস্থ করতে থাকে।

এরপর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব! কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে? একটি ছোট মাথা দরজার ফাঁকে উঁকি মারে।

উঁকি মারে, আবার অন্তর্হিত হয়। ডাক দিই।

অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে। খুব সম্ভব, আগের জন্মের আলাপী; কেননা ইহজন্মে একে কোথাও দেখেছি মনে হয় না।

সঙ্কোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না। একটা আনি দিই ওর হাতে—কিছু বলতে হবে না, এই নাও।

যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি চলে যায়।

নাঃ, ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ নয়। ধড়াচূড়া পরে বেরিয়ে পড়তে হল।

বেরোবার মুখেই দুর্ঘটনা। একটি বালক তিরবেগে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভয়াবহ কলিশন, কিন্তু ফিরে আর তাকাই না; হত অথবা আহত, ফলাফল কি হল দেখবার দুঃসাহস হয় না। কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশে ছুড়ে দিই, দিয়েই দ্রুত এগোই।

গলির মোড়ে আর একটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হন হন করে সে চলেছে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাকে ধরে থামাতে হয়। —কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। এই নাও। আনিটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। —অনেক দূর থেকেই আসছ বলে বোধ হচ্ছে। বাড়িতে আমাকে না পেলে মনে কষ্ট পাবে, সেইজন্যই এই মাঝপথেই দিলাম।

তবু যেন সে বুঝে উঠতে পারে না।

—আমার পায়ে ব্যথা কিনা, তারে চড়তে পারব না তো, সেইজন্যই! আমি ওকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করি।

ছেলেটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে আমি সরে পড়ি।

অনেকক্ষণ এধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরি। সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়, বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে, বিশেষ করে যে-পার্থিব অংশটায় আমার বসবাস। একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত করতে থাকে, পা টিপে টিপে পাড়া দিয়ে চলি। যে-রকম ছেলেপিলের সংক্রামকতা আজকাল!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রচণ্ড কোলাহল কানে লাগে। আর একটু এগোতেই সমস্ত বিশদ হয়। সামনের, পাশের, পেছনের অলিগলি এবং আমার বাড়ির আশপাশ জুড়ে কম-সে-কম প্রায় দেড় হাজার বালক! তারা একবার ঘুড়ির দিকে আর একবার আমার বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কীসের জন্য এত আন্দোলন বুঝতে আর বাকি থাকে না।

'ন যযৌ ন তস্থৌ'—বুকনিটা বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের লেখায় বার বার চোখে পড়েছে, তোমরাও হয়তো চাক্ষুষ করে থাকবে, কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্তেই যেন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

তারপর কেবল এই বাক্যগুলি অস্পষ্টভাবে আমার কানে এল; 'ওই ওই', 'ওই যে তারেশ্বরবাবু!' 'তারেশ্বরবাবু এই দিকে—', 'আসুন আসুন, আমরা আপনার জন্যই—', 'ওঃ কখন থেকে দাঁড়িয়ে, বাপ্‌স!' 'কি হল ওঁর, ভদ্রলোক এগোচ্ছেন না তো!' 'গেঁটে বাত ধরল না কি!' 'ওদিক দিয়ে সরে পড়ছেন যে!' 'ও বাবা, তারেশ্বরবাবুর পেটে-পেটে এত!' 'কি সাংঘাতিক মানুষ দেখছিস!' 'আরে পালায়

যে।' 'তারেশ্বরবাবু পালাচ্ছেন।' 'পালাল রে, তারেশ্বর পালাল।' 'সটকে পড়ল—ধর ধর তারশাকে।'

উপসংহারে এই কথাগুলো শুনলাম ঃ

'আপনি কখনো দৌড়ে পারেন আমাদের সঙ্গে?' 'রানিং-এর অভ্যেস থাকা চাই মশাই।' 'হ্যাঁ, আমাদের মতো প্র্যাকটিস করা চাই রেগুলার, রোজ সকালে উঠেই ছুটতে হবে মাঠে।' 'বলে রানিং-সু-ই কিনে ফেললাম ছ জোড়া' 'কত গন্ডা মেডেলই পেয়েছি প্রাইজ।' 'আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবেন আপনি—ছ্যোঃ।' 'আর এই দেহ নিয়ে?' 'দেহ না তো কলেবর' 'তারের উপর দৌড়-ঝাঁপে কি হয় বলতে পারি না, তবে ফাঁকা রাস্তায় আপনি আমার সঙ্গে হুঁ হুঁ, জানেন আমি রানিং-এ চ্যাম্পিয়ন?' 'ছি ছি, ছুটে পালাচ্ছেন, আপনার ভারী অন্যায়।' 'আপনি ভারী কাপুরুষ তারেশ্বরবাবু।'

তার পর যা হল, তা আর কহতব্য নয়। সম্মিলিত হট্টগোলের মধ্যেই কার্যকলাপ সব ঘটতে লাগল। মোহনবাগানের সেন্টার-ফরওয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় (প্রায়ই দিতে পারে না বা নিজেদের গোলে দিয়ে ফেলে, তাই রক্ষে) সেই দুরবস্থাই আমার হল। ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ির নীচ বরাবর এসে পৌঁছলাম প্রায় পিছমোড়া হয়ে। আমার তখন কাঁদবার অবস্থা।

—কি চাও তোমরা বল তো? অশ্রুপাত সংবরণ করে কোনোরকমে কথাগুলো বলি।

—ওই ঘুড়িটা আমরা চাই। তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটা আপনি আমাদের পেড়ে দিন।



—পায়ে ব্যথা যে, আমি অভিযোগ জানাই, —বাঁ পা-টায়।

—তাতে কি হয়েছে? এক পায়ে কি যাওয়া যায় না? এই রকম করে, একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয়।

তবু আমি বলবার চেষ্টা করি, তারের উপর কি অমন লাফানো চলবে? কতটুকুই বা জায়গা! অত স্কোপ কই?

—খুব খুব, সকলের সমবেত উৎসাহ পাই—

—ও তার ছিঁড়বে না, ভয় নেই। আপনি যত খুশি লাফান না কেন!

—তবে তাই হোক। আমি 'মরিয়া' হয়ে উঠি। সেই হতভাগা জুতো জোড়াকে খুঁজে পাই কি না, দেখা যাক।

বাড়ির মধ্যে ঢুকি। বেরোবার মুখেই বাধা পড়েছিল আজ, তা না মেনেই এই দুর্দশা এখন। পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কি না কে জানে! আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড হয়ে সঙ্গে ভেতরে আসে।

সেদিনই একটা গল্পের বই বেচে একশ টাকা পেয়েছিলাম, নোটখানা বুক পকেটে কড়কড় করছিল। সেইটাই ভাঙিয়ে আনি-য়ে ফেলব না কি? আনি-য়ে মানে আনি করে। মনে মনে ভাবি। কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে? কাঁহাতক, কতদিন এমন পারা যাবে? দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরাবে না। জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশি। তবে? তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক। একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয় বোধ হয়। আমার মনে হয়।

এঘর ওঘর খুঁজে, ভাঙা এক আলমারির পেছনে জুতো জোড়াকে আবিষ্কার করা গেল। কালিঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা, আমার এককালের পরম আত্মীয়! —দেখে দুঃখিত হলাম। বেচারাদের সারা গায়ে অগুন্তি আলপিন আর যত রাজ্যের পেরেক। আমার বাক্সের, দেরাজের আর ঘরের চাবি কেন যে কেবলই হারিয়ে যায়, এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হল। সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন রয়েছে। সব একত্র হয়ে; মিলেমিশে বাস করছে সবাই। সুটকেসের একটা ছোটো তালাও সেই সঙ্গে। একটা কর্ক-স্ক্রুও।

আমার আড়াই ডজন বডিগার্ডের এক এক জনের উপর এক-একটার ভার দিই। দশ জন আলপিনগুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে। চার জনে পেরেকগুলো সংগ্রহ করে। তিন জন মিলে অনেক ধস্তাধস্তিতে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাকি তেরো জন প্রত্যেকে একটা করে চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে; কর্ক-স্ক্রুটাকেও।

তারপরে আমি সেই মারাত্মক জুতো আমার পদগত করি। বিস্তর পয়সা ব্যয় করে ভাল ভাল চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই, যাতে তারে যাতায়াতের দুর্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে

সেইদিকে লক্ষ রেখে। এবং কৃতজ্ঞতাসূত্রে একথা অবশ্যই স্বীকার করব, ওদের অনুগ্রহে তার থেকে কোনোদিন ভূপতিত হতে হয়নি আমায়। হ্যাঁ, ভূপতিত হতে হয়নি, সত্যিই।

কান-ফাটানো করতালির ভেতর তেতলার ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম।। আবার যেন সার্কাসের দিন ফিরে এল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগুন্তি কচি কচি উন্নত মুখ। উৎসুক এবং উদ্দীপ্ত। চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই। এতক্ষণ হৃৎকম্প হচ্ছিল, কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয় ক্রমশ—একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ হতে থাকে।

ভগবান মাথার উপরে এবং জুতো পায়ে—তখন আর ভয় কীসের? আকাশও মাথায় ভেঙে পড়বে না এবং ভূপতনের আশঙ্কাও নেই। অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে উত্তরে যাব! লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করি। সমস্ত তারটায় দু-দুবার টহল দেওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়, উন্মুক্ত আকাশের মুক্ত বায়ুতে প্রাতর্ভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাকতে এত দিন ব্যবহার করিনি কেন? এত উচ্চতায় আর এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয়ই যথেষ্টই থাকে, তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয়! নীচের থেকে হাততালির আর বিরাম নেই।

নীচ থেকে আওয়াজ পাই—ঘুড়ি ঘুড়ি! দেরি করছেন কেন? ওই তো সামনেই! ধরে ফেলুন ঘুড়িটাকে।

হ্যাঁ, ঘুড়ি! প্রাতর্ভ্রমণের ভাবনার মধ্যে ঘুড়ির কথা ভুললে চলবে না। ধরবো তো বটেই।

কিন্তু আমি আছি তারের উপরে আর ঘুড়ি ঝুলছে তারের নীচে—কি করে বাগাই ওটাকে? উঁকি ঝুঁকি মারি, অনেক চেষ্টাচরিত্র করি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নীচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দিই; দিয়ে ইতস্তত সঞ্চালন করি, কিন্তু ঘুড়ি তেমনি থাকে—আমার হাত-পা দুজনেরই নাগালের বাইরে। বিলকুল বেপরোয়া।

তাই তো, এত ভারী মুশকিল হল দেখছি!

—বসে পড়ুন মশাই। হামাগুড়ি দিয়ে বসুন। কিংবা শুয়েই পড়ুন না! পাশ ফিরে শুলেই ঠিক ধরতে পারবেন ওটাকে।

নীচের থেকে আদেশ-উপদেশের কামাই নেই, কিন্তু পালন করাই কঠিন। ভালো করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তেমনটা সহজ হবে না। না, বালিশের অভাবের জন্য বলছি না, এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাত্রেই আমি খুঁজে পাই (আমার মাথার তলার চেয়ে চৌকির তলাই তাদের বেশি পছন্দ)—সেজন্য নয়; কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো লক্ষণীয়। সেটাও বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নীচ থেকে তাগাদার রেহাই হয় না, হাততালিও খুব জোর বাজতে থাকে।

অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি—যা থাকে কপালে, জয় মা দুর্গা, ঘুড়িটাকে আমি হাতাবই। তারের উপর হামাগুড়ি দিয়ে পড়ি। কিন্তু দুঃসাধ্য-সাধনার সূত্রপাতেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

তার থেকে আমার পা ফসকায়। ছেলেদের উত্তেজিত চিৎকারে আকাশ যেন

অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে, কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি ক্রমশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে।

তার থেকে আমি পড়ে যাই। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়? যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে. তাতে পড়া অত সহজ নয়। এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে, আমার উপরে এখন তার থাকে—আমি ঝুলতে থাকি ঘুড়ির মতোই, ঘুড়ির পাশাপাশি। সেই সার্কাসের দুর্ঘটনাটার মতোই আবার। কী বিপদ ভাব দেখি!

নীচে মহা হৈ চৈ! ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারী লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে কে! আমার 'ঝোঝুল্যমান' অবস্থা—আমি নিরুপায়। ঘাড় বাঁকিয়ে আড় নয়নে কেবল তাকাই। সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি—কি আর করব?

এতক্ষণ বাদে সকালের সেই মামা এগিয়ে আসেন—চকোলেট খাওয়া মামা।—আহা, কি করছ তোমরা! ভদ্রলোককে নামাবার ব্যবস্থা কর। শুধু লাফালে কি হবে?

মামা, তোমাকে ধন্যবাদ। আমার মনোব্যথা তুমি বুঝেছ। মনে মনে তাঁর প্রতি সকৃতজ্ঞ হই।

—অমনি করে কি ঝুলে থাকা যায়? ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে না? ওইভাবে কতক্ষণ ওখানে থাকবেন?

—বলুন তো! বলুন মামা, আপনিই বলুন। এভাবে কতক্ষণ থাকা যায় এই শূন্যমার্গে?

মামা একটা দড়ি জোগাড় করে আনেন নিজেই। তাতে ফাঁস লাগিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেন উপরে আমার দিকে। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পর দড়ির ফাঁসটা অমন গলায় এসে বাধে।

মামা বলেন, বি রেডি—সব্বাই! এক হ্যাঁচকায় নাবিয়ে আনব। তোরা হাত পেতে তৈরি থাক—পড়লেই লুফে নিবি। হেঁইয়ো!

এইবার সত্যিই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। —অমন কাজও করবেন না মামা। আমি প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করি,—তাহলে ফাঁসি হয়ে যাব যে! এখনো তো আপনাদের কাউকে আমি খুন করিনি।

মামা বলেন, তাহলে? তাহলে উপায়? তাহলে একটা মই নিয়ে আয়। হরেকেষ্টর বাড়ি আছে তেতলা-সমান মই, চেয়ে আন গে। মই ধরেই নেমে আসতে পারবেন তারেশ্বরবাবু।

হ্যাঁ, তা হয়তো পারবেন। তারেশ্বরবাবু মনে মনে ঘাড় নাড়েন।

মই আসে।

আমার বরাবর খাটানো হয়।

মইয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি।

পা আমার উপরের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে—একান্ত অসহায়। কিন্তু হাত আছে, হাতই পায়ের অভাব মোচন করবে এখন। লোকে

যেমন পা চালিয়ে নামে, আমাকে তেমনি এখন 'স্টেপ বাই স্টেপ' হাত চালিয়ে নামতে হবে।

নামবার উদ্যোগ করছি, আবার ছেলেদের আর্তধ্বনি। —ঘুড়ি ঘুড়ি। ওটাকেও আনবেন ওই সঙ্গে— .

হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে সেই একশ টাকার নোটখানাই হয়তো গুঁড়ির মতো উড়িয়ে দিতে হবে। আর, যার জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামা, তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে?

ঘুড়িটাকে করতলগত করার জন্য হাতই বাড়াই।

কিন্তু এমনি দুর্বিপাক—

এতক্ষণ ব্যাটা পাশে ঝুলছিল অম্লানবদনে, কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, কিন্তু এখন এই মুহূর্তেই কোত্থেকে দমকা বাতাস এসে পড়ল আর সেটা গেল নাগালের বাইরে চলে।

এখন সে উড়ছে তারের উপরে—ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই জায়গায়।

আমি আছি ত্রিশূন্যে, আর সে আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে।

পরোপকারের বিপদ

আমার বন্ধু নিরঞ্জন ছোটোবেলা থেকেই বিশ্বহিতৈষী—ইংরেজিতে যাকে বলে ফিলানথ্রপিস্ট। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তে ওর ফিলানথ্রপিজমের অনেক ধাক্কা আমাদের সইতে হয়েছে। নানা সুযোগে ও দুর্যোগে ও আমাদের হিত করেছে, করবেই, একেবারে বদ্ধপরিকর—আমরাও কিছুতেই দেব না ওকে হিত করতে। অবশেষে অনেক ধস্তাধস্তি করে, অনেক কষ্টে হয়তো ওর হিতৈষিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি। একটা বিহিত হয়েছে।

হয়তো ফুটবল ম্যাচ জিতেছি, সামনে এক ঝুড়ি লেমোনেড, দারুণ তেষ্টাও এদিকে; ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে, বলেছে—এত পরিশ্রমের পর জল খেলে সর্দিগর্মি হবে।

—হয় হোক। গরমের হাত থেকে বাঁচি আগে। বলেছি আমরা!

—হার্টফেল করবে যে!

আমরা বলেছি—করে করুক, তোমার তাতে কি?

—আহা, মারা যাবে যে গো।

—জল না খেলেও যে মারা যাব, দেখছ না?

সে গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছে—সেও ভালো।

তখন ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার ম্যাচ খেলা শুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল বানিয়ে। কিংবা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমোনেডের বোতলগুলোকে ব্যাটের মতো ব্যবহার করা যাক।

পরের উপকার করবার বাতিকে নিজের উপকার করার সময় পেত না সে। নিজের উপকারের দিকটা দেখতেই পেত না বুঝি। এক দারুণ গ্রীষ্মের শনিবারে হাফ-স্কুলের পর মাঠের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছি, নিরঞ্জন বলে উঠল—দেখছ, হিরণ্যাক্ষ, দেখতে পাচ্ছ?

কি আবার দেখব? সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ, একটা রাখাল গোরু চরাচ্ছে, দু-একটা কাক-চিল এদিকে ওদিকে উড়ছে হয়তো—এ ছাড়া আর কোনো দ্রষ্টব্য কোনো দিকে দেখতে পেলাম না। ভালো করে আকাশটা লক্ষ করে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ, দেখেছি, এক ফোঁটাও মেঘ নেই কোথ্থাও। শিগগির যে বৃষ্টি নামবে সে ভরসা করি না।

—ধুত্তোর মেঘ! আমি কি মেঘ দেখতে বলেছি তোমায়?

—তবে কী দেখতে?

ওই যে রাখালটা গোরু চরাচ্ছে দেখছ না?

—অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি, কি হয়েছে তাতে? গোরুদের কোনো অপকার করছে না কি?

নিশ্চয়ই! এই দুপুর রোদে ঘুরলে বেচারাদের মাথা ধরবে না? না, গোরু বলে মাথাই নয় ওদের! মানুষ নয় ওরা? বাড়ি নিয়ে যাক, বলে আসি রাখালটাকে। সকাল-বিকালে এক-আধটু হাওয়া খাওয়ালে কি হয় না? সেই হল গে বেড়ানোব সময়—এই কাঠফাটা রোদ্দুরে এখন এ কী?

কিন্তু রাখাল বাড়ি ফিরতে রাজি হয় না—গোরুদের অপকার করতে সে বদ্ধপরিকর।

নিরঞ্জন হতাশ হয়ে ফিরে হা-হুতাশ করে—দেখছ হিরণ্যাক্ষ, ব্যাটা নিজেও হয়তো মারা যাবে এই গরমে, কিন্তু দুনিয়ার লোকগুলোই এই রকম! পরের অপকারের সুযোগ পেলে আব কিছু চায় না, পরের অপকারের জন্য এমনকি নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!

যখন শুনলাম সেই নিরঞ্জন বড়োলোকের মেয়ে বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাচ্ছে, তখন আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। যাক, এতদিনে তাহলে ও নিজেকে পর বিবেচনা করতে পেরেছে, তা না হলে নিজেকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে? নিজেকে পর না ভাবতে পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা কি নিরঞ্জনের পক্ষে সম্ভব?

অকস্মাৎ একদিন নিরঞ্জন আমার বাড়ি এসে হাজির বোধহয় বিলেত যাবার আগে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতেই বেরিয়েছিল। অভিমানভরে বললাম—চুপি-চুপি বিয়েটা সারলে হে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের? জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি, ভালোমন্দ অনেক কিছু খেয়ে পাছে কলেরা ধরে সেই কারণেই কাউকে জানাওনি,—কিন্তু না হয় নাই খেতাম আমরা, কেবল বিয়েটাই দেখতাম। বউ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না তো!

—কি যে বল তুমি! বিয়েই হল না তো বিয়ের নেমন্তন্ন! নিজের উপকার করব তুমি তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাবছি, তোতলাদের জন্য একটা ইস্কুল খুলব। মূক-বধিরদের বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোতলাদের কিছু নেই। অথচ কি সম্ভাবনাটাই না আছে ওই তোতলাদের।

—কি রকম?—আমি অবাক হবার চেষ্টা করি।

—জানো? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস আসলে কী ছিলেন? একজন তোতলামাত্র। মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্র্যাকটিস করে-করে তোতলামি সারিয়ে ফেললেন। অবশেষে, এত বড়ো বক্তা হলেন যে, অমন বক্তা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় হয়নি। সেটা মার্বেলের গুলির কল্যাণে কিংবা তোতলা ছিলেন বলেই হল, তা অবশ্য আমি বলতে পারি না।

—বোধহয় ওই দুটোর জন্যেই—আমার অনুযোগ।

নিরঞ্জন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল—আমার তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস তৈরি করবো। তোতলা তো তারা হয়েই আছে, এখন দরকার শুধু মার্বেলের গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস হবার আর বাকি কি রইল?

আমি সভয়ে বললাম, কিন্তু ডিমস্থিনিসের কি খুব বেশি প্রয়োজন আছে এ দেশে?

সে যেন জ্বলে উঠল—নেই আবার! বক্তার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি, লোককে কাজে প্রেরণা দিতে হলে বক্তা চাই আগে। শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ আর জাগে না। কেন, বক্তৃতা কি ভালো লাগে না তোমার?

—থামলে ভারী ভালো লেগে যায় তক্ষুনি, কিন্তু যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় কালারাই পৃথিবীতে সুখী।

আমার কথায় কান না দিয়ে নিরঞ্জন বলে চলল—তাহলেই দেখ, দেশের জন্য চাই বক্তা, আর বক্তার জন্য এই তোতলা। কেননা ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোতলাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব, যেহেতু ডিমস্থিনিস নিজে তোতলা ছিলেন। অতএব ভেবে দেখ, তোতলারাই হল আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

যেমন করে সে আমার আস্তিন চেপে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে জামা বাঁচাতে সায় দিতে হল আমায়।

—তোতলাদের একটা ইস্কুল খুলব, সবই ঠিক, বিস্তর তোতলাকে রাজিও করেছি, কেবল একটা পছন্দসই নামের অভাবে ইস্কুলটা খুলতে পারছি না। একটা নামকরণ করে দাও না তুমি! সেজন্যেই এলাম।

—কেন, নাম তো পড়েই রয়েছে, 'নিঃস্বভারতী'—চমৎকার! ভারতী মানে বাক্য, যাদের নিঃস্ব, কি না থেকেও নেই, তারাই হল গিয়ে নিঃস্বভারতী।

—উঁহু, ও নাম দেওয়া চলবে না। কারণ রবিঠাকুর ভাববেন, বিশ্বভারতী থেকেই নামটা চুরি করেছি।

—তবে একটা ইংরেজি নাম দাও—Sanatorium for Faltering Tongues (সানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংস)—বেশ হবে।

—কিন্তু বড়ো লম্বা হল যে?

—তা তো হলোই। যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা সটান উচ্চারণ করতে পারছে, কোথাও আটকাচ্ছে না, সেদিনই বুঝবে তারা পাস হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে। নাম-কে নাম, কোশ্চেন পেপার-কে কোশ্চেন পেপার।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এই নামটাই থাকল!—বলে নিরঞ্জন আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে সবেগে বেরিয়ে পড়ল, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই তার ইস্কুল খোলার সুমতলবে।

মহা সমারোহে এবং মহা শোরগোল করে নিরঞ্জনের ইস্কুল চলছে। অনেক দিন এবং অনেক ধার থেকেই খবরটা কানে আসছিল। মাঝে মাঝে অদম্য ইচ্ছেও হত, একবার দেখে আসি গিয়ে ইস্কুলটা, কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না মোটেই। অবশেষে গত

গুডফ্রাইডের ছুটিটা সামনে পেতেই ভাবলাম—নাঃ, এবার দেখতেই হবে ওর ইস্কুলটা। এ সুযোগ আর হাতছাড়া নয়। নিরঞ্জন ওদিকে দেশের এবং দশের উপকার করে মরছে, আর আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে একটু উৎসাহ দেব, এইটুকুও সময় হবে না আমার। ধিক্ আমাকে!

মার্বেলের গুলির কল্যাণে, নিশ্চয়ই অনেকের তোতলামি সেরেছে এতদিনে। তাছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে আরো অনেক উপকার—যেমন দাঁত শক্ত, মুখের হাঁ বড়ো, ক্ষুধাবৃদ্ধি—এ সবও হয়েছে। এবং ডিমস্থিনিস হবার পথেও অনেকটা এগিয়েছে ছাত্ররা। অন্তত 'ডিম' পর্যন্ত তো এগিয়েছেই, এবং যে রকম কষে তা দিচ্ছে নিরঞ্জন, তাতে 'স্থিনিসের' ও বেশি দেরি নেই—হয়ে এল বলে। নিরঞ্জনের ডিণ্ডিম বাজলো এইবার!

ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছতেই বিপর্যয় রকমের কলরব কানে এসে ধাক্কা মারল, সেই কোলাহল অনুসরণ করে সানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংস খুঁজে বের করা কঠিন হল না। বিচিত্র স্বরসাধনার দ্বারা ঝঙ্কৃত ইস্কুলটা প্রতি মুহূর্তেই যেন প্রমাণ করতে উদ্যত যে, ওটা মূক-বধিরদের বিদ্যালয় নয়। কিন্তু আমার মনে হল, তা-ই হলেই ভালো ছিল বরং, ওদের কষ্টলাঘব এবং আমাদের কান বাঁচানোর পক্ষে।

আমাকে দেখেই কয়েকটি ছেলে ছুটে এল কা-কা-কা-কা-কা-কে চান?

দ্বিতীয়টি তাকে বাধা দিয়ে বলতে গেল—মা-মা-মা-মা-মা—কিন্তু মা-মার বেশি আর কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

তখন প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয়ের বাক্যকে সম্পূর্ণ করল—মাস্টার বা-বা-বা-বা—

আমি বললাম, কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কাউকে আমি চাই না! নিরঞ্জন আছে?

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল? সে কি, নিরঞ্জনকে এরা চেনে না? এদের প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন, তাকেই চেনে না! কিংবা যার নাম উচ্চারণ সামর্থ্যের বাইরে, তাকে না চেনাই এরা নিরাপদ বোধ করেছে?

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ওইখানে দিয়ে, মনে হল এই ইস্কুলের ক্লার্ক, তাঁকে ডেকে নিরঞ্জনের খবর জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—ও, মাস্টারবাবু? এই পর্যন্ত তিনি বললেন, বাকিটা হাতের ইশারা দিয়ে জানালেন যে তিনি উপরে আছেন। এই ভদ্রলোকও তোতলা না কি?

আমাকে দেখেই নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল—এই যে অ-অঁনেক দিন পরে! খ-খবর ভালো?

য়্যাঁ? নিরঞ্জনও তোতলা হয়ে গেল না কি? না, ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে! বললাম, তা মন্দ কি! কিন্তু তোমার খবর তো ভালো বোধ হচ্ছে না? তোতলামি প্র্যাকটিস করছ কবে থেকে?

—পা-পা পরাক—প্র্যাকটিস করব কে-কেন? তো-তো-তোতলামি কি ফের কে-কেউ প্র্যাকটিস করে!



—তবে তোতলামিতে প্রোমোশন পেয়েছ বল!

ভাই হি-হি-হিরণ্না-ণ্না-ণ্না-ণ্না-ণ্না-ণ্না—বলতে বলতে নিরঞ্জনের দম-আটকেযাবার জোগাড় হল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—হিরণ্যাক্ষ বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বল। 'কশিপু'র মধ্যে কোনো 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বলল—ভাই হিরণ্যকশিপু, আমার এই সানাটো-টো-টো-টো-টো—

এবার ওর চোখ কপালে উঠল দেখে আমি ভয় খেয়ে গেলাম। ইস্কুলের লম্বা নামটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার অভিপ্রায়ে বললাম—হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমার এই সানাটোজেন, তারপর?

নিরঞ্জন রীতিমতো চটে গেল—সানাটোজেন? আমার ইস্কুল হো-হো-হলো গিয়ে সা-সানাটোজেন? সানাটোজেন তো এ-একটা ও-ও-ওষুধ!

—আহা ধরেই নাও না কেন! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ! তোতলামি সারানোর এটা ওষুধ নয় কি?

অতঃপর নিরঞ্জন খুশি হয়ে একটু হাসল। ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দুর ডিমস্থিনিস হল?

—ডি-ডিম হল!

—অর্ধেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কী! আমি ওকে উৎসাহ দিই।

নিরঞ্জন বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়ে—আ-আর হবে না। মা-মা-মার্বেলই মুখে রাখতে পা-পারে না তো কি-কি-কি করে হবে?

—মুখে রাখতে পারে না? কেন?

—স-স-সব গি-গিলে ফেলে।

—গিলে ফেলে? তাহলে আর তোতলামি সারবে কি করে, সত্যিই তো! তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল, বুঝলে? রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়াটা দরকার, দেরি করা ভালো না।

হতাশভাবে মাথা নেড়ে নিরঞ্জন জবাব দেয়—আ-আমার যে ডি-ডি-ডি ডিসপেপসিয়া আছে? হ-হ-হজম করতে পা-পারব কেন?

—ও, ডিসপেপসিয়া থাকলে তোতলামি সারে না বুঝি?

—তা-তা কেন? আ-আমিও গি-গিলে ফেলি! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নিরঞ্জন বলল—আ-আমার কি আর পা-পা-পাথর হ-হজম করার ব-ব-বয়স আছে?

—তাই তো! ভারী মুশকিল তো! তোমার চলছে কি করে তাহলে? ছেলেরা বেতন দেয় তো নিয়মমতো?

—উঁহু, স-ব ফি-ফি-ফ্রি যে? অ-অনেক সা-সাধাসাধি করে ধ-ধ-ধবে বেঁ বেঁধে আনতে হয়েছে।

—তবে তোমার চলছে কি করে?

—কে-কেন? মা-মা-মার্বেল বেচে? এক-একজন দ-দ-দশটা বারোটা করে খায় রোজ। ওগুলো মু-মু-মুখে রাখা ভা-ভা-ভা-ভারী শক্ত।

—বটে? বিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে রইলাম, তার পরে আমার মুখ দিয়ে বেরোল—ব-ব-বল কি! কেবল এই কথাটি!

যেমন না নিজের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়া, অমনি যেন আমার আত্মাপুরুষ খাবি খেল! অ্যাঁ, আমিও তোতলা হয়ে গেলাম না কি! নাঃ, আর এক মুহূর্তও এই মারাত্মক জায়গায় নয়! তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়লাম সদর রাস্তায়!

শুঁড়-ওলা বাবা!

বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে দাদামশাই ডেকে বললেন—আজ আর স্কুল যেতে হবে না। তোর শুঁড়-ওলা বাবা আসচেন, দুপুরে এসে পৌঁছবেন, তার পেয়েচি। আজ আবার মেল-ডে, আমার তো আপিস কামাই করা চলবে না। বাড়ি থাকবি তুই।

ইস্কুলে যেতে হবে না জেনে মন্টুর ফুর্তি হল, কিন্তু সে বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। শুঁড়-ওলা বাবা আবার কি রকম বাবা?

সে তো প্রায় বছর দশেক হতে চলল তার বাবা স্বর্গে গেছেন সে শুনেছে, তার কিছুদিন পরে মা-ও তাঁর অনুসরণ করলেন। তখন থেকে মন্টু মামার বাড়িতেই মানুষ। এতদিন সে কোনো প্রকার বাবার সম্বন্ধেই কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য শোনেনি, তবে অকস্মাৎ এই শুঁড়-ওলা বাবার প্রাদুর্ভাব হলো কোত্থেকে আবার?

বই-টই রেখে দিয়ে মন্টু বৈঠকখানায় গিয়ে বসল এবং মনে মনে বাবার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে লাগল।

বাবা তাহলে দুরকম? এক শুঁড় আছে, আরেক শুঁড় নেই। তবে সাধারণতবাবাদের শুঁড় থাকে না। যথা নীতু, নীলিমা ও ঝুনকুর বাবার নেইকো। যে কটি বন্ধুর বাবার সঙ্গে তার চাক্ষুষ ঘটেছে তাঁদের কারুরই শুঁড় নেই।

মন্টুর মতে বাবাদের শুঁড় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাবারা যেমন ছেলেদের গাধা হওয়া পছন্দ করেন না, বাবাদের হাতি হওয়াটাও তেমনি ছেলেদের রুচিতে বাধে। তবে মন্টুর দুর্ভাগ্য, বেচারার বাবাই নেই। আর সব বন্ধুর কেমন বাবা আছে, তারা বাবার কাছ থেকে কত কি প্রাইজ পায়, তমু তো সেদিন একটা সাইকেলই পেয়ে গেছে, কিন্তু বেচারা মন্টু—।

যাক, সৌভাগ্য বলতে হবে যে এতদিন বাদে তবু মন্টুর একজন বাবা আসচেন। তবে দুঃখের মধ্যে ওই যা—শুঁড়! তার জন্যে আর কি করা যায়, নেই-মামার চেয়ে কানা মামা যেমন ভালো, তেমনি একেবারে বাবা না থাকার চেয়ে শুঁড়-ওলা বাবাই বা মন্দ কি? তারপর কাল আবার মন্টুর জন্ম-দিন—হয়তো তিনি কেবল শুঁড় নাড়তে নাড়তেই আসচেন না, কত কি উপহারও ঝাড়তে আসচেন!

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক মন্টুদের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলেন এবং সোজা ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—এইটে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ি না?

—হ্যাঁ।

—তাঁকে বলগে সত্যপ্রিয়বাবু এসেছেন। আমি সকালে তার করেচি, পেয়ে থাকবেন বোধহয়।

তবে ইনিই। মন্টুও প্রায় তাই আন্দাজ করেছিল। খুব মোটা বটেন, তবে হাতির কাছাকাছি একেবারে নন। তাছাড়া, শুঁড় নেই। শুঁড় না থাকার জন্য মন্টু যে ক্ষুব্ধ হল তা নয়, বরং তাকে যেন একটু খুশিই দেখা গেল।

—দাদামশাই আপিস গেছেন। আপনি বসুন।

—তুমিই বুঝি উৎপল? আমি তোমার গুরুজন। প্রণাম করো। মন্টু ঈষৎ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কাকে?

—কেন, আমাকে? আশ্চর্য হবার কি আছে? গুরুজনদের ভক্তি করতে শিখবে, তাঁদের কথা শুনবে। এসব শেখনি।

মন্টু হাত তুলে নমস্কার করল।

—ও কি? ও কি প্রণাম হল? দেখচি এখানে তোমার শিক্ষাদীক্ষা সুবিধা হয়নি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়। যাক, ক্রমশ সব শিখবে। এখান থেকে গেলেই—

—আপনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে? কোথায়?

—কেন? দেশে। তোমার বাবার বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতেই তো আমি এসেচি।

—আপনি আমার বাবা যদি তবে আপনার শুঁড় কই?

—শুঁড়?

—হ্যাঁ। দাদামশাই যে বললেন যে মন্টু তুই বাড়ি থাকিস, তোর শুঁড়-ওলা বাবা আজ আসবেন। কিন্তু আপনার শুঁড় নেইত। শুঁড় কোথায়?

—হুঁ।

'হুঁ' বলে ভদ্রলোক ভারী গম্ভীর হয়ে গেলেন, মন্টুর সঙ্গে তারপর আর কোনো কথাই তাঁর হলো না। ঘাট হয়ে গেছে ভেবে মন্টু ম্লান মুখে চুপ করে রইল। সে বইয়ে পড়েছিল বটে যে কানাকে কানা বলিল না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না ইত্যাদি—পড়েছিল এবং মুখস্থ করেছিল, কিন্তু বইয়ের হুকুম কাজে না মানলে যে অঘটন ঘটবে, তা সে ভাবেনি। যার পা নেই তাকে খোঁড়া বললে সে যেমন মনক্ষুণ্ণ হয়, এঁকে শুঁড় নেই বলাতে বোধহয় ইনি তেমনি বিচলিত হয়েছেন। অঙ্গহীনতার অনুযোগ না করাই মন্টুর উচিত ছিল।

ঘনশ্যামবাবু আপিস থেকে ফিরলে অন্যান্য কথাবার্তার পর সত্যপ্রিয়বাবু বললেন—দেখুন, উৎপলকে আমি নিয়ে যেতে চাই। দাদা বৌদি নেই, কিন্তু আমি তো আছি। আমিই এখন ওর অভিভাবক।

—কেন, এখানে তো ও বেশ আছে। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে—

—তাহলে খুলেই বলি। এখানে ওর যথার্থ শিক্ষা হচ্ছে না।

—যথার্থ শিক্ষা বলতে কি বোঝায়?

—অনেক কিছু। তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার পক্ষে বাতুলতা। তবে এখানে যথার্থ অশিক্ষা যে ওর হচ্ছে তাতে ভুল নেই।

—যথার্থ অশিক্ষা হচ্ছে? কি রকম শুনি।

—আপনি বলেচেন আমি নাকি ওর শুঁড়-ওলা বাবা। উৎপল তাই বলছিল। এতদ্বারা ওকে মিথ্যাবাদিতা শেখানো হচ্চে। আমি তো ওর বাবা নই, তাছাড়া আমার শুঁড়ও নেই।

—এই কথা! তুমি ওর কাকা তো বটে! 'ব'-এ শুঁড় দিলেই 'ক' হয় এও বোঝো না বাপু!

কিন্তু কিছুতেই সত্যপ্রিয়কে বোঝানো গেল না; তারপর দিন সকালেই মন্টুকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। পথে যেতে যেতেই মন্টুর যথার্থ শিক্ষা শুরু হয়ে গেল।

—দেখ উৎপল! আজ আমি তোমাকে মাত্র তিনটি উপদেশ দেব। যদি মানুষ হতে চাও তাহলে আমার এই তিনটি উপদেশ তোমার মূলমন্ত্র হবে আর জীবনে সর্বদা মেনে চলবে! প্রথম হচ্চে, সত্যনিষ্ঠ হবে, সত্যের জন্য যে ত্যাগ, যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনাই স্বীকার করতে হোক না কেন, কখনো পিছুবে না। দ্বিতীয় উপদেশ এই, সব সময়ে নিয়মানুবর্তী হবে। নিয়ম না মানলে শৃঙ্খলা থাকে না, তাতে করে সামাজিক ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে। আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে এই—

উপদেশগুলো মন্টুর কানে যাচ্ছিল কিনা বলা যায় না, কানে গেলেও তার মানে নিশ্চয় তার মাথায় ঢোকেনি। একটু আগে একটি ছেলে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অকারণে, বোধহয় অকারণ পুলকেই, মাথায় চাঁটি মেরে গেছল, কাকার নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচারের মাঝখানে তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সে খুঁজছিল। তৃতীয় উপদেশের সূত্রপাতেই, পথে চলতি ছেলেটি আবার যেমনি তার পাশে এসেছে অমনি সে তাকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল।

মন্টু নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে সম্ভবত নিয়মরক্ষাই করেছিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় উলটো বুঝলেন—দ্যাখো, এইমাত্র তুমি পথে চলার নিয়মভঙ্গ করলে!

—ও যে আমাকে চাঁটি মারল আগে!

—আমি তা দেখেচি, কিন্তু ওকে ক্ষমা করাই তোমার উচিত ছিল না কি? আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্চে, কখনো কাউকে আঘাত করবে না। কেউ যদি তোমার বাঁ গালে চড় মারে তাকে ডান গাল ফিরিয়ে দেবে।

স্টেশনে গিয়ে সত্যপ্রিয় দারুণ ভাবনায় পড়লেন। মন্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী টিকিট কিনব? হাফ না ফুল? একটু মুশকিল আছে দেখচি।

—আমি তো হাফ-টিকিটে যাই।

—বারো বছর পুরে গেলে পুরো ভাড়া দিতে হয়। আজ তোমার ঠিক বারো বছর পূর্ণ হবে। তবে হিসেব করে দেখলে ঠিক বারো বছরে পড়তে এখনো তোমার চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেন্ড বাকি। তারপর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।

—তা কেন ? আমাদের পাড়ার হাবলা দেখতে বেঁটে, কিন্তু তার বয়স সতের বছর। সে এখনো হাফ-টিকিটে যায়, তাকে কই ধরে না তো।

—এতক্ষণ কি বোঝালাম তোমাকে ? সর্বদা সত্যনিষ্ঠ হবে—বাক্যে. চিন্তায় এবং আচরণে। কাজেই এখনো যখন তোমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি এখন ফুল-টিকিট কেনা যেতে পারে না কিন্তু গাড়িতে যেতে যেতে পূর্ণ হবে, সেইটাই ভাবনার কথা। আচ্ছা তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

গাড়িতে উঠে সত্যপ্রিয় একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মন্টু জানলার ফাঁকে বাইরের পৃথিবীর পরিচয় নিতে লাগল।

কিন্তু যেই না চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেন্ড গত হওয়া, অমনি সত্যপ্রিয়বাবু তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ির অ্যালার্ম সিগনালের শেকল ধরে ঝুলে পড়লেন। ফল হলো ঠিক মন্ত্রের মতো—ঝড়ের বেগে যে-গাড়ি ছুটছিল, গাছপালাদের ছোটাচ্ছিল, দুধারের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যখানে অকস্মাৎ তা থেমে গেল। ট্রেনের গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কে শেকল টেনেছে ?

সত্যপ্রিয় বুঝিয়ে বললেন—দেখুন, এই ছেলেটির বারো বছর এইমাত্র পূর্ণ হলো। এরপর তো একে আর হাফ-টিকিটে নিয়ে যেতে পারি না। কোনো স্টেশনে থামলেই ভালো হত, কিন্তু মাঠের মাঝখানে যে বয়স পূর্ণ হবে তা কি করে জানব বলুন ! অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে আমি অক্ষম, তা ছাড়া রেল কোম্পানিকে আমি ঠকাতে চাইনে। ওর হাফ-টিকিট আছে। এখান থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত আরেকটা হাফ-টিকিট আপনি দিন কিম্বা হাফ-টিকিটের ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন।

—এই জন্য গাড়ি থামিয়েছেন ? আচ্ছা পরের স্টেশনে দেখা যাবে।

—তা দেখতে পারেন, কিন্তু ভাড়া এখান থেকেই ধরতে হবে, পরের স্টেশন থেকে নিলে চলবে না।



পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই গার্ড সত্যপ্রিয়কে জানালেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েচে। তিনি আকাশ থেকে পড়ে বললেন—কেন, গ্রেপ্তার কীসের জন্য?

—দেখচেন না, অকারণে শেকল টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। স্পষ্টই লেখা রয়েচে। দরজার মাথায় ওই!

—অকারণে তো টানিনি।

—সে কথা আদালতে বলবেন।

সত্যপ্রিয় কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবেন না, সত্যের মর্যাদা রাখবার জন্য যা করা দরকার, যা প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ভদ্রলোকই করবে, তাই তিনি করেচেন। তিনি তো কোনো নিয়ম লঙঘন করেননি, কারণ—গুরুতর কারণ—ছিল বলেই শেকল টেনেচেন। কাজেই তিনি গ্রেপ্তার হতে নারাজ, এটা বেশ ওজস্বিনী ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি নামতে প্রস্তুত নন, অথচ তিনি না নামলে ট্রেনও ছাড়তে পারে না। অনর্থক ডিটেন হতে হবে ভেবে সত্যপ্রিয়র সহযাত্রীরা গার্ডের সাহায্যে অগ্রসর হল। মাঠের মাঝখানে গাড়ি থামানোর জন্য তারা তখন থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে জোর করে নামাতে গেল। টানা-টানিতে সত্যপ্রিয়র দামি সিল্কের অমন পাঞ্জাবীটা গেল ছিঁড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজও গেল রুখে, তিনি ধাঁ করে একজন সহযাত্রীর নাকে ঘুসি মেরে বসলেন। তখন সকলে মিলে চাঁদা করে তাঁকে ইতস্তত মারতে শুরু করে দিলে। কদাচ কাহাকেও আঘাত করিয়ো না—জীবনের এই মূলমন্ত্র তিনি ভুলে গেলেন। তবে, বাঁ গালে মার খাবার পর ডান গাল তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা বোধহয় বাধ্য হয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে, কেননা আক্রমণ থেকে এক গাল বাঁচাতে গিয়ে অন্য গাল বিপন্ন হচ্ছিল। অসুবিধা এই যে দুটো গাল এক সঙ্গে ফেরানো যায় না।

একা সত্যপ্রিয় কী করবেন? খানিকক্ষণ খণ্ডযুদ্ধের পরেই দেখা গেল যে একা তিনি সাতজনকে মারবার চেষ্টা করে কাউকেই বিশেষ মারতে পারেননি, কিন্তু সাতজনের মার তাঁকে হজম করতে হয়েচে। সকলে মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে স্টেশনের একটা গুদাম ঘরে নিয়ে ফেলে তার বাহির থেকে দরজা লাগিয়ে দিল—সেই যতক্ষণ না থানার থেকে পুলিশ এসে তাঁর হেফাজত নেয়। মন্টুও কাকার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সেই ঘরে আটক রইল।

তারপর ট্রেন ছাড়ল। স্টেশন জুড়ে ব্যস্ত উত্তেজনা, বিরাট শোরগোল, সব সেই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। ছোট্ট স্টেশনটা সত্যপ্রিয়র মতো নির্জীব ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সেই বদ্ধ ঘরের মধ্যে সত্যপ্রিয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। তাঁকে তখন আর চেনাই যায় না। সমস্ত মুখখানা ফুলে মস্ত হয়েচে, চোখ দুটো ছোটো হয়ে গেছে, প্রকাণ্ড মুখে তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না—হ্যাঁ, এতক্ষণে হাতির মাথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অচিরেই হয়তো শুঁড়ও বেরুতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে মন্টুর সন্দেহ হতে থাকে।

টুনুর পৃথিবী ভ্রমণ

টুনুর বয়স বেশি নয়, এই পনেরো মোটে। বড়দার বিশেষ দুঃখ যে পড়াশোনায় তার মোটেই মন নেই। বড়দা এক ডজন উদাহরণ দিতে পারেন যেখানে পনেরো বছরের ছেলে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। সময়ে অসময়ে টুনুর কাছে সেই সব ক্ষণজন্মা বালকদের নামোল্লেখ করে তাকে লজ্জিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু লজ্জাশীলতা টুনুর ধাতে নেই। সে ওই বয়সে ফোর্থ ক্লাসে পড়ে এবং সেজন্য দুঃখিত হবার কোনো কারণ বোধ করে না। বড়দার জবাবে সে-ও গড় গড় করে নাম বলে যায় তার ক্লাসে, এমনকি তার নীচের ক্লাসেও কে কে ছেলে পড়ে যারা তার চেয়েও বয়সে বেশি; এমনকি তাদের মধ্যে দাড়ি গোঁফের বহরে বড়দাকেও হারিয়ে দিতে পারে এমন সব ছেলের নামও টুনুর কণ্ঠস্থ। টুনুর মতে, তারাই বা উদাহরণ নয় কেন?

বড়দার দুঃখ, টুনু ভারী বাজে বই পড়ে—টুনুর বড়ো দোষ। পাঠ্য বইয়ের আধপাতা পড়ার নাম নেই, অথচ সারাদিনে অপাঠ্য বইয়ের দুশো পাতা শেষ করে বসে আছে। অবশ্য পাঠ্য ও অপাঠ্য নিয়ে বড়দা ও টুনুর মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ। বড়দা মনে করেন জিওগ্রাফি একটা অবশ্যপাঠ্য, গ্রীস এবং টাইগ্রীসের মধ্যে কোনটা দেশ এবং কোনটাই বা নদী জানা বিশেষ দরকার কিন্তু টুনুর সে বিষয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই। জ্ঞাত জগতের চেয়ে "অজ্ঞাত জগতের" আকর্ষণ তার কাছে বেশি; এজন্য বড়দার কাছে পড়ার চাইতে "ডাকাতের হাতে" পড়তেও সে রাজি। কেবল গল্পের বই-ই নয়, বিজ্ঞানের বইও সে অনেক পড়ে ফেলেছে। জগদানন্দ রায় এ পর্যন্ত যা লিখেছেন তার কোনোটা পড়তে তার বাকি নেই, 'গ্রহ নক্ষত্র' থেকে শুরু করে 'মাছ-ব্যাঙ-সাপ' পর্যন্ত সে গোগ্রাসে গিলেছে।

সেদিন সকালে বড়দা টুনুর উপর ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন; আগের দিনে অত কাণ্ড করে টুনুকে টেনস্ বোঝালেন তার সমস্তই সে কিনা একদম হজম করে বসে আছে। অনেক পরিশ্রমের পর যখন তাঁর মনে হল এবার টুনুকে টেনসের ব্যাপারটা পুনরায় হৃদয়ঙ্গম করানো গেছে তখন তিনি ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছেন।

"আচ্ছা টুনু, এবার ট্রান্সলেট করো দিকি—টুনু খুব ভালো ছেলে ছিল।"

টুনু কপাল কুঁচকে একটু ভেবে নিলে, তারপর মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করে জবাব দিলে—টুনু হ্যাড এ ভেরি গুড বয়।

"কি? টুনু হ্যাড এ ভেরি গুড বয়? তোমার পিণ্ডি। টুনু হ্যাড এ হর্স—এর মানে কি তবে?

"টুনু ঘোড়া ছিল।"

হাসবেন কি রাগ করবেন ঠিক করা বড়দার পক্ষে কঠিন হলো।

"হ্যাঁ, আগে ঘোড়া ছিল বটে, কিন্তু এখন একেবারে আস্ত গাধা। আচ্ছা, আই রাইট-এর ফিউচার ইনডেফিনিটে কি হবে? এটা যদি না বলতে পারো তোমায় আস্ত রাখব না আজ।"

বড়দার এবম্বিধ ভীষণ প্রতিজ্ঞায় টুনু মনে মনে ভারী বিচলিত হয়ে পড়ল। সে ভাবতে লাগল,—ফিউচার ইনডেফিনিট সম্বন্ধে কিম্বা ডেফিনিট ফিউচার সম্বন্ধে, তা ঠিক বলা যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে সে বললে—আই শ্যাল রাইটিং।

"আই শ্যাল রাইটিং!"

বড়দা থ হয়ে গেলেন, অনেকক্ষণ তাঁর মুখ থেকে কথা বেরুল না। অবশেষে শুধোলেন—এর মানে?

"মানে? মানে, আমি লিখিয়া থাকিব।"

"মানে আমি বোঝাচ্ছি।" এই না বলে বড়দা সবলে টুনুর ছোটো কানটি ধরলেন। —"মানে এবার বুঝতে পারচ? মানে, আমি তোমার কান মলিয়া থাকিব।"

কর্ণের বিপদ অনেক, তার বিরুদ্ধে অনেকের চক্রান্ত। টুনু মহাভারত পড়ে একথা জেনেছিল, এখন হাতে-নাতে বুঝল। অনেক ধস্তাধস্তি করে দাদার কবল থেকে সে কর্ণকে মুক্তি দান করল।

"দেখি বাংলা অনুবাদের খাতাটা, বিদ্যের বহরটা দেখি একবার। Phula Sing was not dead—এই চ্যাপ্টারটা কাল অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম, করা হয়েছে?"

টুনু ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

এক লাইন পড়েই বড়দার চক্ষুস্থির। টুনু লিখেছে—ফুলের গান এখনো মরে নাই।

খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক বিরাট চড় তুলে বড়দা বললেন, —"মরে নাই কিন্তু এইবার মরিবে।"

কে যে চড়ের লক্ষ বুঝতে টুনুর এক মুহূর্তের বেশি দেরি হয়নি। পরমুহূর্তেই সে খাতাপত্র ফেলে সবেগে ঘর থেকে প্রস্থান করেছে। উদ্যত ক্রোধ সম্বরণ করে নিয়ে বড়দা খাতাটা কুড়িয়ে আনলেন, টুনু আরো কতখানি বিদ্যে খরচ করেছে তার নমুনা দেখবার তাঁর বাসনা হলো। কিন্তু তারপরে বাংলা অনুবাদের দুশ্চেষ্টা টুনু আর করেনি। ফুলের গানের অমরত্ব ঘোষণার পরেই সে লিখে রেখেছে—" 'পৃথিবী ভ্রমণ' বইখানি পড়িবার জন্য বড়দার টাসক আজ রাত্রে করা হইল না। বড়দাদা কাল ফুলে তিনখানা হবে, সে ভারী মজা—তা হোক। আমার খুবই ইচ্ছা যে আমি একবার পৃথিবী ভ্রমণ করিব।"

যেখানে ফেলেছিলেন তার চেয়ে আরো বেশি দূরে এবার খাতাখানিকে ছুঁড়ে ফেলে বড়দা বললেন—পৃথিবী ভ্রমণ করাচ্ছি। আজ আফিস থেকে ফিরি আগে। ওর ডায়েরি লেখাও বার করব আমি।

বড়দা বেরিয়ে যাবার পর টুনু ঘরে ঢুকল। বই-টই গুছিয়ে শেল্‌ফে রেখে খাতাখানা

কুড়িয়ে আনল। তারপর পেনসিলটা বেড়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একমনে তার শিসটা সরু করল। তারপর খাতায় লিখল—

"দাদার অত্যাচারে আমি চটে গেছি। আমার রীতিমতো প্রাণে লেগেছে। প্রাণে এবং কানে। তাই আমি এখনই পৃথিবী ভ্রমণে বেরুব। এই কারণে আমি আজ আর ইস্কুলে যাব না।"

তারপর টুনু সেই খাতা আর পেনসিল নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, বোধহয় যেদিকে পৃথিবী সেই দিকেই।

খাতা পেনসিল সঙ্গে নেবার কারণ, পথে উল্লেখযোগ্য যা কিছু দেখবে সব লিখবে। কেননা টুনুর মতে ভ্রমণ-কাহিনী লেখার জন্যই ভ্রমণ করা। এমনকি ঘরে বসে যদি ভ্রমণ-কাহিনী লেখা যেত তাহলে কষ্ট করে ভ্রমণ না করলেও চলত। টুনু মনে মনে কত আশ্চর্য জায়গায় বেড়ায়, তার দুঃখ এই, সে সমস্ত সে গুছিয়ে লিখতে পারে না—যদি পারত, তাহলে বড়দার শেল্‌ফে যেমন সব চমৎকার বাঁধানো বই আছে, তার নিজের লেখা তেমনি একখানা বই ছাপানো যেত। তবু টুনুর সাধ যে সে লেখক হবে। আপাতত তার দাদার মতো ডায়েরি লিখে সে লেখক হবার চেষ্টা করে। অঙ্কের খাতা কিম্বা কম্পোজিশনের খাতার পাতা উলটালেই এখানে সেখানে টুনুর দু-চার ছত্র ডায়েরি দেখা যাবে। কোথায় কোন ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কোন মাস্টার কি রকম কড়া, পাড়ার অমুক ছেলেকে কীভাবে জব্দ করা গেছল, বায়োস্কোপের সেদিনকার ছবিখানা তার কেমন লেগেছে তার যথাসাধ্য বর্ণনা রয়েছে সেই ডায়েরিতে।

গ্রে স্ট্রিট, হেদো, গোলদিঘি—অনেকদূর সে পেরিয়ে গেল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা তার চোখে পড়ল না। সেই ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, লোকজন যাচ্ছে—অভূতপূর্ব চমকপ্রদ কিছু তার পথে এল না। সে ভারী বিরক্ত হলো। অন্যান্য ভ্রমণকারীদের তুলনায় তার বরাতটা খারাপ বলতে হবে, অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ ডায়েরিতে লেখবার মতো অনেক চমৎকার ব্যাপার দেখতে পেতো। যাই হোক, দুঃখিত মনে সে পথ চলতে লাগল, পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে এখন তো আর ফিরে যেতে পারে না। পৃথিবী যদি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তো করুক, সে কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই।

বৌবাজার বরাবর এসে একটা দুর্ঘটনায় তাকে দাঁড়াতে হলো। একটি অত্যন্ত ভারী লোক রিকশা ভাড়া করেছিলেন, রিকশাওয়ালা খোট্টাছেলেটি টুনুরই প্রায় সমবয়সী। সে কোনো প্রকারে টেনে চলছিল, কিন্তু যেমনি না ভদ্রলোক আয়েশ করে পিছন দিকে হেলান দিয়েছেন অমনি রিকশাটাও উলটে গিয়ে উপর দিকে তার হাতল তুলেছে। রিকশাচালক ছেলেটি তখন হাতল-লগ্ন হয়ে ত্রিশূন্যে। ভদ্রলোক অবশ্য তাঁর অভাবিত অধঃপতনের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় কাত হয়ে রইলেন, কিন্তু রিকশাকুলি হাতল ধরে ঝোলাঝুলি বেশিক্ষণ বাঞ্ছনীয় বোধ না করে নেমে পড়ল। টুনু এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটা ডায়েরিতে লিখে অবশেষে মন্তব্য করল—



"আমরা মাধ্যাকর্ষণের কথা বিজ্ঞানের বইয়েই পড়েছি নিউটন যা আবিষ্কার করেছিলেন। এখানে এই ভদ্রলোকের ঠেস দিতে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণে পড়ে যাওয়া তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ হয়েছে, বোধহয় নিউটনের মতন আমিও একটা নতুন আকর্ষণ আবিষ্কার করতে পেরেছি। ছেলেটা যে খানিকটা আকাশে উঠে গেছল, তাতে মনে হয় মাধ্যাকর্ষণের মতো আকাশেরও নিশ্চয় একটা আকর্ষণ আছে, তা না হলে ছেলেটা উঠল কি করে। নিউটন এই আকর্ষণটা আবিষ্কার করতে পারেননি কিন্তু আমি পেরেছি। এটা গাছ থেকে আপেল পড়ার চাইতে কোনো অংশে কম নয়।"

এই পর্যন্ত ডায়েরিতে লিখে এবার সে খুব গম্ভীরভাবে পথ চলতে লাগল। কেননা এবার আর সে সামান্য টুনু নয়, নিউটনের সমকক্ষ একজন বৈজ্ঞানিক। এক নিউ টুনু। কি করে এখুনি তার আবিষ্কারের কথা সমস্ত পৃথিবীর লোককে ডেকে জানানো যায়, এই কথা সে ভাবতে লাগল।

চৌরঙ্গিতে এসে একটি চমৎকার কুকুর তার ভারী পছন্দ হলো। কুকুরটি গ্রে-হাউন্ড। প্রকাণ্ড বড়ো সাহেব-বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে একমনে সে কুকুরটিকে পর্যবেক্ষণ ও প্রশংসার স্বগতোক্তি করছে এমন সময়ে কুকুরের মালিক একটি ছোটো মেয়ের অশুভ দৃষ্টি তার প্রতি পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ কুকুরটিকে তার দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। কুকুরটি যে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য আসছে না একথা বুঝতে টুনুর বেশি বিলম্ব হয়নি, কেননা টুনুও সেই ধাবমান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ দৌড়

দিয়েছে। ঠিক অনুসরণ নয়, কেননা সে কুকুরের আগে আগে দৌড়াচ্ছিল, তবে অনুকরণ বলা যেতে পারে।

কুকুরটা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাকে তাড়িয়ে রেখে অবশেষে ফিরে গেছে। টুনু অনেকক্ষণ হাঁপিয়ে জিরিয়ে নিয়ে তার খাতা পেনসিল বের করল।—

পৃথিবীর এই অংশটায় দৌড়াবার আমার আগ্রহ ছিল না। কেননা আমি কেবল পৃথিবী ভ্রমণ করব,—দৌড়াইয়া ভ্রমণ করব এমন প্রতিজ্ঞা করি নাই। কিন্তু কি করি, পাজি কুকুরটা এমন তাড়া করেছিল। না দৌড়লে সে নিশ্চয় আমাকে কামড়ে দিত। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এও বোধ হয় বরাবর এইভাবে আমার সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণ করবে সেই মতলবেই বেরিয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। সে পারবে কেন? আমার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই, সে ফিরে গেছে। আর তাছাড়া ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে সে পারত না, অনর্থক ভ্রমণ করে সে কি করবে? যাই হোক, কুকুরদের আমি খুবই ভালোবাসতাম কিন্তু এখন আর বাসি না। ভারী দুষ্টু ওরা।

সন্ধ্যার মুখে টুনুকে সি. আর. দাসের বাড়ির সামনে (এখন যা সেবাসদন হয়েছে) , বসে থাকতে দেখা গেল। স্তূপীকৃত খোয়া আর পাথরের মধ্যে একটা উপবেশন-যোগ্য অংশ সে আবিষ্কার করেছে, অনেকক্ষণ থেকে সেই আবিষ্কারের সুবিধা সে একাকী উপভোগ করছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর আরো খানিকটা সে ভ্রমণ করেছে দেখা গেল, কেননা এর আগে চৌরঙ্গি মোড়ে তাকে আমরা দেখেছি। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, এইজন্য ভ্রমণের উৎসাহ তখন আর টুনুর ছিল না। তার মামা ডাক্তার, কাছেই হাজরা রোডে তাঁর বাড়ি, ততটুকু ভ্রমণ করবে কিনা এই কথা সে তখন ভাবছিল। কষ্ট করে তাও তাকে করতে হলো না, কেননা খানিক পরে নিজের কল্ সেরে সেই পথ ধরেই তিনি মোটরে ফিরছিলেন, টুনুকে দেখে গাড়ি থামলেন।

—কিরে, এখানে বসে বসে কি করছিস?

টুনু কি জবাব দেবে? সে চুপ করে রইল।

—তোর হাতে ওটা কীসের খাতা দেখি?

খাতাটা হাতে নিতেই তার প্রথম পাতাতেই দেখলেন টুনুর ভালো নাম আর ব্র্যাকেটে টুনু তারপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে—পৃথিবী-ভ্রমণ।

—পৃথিবী ভ্রমণ হচ্ছে এখানে বসে বসে? আয় আমার সঙ্গে। খুব হয়েছে। আর ভ্রমণে কাজ নেই, আয়।

মামার বাড়ি গিয়ে ডায়েরির পাতায় টুনু লিখল—পৃথিবী ভ্রমণে অনেক বাধা—কুকুর, খিদে এবং মামা। যাহোক, বাহির হয়ে শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর, পৃথিবীর অনেকখানি আজ ভ্রমণ করা গেল। বাকিটা পরে সুবিধামত সারা যাইবে। ইতি, টুনু।

হারাধনের দুঃখ।

আমাদের হারাধনের বড়ো দুঃখ। দুঃখের কারণ তার মাথায়। তার যে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তা নয়, তাহলে তার বন্ধু-বান্ধবরা তার সম্বন্ধে দুঃখিত হলেও সে নিজের সম্বন্ধে কোনো দুঃখবোধ করত না। কেননা তার যে মাথা খারাপ হয়েছে আর সকলে তা জানলেও তার অজানা থাকত।

তার দুঃখের কারণ তার মাথার চুলে। হারাধনের বয়স বেশি নয়। এই বাইশ বছর মোটে, কিন্তু এরই মধ্যে তার দারুণ চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যহ তেল মাখতে, চুল আঁচড়াতে এত বেশি চুলক্ষয় হচ্ছে যে সে ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। এভাবে আর কিছুদিন চললে টাক পড়তে আর দেরি কি? আর টাক পড়বে—এই বয়সে?

তার উপর হারাধন আবার কবিতা লেখে। যাকে বলে তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কেশাধিক্য দেখতে পাওয়া যায়—তাই থেকে হারাধনের ধারণা চুলের সঙ্গে কবিতার নিকট সম্পর্ক কিছু আছে। বোধহয়, আকাশের উড়ন্ত ভাবগুলো চুলে এসে আটকে যায়, যেমন বেতারের তারে শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে। চুল গেলে কি আর সে কবিতা লিখতে পারবে? বোধহয় না! আজ যদি রবীন্দ্রনাথের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয় তিনি কি আর কবিতা লিখতে পারবেন?

না। কবিতাও লিখতে পারবেন না। আবার, নোবেলতলাতেও আর যেতে হবে না তাঁকে। এবং চুল উঠে গেলে সেই নোবেল আর তার বরাতেও কোনোদিন পাকবে না!

তাই হারাধন ভারী ভাবনায় পড়ে গেছে। চুল চলে গেলে ব্যক্তিত্ব যায়, যৌবন যায়, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত আকর্ষণ চলে যায়—কেবল জীবনটা থাকে। তাও কেবল প্রাণে থাকে মাত্র, সেই জীবনের কোনো মানে থাকে না। তাই হারাধন বড়ো ভাবিত।

অবশেষে হারাধন, "ভিষগ্‌রত্ন, ভিষগাচার্য্য, ধন্বন্তরী"—এই সব উপাধি সাইনবোর্ডে দেখে এক কবিরাজের শরণ নিল। গিয়েই প্রশ্ন করল, 'মশাই, আপনাদের কবিরাজিতে কি সমস্ত অধিব্যাধির প্রতিকার আছে?'

কবিরাজ মহাশয় বিস্ময়ের বিমূঢ়তা অতি কষ্টে কাটিয়ে উঠে উত্তর দিলেন—'বলেন কি আপনি। ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের আবিষ্কৃত এই আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র। আপনি যে অবাক করলেন আমাকে।'

না, না, আমি তা বলচিনে। শাস্ত্রর উপর কোনো কটাক্ষপাত করচিনে আমি। আমি বলচি কি—

বাধা দিয়ে কবিরাজ বললেন—'কটাক্ষপাত আর কাকে বলে! আজ না হয় ওই সদ্য বিষ—এই এলোপ্যাথিগুলো এসেছে, কিন্তু আগে কোন ওষুধ খেয়ে বাঁচতেন? সত্যে, ত্রেতায়, দ্বাপরে—?'

'আপনি ভুল করচেন! আমি সত্য কি ত্রেতাযুগে ছিলুম না, দ্বাপরেও আমি বাঁচিনি। এমনকি বাইশ বছর আগেও—

'ওই তো আজকালকার ছেলেদের দোষ! মুনি ঋষিতে বিশ্বাস নেই, শাস্ত্রে বিশ্বাস নেই। তাতেই তো উচ্ছন্ন গেল দেশটা! বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ—বিশ্বাস করতে শিখুন!'

'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হতে পারে এমন কোনো মারাত্মক রোগ আমার হয়নি! আমার যে রোগ, আদপে তা রোগ কিনা, তাই এখনো আমি জানি না। সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা!'

'বলুন আপনার কি ব্যাধি? যা কোনো চিকিৎসায় না সেরেছে তা কবিরাজিতে সারবে। সারবেই। আপনাকে মুখে বলতেও হবে না, দেখি আপনার হাতটা! নাড়ি টিপলেই সব টের পাব।'

কবিরাজ মশাই হতভম্ব হারাধনের হাতখানা টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি টিপে অবশেষে বললেন—'হুঁ, হয়েচে। জলৌকাগতিঃ। আপনার নাড়ির গতি ঠিক জোঁকের মতো! বায়ু-পিত্ত-কফ। আপনার বায়ু কুপিত। —যন্ত্রণাটা কোথায়?'

'যন্ত্রণা কিছুই নেই। বেজায় চুল উঠছে।'

কবিরাজ মশাই ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—অ্যাঁ?

হারাধন বলল—মাথার চুল উঠে যাচ্চে এই আমার অসুখ। এবার কবিরাজ মশাই রোগটা ধরতে পেরে নিজেকে সামলে নিলেন, ও! আপনার চুলের রোগ! বায়ু কুপিত কিনা, সেই কারণেই উঠচে। টাকের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অচিরেই টাক পড়বে।

কাঁচুমাচু হয়ে হারাধন বলল—'টাক পড়বেই? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে কিম্বা ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের ব্যবস্থায় কিম্বা আপনার ওই কবরেজিতে?'

'আলবত আছে! দেখান দিকি রামায়ণ কি মহাভারত খুলে যে যুধিষ্ঠির কিম্বা রামচন্দ্রের কখনো টাক পড়েছিল? দ্রোণাচার্য কিম্বা ধৃষ্টদ্যুম্নের? দশরথের কিম্বা দশাননের? রাবণের বারোটা মাথার একটাতেও টাক পড়েনি। তখনই কেন চুল উঠত না আর এখনইবা কেন ওঠে—তা বলতে পারেন?'

'বোধহয় আমরা এলোপ্যাথি ওষুধ খাই বলে।'

'ঠিক তাই। যাই হোক, ও আপনার সেরে যাবে। আপনি ভাববেন না। শাস্ত্রীয় মহাভৃঙ্গরাজ তৈল দিন সাতেক ব্যবহার করলেই আর দেখতে হবে না। তখন চিরুণী-ঠেলা দায় হবে।'

আশা ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে হারাধন বলল—'বলেন কি, এমন ওষুধ আছে আপনাদের?'

'নিশ্চয়ই। আয়ুর্বেদে নেই কি?'

'দিন, তাহলে এখুনি সেই ভৃঙ্গরাজ আমাকে দিন। যা দাম লাগে দিচ্ছি।'

দেখুন শাস্ত্রীয় ওষুধের দাম একটু বেশি। তাই সব সময়ে তৈরি থাকে না। আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে। অল্প করে তৈরি করতে আবার খরচা বেশি পড়ে যায়। আপনার কাছে বেশি কিছু নেব না, তৈরির যা খরচ তাই কেবল দেবেন।'

'কত পড়বে বলুন আমি আগাম দিচ্ছি। আজই তৈরি শুরু করে দিন।'

'নিশ্চয়ই। আপাতত টাকা ষোলো দিয়ে যান—তাতেই শিশিটাক হবে। এক শিশি এক মাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্টই।'

ষো-লো-টা-কা! অতগুলো টাকার কথায় হারাধনের টনক নড়ল। কিছুক্ষণ সে ভাবল। টাকা আর চুল—কাকে সে ছাড়বে? অবশেষে চুলেরই জয় হলো। রবিঠাকুরের কথা-কাহিনীতে সে পড়েছিল কে-এক মুসলমান সম্রাট কোন-এক পরাজিত শিখকে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন তার চুলের বিনিময়ে, কিন্তু সেই শিখ, চুল দিতে রাজি না হয়ে একেবারে মাথাটাই ধরে দিতে চেয়েছিল। সুতরাং হারাধন যে টাকা দিতে প্রস্তুত হবে এ আর বেশি কথা কি। যদিও ষোলো টাকা সামান্য টাকা নয়—বিশেষত হারাধনের পক্ষে।

হারাধন টাকা ষোলোটা দিয়ে আমতা আমতা করে বলল—'দেখুন, আমার একটা প্রশ্ন আছে! এটা আপনার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপর কটাক্ষপাত বলে ভাববেন না! আমার জিজ্ঞাস্য এই, আপনি তো মহাভৃঙ্গরাজের মালিক, তবে আপনার মাথায় এমন চৌকস টাক কেন মশাই?'

টাকাটা ট্যাকে গুঁজে মধুর হাস্য করে কবিরাজ বললেন—'বুঝলেন না, ওটা বিজ্ঞাপন! তেলের নয়, আমার নিজের। টাক প্রবীণতার লক্ষণ, আর প্রবীণ চিকিৎসক না হতে পারলে কি পসার জমে? টাকা হলে টাক হয়, কথায় বলে না? এর উলটোটাও সত্যি, টাকের চাকচিক্য থেকেও টাকার চাকচিক্য।'

হারাধন তথাপি যেন আশ্বস্ত হতে পারল না। কবিরাজ পুনরায় বললেন—দেখুন, এজন্য ভৃঙ্গরাজ মাখা দূরে থাক, আমরা তা শুঁকি না পর্যন্ত। পাছে টাক না পড়ে আবার। এখন তো টাক পড়ে গেছে কিন্তু এখনও মশাই বিশ্বাস করি না ওই তেলটাকে!

তেলের এমন গুণ—শুঁকলেও চুল গজায়! এতক্ষণে হারাধন নিশ্চিন্ত হলো। ধন্বন্তরী মশায়কে নমস্কার করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল সে! অবশ্য মনে মনে লাফিয়ে! ইচ্ছে থাকলেও বাইশ বছর বয়সে, বারো বছরের মতন লাফানো যায় না তো।

কয়েকটা দিন হারাধন খুব কষ্টে কাটাল—ভৃঙ্গরাজের প্রতীক্ষায়! অবশেষে ওষুধ তৈরি হয়ে এল—ও বাবা! এর যে নিদারুণ গন্ধ। তার সৌরভের সঙ্গে তুলনা দেবার উপযুক্ত শব্দ নেই। সে-তেল মেখে খেতে বসলে পেটের ভাত গিয়ে মাথায় উঠবে—



অর্থাৎ মাথায় উঠবার চেষ্টায় সামনেই সদর দরজা খোলা পেয়ে গলা দিয়ে গলে বেরুবে। সে-তেল মাথায় মেখে রাস্তায় বার হলে পেছনে কুকুর লাগবে কিনা বলা যায় না, তবে পথের লোকেরা তাড়া করবে নির্ঘাত, তাতে ভুল নেই।

কি করে বেচারা হারাধন? চুলের দায় প্রাণের দায়ের চেয়ে বড়ো। তেল মেখে অন্য লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকে কিন্তু নিজের থেকে দূরে থাকা যায় না তো? মাথাটা আবার নাকের বেয়াড়া রকম কাছে—। এই সত্যটা এতদিন একেবারে অজানা না থাকলেও এখন খুব প্রবলভাবেই যেন তার গোচর হতে থাকে।

কিন্তু হারাধনের কপাল! ক্রমেই তা প্রশস্ত হচ্ছিল। আগে যদি বা দশটা-বিশটা উঠত, এখন মুঠো মুঠো উঠতে লেগেছে। বোধহয় চুলের গোড়ায় ওষুধ যাচ্ছে না। সেই জন্য সে মরিয়া হয়ে একদিন রাত্রে শোবার আগে সমস্ত মাথা বেশ করে তেলে ভিজিয়ে নিল। পরদিন সকালে কেশ প্রসাধনে যেমন না ব্যাকব্রাশ শুরু করেছে, তার মনে হলো সমস্ত চুল যেন পরচুলার মতো পেছনে খসে পড়ল। হারাধন আয়নার সামনে দৌড়ে গিয়ে দেখে—ওমা, তাই তো। প্রতিপদের রাত্রে চন্দ্রোদয়ের মতো, চুলের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে সারা মাথা জুড়ে চাঁদির ন্যায় দিব্যি চকচকে টাক বেরিয়ে পড়েছে!

হারাধন প্রথমে ভাবল ডাক ছেড়ে কাঁদে। তারপর মনে হলো, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধন্বন্তরিকে তার স্বস্থানে অর্থাৎ স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়। একবার তার ইচ্ছা হল, লোটা-কম্বল নিয়ে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে, আর সংসারে থেকে লাভ কি, সন্ন্যাসী হয়ে

যেদিকে দুচোখ চায় চলে যায়। শুধু গেরুয়াটা পরে নিলেই চলবে, কষ্ট করে আর মাথা মুড়োতে হবে না, সে কাজটা এগিয়েই রয়েচে। অবশেষে মনে করল, নাঃ বেঁচে আর সুখ নেই, সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু কিছুই তার করা হলো না। ভাবতে ভাবতে হারাধন তার সদ্যোজাত টাকে হাত বুলোতে লাগল। হাত বুলিয়ে সে বেশ আরাম পেল। প্রত্যেক খারাপ জিনিসেরই ভালো দিক আছে, টাকের ভালো দিকটা এতক্ষণে তার চোখে পড়ল, আর হাতেও ঠেকল

হারাধন অবশ্য এখন আবিষ্কার করেছে যে টাক নিয়েও বেশ টেকা যায়, কিন্তু কবিরাজের রাস্তা সে আর মাড়ায় না। তার কেমন যেন লজ্জা করে। ও-পাশের ফুটপাথ ধরে সে কেটে পড়ে। এক একবার তার মনে হয় বটে যে টাকাগুলো বড্ড ঠকিয়ে নিয়েছে কিন্তু তা তো আর ফেরত পাবার কোনো উপায় নেই! এক আধটা নয়—ষোলো ষোলোটা টাকা! তাতে ষোলো দিন আরাম করে দেলখোসে খাওয়া যেত—বত্রিশ দিন বায়োস্কোপে যাওয়া যেত—দুমাস ফুটবল ম্যাচ দেখা চলত। টাকের চেয়ে টাকার শোকটাই এখন তার বেশি।

একদিন হারাধন দেখতে পেল, এক বন্ধু কবিরাজের দোকান থেকে বেরুচ্ছে। আসন্ন বিপদ থেকে বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরল—কীহে? কবরেজের কাছে গেছলে কেন? ও যে সাক্ষাৎ—

বন্ধু বলল—আর ভাই বলচ কেন! কোনো পুরুষে নেই কি এক ব্যাধি এসে জুটল আমার!

হারাধন তার মাথাভরা চুলের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল—সে কি! তোমারো চুল উঠচে নাকি?

না ভাই! বাত! তাও আবার পায়ে! কেউ বলছে সায়াটিকা কেউ বলছে নিউরালজিয়া। ভারী বিপদেই পড়েছি। এলোপ্যাথি তো করলুম, কিছু হল না। দিন-কতকের জন্য সারে তারপর আবার সেই! দেখি এবার একবার কবিরাজি করিয়ে—

তা কবরেজ কি বললে?

বললেন কি একটা তেল। একেবারে অব্যর্থ—দিন সাতেকের মালিশেই সারবে। বৃহৎবাতচিন্তামণি তৈল! তা তুমি কি বলছিলে—উনি সাক্ষাৎ কি?

আমি বলছিলাম উনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! নামেও এবং কাজেও! আমাকেও একটা তেল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন সাত দিন পরে আর দেখতে শুনতেহবে না। তা কথা যা বলেছিলেন একেবারে খাঁটি!

বল কী? কিন্তু আমার কপাল, সে তেল এখন তৈরি নেই। দামি জিনিস সব সময় তৈরি থাকে না। এক শিশির দাম পড়বে টাকা চব্বিশ, তা দিতে আমি এখনই প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তৈরি হতে লাগবে তিন-চারদিন। আমার আবার আজই এলাহাবাদ যেতে হবে—বদলি হয়েছি কিনা! একদিনও আর থাকবার উপায় নেই—কি করি বলত?

তাই ত! কি করবে তাহলে!

হ্যাঁ, কি বলছিলে তোমাকেও ওই তেল দিয়েছিলেন না? তা তার কি কিছু আছে?

হারাধন আমতা আমতা করে বলল—তার প্রায় সমস্তটাই আছে। সামান্য একটু ব্যবহার করেই যা ফল পেলুম না!

তা ভাই, তুমি এই টাকা চব্বিশটা নাও, আর তেলটা আমাকে দাও! তাহলে বন্ধুর যথার্থ উপকার করা হবে—

তা, তা কি করে হয়? সে যে—

তা তোমার বাত তো সেরেই গেছে ভাই, আর ও তেল রেখে কি করবে?

কিন্তু—

না না আর কিন্তু না। বাড়ির কাছেই কোবরেজ—দরকার হলে তৈরি করিয়ে নিয়ো। না আমাকে ওটা দিতেই হবে তোমায়। তিন মাসের জন্য এলাহাবাদে ঠেলেছে। তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে বিদেশে বিভুঁয়ে ওই তেল না নিয়ে এক পাও আমি আর এগুচ্ছি না।

এক রকম জোর করেই টাকা চব্বিশটা হারাধনকে গুঁজে দিয়ে তার বন্ধু তেলটা নিয়ে চলে গেল। হারাধন ভাবল, মন্দ কি! একদিক দিয়ে তো দেড়গুণ ফিরে এলো। আর মহাভৃঙ্গরাজে বাতের যত ক্ষতিই করুক, বৃহৎ বাতচিন্তামণির চাইতে বেশি করবে না নিশ্চয়ই। টাক হলেই টাকা হয় বলেছিল, কবিবাজের কথাগুলো খাঁটি, হারাধন বিবেচনা করে দেখল।

অষ্ট মুদ্রা হাতে হাতে আমদানি হল স্পষ্ট দেখল।

কিন্তু সাত দিন বাদে এলাহাবাদ থেকে বন্ধুর চিঠি পেয়ে হারাধন তো অবাক! বন্ধু লিখেছে—ভাই, ধন্য তোমাদের কবিরাজ! সাত দিন মাত্র ব্যবহার করছি এর মধ্যেই আমার বাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তাঁর ওষুধ মন্ত্রশক্তির মতোই অব্যর্থ। কি বলে যে তাঁকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাবো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিন মাস পরে বন্ধু কলকাতায় ফিরেছে জেনে হারাধন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। একটি ছোটো ছেলে বৈঠকখানার দরজা খুলে তাকে বসিয়ে বলল—'মামা কামাচ্চেন, আপনি বসুন একটু।'

হারাধন বসেই আছে, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা, একঘণ্টা যায়—বন্ধুর দেখা নেই। অবশেষে দুঘণ্টা বাদে, বসবে কি চলে যাবে এই কথা যখন সে ভাবছে তখন তার বন্ধু নামল।

হারাধন ভারী চটে গেছল মনে মনে। কাজেই প্রথম সাক্ষাতে কুশল প্রশ্ন, কেমন ছিলে, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে বলে বসল—'মন্দ না! এতক্ষণে লাটসাহেবের নামা হোল।'

বন্ধু বলল—কিছু মনে কোরো না ভাই! কামাচ্ছিলুম।

হারাধন সবিস্ময়ে বলে—দাঁড়ি কামাতে কি একযুগ লাগে নাকি?

দাড়ি নয় হে! পা। এই শ্রীচরণ।

পা কামাচ্ছিলে কি রকম? পায়ের রোঁয়া কি কেউ কামায় নাকি আবার?

রোঁয়া নয় হে রোঁয়া নয়, চুল। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে কেশকলাপ, কেশদাম। তাই কামাচ্ছিলাম।

পায়ে কেশদাম—অবাক করলে তুমি আমায়!

দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই। বাত গিয়ে এই এক উৎপাত। রোঁয়ার আর চুলে তফাত তো জানো? সে তফাত এই, রোঁয়া খানিকটা বাড়ে তারপর আর বাড়ে না, কিন্তু চুল ক্রমশ বেড়েই চলে। ভুরু আর চুলে যে তফাত। আমার দুটো পায়ের সব জায়গা জুড়ে যা গজিয়েছে, তা রোঁয়াও নয়, ভুরুও নয়, আদি ও অকৃত্রিম চুল। না কমালে চলে না। বেড়েই চলে। ছাঁটারও উপায় নেই, কেননা এমন ঘন বিন্যস্ত যে কেউ তাকে চুল ছাড়া অন্য কিছু বলে ভ্রম করবে না। তাই দাড়ির মতো নিয়মিত পা কামাই, কি করব?

হারাধন নিষ্পলক নেত্রে বন্ধুর দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বন্ধু বলল—নিত্যি এক হাঙ্গাম বটে, কিন্তু ওই বাতের চেয়ে এ ভালো। চুলের রোগের জন্য তো ডাক্তারের কাছে ছোটার দরকার করে না। কোনো যন্ত্রণাও নেই এর, আর এ রোগ কামালেই কমে যায়।

হারাধন কণ্ঠ থেকে একটিও কথা বেরুল না। সে মাথায় হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

ঠিক মাথায় নয়, তার টাকে হাত দিয়ে।

গোখলে, গান্ধিজি এবং গোবিন্দবাবু

মহাত্মা বলে সর্বসাধারণে পরিচিত ও পূজিত হবার ঢের আগে থেকে গান্ধিজি যে যথার্থ অর্থে মহান আত্মা, তার পরিচয় এই গল্পে তোমরা পাবে। যিনি এই গল্পের অন্য নায়ক, এক গৌণ চরিত্র, তাঁর নিজের মুখ থেকে এ কাহিনীটি শোনা আমার।

গোবিন্দবাবু সেই সময়ে কলকাতার একজন সাধারণ আপিসের কেরানি। তাঁর আসল নাম অবশ্য গোপন রাখলাম। এখন তিনি এমন বড়ো পদে প্রতিষ্ঠিত যে তার নাম করলে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারবেন।

বহুদিন আগেকার কথা। গোখলে সেই সময়ে ভারতবর্ষের নেতা। সেই গোখলের কলকাতাবাসের সময়ে তাঁকে পছন্দসই বাসা খুঁজে দিয়েছিলেন, এই সূত্রে গোখলের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দবাবুর ঘনিষ্ঠতা গজায়।

ঘনিষ্ঠতা দিনদিনই দারুণ থেকে দারুণতর হয়ে উঠছিল। কেননা, গোখলের দেশ থেকে যখনই তাঁর আত্মীয়-গোষ্ঠীর কেউ আসেন, গোখলে তাঁকে কলকাতা দেখাবার ভার গোবিন্দবাবুর উপর দেন। গোবিন্দবাবুকে গোখলের অনুরোধ রাখতে হয়। অত বড়ো দেশমান্য ব্যক্তির ভাড়াটে বাড়ি জোগাড় করে দেবার সুযোগ লাভ করে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলেন, এখন তাঁর দেশোয়ালিদের কলকাতা দেখিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন।

তাঁর ফরমাস খাটতে পেলে গোবিন্দবাবু যে আপ্যায়িত হন এটা বোধ করি গোখলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গোবিন্দবাবুকে বাধিত করবার সামান্য সুযোগও তিনি অবহেলা করতেন না। যখনই পোরবন্দর, কি পুণ্য কি ভুসাওয়াল থেকে কোনো অতিথি আসত, গোখলে বলতেন, "গোবিন্দবাবু, ইনকো কলকাত্তা তো কুছ দেখলা দিজিয়ে।

গোবিন্দবাবু অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঘাড় নাড়তেন। কিন্তু সেই অদৃষ্ট-পূর্ব অপরিচিত অভ্যাগতকে কলকাতার দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য দেখিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেই উৎসাহের কতখানি পরে বজায় থাকত তা বলা কঠিন।

সেই সময়ে গান্ধিজি আফ্রিকা থেকে সবে স্বদেশে ফিরেছেন, তাঁর কীর্তি-কাহিনী সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। যদিও আপামর সাধারণের কাছে তাঁর নাম তখনো পৌঁছেনি, তবু তাঁর অদ্ভুত চরিত্র, জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রণালীর কথা ক্রমশ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভারতবর্ষে ফিরেই গান্ধিজি গুজরাট থেকে কলকাতায় এলেন গোখলের সঙ্গে দেখা করতে।

সেই তাঁর প্রথম কলকাতায় আসা। কাজেই স্বভাবতই ইচ্ছা গান্ধিজিকে কলকাতাটা

দেখানোর। এ কাজের ভার আর কার উপর তিনি দেবেন ? এহ কাজের উপযুক্ত আর কে আছে ওই গোবিন্দবাবু ছাড়া ? অতএব 'গোবিন্দবাবুকে' ডেকে অনুরোধ করতে তাঁর বিলম্ব হল না।

"মোহনদাসকো কলকাতা তো দেখলা দিজিয়ে!"—শুনে গোবিন্দবাবু কিন্তু নিজেকে এবার অনুগৃহীত মনে করতে পারলেন না। গান্ধিজির পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। যদিও গোবিন্দবাবুর কানে গান্ধিজির খ্যাতি পৌঁছেছিল, তবু কেবল 'মোহনদাস' থেকে তিনি বুঝতে পারলেন না যে তিনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির 'গাইড' হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তা ছাড়া গোখলের কথায় তিনিই সকালে গিয়ে লোকটাকে স্টেশন থেকে এনেছেন—থার্ড ক্লাসের যাত্রী, পরনে মোটা গড়া—তাও আবার আধময়লা, পায়ে জুতো নেই, মলিন অপরিচ্ছন্ন চেহারা—এ সব দেখে লোকটার উপর তাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়নি। সেই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরতে হবে ভেবে গোবিন্দবাবুর উৎসাহ উপে যাবার জোগাড়!

কিন্তু কি করবেন ? গোখলের অনুরোধ। আগের দিনই তিনি গোখলের দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়কে কলকাতা দর্শন করিয়েছেন। সে লোকটি গুজরাটের কোনো এক তালুকের দারোগা। সে তবু কিছু সভ্য-ভব্য ছিল, হাজার হোক দারোগা তো! কিন্তু এ লোকটা—? গান্ধিজির দিকে দৃষ্টিপাত করে গোবিন্দবাবু বিরক্তি গোপন করতে পারলেন না। বোধহয় কোনো সিপাই টিপাই কি দরোয়ানই হবে বোধহয়! গোখলের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু—তাঁর প্রদেশের তাবৎ লোকের উপর গোবিন্দবাবু বেজায় চটে গেলেন। তাদের কলকাতা আসার প্রবৃত্তিকে তিনি কিছুতেই মার্জনা করতে পারছিলেন না।

যাই হোক, নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে সিপাইকে লেজে বেঁধে গোবিন্দবাবু নগর-ভ্রমণে বার হলেন। এই ভেবে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে রাস্তার লোকে এও তো ভেবে নিতে পারে যে, এ তাঁর নিজেরই সেপাই। 'গোবিন্দবাবু আজ বডি গার্ড সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন'—তাদের এই সাময়িক ভুল-বোঝার উপর কথঞ্চিৎ ভরসা করে তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ পাবার চেষ্টা করলেন।

পরেশনাথ মন্দিরের কারুকার্য, সেখানকার মাছের লাল, নীল ইত্যাদি রং বেরং হবার রহস্য, মনুমেন্ট কেন অত উঁচু হয়, কলকাতার গঙ্গা কোন কোন প্রদেশ পেরিয়ে এসেছে, হাওড়া-পুল কেন জলের ওপর ভাসে আর ভাসা পুল কেন জলের যে ডুবে যায় না তার বৈজ্ঞানিক কারণ ইত্যাদি কলকাতা শহরের যা কিছু দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য ছিল লোকটাকে তিনি ভালো করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

ওকে ক্রমশই তাঁর ভালো লাগছিল। এমন সমঝদার শ্রোতা তিনি বহুদিন পাননি। এমনকি কালকের সেই দারোগাটিও এমন নয়। দারোগাটি তবু মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করার প্রয়াস পেয়েছে—বলেছে অত বড়ো মনুমেন্ট কেবল ইঁটের বাজে খরচ, মানুষ যদি না থাকলো তো অত উঁচু করার ফায়দা কি! বলেছে মাছের ওই লাল, নীল রং সত্যিকার নয়, রাত্রে লুকিয়ে রং লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই সিপাইটি সে রকম না;

তিনি যা বলেন তাতেই ঘাড় নেড়ে এ সায় দেয়। তবে অসুবিধার কথা এই যে কালকের দারোগাটি তবু কিছু ইংরেজি বুঝত, ইংরেজির সাহায্যে তাকে বোঝানো সহজ ছিল, কিন্তু এ সিপাই তো ইংরিজির এক বিসর্গও বোঝে না! অথচ হিন্দিতে সমস্ত বিষয় বিশদ করতে গিয়ে গোবিন্দবাবুর এবং হিন্দি ভাষার প্রাণান্ত হচ্ছিল।

গোবিন্দবাবু সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন মিউজিয়মে গিয়ে। চিড়িয়াখানায় তেমন কিছু দুর্ঘটনা হয়নি, কেননা, জন্তু-জানোয়ারের অধিকাংশই উভয়ের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল নয়। 'ই হাঁথি, ই ভালু, ই বান্দর''—এই বলে তাদের পরিচিত করার পরিশ্রম গোবিন্দবাবুকে করতে হয়নি। কিন্তু মিউজিয়মে গিয়ে বাঁদরের পূর্বপুরুষ থেকে কী করে ক্রমশ মানুষ দাঁড়াল তার বিভিন্ন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ডারুইনের বিবর্তন বাদ বোঝাতে গোবিন্দবাবুর দাঁত ভাঙবার জোগাড় হল। কিন্তু সিপাইটির ধৈর্য ও জ্ঞান-তৃষ্ণা আশ্চর্য বলতে হবে। গোবিন্দবাবু যা বলেন তাতেই সে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, আর বলে—''সম্‌ঝাতা হ্যায়, সম্‌ঝাতা হ্যায়।''

সমস্ত দিন কলকাতা শহর আর হিন্দি 'বাতের' সঙ্গে রেষারেষি করে গোবিন্দবাবু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে ছ্যাকরা গাড়ির সাহায্য নিলেও অধিকাংশ পথ তাঁদের হেঁটেই মারতে হয়েছিল। ফিরবার পথে গোবিন্দবাবু স্থির করলেন আর হাঁটা নয়, এবার সোজা ট্রামে বাড়ি ফিরবেন। সারাদিনের ধস্তাধস্তিতে গোবিন্দবাবু কাবু হয়ে পড়লেও সিপাইটির কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখা গেল না।

অশ্ব-বাহন ছেড়ে কলকাতায় তখন প্রথম বিদ্যুৎ-বাহনে ট্রাম চলছে। গোবিন্দবাবু ট্রামে উঠলেন বটে, কিন্তু সিপাইটি যে তাঁর পাশে বসে, এটা তাঁর অভিরুচি ছিল না। যদি চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে যায়! কিন্তু সিপাইটির যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে! সে অম্লানবদনে কিনা তাঁর পাশেই বসল। তার আস্পর্ধা দেখে গোবিন্দবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন এবং সংকল্প করলেন আর কখনও গোখলের বাড়ির ছায়া মাড়াবেন না।

তাঁদের মুখোমুখি আসনে একজন ফিরিঙ্গি বসেছিল, তার কি খেয়াল হল, সে হঠাৎ গোবিন্দবাবু এবং সিপাইয়ের মধ্যে যে জায়গাটা ফাঁক ছিল, সেইখানে তার বুটশুদ্ধ পা সটান চাপিয়ে দিল।

গোবিন্দ বেজায় চটে গেলেন। ফিরিঙ্গিটার অভদ্রতার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা থাকলেও ওর হোঁৎকা চেহারার দিকে তাকিয়ে একা কিছু করবার উৎসাহ তাঁর হচ্ছিল না। তিনি সিপাইটির দিকে বক্র কটাক্ষ করলেন, কিন্তু তার রোগাপটকা শরীর দেখে সেদিক থেকেও বড়ো একটা ভরসা পেলেন না। অগত্যা তিনি নীরবে অপমান হজম করতে লাগলেন।

কিন্তু একটু পরে তিনি যে অভাবিত দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। সিপাইটি করেছে কি, তার ধূলিধূসরিত চরণযুগল সোজা সাহেবের পাশে চাপিয়ে দিয়েছে। বাবাঃ, সিপাইটির সাহস তো কম নয়, তিনি মনে মনে তার তারিফ করলেন। সামান্য নেটিভের দুঃসাহস দেখে ফিরিঙ্গিটাও বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ফেরঙ্গ স্বভাব চাড়া দিয়ে উঠল। সে রুক্ষ স্বরে হুকুম করলে—"এইও। গোর হঠা লেও।"

সিপাইটি কোনো জবাবও দেয় না, পাও সরায় না; যেন শুনতেই পায়নি সে।

সাহেব সিপাইয়ের পাঁজরায় বুটের ঠোক্কর মেরে বলল—"এই। তুম্ শুনতা নেহি?"

প্রত্যুত্তরে সিপাই পা না সরিয়ে মৃদু একটু হাসল কেবল।

এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সাহেব জীবনে কখনো দেখেনি। সাহেবের হুমকিতে ভয় খায় না, অথচ পদাঘাতের প্রতিশোধ নেবারও চেষ্টা করে না, ভয়ও নেই ক্রোধও নয়—অপমান ও লাঞ্ছনায় হাস্যরত এমন অপূর্ব সমন্বয়ের সাক্ষাৎ এর আগে সে পায়নি। বিস্ময়ে এবং পরাজয়ে তার স্পর্ধা স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে এল। সে এবার গোবিন্দবাবুকে ইংরেজিতে বলল—"তোমার বন্ধুকে পা তুলে নিতে বল।'

গোবিন্দবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। সেই সামান্য সিপাইটা তাঁর বন্ধু! দস্তুরমত রাগ হল তাঁর। তিনি গোবিন্দবাবু, হাকিমের দক্ষিণ হস্ত, আর এই সিপাইটা কিনা তাঁর সমকক্ষ! ফিরিঙ্গির উপর গোড়া থেকেই তিনি চটেছিলেন, এখন তার এই অমূলক সন্দেহে তিনি অসম্ভব ক্ষেপে গেলেন। দ্বিরুক্তি না করে উঠেই রাগের মাথায় তিনি ফিরিঙ্গিটার নাকের গোড়ায় এক ঘুসি কসিয়ে দিয়েছেন।

সারা ট্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ফিরিঙ্গিও আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াল। সেই গাড়িতে হিন্দু-স্কুলের জনকতক ছাত্র যাচ্ছিল, তারা গোবিন্দবাবুর পক্ষ নিল। ফিরিঙ্গিটিকে হিড়-হিড় করে রাস্তায় নামিয়ে তুলো ধুনবার উদ্যোগ করল তারা।



যে-সিপাইটি নিজের লাঞ্ছনায় এতক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন ও নির্বিকার ছিল, সাহেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনায় সে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। "Oh my boys" বলে ছেলেদের সম্বোধন করে সে বক্তৃতা শুরু করে দিল। সেই বক্তৃতার মর্ম হচ্ছে—সাহেবের কোনো দোষ নেই। তাকে মারবার কোনো অধিকার নেই আমাদের। কারুকেই মারবার আমাদের অধিকার নেই। মানুষ যেন মানুষকে আঘাত না করে। তোমরা অন্যায় আচরণকারীকে ক্ষমা করতে শেখ, ভালোবাসতে শেখ। ভালোবাসা দ্বারাই অন্যায়কে জয় করা যায়। অহিংসা পরমো ধর্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিপাইয়ের মুখে ইংরেজির চোস্ত বুলি শুনে গোবিন্দবাবু তো হতভম্ব। এ যদি এমন চমৎকার ইংরেজি জানে তবে এতক্ষণ তা বলেনি কেন? তাহলে কি তাঁকে সারাদিন এমন হিন্দি কসরৎ করে এমন গলদঘর্ম হতে হয়? আহা, আগে জানলে ডারউনের বিবর্তনবাদ কত ভালো করেই না একে বোঝান যেত!

ছেলেরা নিরস্ত হল, কিন্তু গোবিন্দবাবুর উষ্মা যায় না। তিনি বললেন—"ও কেন আমাদের পাশে পা তুলে দিল?"

"ও আরামের জন্য পা তুলেছে, আমিও আরাম পেয়েছি, পা তুলে দিয়েছি। শোধবোধ হয়ে গেছে।"

"ও তোমাকে মারল কেন?"

"আমি তো সেজন্য ওকে কিছু বলছি না।"

লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, এই অদ্ভুত লোকটির কথায় ও ব্যবহারে সাহেব চমৎকৃত হয়ে গেছল। সে সিপাইটির করমর্দন করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে চলতি একজনের মোটরে চড়ে চলে গেল। সিপাইটি গোবিন্দবাবু ও ছেলেদের হয়ে সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।

ঠেঙাবার এমন দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় গোবিন্দবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি সারা পথ আর বাক্যবায় করলেন না, সিপাইয়ের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। ভীতু কোথাকার! যদিও ভালো ইংরেজি বলতে পারে তবু তার কাপুরুষতাকে তো মার্জনা করা যায় না! তাকে গোখলের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে তিনি সটান বাড়ি ফিরলেন। সিপাইয়ের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না।

পরদিন গোখলের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—"আপনার সিপাই কিন্তু খাসা ইংরেজি বলতে পারে।"

"সিপাই কৌন? আরে মোহনদাস। তুম সিপাহি বন গিয়া!" বলে গান্ধিজিকে ডেকে গোখলে একচোট খুব হাসলেন। গান্ধিজিও হাসতে লাগলেন।

এত হাসাহাসির মর্মভেদ করতে না পেরে গোবিন্দবাবু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যখন রহস্যভেদ হল, 'সিপাহি'র যথার্থ পরিচয় তার অজ্ঞাত রইল না, তখন তিনি আরো কত বেশি অপ্রস্তুত হয়েছিলেন তা তোমরা অনুমান করতে পার। বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর কোনো মানুষ এতখানি অপ্রস্তুত হয়নি।

আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয়

ডিটেকটিভ গল্পের জোঁক সে—পড়াশুনার ফাঁকে যে অবকাশ পায় ডিটেকটিভ বই পড়ে সে কাটায়। তাছাড়া আর কোনো ঝোঁক তার নেই, ক্যারাম খেলার, না ঘুড়ি ওড়ানোর—না অন্য কোনো খেলাধূলার। তার জীবনের আকাঙ্ক্ষাই হল যে বড়ো হয়ে ডিটেকটিভ হবে এবং বুদ্ধি খাটিয়ে যত সব ভয়ানক চোর, ডাকাত, খুনে—তাদের গ্রেপ্তার করবে। তার ধারণা, ইতিমধ্যেই তার মাথা এমন পেকেছে যে এখুনি সে বড়ো বড়ো চুরি, ডাকাতি, খুনের কিনারা করতে পারে—যদি এসবের রহস্যভেদের ভার তার উপর দেওয়া হয়। কিন্তু সে যে এসব পারে সে সম্বন্ধে আর কারোই ধারণা হয় না—তার কারণ বোধহয় তার অল্প বয়স। নাঃ, বড়ো না হলে কিছুই হচ্ছে না—ক্ষুণ্নমনে এই কথা প্রায়ই ভাবে আলেকজেন্ডার।

কিছুদিন থেকে তাদের পাড়ায় চুরি লেগেই আছে, ছোটোখাটো ছিঁচকে চুরি নয়, রীতিমতন সিঁধ কেটে চুরি। ফি হপ্তাই একটা-না-একটা বাড়িতে হচ্ছে—এই হুদ্দার থানার দারোগা-পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল, একটারও কিনারা করতে পারল না। এইসব চুরির রহস্য ভেদ করতে পারত একমাত্র আলেকজেন্ডার—কিন্তু তাকে এ সবের তদ্বির করতে কেউ ডাকে না। দুঃখের কথা বলব কি, তাদেরই হোস্টেলের চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা যখন চুরি গেল তখন সে নিজেই অযাচিতভাবে অগ্রসর হয়ে তার কিনারা করতে চেয়েছিল কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করল না। তাদের হোস্টেল এবং তাদেরই কলের স্টপার, সুতরাং এর একটা বিহিত করার তার সম্পূর্ণ অধিকার; তবু এই প্রস্তাব সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে করতেই তিনি প্রথমত বললেন—"গেছে যাক গে, ভারী তো দাম! বারো আনা মোটে!" তথাপি আলেকজেন্ডার তার প্রস্তাবের পুনরুক্তি করায় তিনি চটে গিয়ে বললেন—"তোমাকে আর গোয়েন্দাগিরি ফলাতে হবে না। যাও, নিজের কাজ করো গে, পড়ো গে তুমি।"

সেদিন আলেকজেন্ডার ভারী মর্মাহত হয়েছিল এবং তার মনে হয়েছিল যে এই স্টপার চুরির ব্যাপারে হয়তো সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোনো যোগাযোগ আছে, সেই রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়েই তিনি—হুঁ, ঠিক তাই!

তার আসল নাম আলেকজেন্ডার নয়, এই নাম তার অল্পদিনের উপার্জন—এর পেছনে একটু ইতিবৃত্ত আছে। ক্লাসে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—জেন্ডার কয় প্রকার?

সে উত্তর দিল—"তিন প্রকার; ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর—আর—আর" আর-টা কিছুতেই তার মনে আসছিল না। পাশের ছেলেটি ফিস-ফিস করে তাকে কী বলেছে। তার প্ররোচনা আর মাস্টারের প্রতাড়না, এই দুয়ের তাড়ায় সে বলে ফেলল— "আর আলেকজেন্ডার।"

বলে ফেলেই সে বুঝতে পারল যে ভুল হয়েছে; কেননা এই তৃতীয় জেন্ডারটি গ্রামারের নয়, ইতিহাসের। কিন্তু তখন আর ফিরিয়ে নেবার তার উপায় ছিল না, বিশেষত নিউটার জেন্ডার যখন কিছুতেই তার মাথায় আসছিল না। মাস্টার মশাইও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন—"উদাহরণ দাও।"

ম্যাসকুলিন ও ফেমিনিনের উদাহরণ সে দিল, কিন্তু তাই দিয়েই কি তার পার আছে! মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করেছেন—"আর আলেক-জেণ্ডার?"

তার উদাহরণ সে কী দেবে? তার উদাহরণ যে মোটে একটিই ছিল এবং সেটিও বহুদিন আগে বিগত হয়েছে, ইতিহাস পাঠে একথা জানা যায়। সেই একমাত্র ও অবর্তমান উদাহরণে ইতিহাসের মাস্টার পুলকিত হতে পারেন কিন্তু তাতে কি গ্রামারের টিচারকে তেমন খুশি করা যাবে? সে ভরসা তার খুব কমই ছিল, তাই সে অগত্যা মুখখানাকে এরকম শশব্যস্ত করল যেন উদাহরণটা তার গলার গোড়ায় এসেছে কিন্তু জিভের ডগায় আসছে না।

মাস্টারমশাই বললেন—"ভেবে পাচ্ছ না? তার উদাহরণ যে সামনেই রয়েছে গো!"

সামনেই রয়েছে? অথচ সে ভেবে পাচ্ছে না! আলেকজেন্ডার উচ্চকিত হয়ে সামনের সমস্তটা একবার পর্যবেক্ষণ করে নিল।

মাস্টারমশাই বললেন—"তার উদাহরণ তুমি নিজে। তুমিই আলেকজেন্ডার!"

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে সেদিন থেকে তার ওই নামটাই রটে গেল, সকলেই তাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করল—ফলে, তার যে পৈতৃক আর একটা নাম আছে সে সম্বন্ধে তার নিজেরও অনেক সময় সন্দেহ হতে লাগল।

এই হল তার অভিনব নামকরণের ইতিহাস।

সেদিন সকালে উঠেই আলেকজেন্ডার শুনল যে আবার তাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে, এবার আর বেশি দূরে নয়, তাদের হোস্টেলের রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেইখানে কুন্দন সিং-এর কোঠায়। ছোটোখাটো চুরি নয়, একেবারে সিঁধ কেটে চুরি—বেচারা কুন্দন সিং-এর যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে চোরে। কুন্দন সিং ভোজপুরি মানুষ, এক লোটা ভাঙ আর এক সের পুরি ভোজন করে সারা রাত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে—সকালে ঘুম ভেঙেই দেখে এই কাণ্ড!

আলেকজেন্ডার ভাবল, এই চুরিটার তদারক করা তার কর্তব্য। নাঃ, চোরদের অত্যাচার চরমে উঠেছে একেবারে। কুন্দন সিং তার আলাপি মানুষ ভারী ভালো লোক, ভাঙা বাংলায় আর আধ-ভাঙা হিন্দিতে অনেক দিন ধরে উভয়ের মধ্যে আলাপ জমেছে আর সেই কুন্দনেরই এ সর্বনাশ। দারোগা, পুলিশ তাদের হোস্টেলের রাস্তা দিয়ে এল

এবং চলেও গেল—কিন্তু তারা যে এই চুরির কিনারা অন্য চুরিগুলোর মতোই করবে এ বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না।

কুন্দন সিং-এর বাড়ি গিয়ে আলেকজেন্ডার দেখলে, বেচারা মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। পাকা ডিটেকটিভরা যেভাবে খুঁটিনাটি সব কিছু ভালো করে আগে দেখে নেয়, সে সমস্তই বই পড়ে আলেকজেন্ডারের জানা ছিল। কুন্দনের সঙ্গে কোনো কথা না বলে প্রথমেই সে তার ঘরের ভেতর, বাড়ির চারিধার খুঁটিযে পর্যবেক্ষণ করল—কিন্তু কোথাও কোনো হাতের ছাপ, কি আঙুলের টিপ কিংবা পায়ের দাগ আবিষ্কার করতে পারল না।

তারপরে সে ভোজপুরি বন্ধুর দিকে মনোযোগ দিল, বলল, "কুন্দন সিং কিছু ভেব না তুমি। চোরদের ধরে তোমার সমস্ত জিনিস বের করে দেব, তুমি দেখে নিও। এখন তুমি আমায় বলো দেখি, কাল রাত্রে কী হয়েছিল? যা যা জানো সমস্ত বলো, সবই আমার কাজে লাগবে। কিচ্ছু গোপন কবো না।"

কুন্দন তার কথায় কতটা আশ্বস্ত হল সেই জানে, তবে সে যা বলল তার মর্ম এই যে, ভোর রাতের দিকে সে তার ঘরের ভিতরে বিল্লির আওয়াজ শুনতে পায়, বোল ছিল ম্যাও ম্যাও—তাতে তার নিদ টুটে যায়। একবার সে ভাবতেও ছিল যে কেয়ারি তো বন্দ্ আছে বিল্লি আসছে কুন্ পাকে? কিন্তু কাল রাত্রে নেশাটা বড়ি জোর হযে গিয়েসিল বলে তার উঠবার ফুরসৎ হইল না।

আলেকজেন্ডার ভাবিত হয়ে বলল—"হুঁ। তারপর?"

"—তারপর ফজিরে উঠে দেখি এহি ব্যাপার! হামার লোটাভি লিযে গেসে। একটা বর্তনভি নেই যে রোটি পাকাই!"

আলেকজেন্ডার বলল—"কে চুরি করেছে বলে তোমার মনে হয়? কাকে তোমার সন্দেহ? কোনো হদিস দিতে পারো যদি তাতে আমার গোয়েন্দাগিরির সুবিধা হবে!"

কুন্দন বলল—"হামার তো মনে লাগে ওই যে ম্যাও ম্যাও বোলছিল—উসিকা ভিতর হদিস আছে। কুনোদিন হামার ঘরে বিল্লি আসে না, কভি আসছে না, হামি তো বাংগালির মতো মছলি খায় না।"

আলেকজেন্ডার বিস্মিত হয়ে বলল—"বল কি! বেড়ালে সিঁধ কাটবে? তাতে আবার এতবড়ো সিঁধ? অসম্ভব! তবে যদি বনবিড়াল হয়—বলা যায় না তাহলে।"

বনবিড়াল সে কখনো চোখে দেখেনি, সেজন্য তাদের সম্বন্ধে তার উচ্চ ধারণাই রয়েছে।

কুন্দন বলল—"না, বিড়াল কেনো কাটবে? চোর ঢুকে বিড়াল ডাকতেছিল—হামি নিদতে আছি না জাগতে আছি ওহি জানবার মতলবে।"

আলেকজেন্ডার বলল—"হ্যাঁ, তা হতে পারে। কিন্তু তা দিয়ে কি আর চোর ধরা যাবে? বেড়াল-ডাকা খুবই সোজা, সবাই ডাকতে পারে। আচ্ছা, চোরেরা কোনো হরতনের নওলা কি চিড়িতনের সাতা ফেলে যায়নি?"

কুন্দন বলল—"তাস? নাঃ, উলোক তো তাস খেলতে আসে নাই, চোরির মতলবেই আসছিল।"

আলেকজেন্ডার বলল—"তা তো এসেছিল, কিন্তু অনেক সময় সামান্য একখানা তাস থেকে বড়ো বড়ো খুনের পর্যন্ত কিনারা হয়ে যায়, তা জানো? তোমার এ চুরিটা বড়ো রহস্যপূর্ণ! তা, আমি এর রহস্যভেদ করবই করব—চোরদেরও ধরব, তোমার জিনিসও ফেরত পাবে। আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়েছে, আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট দোলগোবিন্দরবাবুর সঙ্গে কি কাল-পরশু তোমার কোনো কথা হয়েছিল?"

কুন্দন সিং জানাল যে কাল বিকালেই রাস্তায় দেখা হয়েছিল, কুন্দন সিং-এর সেলামের জবাবে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—'কি কুন্দন, ভালো আছ তো? এই বাত।"

হুঁ—ঠিক। এতক্ষণে আলেকজেন্ডারের মনে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল, এইবার যেন রহস্যভেদের মতো হয়েছে। সেই স্টপার চুরি যাওয়ার পর থেকেই দোলগোবিন্দবাবুর উপর তার সন্দেহ জমেছিল, এইবার সেটা গাঢ় হল। ওই যে বসন্ত-চিহ্নবিকৃত খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ—এ সমস্তই ডিটেকটিভ বইয়ের অপরাধীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। খিটখিটে মেজাজের জন্য আলেকজেন্ডার লোকটার উপর মনে মনে ভারী চটা ছিল—সে বুঝতে পারল যে তার রাগ নেহাৎ অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি।

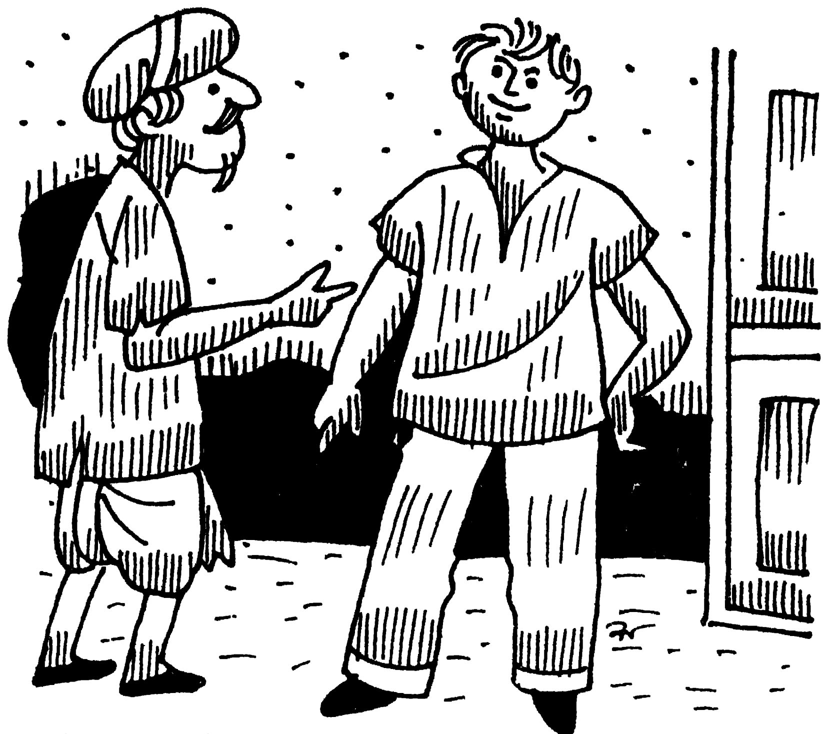
আলেকজেন্ডার গম্ভীর মুখে বলল—"তোমার চোরাই মাল কোথায় আছে আমি জানতে পেরেছি। কালকের মধ্যেই তুমি সব পাবে, কিন্তু চোরকে আমি ধরে দিতে পারব না তা বলে দিচ্ছি। কেননা আমার চেয়ে তার গায়ে জোর ঢের বেশি, তাছাড়া সে যেরকম বদরাগী মানুষ, ধরতে গেলে আমাকে হয়তো কামড়েও দিতে পারে।"

কুন্দন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার বালক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল যে মাল ফিরে পেলেই সে বহুত খুশি—চোরকে নিয়ে তার কুনো দরকার নাই।

এক রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে আলেকজেন্ডার হোস্টেলে ফিরে এল। তাহলে এই পাড়ায় যত চুরি হচ্ছে এ সবই তাদের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাজ? তিনি একাই করছেন না তাঁর আরও দলবল আছে? লোকটা যে রকম চার্জ নেয় আর যা খারাপ খাওয়ায় তাতে তার অসাধ্য কিছুই নেই।

আলেকজেন্ডারদের ওটা প্রাইভেট হোস্টেল। দোলগোবিন্দবাবু একটা ছোটোমতো বাড়ি লিজ নিয়ে জনা-পঁচিশেক ইস্কুলের ছাত্র জুটিয়ে এই বোর্ডিং হাউসটা ফেঁদেছেন—তার আয়ে তাঁর উপরি হোক না হোক, কলকাতার শহরে খাওয়া-থাকাটা নির্বিবাদে চলে যায়।

সেদিন রবিবার ছিল। দোলগোবিন্দবাবু ছেলেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে স্টিমার-ট্রিপের আয়োজন করেছিলেন। ছেলেদের স্বাস্থ্য এবং স্ফূর্তির জন্য তাদেরই খরচে মাঝে মাঝে তিনি এই রকম 'আউটিং'-এর ব্যবস্থা করতেন। আলেকজেন্ডার হোস্টেলে ফিরে দেখল আর সব ছেলে ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া সমাধা করে তৈরি হয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছে।



সে ফিরতেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন—“এতক্ষণ ছিলে কোথায়? যাও, চটপট খেয়ে তৈরি হয়ে নাও গে, দেরি করো না।”

আলেকজেন্ডার বলল—“আমি যাব না। আমার শরীরটা ভাল নেই, আমি খাবও না কিছু।”

সুপরিন্টেন্ডেন্ট বললেন—“আমরা কাল দুপুরে ফিরব। চাকর বামুনদেরও ছুটি দিয়ে দিয়েছি। তুমি থাকতে পারবে তো একলা?”

আলেকজেন্ডার বলল—“খুউব।”

সে ভেবে দেখল এ-ই চমৎকার সুযোগ। কেউ থাকবে না, সে বিনা বাধায় সুপারিন্টেন্ডেন্টের জিনিসপত্রের আড়াল থেকে কুন্দনের চোরাই মাল আবিষ্কারের অবকাশ পাবে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে গিয়ে সে তাঁর সাজসজ্জা দেখতে লাগল, কিন্তু তার আসল লক্ষ রইল তাঁর ঘরের আনাচে কানাচে। ওই যে কোণটায় এক পেট-মোটা থলে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এটা তো কাল ছিল না—তবে কি ওরই মধ্যে কুন্দনের যত মাল—লোটা, বর্তন ইত্যাদি—?

মনে মনে আঁচ করল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এক মিনিটের জন্য বেরুলে সে একবার উঁকি মেরে থলের ভেতরটা দেখে নেবে, কিন্তু তিনি আদপেই নড়লেন না। অবশেষে মরিয়া হয়ে আলেকজেন্ডার জিজ্ঞেস করে বসল—“সার, আপনি কি বেড়াল ডাকতে পারেন।”

দোলগোবিন্দবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, কথাটা তাঁর কানে যায়নি, তিনি চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি?"

তাঁর শাণিত কটাক্ষে বিচলিত হয়ে আমতা আমতা করে সে বলল—"বেড়ালের ডাক কি রকম তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

"—কেন? তাদের সাথে কি তোমার ভাব নেই তেমন? আলাপ করলেই জানতে পারবে।"

তাঁর উত্তরে আলেকজেন্ডার ভারী দমে গেল। বুঝল এ বড়ো কঠিন ঠাঁই—সহজে ধরা দেবার পাত্র দোলগোবিন্দবাবু নন। গল্পের বইয়ে যেমন যেমন পড়েছে একেবারে লাইনে লাইনে মিলে যাচ্ছে। হুবহু। কিন্তু সেও সেই সব ডিটেকটিভের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না,—দোলগোবিন্দবাবুকে বাজানো সহজ নয় সে বুঝল, কিন্তু তারও প্রতিজ্ঞা এই, দোলগোবিন্দবাবুকে ঢোল-গোবিন্দ করে তবে সে ছাড়বে।

দোলগোবিন্দবাবু তাঁর ঘরের চাবি এঁটে তালা টেনে পরীক্ষা করে চারিধারে চুরির উপদ্রবের কথা উল্লেখ করে, কুন্দন সিং-এর বাড়ির কালকের উদাহরণ দেখিয়ে আলেকজেন্ডারকে সাবধান থাকবার উপদেশ দিয়ে আর সব ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ওকে একটা টাকা দিয়ে গেলেন দরকার মতো খরচ করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে এও বলে গেলেন, সে আলু-কাবলি, ফুচকিয়া বাজে দোকানের চপ-কাটলেট ইত্যাদি খেয়ে অসুখ আরো না বাড়ায় যেন।

কত গুলো চাবি জোগাড় করে আলেকজেন্ডার সুপারিন্টেন্ডেন্টের দরজার তালা খোলার কাজে মনোনিবেশ করল। কিন্তু নাঃ—সেই প্রচণ্ড রামতালা কিছুতেই খুলবার নয়। চাবিগুলো ঘষে মেজে তৈরি করতেই তার গোটা দুপুরটা কেটে গেল, কিন্তু কোনো চাবিই লাগল না। সারাদিন খেটে হয়রান হয়ে তার ভারী খিদে পেয়েছিল, বিকেলের দিকে টাকাটা পকেটে নিয়ে খাদ্যের অন্বেষণ বড়ো রাস্তার দিকে বেরুল। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে ইচ্ছামত চপ, কাটলেট, কারি কোর্মা খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে যখন হোস্টেলে ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে।

হোস্টেলের ভেতরে পা দিতেই তার বুকটা ছাঁত করে উঠল। চাকর-বাকরের সেদিন ছুটি, কেউ কোথাও নেই; আলোও জ্বলেনি, চারিধার ঘুট-ঘুটে অন্ধকার! তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশান ছিল না, কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলত। কোনোরকমে হাতড়ে হাতড়ে সে সিঁড়ির কাছে এল। অন্যদিন এই সময়ে ছেলেদের শোরগোলে কি রকম জমজমাট থাকত আর আজ কী ভয়ানক নিস্তব্ধতা! আলেকজেন্ডারের বুকটা গুড় গুড় করে উঠল—সে এক ছুটে দোতলায় তার নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিল।

ল্যাম্প? ওই যা—তার ল্যাম্পটাও যে নীচে রান্নাঘরে রয়েছে, তেল ভরতে সকালে দেওয়া হয়েছিল। দেশলাই একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কোনখানে এই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া দায়। তার স্মরণ হল যে সদর দরজা বন্ধ করে আসা হয়নি। থাক গে খোলা পড়ে, লাখ টাকা দিলেও সে আর নীচে নামছে না।

কী করবে আলেকজেন্ডার? খানিকক্ষণ বিছানার ধারে চুপ করে বসে রইল—ঘরের জমাট অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে দেখল যেন কত কি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি! ভূতের তার ভারী ভয় এবং অন্ধকারে ভূত ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না। চোখ বুজে কোনো রকমে চাদরটা খুঁজে নিয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা আওয়াজে তার ঘুম গেল ভেঙে। মনে হল পাশের ঘরে কে দড়াম করে পড়ে গেল যেন! আলেকজেন্ডারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। তারপরেই যেন চাপা হাসির শব্দ। ফিস ফিস করে কারা যেন কথা কইছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে কারা। কারা যেন তেতলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে গটমট করে।

বাঘের চেয়েও ভূত মারাত্মক। ভূতের সান্নিধ্য থেকে একটা খুনের সঙ্গ পেলেও লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। কিছুদিন আগে একটা ছেলে এই হোস্টেলে মরেছিল সেই কথা তার মনে পড়ল। না, আর এখানে এক মুহূর্ত নয়। তাহলে আলেকজেন্ডারকে কাল আর দেখতে হবে না।

আলেকজেন্ডার খিল খুলে চোখ-কান বুজে এক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, তার যেন মনে হল ভূতেরা তার পিছু পিছু তাড়া করে আসছে। রাস্তায় নেমেই সে সদর দরজা বাইরে থেকে এঁটে দিল। দিয়েই নিকটবর্তী গ্যাস-পোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল—না, অত আলোয় ভূতের চিহ্নমাত্র নেই! সেখানে একটা রোয়াকে বসে ভুতুড়ে বাড়িটার দিকে সে তাকিয়ে রইল। তার মনে হতে লাগল দোতলার ঘরগুলোতে কী সব যেন অস্পষ্ট ছায়ার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখন আলোর প্রাচুর্যের মধ্যে বসে অন্ধকারের ভূত দেখতে ভালোই লাগে, ভয় করে না।

ভোরের দিকে একজন পুলিশ-কর্মচারী ওই পথে সাইকেলে যেতে আলেকজেন্ডারকে ওখানে ওইভাবে দেখে প্রশ্ন করলেন—"তোমার বাড়ি কোথা—থাকো কোথায়?"

আলেকজেন্ডার বাড়ি দেখিয়ে দিল।

"তবে এখানে বসে কেন এমন করে?"

"ওখানে ভারী ভূতের উপদ্রব...পালিয়ে এসেছি তাই।"

"আর কেউ নেই বাড়িতে?"

"না, বেড়াতে গেছে সবাই।"

"দেখি কেমন ভূত?" বলে পুলিশ-কর্মচারী হুইসল দিয়ে কয়েকজন কনস্টেবল ডাকলেন, তার পরে শেকল খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। আলেকজেন্ডারও সঙ্গে সঙ্গে গেল। কারণ তার ধারণা ছিল ভূত যদি পৃথিবীতে কারুর পরোয়া করে তবে পুলিশের। সুতরাং পুলিশ সঙ্গে থাকলে ভূতের ভয় কীসের। তাছাড়া তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—দিনের বেলায় তো ভূত বলে বস্তু কিছু নেই কো।

দোতলায় উঠে দেখা গেল, প্রত্যেক ঘরের বাক্স-পেট্‌রা সব ভাঙা পড়ে আছে কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আলেকজেন্ডার খুব আশ্চর্য হলো...ভূতে তো ঘাড়ই ভাঙে

জানা ছিল, বাক্সও আবার ভাঙে নাকি? তেতলায় উঠে দেখা গেল, একটা ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র একত্র জড়ো করা, আর তারই পাশে বসে দুজন লোক কী পরামর্শ করছে।

ইনস্পেক্টর বললেন—"ভূত নয়, চোর। খালি বাড়ি পেয়ে ঢুকেছে, কিন্তু তুমি বুদ্ধি করে বাইরে থেকে শেকল এঁটে দিয়েছিলে বলে আর বেরুতে পারেনি। এখন বুঝতে পারছি, এ পাড়ায় এতদিন যত চুরি হয়েছে সব কাদের কীর্তি।"

চোর দুজন গ্রেপ্তার হয়ে থানায় গেল। সেখানে তারা সব স্বীকার করল, তার ফলে তাদের দলের আরো কজন ধরা পড়ল, অনেক চোরাই মালও বার হল। কুন্দন সিং তার বর্তন, লোটা এবং আর যা যা গেছল সব ফিরে পেল। ও-পাড়ায় আরো সব চুরির অনেক জিনিস উদ্ধার হল, চৌবাচ্চার কলের স্টপারটা পর্যন্ত পাওয়া গেল।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছেলেদের নিয়ে স্টিমার-ট্রিপ থেকে ফিরে আলেক-জেন্ডারের দিগ্বিজয়-কাহিনী শুনলেন। শুনে তিনি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হলেন। তাঁর ঘরেরও তালা ভেঙেছিল এবং তাঁর সেই থলেটাও সেইখানে ছিল, কিন্তু আলেকজেন্ডারের তার ভেতরে উঁকি মারার উৎসাহ আর ছিল না।

দোলগোবিন্দবাবু আলেকজেন্ডারের পিঠ চাপড়ে বললেন—"বাহাদুর ছেলে! আমি ভাবি কী সব ছাইপাঁশ পড়, কিন্তু না, গোয়েন্দাগিরি করে ধরেছ তো ঠিক...এই সব দুর্ধর্ষ চোরের জ্বালায় পাড়া অস্থির, পুলিশ পর্যন্ত নাস্তানাবুদ আর এইটুকু ছেলে তাদের ধরেছে—কম কথা নয়। নাঃ, ডিটেকটিভ বই পড়লে বুদ্ধি পাকে এ কথা মানতেই হবে, তুমি বইগুলো দিয়ে একবার আমায়, এবার থেকে আমিও পড়ব।"

আলেকজেন্ডার বলল—"না সার, ও-সব বই পড়লে বরং বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায়, এত লোকের উপর এমন বাজে সন্দেহ হয় আর এরকম ভুল বোঝায়! ওতে আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা। নাঃ, আমি আর ডিটেকটিভ বই পড়ছি না।"

কুন্দন সিং-এর আনন্দ আর ধরে না, সে এসে আলেকজেন্ডারকে খাবার নেমন্তন্ন করে গেছে। ভোজপুরি বন্ধুর পুরির ভোজ সম্ভবত সে ঠেলতে পারবে না।

শিশুশিক্ষার পরিণাম

ছোটো ছেলেদের আমি ভালোবাসি। হ্যাঁ, ভালোই লাগে আমার ওদের। যেন ভোরবেলায় এক ঝলক সোনালি রোদ, কিংবা গুমোট গরমের দিনে এক পশলা ফিনফিনে বৃষ্টি, কিংবা নীল-আকাশের গায়ে এক ঝাঁক বলাকা, কিংবা—। এমনি অনেক কিছু বানিয়ে কবিতার মতো করে বলা যায় ওদের সম্বন্ধে! হ্যাঁ, ভালো কথা, বলাকা মানে কী? অনেকদিন থেকেই শুনতে পাচ্ছি কথাটা, ওই নামে একটা বইও আছে কে যেন বলছিল,—একদিন অভিধানটা খুলে দেখতে হবে, কিংবা সেই বইখানাই।

আসল কথা ছেলেদের আমার ভালো লাগে। তাদের মানুষের মতো মানুষ করার একটা প্রবল বাসনা যেন আমার মধ্যে আছে। সব সময়ে সেটা টের পাই না, যেদিন বদহজম হয় কেবল সেই দিনই জানা যায়। চোঁয়া ঢেকুরের সঙ্গে ইচ্ছাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, যে-সব মানুষ চলাফেরা করছে তাদের দ্বারা কিছুই হবে না, না-তাদের নিজের না-এই পৃথিবীর; কেবল যে-সব মানুষ এখন হাই জাম্প লং জাম্প দিচ্ছে, হাডুডু খেলছে, ময়দানে ফুটবল পিটছে, কিংবা তারাও নয়—যে-সব এখন কলকাতার সরু গলির মধ্যে টেনিস খেলছে (মানে, বেওয়ারিশ বাতিল টেনিস বলের সঙ্গে ফুটবলের মতো দুর্ব্যবহার করছে), হাফপ্যান্ট পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে এবং সুযোগ পেলেই আলু-কাবলি চাখছে, কিংবা তারাও নয়,—যে-সব মানুষ এখন নেহাত হামাগুড়ি দিচ্ছে কেবল তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের ভবিষ্যৎ।

মানুষের ভবিষ্যৎ এবং পৃথিবীর স্বর্গ-প্রাপ্তি! হ্যাঁ, তাদের মধ্যেই। (স্বর্গ-প্রাপ্তি মানে চন্দ্রবিন্দু-প্রাপ্তি নয়! পৃথিবীটাই একদিন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে এই রকম একটা কানাঘুষা প্রায়ই শোনা যায়, আমি তারই ইঙ্গিত করছি এখানে)।

কে এক বিলিতি কবি বলে গেছেন, ফাদার ইজ দি চাইল্ড অব ম্যান?—নাঃ, ম্যান ইজ দি ফাদার অফ চাইল্ড? উঁহু, ম্যান ইজ দি চাইল্ড অফ ফাদার? তাও বোধহয় না! কথাটা কি বলেছিলেন ভদ্রলোক, আমার ঠিক মনে পড়ছে না এখন। মোদ্দা কথা, তার মানেটা হচ্ছে এই—

তার মানেটা কী তাও বলা ভারী শক্ত। বিলিতি কবিতা আর বিলিতি বেগুন দুই-ই আমার কাছে এক জাতীয়। দুটোই সমান বিস্বাদ, গলাধঃকরণ করতে প্রাণ যায় কিন্তু উভয়ই ভয়ঙ্কর হজমি! একবার পেটে গেছে কি একেবারে হজম। তখন

তাকে মুখে আনা বেজায় কঠিন। (দেখছ না, এই চাইল্ডের কবিতাটা কিছুতেই আসতে রাজি হচ্চে না। অথচ, চাইল্ড, মানুষের খুড়ো কি জ্যাঠা জানবার কতখানি দরকার ছিল আমার)।

এইসব কারণে, ছেলে পেলেই মানুষ করার চেষ্টায় আমি হাত পাকাই। কিন্ডারগার্টেনের মতো একটা নতুন ধরনের শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি, যার ফলে ছেলেরা সটান পুরো মানুষে পরিণত হতে পারে, এই রকম একটা কিছু আবিষ্কার করে যাবার মলতব আছে আমার মনে মনে।

সেদিন বৌদির এক বন্ধু বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। বছর আষ্টেকের ছোট্ট একটি ছেলেকে সঙ্গে করে। দিব্যি ফুটফুটে ছেলেটি। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। হ্যাঁ, এরাই তো মানুষ হবে কালক্রমে। (যদি কোনোক্রমে টিকে যায় অবশ্যি!)

তিনি বৌদির সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন বাড়ির ভেতরে এবং ছেলেটা এসে জমল আমার পড়ার ঘরে। জমুক এসে, আমার আপত্তি নেই, ওদের জন্য আমার অভ্যর্থনা সব সময়েই—সব সময়েই কী? (সাহিত্য করে বলতে গেলে কি হবে? উদগ্রীব? উন্মুখ? উন্মুখর? উঁহু—!) ওদের জন্য আমার অভ্যর্থনা সব সময়েই ব্যতিব্যস্ত। (কিম্বা হেস্তনেস্ত, কিম্বা যদি আরো ভালো করে বলি—) আমার অভ্যর্থনা একেবারে চুরমার, ছত্রখান, জীবনস্মৃতি—ছিন্নপত্র!

"তোমার নাম কি খোকা?"

"মা যে বলল তোমার কাছে আসতে।"

তা তো বলবেনই। তিনি জানেন কিনা, ছেলে মানুষ করার কাজে মার পরেই আমার স্থান। মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠি! বলি—"কিন্তু তোমার নাম কি তা তো বললে না?"

"বলব? কিন্তু বানান করতে হবে না তো?"

আমি অভয় দিই। খোকার নাম শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকেন্দ্র প্রসন্ন পুরোকায়স্থ। বাব্বাঃ! বানান করা যেমন শক্ত, উচ্চারণ তার চেয়ে কিছু কম নয়। এমন ফুটফুটে ছেলের এ কি বিদঘুটে নাম! মনে মনে সহানুভূতি হয় ওর উপর। জীবনভোর এই নাম নিয়ে ওকে ধস্তাধস্তি করতে হবে! এই জগদ্দল বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মানুষ হতে হবে এবং ওই বিলিতি কবি যা বলে গেছেন (কি বলে গেছেন জানি না!) তাই হতে হবে ওকে। বাপস!

"তা বেশ বেশ। এমন আর মন্দ কি? অন্তত বদনামের চেয়ে ভালো তা তুমি কি পড়-টড়?"

খোকা ঘাড় নাড়ে—"হ্যাঁ, ইংজি পড়ি।"

"ইংরিজি? তা ওই ইংজিই একটু বলো।" (বুঝতে পারব কিনা মনে মনে ভয় হয়। ওই সাবজেক্টেই আমি একটু কাঁচা আবার।)

খোকা অমিতবিক্রমে গড়গড় করে বলতে থাকে—"এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে, এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এল এম, এ বি সি ডি ই এফ জি এচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর, এ বি সি ডি ই এফ—"

ওর বুক ফুলে উঠে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, আমি বলি—"থামো, খুব হয়েছে!" আশঙ্কা হয়, বিদ্যের সঙ্গে বক্সিং-এর প্যাঁচ না জাহির করে বসে।

কিন্তু সে কি থামবার? হিন্দি এবং ইংরেজি বক্তৃতার গুণই এই (কিম্বা দোষও বলতে পারো) যে, তাকে সহজে থামানো যায় না? আপনার বেগে আপনি চলতে থাকে, যেন কলের গাড়ি। অবশেষে খোকা তার লাস্ট সেন্টেন্স হাতড়ে পায়—

"এ বি সি ডি ডবলিউ এক্স ওয়াই জেড।" বলে খোকা নিরস্ত হয়। বেশ বোঝা যায় এই জেড খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই তার জেদ থামছিল না। হ্যাঁ, এই ছেলেই তো মানুষ হবে (কিংবা ওই ইংরেজ কবি যা বলেছেন তাই।) কিম্বা মানুষের বাবাও হতে পারে, বিচিত্র নয়। কিছুই বলা যায় না এখন।

"গোলোক, তোমাকে একটা ইতিহাসের গল্প বলি শোনো।"

"হাঁসের গল্প? বলুন।" গোলোক কাছে ঘনিয়ে আসে। "হাঁসে ডিম পাড়ে, আপনি জানেন?"

তার আগ্রহ দেখে আমার আনন্দ হয়। "হাঁসের গল্প নয়, ইতিহাসের গল্প! ইতিহাস কাকে বলে জানো না?"

খোকা ঈষৎ অবাক হয়। —'ইতিহাস আবার কি রকম হাঁস? পাতিহাঁস তো জানি! কিন্তু পাতিরাম আমাদের দারোয়ান, সে হাঁস নয়!" একটু ভেবে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে...'ইতিহাস কি তবে খোঁড়া? ঘোঁড়াতেও ডিম পাড়ে কিনা! কিন্তু তাকে বলে ঘোঁড়ার ডিম।"

"চুপ করে গল্প শোনো। আমাদের দেশে—"

"আমাদের কোন দেশ?"

"আমাদের বাংলাদেশ। বাঙালিদের দেশ! তোমার দেশ, আমার দেশ, আমাদের বাবার-মার-ঠাকুদ্দার সবার জন্মভূমি! বুঝলে?"

খোকা ঘাড় নাড়ে।

"আমাদের বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্য বলে এক রাজা ছিলেন।"

"কে সে?" আবার প্রশ্ন।

ওর অনুসন্ধিৎসা আমাকে পুলকিত করে। "আমাদের দেশের এক রাজা!"

"কোন দেশের?"

"আমাদের এই বাংলাদেশের।"

"ও!"

"তিনি ভয়ানক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। খুব যুদ্ধ করতে পারতেন।"

"কে যুদ্ধ করতে পারতেন?"

"কেন, এইমাত্র যে বললাম।"

"কি বললেন?"

ছেলেদের সঙ্গে বাক্যালাপের অদ্ভুত কৌশল আছে, সবাই সেটা জানে না। বালক গোলোকের এই পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, কারু কারু হয়তো পিত্ত জ্বলে গিয়ে চড় কষিয়ে দেবার প্রলোভন হত! কিন্তু আমি তো জানি ছেলেদের মনস্তত্ত্বই এই, সব বিষয়েই তাদের জানবার ইচ্ছা। ছোটোবেলার এই কৌতূহল থেকেই তো তারা বড়ো হয়ে উঠবে (মানুষ হয়ে উঠবে) এবং অন্য সকলের কৌতূহলের বিষয় হবে। সুতরাং এই ধাক্কায় আত্মসংযম করা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হল না।

অতএব আমি মিষ্টি করে একটুখানি হাসলাম। ঠিক যে রকম মিষ্টি করে আমাদের ফটোগ্রাফের মধ্যে আমরা হেসে থাকি। যৎসামান্য মৃদু হাস্য, নদীর ঢেউ সূর্যকিরণে ভেঙে পড়লে যেমন দেখায়, সেই সঙ্গে কেমন একটা কোমল বিষাদের ভাব মিশানো— সমস্ত জিনিসটা আকর্ণ-বিস্তারের আগেই সতর্কতায় সামলে-নেওয়া। গোলোকের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে কিঞ্চিৎ ফটোগ্রাফিক হাসি আমি হেসে নিলাম।

"রাজা প্রতাপাদিত্য। খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কেন, পদ্যের বইয়ে পড়নি?— যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

গোলোক এতক্ষণে সায় দেয়—'হুম। আমরা।"

আমি কিছু অবাক হই—"কি তোমরা?

"আমরা প্রতাপাদিত্য।"



আমি এবার ঘাবড়ে যাই—"তোমরা প্রতাপাদিত্য কি রকম?"

"হুম, আমরাও। আমরা পুরোকায়স্থ।"

"ও, বুঝলাম এতক্ষণে। এখন মন দিয়ে শোনো, খুব মজার গল্প। প্রতাপ যখন খুব ছোটো ছিলেন, এই তোমারই মতো ছেলেমানুষ সেই সময় একদিন তার বাবা—"

"কার বাবা?"

"প্রতাপের বাবা।"

"কে প্রতাপ?"

"কেন, রাজা প্রতাপাদিত্য! যার ছেলেবেলার গল্প তোমাকে বলছি।"

"ও!"

ওর গল্প শোনার আগ্রহ যে কতো-ধারালো তার পরিচয় ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। হবেই, আমি জানতাম। গোড়ার দিকে গলার উপদ্রব শোনা গেলেও, গল্প খানিকটা গড়াবার পর, তখন ছেলেদের মধ্যে চোখ এবং কান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমরা তো ঠাকুমার কোলে আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলেছি। দুঃখের বিষয়, আমার কোনো ঠাকুমা ছিল না, যদি বা কখনো থেকে থাকে আমার কালে তাঁর চিহ্নমাত্র পাইনি। কিন্তু তাতে কি, ঠাকুমার কাহিনীর কল্পনাতেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয় এখন পর্যন্ত।

"এখন, প্রতাপের বাবা প্রতাপকে একদিন একটা ছোটো কুঠার দিলেন দিয়ে—"

"প্রতাপের বাবা কে?"

ছেলেদের জানবার ইচ্ছা অসীম। পৃথিবীর যত কিছু সমস্যা, যত কিছু প্রশ্ন, তা প্রথম প্রশ্নই কি আর শেষ প্রশ্নই কি, শিশুমন থেকেই সে সমস্তর সমুদ্ভব। শোনা গেছে, কোনো এক শিশু মুশকিল আসান, সেলাই বুরুশ এবং ইস্টিশান খেতে চেয়েছিল, সে আর কিছু না, জিভের কস্টিপাথরে সেই জিনিসগুলি জানবার বাসনা। ছেলেদের বায়নায় যারা রাগ করে তারা মূর্খ। ছেলেদের আগ্রহ সর্বদা মেটাতে হয়।

"প্রতাপের বাবা? তার নামটা এখন মনে আসছে না, তবে তার এক খুড়োর নাম ছিল বটে বসন্ত রায়। তাহলে ধর হেমন্ত রায়, গ্রীষ্ম রায় কি বর্ষা রায় বা শরৎ রায় এমন কিছু একটা হবে হয়তো।"

"কি হবে?"

"প্রতাপের বাবার নাম।"

"ও!"

আমি আবার গল্পের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করি—"প্রতাপকে ছোট কুঠারখানি দিয়ে তিনি বললেন—"

"কে দিল কুঠার?"

ছেলেটির বুদ্ধির পরিচয় আমাকে মুগ্ধ করল্। যতদূর সম্ভব কণ্ঠকে কোমল করলাম এবং সেই দেবদুর্লভ হাসির সঙ্গে মিকশ্চার করে নিয়ে সামান্য একটু তাড়া দিলাম—"এতক্ষণ তবে কি বললাম তোমায়?"

কিন্তু তাড়ায় পর্যবসিত হবার ছেলে সে নয়। "কি বলে?

বলা বাহুল্য, অনেকেই এ প্রশ্নে ক্ষেপে যেতেন, কিন্তু ধৈর্য, আত্মসংযম, তিতিক্ষা এসব আমার আয়ত্তের মধ্যে, আমি সহজে ক্ষেপি না। আমি জানি, কি করে ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে হয়। হাসবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাসি এল না, অগত্যা না হেসেই বললাম—"প্রতাপের বাবা দিলেন।"

"কাকে দিলেন?"

"প্রতাপকে।"

"ও!"

"দিয়ে বললেন—"

"কাকে বললেন?"

"প্রতাপকে।"

"ও হ্যাঁ, প্রতাপকে!"

বুঝতে পারলাম, গল্পের শেষ জানবার জন্য খোকার আগ্রহের অন্ত নেই। ওর উৎসাহের সঙ্গে তাল রেখে, যতটা সম্ভব ধৈর্য ও মাধুর্যের অবতার হয়ে আবার গল্পের সূত্র ধরলাম।

"তিনি কুঠার দিয়ে বললেন—"

"প্রতাপ বলল বাবাকে?"

"না প্রতাপের বাবা বলল প্রতাপকে—"

"ও!"

"বললেন যে, সে যেন কুঠার নিয়ে অসাবধান না হয়—"

"কে অসাবধান হবে না?"

"প্রতাপ হবে না।"

"ও!"

"হ্যাঁ, যেন অসাবধান না হয়, যেখানে সেখানে না ফেলে রাখে এবং নিজে না কাটা পড়ে। প্রতাপকে ছোটোবেলার থেকেই অস্ত্রের ব্যবহার শেখাতে হবে তো, নইলে বড়ো হয়ে সে সাহসী হবে কেন? রাজার ছেলের বীর হওয়া চাই তো, তাই তিনি প্রতাপকে সেই ছোটো কুঠারখানি দিলেন এবং সাবধান হতে বললেন। কারণ সাবধান না হলে ছেলেমানুষ হাত-পা কেটে ফেলতে কতক্ষণ? আর হাত-পা কাটা গেলে হাতেও খোঁড়া হতে হবে পায়েও খোঁড়াবে তখন বীর হওয়া ভারী শক্ত ব্যাপার! অবশ্য বাক্যবীর হবার পথ তখনো পরিষ্কার থাকবে। কিন্তু—, তুমি বুঝতে পারছ তো—?"

প্রশ্ন করলাম বটে, কিন্তু ওকে বুঝবার অবকাশ দেবার জন্য মুহূর্তমাত্র থামবার সাহস আমার হল না। কারণ স্পষ্টই দেখছিলাম, ওর চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে, হাজার হাজার প্রশ্ন যেন ঝরে পড়ার প্রতীক্ষায় শ্রাবণের মেঘের মতো ঘনীভূত হয়েছে। এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে বড়ো বড়ো সেনাপতিরা যে কায়দা করে

থাকেন আমিও তাই অবলম্বন করলাম, অর্থাৎ আক্রান্ত হবার আগেই আক্রমণ করা। ওর প্রশ্নের ধাক্কায় হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে ওকেই গল্পের তোড়ে ভাসিয়ে দেওয়া আমি ভালো মনে করলাম। সুতরাং নিশ্বাস ফেলার বিলাসিতা পর্যন্ত আমাকে ছাড়তে হল। আমি বলেই চললাম—

"আর প্রতাপও তখন কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়ল অস্ত্র-বিদ্যায় হাত পাকানোর জন্য। প্রথমে কতগুলো কচুগাছ শেষ করল, তারপর কলা-বাগানে গেল, সেখানে কলাগাছদের কচুকাটা করে অবশেষে গিয়ে আমবাগানে ঢুকল। বাগানের মধ্যে, বাবার সব চেয়ে প্রিয় যে ফজলি আমের গাছটা ছিল, সব চেয়ে নিরীহ দেখে এবং একলা পেয়ে তাকেই ধরাশায়ী করল।"

"ধরাধরি করে নিয়ে গেল? গাছটাকে?" খোকার চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন।

আমি দম নেবার জন্য মুহূর্তখানেক থেমেছি কি থামিনি, সেই ফাঁকেই গোলোকচন্দ্র একটি প্রশ্নপত্র পরিত্যাগ করেছেন।

"উঁহু, ধরাশায়ী করল, মানে, কেটে ফেলল।

"কে কেটে ফেলল?"

"প্রতাপ।"

"ও!"

"প্রতাপের বাবা বিকেলে বাগানে বেড়াতে গিয়েই এই কাণ্ড দেখতে পেলেন—"

"কি দেখতে পেলেন? কুঠারটাকে?"

"না না! সেই ফজলি গাছের দশা। তিনি সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আমার ফজলি গাছ কেটেছে?"

"কার ফজলি গাছ?"

"প্রতাপের বাবার। এবং সবাই জবাব দিল যে তারা কেউ কিছুই জানে না এর সম্বন্ধে—"

"কার সম্বন্ধে?"

"ফজলি আমগাছের সম্বন্ধে।"

"ও!"

"সেই সময়ে প্রতাপ সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং সমস্ত শুনল—"

"কি শুনল?"

"তার বাবা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছেন শুনতে পেল।"

"কি জিজ্ঞাসা করছেন?"

"সেই ফজলি আম গাছের বিষয় জিজ্ঞাসা করছেন।"

"কেন ফজলি আম গাছ?"

"আহা, সেই ফজলি আমের গাছ যা প্রতাপ কেটে ফেলেছিল।"

"প্রতাপ কে?"

"প্রতাপাদিত্য।"

"উঁহু, প্রতাপাদিত্য না। প্রতাপ কে?"

"প্রতাপের বাবার প্রতাপ।"

"ও!"

"তখন প্রতাপ এগিয়ে এসে বলল—বাবা, মিথ্যা কথা বলতে আমি পারব না—"

"ওর বাবা পারবে না?"

"তা কেন হবে? প্রতাপ পারবে না মিথ্যা কথা বলতে।"

"ও! প্রতাপ! হ্যাঁ বুঝেছি।"

"প্রতাপ বলল—বাবা, তোমার ফজলি আমের গাছ আমি কেটেছি।"

"ওর বাবা কেটেছে?"

"না, না, না, সে নিজে কেটেছে ফজলি গাছটা, প্রতাপ বলল।"

"প্রতাপের নিজের ফজলি আম গাছ?"

"উঁহুঃ, তার বাবার।"

"ও!"

"সে বলল—"

"তার বাবা বলল?"

"না, না, না! প্রতাপ বলল—বাবা, আমি মিথ্যা বলতে পারব না, আমার সেই ছোটো কুঠারখানা দিয়েই আমি গাছটাকে কেটে ফেলেছি! এবং তার বাবা বলল—তোমার সত্যবাদিতায় আমি মুগ্ধ হলেম। তুমি খাসা ছেলে! তোমার একটা মিথ্যা কথা বলার চেয়ে আমার এক হাজার গাছ যাক, আমার তাতে দুঃখ নেই।

"প্রতাপ বলল এই কথা?"

"না, প্রথাপের বাবা বললেন।"

"বললেন যে বরং তাঁর একহাজার গাছ হোক—?"

"না, না, না। বললেন যে তিনি এক হাজার গাছ খোয়াবেন সেও ভালো, তবু—"

"প্রতাপকে গাছ খোয়াতে দেবেন না?"

"না; তবু প্রতাপ মিথ্যা কথা বলুক, এটা তিনি কখনো চাইবেন না।"

"তিনি নিজে মিথ্যা কথা বলবেন!"

'তা কেন?"

"ও! প্রতাপ চাইবে যে তার বাবা মিথ্যা কথা বলুক!"

"তা কেন?"

"নাঃ, আমার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়, নিজের গুণে নিজেই আমি চমৎকৃত!

শিশুদের শিক্ষাদান সহজ কাজ নয়, যাঁরা কিল-চাপড়-কানমলার সাহায্যেই সেটা সারেন তাঁরা আমার এই কঠোর প্রয়াসের অর্থ বুঝবেন না। গল্পের ছলে ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিতে হবে, তাদের চরিত্র গড়ে তোলার ওই হচ্ছে একমাত্র পথ।

এই ছেলেটিকে আমার নিজের আবিষ্কৃত সেই আদি ও অকৃত্রিম উপায়েই এতক্ষণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বৌদির বন্ধু এই সময়ে বাহিরে এলেন এবং এ-যাত্রা বেঁচে গেল এ-বেচারা। যাক, হাতে সময়ও বিস্তর আছে আমার এবং পাড়ায় ছেলেরও অভাব নেই—।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গোলোক তার মাকে বলছে আমার কানে এল—

"মা শুনেছ? ভারী মজার গল্প! ওই লোকটা বলছিল! একটা ছেলে ছিল তার বাবার নাম হচ্ছে প্রতাপ, তা সেই ছেলেটা তার বাবাকে ডেকে বলল একটা ফজলি আমের গাছ কাটতে। তার বাবা কি বললে জানো মা? বলল যে আমি এক হাজার মিথ্যা কথা বলব সেও ভালো তবু একটা ফজলি আমের গাছ কাটতে পারব না।..."

বলতে কি, ছেলেদের সত্যিই আমি ভালোবাসি। ভারী ভালো লাগে আমার ওদের। ওরা স্বর্গের ফুল। (আমার মতো যিশুখৃষ্টও ছেলেদের ভালোবাসতেন, সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন—বোধহয় পরে ক্রুশে যাবার যন্ত্রণাটা আগে থেকে গা-সইয়ে নেওয়া এই করেই তাঁর রপ্ত হয়েছিল।)

হ্যাঁ, বিলিতি কবির কথাটা মনে পড়েছে এবার—চাইল্ড ইজ দি এল্‌ডার ব্রাদার অফ হিজ ফাদার!

ওর বাংলা হচ্ছে, শিশুরা এক একটি জ্যাঠামশাই! আস্ত অকালপক্ক। পাক্কা।

যখন যেমন—

আগের থেকেই ওদের স্থির ছিল যে এবারের মহরমে তাজিয়াটা ওরা খুব প্রকাণ্ড করে করবে। হয়েচেও—তাই, অন্যবারের চেয়ে এবারের তাজিয়াটা অন্তত ছ গুণ বড়ো হয়েচে—আর উঁচুও হয়েছে প্রায় দোতালা বাড়ির সমান। তাজিয়াটা দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না—হ্যাঁ, একখানা তাজিয়ার মতো তাজিয়া বটে। এ অঞ্চলের আর কারুর তাজিয়াকে ওদের ছাড়িয়ে উঠতে হবে না সে সম্বন্ধে ওরা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু একটা হলো মুশকিল। যে যে রাস্তা দিয়ে তাজিয়াটা যাবে তার দুপাশের কোনো কোনো গাছের শাখা-প্রশাখায় ওটার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা রইল। এটা ওদের ধারণায় আসেনি, আজই প্রথম চোখে পড়ল হঠাৎ। তাই আজ মহরমের দিনে সকাল থেকেই গাছে গাছে লোক লেগে গেছে ডালপালা ছাঁটার কাজে।

এই নিয়ে আলোচনা চলছিল তর্কচঞ্চু ও ন্যায়বাগীশের মধ্যে—"এবার মুসলমানদের তাজিয়াটা বড়ো হলো কেন জানো হে তর্কচঞ্চু! আমার জন্যই।"

বিস্ময়াবিষ্ট তর্কচঞ্চু বলল—"বলো কি হে ন্যায়বাগীশ, তুমি—তুমি—তোমার—"

—"আহা, আমি কি ওদের কানে কানে বলতে গেছি! আমার অভিশাপের জন্যই এটা হল।"

—"তুমি অভিশাপ দিয়ে ওদের তাজিয়া বাড়িয়ে দিলে? শাপে বর হয়ে গেল যে হে!"

—"আহা, আমি কি তাজিয়াকে অভিশাপ দিতে গেছি? সেদিন তোমায় বললাম না? বড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে একটা ক্ষুদ্র প্রশাখা এসে পড়ল আমার পৃষ্ঠদেশে—তোমাকে বলিনি কথাটা? এখনো পৃষ্ঠে বেশ বেদনা রয়েছে।"

—"বলেছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাজিয়া-বৃদ্ধির সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না ভায়া।"

—"তৎক্ষণাৎ আমি পিঠে হাত বুলতে বুলতে বৃক্ষদের ব্রহ্মশাপ দিলাম, বড্ড বাড় বেড়েছিস তোরা। ভস্ম হয়ে যা। বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, এখনো প্রত্যহ কাঁচকলা দিয়ে হবিষ্যান্ন করি, আমার ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হবার?"

তর্কচঞ্চু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল—"ঠিক বুঝতে পারলাম না ভায়া। বড়ো রাস্তার গাছগুলো তো আজ প্রাতঃকালেও সজীব দেখেছি, ভস্ম হয়ে যায়নি তো।"

—"এইবার হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। সাপের বিষ ধরতে সময় লাগে, ব্রহ্মশাপের বেলাই কি অন্যথা হবে? কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আজ প্রত্যুষ হতেই বড়ো রাস্তার শাখা-প্রশাখা সব কাটা পড়েছে, তাজিয়া যাবার জন্য। সেই সব ছিন্ন শাখা-প্রশাখা জমিদারবাড়ি চলে যাচ্ছে ইন্ধনের নিমিত্ত; একবার উনুনে ঢুকলে ভস্মসাৎ হতে আর কতক্ষণ হে?"

তর্কচঞ্চু নিশ্বাস ফেলে বলল—"ও, এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। তোমার ব্রহ্মশাপের ফল যে এতদূর গড়াবে আগে ভাবতে পারিনি।"

ন্যায়বাগীশ আস্ফালন করতে লাগলেন—ঠিক হয়েচে, চূড়ান্ত হয়েচে। আজকাল ব্রহ্মশাপ ফলে না যারা বলে তারা দেখুক এসে। ওঃ, এখনো আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনা রয়েচে হে!"

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকো টানতে টানতে উপস্থিত হলেন—"বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, সমস্তই মায়া!"

তর্কচঞ্চু বললেন—"তবু একটু সতর্ক হয়ে টানাই ভালো। যেভাবে হুঁকোটাকে ধরেচে, যদি কল্কের আগুন নলচে টপকে গায়ে এসে পড়ে তখন সমস্তটা ঠিক মায়া বলে বোধ হবে না।"

হুঁকোটা পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে এসেছিল, বেদান্ত শিরোমণি ওকে রাইট অ্যাঙ্গেলে স্থাপন করে বললেন—"যা বলেছ। বিশেষত গায়ে না পড়ে যদি বস্ত্রে লাগে তবে তো পাঁচ সিকের ধাক্কায় ফেলেছে। বস্ত্র কি আক্রা হে আজকালকার বাজারে—আড়াই মুদ্রা জোড়া! ঠিক বলেছ তুমি তর্কচঞ্চু! সাবধানের বিনাশ নাই।"

ন্যায়বাগীশ বলল—"স্মৃতিরত্নকে দেখছি না, আজ সকাল থেকে কোথায় গেল সে?—"

জঙ্গিপুর গ্রামটিকে ব্রাহ্মণ-প্রধান বলাই উচিত, কেননা ব্রাহ্মণরাই এখানে প্রধান—অন্তত তাঁদের নিজেদের কাছে। হাড়ি, মুচি, ডোম বাগদি প্রভৃতি অনুন্নতশ্রেণীর কয়েক ঘর হিন্দু থাকলেও, তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কোনো সম্পর্ক নেই—না অন্তরের না বাহিরের। স্মৃতিরত্ন, তর্কচঞ্চু, ন্যায়বাগীশ, কাব্যতীর্থ আর বেদান্ত-শিরোমণি—এই পাঁচঘর, চারিধারের ম্লেচ্ছতা আর অস্পৃশ্যতার সমুদ্রে মোহনার পাঁচটি ব-দ্বীপের মতো কোনো রকমে নিজেদের মাহাত্ম্য ও শুচিতা বাঁচিয়ে রেখেচেন।

ম্লেচ্ছতার সমুদ্রই বলতে হবে, কেননা এর আশপাশ থেকে শুরু করে বহুদূর পর্যন্ত কেবল মুসলমান আর মুসলমান। চারিধারেই মুসলমানের বস্তি—জঙ্গিপুর নামের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। যখন পোলাও, কালিয়া আর মুরগি রান্নার সৌরভ এসে আক্রমণ করে তখন স্মৃতিরত্ন, ঘন ঘন নাকে নস্য দিতে থাকেন, কাব্যতীর্থ ওর ফাঁকে এক আধটু ঘ্রাণে অর্ধভোজন করে নেন হয়তো, কেবল বেদান্ত শিরোমণি ঘন ঘন হুঁকো টানেন আর বলেন—মায়া, মায়া, সমস্তই মায়া।

বলতে বলতে স্মৃতিরত্ন এসে উপস্থিত। তর্কচঞ্চু বলল—"বহুদিন বাঁচবে তুমি হে। বহুকাল জীবিত থাকবে। এই মাত্র ন্যায়বাগীশ তোমার নাম উচ্চারণ করছিল।"



বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা তর্কচঞ্চুর হাতে দিয়ে বললেন—"বাঁচলে কি হবে, সমস্তই মায়া। ওর বাঁচাও যা মরাও তাই।"

ন্যায়বাগীশ বলল—"উঁহু, মরাটাকে ঠিক তাই বলতে পারি না! মরলে শ্রাদ্ধের একটা ভোজ পাওয়া যাবে, সেটাকে কি ঠিক মায়া বলা যায়? তুমি এই সাতসকালে কোথায় গেছলে হে স্মৃতিরত্ন?"

—"আরে বোলো না! একটা জাতিচ্যুতির ব্যাপার।"

সবাই আগ্রহে ঘন হয়ে এল—"বলো কি হে? কার জাতিচ্যুতি হলো আবার?"

—"নতুন কূপটার। বুঝতে পারছ না? বাজারের নতুন ইঁদারাটার গো! মুচিরা বালতি ডুবিয়েছিল।"

কাব্যতীর্থ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন, এইবার এগিয়ে এলেন, "তা ডুবিয়েছিল, অমনি কূপের জাত মারা গেল? এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে যা জল পিপাসা হয় তা কহতব্য নয়—আর মুচি বলে কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই ওদের? কোথায় যায় বেচারারা কও দেখি।"

স্মৃতিরত্ন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"তুমি থামো কাব্যতীর্থ! কাব্যের অনুশাসনে কিন্তু সংসার চলছে না। মনুসংহিতার বিধান মেনে চলতে হবে আমাদের। তোমাদের কি—কথায় বলে, নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।"

ন্যায়বাগীশ বলল—"তা তুমি কি বিধান দিলে স্মৃতিরত্ন?"

—"যা শাস্ত্রে রয়েচে তা ছাড়া আবার কি? প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলাম।" বেদান্ত-শিরোমণি বিস্ময়ে বললেন—ইঁদারার প্রায়শ্চিত্ত, সে আবার কি হে? ইঁদুরের প্রায়শ্চিত্ত

হলেও না হয় বুঝতাম; তবে একটা কথা, কিছুই বোঝার আবশ্যক করে না—সমস্তই মায়া কি না।"

স্মৃতিরত্ন বললেন—"মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার নামই প্রায়শ্চিত্ত—কূপের বেলায় কি তার অন্যথা হবে? শান বাঁধানো মাথাটা চেঁছে ফেলা হলো, তারপর পঞ্চগব্য দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভালো করে মাজা হলো,—তারপর কলসপূর্ণ ঘোল ঢেলে দেওয়া হলো কূপের মধ্যে।"

কাব্যতীর্থ দুঃখ প্রকাশ করলেন—"আহা, পেটে গেলে কাজ দিত হে! এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘোলের শরবৎ অতি উপাদেয়।"

ন্যায়বাগীশ বললেন—"কিন্তু পাপ করল মুচিরা, প্রায়শ্চিত্ত কূপের; উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে, এটা কি রকম ন্যায়সঙ্গত?'

স্মৃতিরত্ন বললেন—"তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্র? জমিদার-বাড়ি হয়েই আসছি, ভিটেমাটি-উচ্ছেদ করে মুচিদের গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে এলাম। একেবারে প্রায়শ্চিত্তের বাবা, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?"

তর্কচঞ্চু মাথা নাড়তে লাগলেন—"ভালো কাজ করোনি হে! হাড়িজনরা সব হরিজন হচ্ছে আজকাল, একটু সতর্ক থাকতেই হয়। যদি বাগে পেয়ে গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়? অবশ্য আমরা গোরু নই এবং এখনও মরিনি—মরা গোরুরই ওরা ছাড়ায়। কিন্তু ভ্রম হতে কতক্ষণ। রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, আর ব্রাহ্মণে গোরু ভ্রম হবে এ আর বেশি কথা কি?"

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা হাতে নিয়ে বললেন—হাঁ, "এখন কিছুদিন সতর্ক থাকতেই হবে, যা ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন স্মৃতিরত্ন! যদিও সমস্তই মায়া তবু প্রাণের মায়াটাই হলো তার মধ্যে প্রধান। সাবধানের বিনাশ নেই, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?"

তর্কচঞ্চু এমন সময়ে প্রস্তাব করলেন—"চলো, মহরমের তাজিয়াটা দেখে আসিগে! ন্যায়বাগীশের ব্রহ্মশাপের ফলে ওটার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসা যাক।"

স্মৃতিরত্নের নাসিকা কুঞ্চিত হলো—"ম্লেচ্ছদের ব্যাপার..."

ন্যায়বাগীশের উৎসাহ দেখা গেল—"তাতে কি! দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।"

কাব্যতীর্থ যোগ দিলেন—"তাজ আর তাজিয়া উভয়ই এক বস্তু শুনেছি। তাজমহল থেকেই তাজিয়ার উৎপত্তি নাকি! তাজমহল চাক্ষুষ করার আশা তো নেই কোনদিন, তাজিয়া দেখেই আশ মিটানো যাক।"

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—"সবই মায়া জানি, তবু চলো। একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার যে তাতে সন্দেহ নাস্তি।"

যা শোনা গেছল সত্যি! এত বড়ো উঁচু তাজিয়া এ অঞ্চলে দেখা যায়নি, অন্তত স্মৃতিরত্ন তো জন্মাবধি দেখেননি, কাব্যতীর্থ যে রকম হাঁ করেছেন তাতে মনে হয়, পরজন্মেও যে এত বড়ো তাজিয়া তিনি দেখতে পাবেন তেমন প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। বেদান্ত শিরোমণির কাছে সমস্তই মায়া, তিনি হুঁকোর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এই

অপূর্ব সৃষ্টিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আর ন্যায়বাগীশের কথা বলাই বাহুল্য, তাঁরই ব্রহ্মশাপের জোর যেন তাজিয়া-মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, সাফল্য-গর্বে হাসি তাঁর ধরে না আর।

কেবল কাব্যতীর্থের মুখ দিয়ে বাক্য বেরয়—"হ্যাঁ, তাজমহলই বটে!"

মহরমের শোভাযাত্রা বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু মুশকিল বেধেছিল ওই তাজমহলকে নিয়েই। ওটাকে বইবে কে? কারা? যেমন উঁচু, ভারীও সেই অনুপাতে কিছু কম হয়নি। তাছাড়া সবাই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে চায়, তাজিয়া বয়ে মরতে রাজি নয় কেউ। সমাগত ব্রাহ্মণ-পন্ডিতদের দেখিয়ে ওদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করল,—ওই হাঁদু মৌলবীদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলে হয় না?

ওদেরই মধ্যে যে একটু বিশেষজ্ঞ সে বলল—"চুপ চুপ, ওরা সব পান্‌ডিৎ। মৌলবী কইলে ওনাদের গোসা হইবে, তখন আর ওনারা কাঁধ দিতে রাজি হবেন নি।"

প্রস্তাব শুনে 'পাণ্ডিৎদের' চক্ষু তো চড়কগাছ। ন্যায়বাগীশের এখনো পৃষ্ঠ-প্রদেশের বেদনা মরেনি, তার উপর ওই ভারী তাজিয়া বইতে হলেই তো তাঁর হয়েছে। কতদূর নিয়ে যেতে হবে কে জানে! স্মৃতিরত্নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, তিনি আমতা আমতা করে বললেন—"বাপু আমরা হলেম গিয়ে—আমরা গিয়ে—ও হে কাব্যতীর্থ, ম্লেচ্ছ কথাটার পারসিক প্রতিশব্দটা কীহে?"

শুষ্ক মুখে কাব্যতীর্থ বললেন—"কাফের।"

"হ্যাঁ, আমরা হলাম গিয়ে কাফের। আমরা ছুঁলে তোমাদের দেবতা অশুদ্ধ হবে না?"

যাদের মিলিটারি মেজাজ তারা কথার ঘোর-প্যাঁচ পছন্দ করে না. আইনকানুনের সূক্ষ্ম তর্কেও তাদের উৎসাহ নেই। স্মৃতিরত্নের অত বড়ো তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জবাবে এই সংক্ষিপ্ত কথাটা ওরা জানাল যে তাজিয়া বইতে রাজি না হলে মাথাগুলো রেখে যেতে হবে।

তর্কচঞ্চু স্মৃতিরত্নকে প্রশ্ন করলেন—"এ সম্বন্ধে মনুর কি বিধান? যবনদের তাজিয়া বওয়া কি শাস্ত্র-সম্মত?"

স্মৃতিরত্ন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। কাব্যতীর্থ বলেন—"এ সম্বন্ধে বেদবাক্য কিছু না থাকলেও প্রবাদবাক্য একটা আছে বটে, তাতে বলে—পড়েছ মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।"

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—"যদিও সমস্তই মায়া তবু মাথাকে স্কন্ধচ্যুত করার চেয়ে তাজিয়াকে স্কন্ধে নেওয়াই আমার মতে সমীচীন। কি বলো হে ন্যায়বাগীশ?"

ন্যায়বাগীশ কিছুই বলেন না, কেবল পিঠে হাত বুলান। শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে চলল জোয়ান ছোকরার দল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে তাদের অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স যাদের তারা সবাই লম্বা লম্বা লাঠি উঁচু করে—মুহুর্মুহু লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি বাধানোই হলো তাদের কাজ। তারপর চলছিল ছয়টা জয়ঢাক, তাদের আওয়াজে কানে তালা লাগবার জোগাড়। তাদের পেছনেই আরেকদল চলল—

তাদের বুক বোধকরি পাথরের—তারা খালি 'হাসান হোসেন' বলে আর বুক চাপড়ায়। তারপরেই পান্ডিৎদের পৃষ্ঠারূঢ় চলমান তাজমহল। চলমান এবং টলমান।

তর্কচঞ্চু কাঁধ বদলে নিয়ে বলেন—"শাপটা দিয়ে ভালো করোনি হে ন্যায়বাগীশ। এখন ঠেলা সামলাও।"

ন্যায়বাগীশের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ শোনায়—"আর ভাই, কে জানে ব্রহ্মশাপের জের এতদূর গড়াবে!"

কাব্যতীর্থ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন—"ব্যাটারা অমন করে বুক চাপড়ায় কেন হে?"

বেদান্ত-শিরোমণি ভারী গম্ভীর হয়ে যান—সমস্তই মায়া, কিন্তু মায়াদয়া নেই ব্যাটাদের। এত ভারী করার কি দরকার ছিল এমন! তাছাড়া যা প্যাঁয়াজের গন্ধ ছেড়েচে!—"

করাঘাতকারীদের একজন পণ্ডিতদের বলে—"হ্যাঁ দ্যাখো। তোমরা চাপড় দাও নাই ক্যান? ছাতি চাপড়াও।"

স্মৃতিরত্ন বললেন—"এর উপর যদি আবার বুক চাপড়াতে হয় তাহলে তাজিয়া পড়ে যাবে কিন্তু।"

ন্যায়বাগীশ ভীত হয়ে ওঠেন—"সর্বনাশ! একেই আমার পৃষ্ঠে ব্যথা তারপর তাজমহল-চাপা পড়লে আর বাঁচব না।"

ওরা বিরক্তি প্রকাশ করে—"চাপড় যদি না দিবা তো আমরা যা কইতেছি তাই কও।"

স্মৃতিরত্ন চাপা গলায় প্রশ্ন করেন।—"কি বলছে ব্যাটারা বুঝতে পারছ কিছু?"

"বোধহয় বলছে—" তর্কচঞ্চু চুপি চুপি—কথাটা জানান। স্মৃতিরত্ন ঘাড় নাড়েন—"ঠিক বলেছ, তাই হবে।"

ওরা বলতে বলতে চলে—"হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন..."

পণ্ডিতেরা অগত্যা যোগ দেয়—"যখন যেমন, তখন তেমন। যখন যেমন, তখন তেমন..."

মহাযুদ্ধের ইতিহাস

কী ছেলে রে বাবা! দিনরাত মুখ ভার করেই আছে। কেউ ওকে কখনো হাসতে দ্যাখেনি।

চার বছর বয়স—এইটুকুন গলা, বোধহয় একটা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়—কিন্তু তারই কী কানফাটানো আওয়াজ! কাঁদতে শুরু করলে আর রক্ষা নেই—ঢাক ঢোলকে ছাড়িয়ে যায়, কাক-চিলকে পাড়া ছাড়ায়।

ডাক্তার ওকে দেখে অদ্ভুত একটা অসুখের নাম করে বলেছেন—যদি কখনো হাসাতে পারে তা হলেই ও ভালো হবে, তাছাড়া ওর এই কান্না-রোগের আর কোনো দাবাই নেই।

শুনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট দোলগোবিন্দবাবু তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। ওকে হাসানো জলে পাথর ভাসানোর মতোই যে অসম্ভব! কে ওকে হাসাবে? সে কি এই পৃথিবীতে জন্মেছে।

আলেকজেন্ডারের পরোপকারের প্রেরণা বড়ো প্রবল। সে নিজে সেধে গিয়ে বলেছে—'দেখি আমি একবার চেষ্টা করে।"

বেচারা সকাল থেকে হিমসিম খেয়ে গেল। গম্ভীর লোককে হাসাবার যে কটা প্রণালী ওর জানা ছিল সবই সে প্রয়োগ করেছে,—এত রকম করে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, ব্যাঙ সাজল, উট সাজল, নাড়ুগোপাল হল—কিন্তু নাঃ, সমস্তই নিষ্ফল! এমনকি, তার বক দেখানো অব্দি নাহক হয়। ছেলেটা গম্ভীরভাবে ওর তাবৎ কার্যকলাপ লক্ষ করে, কিন্তু হাসে না।

অবশেষে আলেকজেন্ডার বললে—"আচ্ছা এবার ব্রহ্মাস্ত্র আছে। দেখি কাতুকুতু দিলে কেমন না হাসে।"

কিন্তু চেষ্টার শুরুতেই ছেলেটা এমন বেসুর ছাড়লে যে আলেক-জেন্ডারকে ভড়কে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিতে হল। কাতুকুতুতে যে কাঁদে কার সাধ্য তাকে হাসায়! বঙ্কু বিদ্রুপ করল—"তুই না ভাই দিগ্বিজয়ী আলেকজেন্ডার! খবরের কাগজে কাগজে না তোর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বেরিয়ে গেছে, আর তুই হার মানলি একটা সামান্য শিশুর কাছে?"

এতক্ষণ আলেকজেন্ডারের প্রাণান্ত পরিশ্রম দেখে ওরা হেসে লুটোপুটি খেয়েছে—সমবেত ভদ্রবালকদের মধ্যে হাসেনি কেবল দুজনা, এক সে নিজে আর এক, ওই দুর্দান্ত অপোগণ্ডটা।

আলেকজেন্ডার গম্ভীর মুখে জবাব দিল—"হবেই তো! পুরুর কাছে আলেকজেন্ডার হারবে এ তো নতুন কথা নয়। বইয়েই লেখা রয়েছে না?"

বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে—"এখানে পুরু আবার কে রে?"

—"কেন, ওর গলার আওয়াজ কি কিছু কম পুরু নাকি?" বলে সে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে বিরক্ত হয়ে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। ওই কণ্ঠস্বর আর ওদের ঠাট্টা থেকে যতক্ষণ দূরে থাকা যায় ততক্ষণই শান্তি।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট দোলগোবিন্দবাবু কয়েকদিন হল দেশ থেকে তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে এসেছেন—ছেলের অসুখ সারানোর জন্যই কলকাতায় আনা। কোথাও সুবিধামতো একটা বাসা পাচ্ছেন না বলে আপাতত বোর্ডিং-এ তাঁদের উঠিয়েছেন। আলেকজেন্ডার মনে মনে বলল—"যেমন অদ্ভুত ব্যায়রাম, তেমনি তার চিকিৎসা! না হাসলে কাঁদুনে-রোগ সারবে না। কিন্তু যে ওকে সারাতে যাবে তাকে না ধরে ওই রোগে! নাঃ, দেখছি আমাকেই ওদের বাসা খুঁজে দিতে হল!" আলেকজেন্ডার তার ভোজপুরি বন্ধু কুন্দন সিং-এর সন্ধানে চলল, সে যদি বাসার কোনো খবর দিতে পারে।'

রাত হলেই ওর কান্নার উৎসাহ যেন বেড়ে যায়! দিনের বেলায় তবু মাঝে মাঝে ক্ষান্তি আছে, খাবার কিছু পেলেই থেমে থাকে, কিন্তু সারা রাত তার কী চিৎকার! দেয়াল ফুড়ে আওয়াজ আসে, ঘুমানোর দফা রফা! রুমমেট বন্ধু বিরক্তি প্রকাশ করে—"কী আপদ! থামাতে পারছে না ছেলেটাকে!"

আলেকজেন্ডার সান্ত্বনা দেয়—"ভাই, গ্রিনল্যান্ডে ছমাস করে রাত— ভাগ্যিস আমরা সেখানে নেই! তা হলে কি মুশকিল যে হতো!"

বন্ধু সান্ত্বনা পায় কি না সেই জানে! —সমস্ত রাত এ-পাশ ও-পাশ করে, কিন্তু আলেকজেন্ডারের মতামত আর চায় না।

সন্ধ্যাবেলা দোলগোবিন্দবাবু অফিস থেকে ফিরতেই আলেকজেন্ডার গিয়ে অভিযোগ করল—"দেখুন আপনার খোকা—"

"কি হয়েছে? কি করেছে খোকা?

—"এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি করেনি আমার, তবু—" আলেকজেন্ডার চুপ করে থাকে!

—"বল না, যদি কিছু ভেঙে থাকে কি নষ্ট করে থাকে আমি দাম দেব।"

এবার আলেকজেন্ডার একটু উৎসাহ পায়—"আমার একটা কপিং পেন্সিল, তার অবশ্য আধখানাই ছিল—খোকা সেটা খেয়ে ফেলেছে।'

—অ্যাঁ, বল কি! খেয়ে ফেলেছে! কখন?" দোলগোবিন্দবাবুর চোখ কপালে উঠল।

—"আজ দুপুরে।"

—"আজ দুপুরে? এতক্ষণ তুমি কি করছিলে?"

—"ফাউন্টেন পেনে লিখছিলাম, কি আর করব?"

—"ডাক্তারকে খবর দাওনি কেন?"

আলেকজেন্ডার দারুণ বিস্মিত হয়।—"ডাক্তারকে? কেন, তা হলে কি জিনিসটা পাওয়া যেত? সে যে একেবারে গিলে ফেলেছে দেখলাম।"

"কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!"—বলতে বলতে দোলগোবিন্দবাবু অফিসের জামা-কাপড় না ছেড়েই খোকাকে নিয়ে ডাক্তার-বাড়ি ছুটলেন।

আলেকজেন্ডার ভেবেছিল পুরো দামটা পাওয়া গেলে আবার একটা নতুন পেনসিল কেনা যাবে কিন্তু দোলগোবিন্দবাবুকে একটু আগের প্রতিশ্রুতি একটু পরেই ভুলে যেতে দেখে সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। সে পর্যালোচনা করে দেখল—ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া বৃথা, ও-পেনসিল যে আর বেরুবে এ তার বিশ্বাস হয় না—ওটা যে একদম পেটে চলে গেছে, বেরুলেও গলপথে বেরুবে না, তলপথে যদি বেরয়! এতক্ষণে তার হজম হয়ে যাবার কথা।

সে গজরাতে লাগল—"হুঁঃ", মোটে তো একটা পেনসিল খেয়েছে আজ! ও যা রাক্ষুসে ছেলে, আর কিছুদিন থাকলে আমাদের জামা-কাপড়, বই খাতা সব পেটে পুরবে, কিচ্ছু বাকি রাখবে না।"

দোলগোবিন্দবাবু ডাক্তার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসা দেখে হোস্টেলে ফিরলেন—আজ রাত্রেই স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তিনি স্থানান্তরিত হবেন। তখন থেকে তাঁর বকবক শোনা যাচ্ছে—"কি সর্বনাশ ভাবো দেখি! এখানে রাখলে ছেলেটাকে এরা দুদিনে মেরে ফেলবে। একে ওর ওই শক্ত ব্যায়রাম, তার ওপর ওকে পেন্সিল খাইয়ে দিয়েছে! ওইটুকুন ছেলে, পেন্সিল কি ওর পেটে সইবে! আর কয়েকটা খেলেই ব্যস—তখন আর দেখতে হবে না। একেবারে যাকে বলে লেড পয়জন!"

আলেকজেন্ডারকে এই সব স্বগতোক্তি শুনতে হচ্ছিল। পেন্সিলটা তার বড়ো আদরের,—জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে কেনা—চার আনা দামের! একটা 'মৌচাক' কেনা যায়, একবার সিনেমা দেখা যায় তাতে। একখানা সন্দেশ পড়া যায় কি খাওয়া যায়। পেন্সিলের ভাগ্যে যে এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটবে কোনো দিন সে তা ভাবেনি, তার এই শোচনীয় পরিণামে তার মন খারাপ হয়ে গেছল—সে কোনো উত্তর দিল না।

দোলগোবিন্দবাবু বকে চললেন—"আজ তো শুধু আধখানা পেন্সিল খেয়েছে মোটে! কিন্তু কাল যদি আস্ত একটা ছুরি কি কাঁচি খেয়ে ফ্যালে—তখন কী সর্বনাশ! তখন বেচারার নাড়ি-ভুঁড়ি সব কেটেফুটে যাক! তা হলে কি আর ও বাঁচবে—নাড়ি ভুঁড়ি না নিয়ে বাঁচে কেউ! একে ওর ওই শক্ত ব্যায়রাম! নাঃ, আর এখানে থাকা নয়, স্থান ত্যাগেন দুর্জনাৎ। ভালো বাসা পাওয়া গেছে, কুন্দন সিং-এর আস্তানার পাশেই। লোকটাও বড়ো ভালো—ছেলেটাকে দেখবে-শুনবে।"

আলেকজেন্ডার কোনো উত্তর দ্যায় না। এই ভেবে সে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে—ভাগ্যিস, আধখানা পেন্সিলের উপর দিয়েই গেছে! তার বদলে যদি তার অমন চমৎকার ছুরিটা খেত, তা হলে কি ক্ষতিই না হতো তার! ছেলেটার পেটুকপনা আগে থেকে

জানা গেল ভালোই হলো। এর পরে ও ঘরে এলে ছুরি-কাঁচি এবং আর যা যা দামি জিনিস তার আছে সব সামলে রাখতে হবে—কি জানি, যখন ওর মতলব ভালো নয়। এ রকম রাক্ষুসে খিদে আর অদ্ভুত খাদ্যরুচির সে মোটেই সমর্থন করতে পারে না।

পরদিন কুন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই সে বলল—"বাবুজি! কাল সমুচা রাত বহুৎ তকলিখ গিয়া নিদ মোটে হোয় নি।"

—"কেন, ফিন চোর-লোক আয়া নাকি? ফিন বিড়াল ডাকছিল?"

—"না, বিল্লি আউর ডাকসে না—বিল্লিসে কি হামি ডোর কোরি? ইস দফে—ইস্ দফে—উস্‌সেভি জবর!"

—"কি, কি হয়েছে এবার?" আলেকজেন্ডার সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

—"বিলাই নেহি, তবে বিলাইকে বাবা—ওই সুপারিন্‌ডন্ বাকুকো লেড়কা। কাল সমস্তো রাত এতনা চিল্লায়া! সে হামি কি বোলবে—হামি মোটে নিদতে পারেনি।"

চোখ লাল, দৃষ্টি উদাস—এক রাত্রির নিদ্রা-অভাবে ওই বিরাট দেহ ভোজপুরির প্রায় ক্ষেপে যাবার দশা হয়েছে, দেখে আলেকজেন্ডারের দুঃখ হল। সে সহানুভূতি প্রকাশ করল—"কানমে তুলা দিয়ে দেখছ?"

কুন্দন সিং হতাশভাবে হাত নাড়ে—"তুলাসে কি করবে? কানমে অঙ্গুলি দোবে থাকসে, তাতে ভি কিসু হোয় না।" বলে সমস্ত রাত কেমন সজোরে কানে আঙুল চেপে ছিল আলেকজেন্ডারকে দেখায়।

পড়ার চাপে সপ্তাহ খানেক আর সে কুন্দনের খবর নিতে পারেনি—ইতিমধ্যে তার অবস্থা আরো কী শোচনীয় দাঁড়িয়েছে কে জানে। সেদিন সকালে উঠেই আলেকজেন্ডার কুন্দনকে দেখতে গেল।

কুন্দন সিং, তোমার তলোয়ারটা তো চমৎকার!" কুন্দন সিং উত্তরও দ্যায় না, তাকায়ও না। তার ভ্রূক্ষেপই নেই।

"বাঃ এমন চমৎকার জিনিসটা এর আগে দেখিনি তো! হ্যাঁ, একখানা তলোয়ার বটে!" এবার কুন্দন কথা বলল—"হামার বাবা চন্দন সিংকা হাতিয়ার।"

কুন্দনের চোখের দৃষ্টিটা যেন কী রকম। এমন অদ্ভুত চাউনি সে এর আগে ওর দ্যাখেনি। —"তা এতে ধার দিচ্ছ যে। এ দিয়ে তুমি কি করবে?"

—"হামি দুষমনকে মারবে। একদম মার ডালবে।"

—"যে রকম হাতিয়ারের অবস্থা, কাউকে মার ডালতে গেলে কি ও আর আস্ত থাকবে? যাকে মারবে তার কিছু হবে না, মাঝখান থেকে তোমার তলোয়ারটাই ভাঙবে। পৈতৃক সম্পত্তি, তার উপরে এমন একটা দামি জিনিস এইভাবে নষ্ট করা কি ভালো?"

কুন্দন সিং অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বলল—"চন্দন সিং-কা বাচ্চা কুন্দন সিং, হামি ভি তলোয়ার চালানো জানে।"

—"জানো না তা কি আমি বলছি! তবে তোমার দুষমন আবার কে?"

—"ওহি খাড়া হ্যায়, হুঁয়া সে তাকতা হ্যায়।"—কুন্দন সিং-এর ইঙ্গিত অনুসরণ

করে দো-তলার জানলায় দোলগোবিন্দবাবুর বংশধরকে সে দেখতে পেল। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারই ফাঁক দিয়ে কুন্দন সিং-এর কার্যকলাপ গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে।

কুন্দন সিং শূন্যে ঘুঁষি ছুড়তে লাগল—"সাত রোজ হামি নিদতে পারেনি, আজ হামকে ঘুমতে হোবে।"

একটু পরেই সারা পাড়ায় খবর রটল যে কুন্দন ক্ষেপে গেছে, একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে খাড়া, ও-পথে যে যাচ্ছে তাকেই তাড়া করছে। এমন ক্ষেপা ক্ষেপেছে যে তলোয়ার কি করে ধরতে হয় তা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে, ধারালো দিকটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাঁটের দিক দিয়ে যে সামনে আসছে তাকেই দু-এক ঘা কষিয়ে দিচ্ছে। বাঁটিয়েও দিচ্ছে বলা যায়।

আলেকজেন্ডার দৌড়ে গিয়ে দূর থেকে দেখল—ব্যাপার তাই বটে! কুন্দনের লম্ফঝম্ফ দ্যাখে কে! সে বুঝতে পারল, তলোয়ারের মায়ায়, পাছে ভেঙে যায় এই ভয়ে তার ধারালো দিকটা সে ব্যবহার করছে না, ভাগ্যিস, তাই বাঁচোয়া! নইলে অনেককে প্রাণের মায়া ছাড়তে হত।

সত্যিই কুন্দন ক্ষেপে গেছে—তা নইলে লাফিয়ে দো-তলায় ওঠার চেষ্টা কেউ



করে কখনো? খোকা তখনো জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে, তার মুখ চোখ দেখলে মনে হয় সারা ব্যাপারটায় সে ভারী উৎসাহ বোধ করছে। সব কিছুতেই মুখ ভার ছাড়া আর কোনো মৌখিক অবস্থা এর আগে খোকার দেখা যায়নি; আলেকজেন্ডার প্রথম তার এই ভাবান্তর দেখল।

কুন্দন সিং তলোয়ার ঘুরিয়ে তাকে বলে—"আও বাচ্চা, তুম নীচা আও, তুমকো দেখেগা হাম।"

খোকা রেলিং-এর ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আগ্রহ সহকারে কুন্দনের আস্ফালন লক্ষ করে।

কুন্দন সিং লাফিয়ে তার নাগাল পেতে চায়, খোকা কিন্তু মোটেই ভীত নয়—মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব তার জানা আছে বোধহয়। সে গরাদ থেকে নড়ে না, তাকে দেখে মনে হয় সমস্তটাই সে খুব উপভোগ করছে।

কুন্দন সিংকে ঘিরে ফার্লংটাক দূরে চারিদিকেই বেশ জনতা দাঁড়িয়ে গেছে—কিন্তু কারু সাহস হয় না যে ওর হাত থেকে গিয়ে তলোয়ারটা কেড়ে নেয় কিংবা ওকে ধরে।

একটা ষাঁড় যাচ্ছিল ওই দিক দিয়ে, এত ভিড় দেখে তার কৌতূহল হলো। হয়তো ভেতরে কেউ ম্যাজিক দেখাচ্ছে কিম্বা খাবারের ঠোঙা পড়ে রয়েছে—এমনি কিছু একটা সে ভেবে থাকবে, জনতা ভেদ করে সে অগ্রসর হল। এবং অগ্রসর হল কুন্দনের দিকেই।

ষাঁড়টার অপঘাত আশঙ্কা করে সবাই সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল কিন্তু ওকে বাঁচাবার জন্য এগুতেও কারুর সাহস হল না! আলেকজেন্ডার সংকল্প করল সে-ই এ দুঃসাহসিক কাজ করবে, ষাঁড় মারলে যদিও গোহত্যা হয় না তবুও। ষাঁড়ের অমূল্য জীবন রক্ষার দায়িত্ব সে নিজেই নেবে। মহাপ্রস্থানের পথ থেকে ষাঁড়কে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিরস্ত করবে।

ষাঁড়টা কিন্তু অকুতোভয়! আলেকজেন্ডার অনেক করে তার মতি-গতি ফেরাবার চেষ্টা করল কিন্তু সে তাকে আমলই দিল না। অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখে আলেকজেন্ডার তার লেজ ধরে টানতে শুরু করল। কেননা এটা সে বুঝেছিল যে তার শিঙের দিকে গিয়ে মুখোমুখি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করাটা ঠিক সমীচীন হবে না।

তার ফলে ষাঁড়টা কিন্তু উলটো বুঝল, ফেরা তো দূরে থাক সে দৌড়তে সুরু করল—এবং কুন্দনের দিকেই। মহাপ্রস্থানের পথে একা নয়, আলেকজেন্ডারকেও নিয়ে চলল, লেজে বেঁধে, কেননা ষাঁড়ের লেজ ধরে দৌড়ানো ছাড়া তার উপায় ছিল না। বাহন থামলে আলেকজেন্ডার দেখলে সে একেবারে কুন্দনের সামনাসামনি গিয়ে পড়েছে—মাঝে শুধু এক ষাঁড়ের ব্যবধান মাত্র।

কুন্দন সিং বাঁট উঁচিয়ে তার দিকে এগুতে লাগল—আলেকজেন্ডার দেখল ষাঁড়কে

এখন ঢালের মতো ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। লাগামের দ্বারা যেমন ঘোড়াকে চালায়, তেমনি লেজের দ্বারা ষাঁড়কে পরিচালিত করবে স্থির করল সে। যুদ্ধে সে পিছু হটবে না, পালাবে না, তার ঐতিহাসিক নাম সে কলঙ্কিত করবে না। সে হচ্ছে আলেকজেন্ডার—নিজেকে এবং লেজকে বাগিয়ে নিয়ে সে প্রস্তুত হল।

কুন্দন ভাবল, আলেকজেন্ডারকে আঘাতের আগে তার অস্ত্রনৈপুণ্যটা ষাঁড়ের মাথায় একবার পরীক্ষা করলে কেমন হয়। ষাঁড়টা এতক্ষণ নিরপেক্ষ ছিল কিন্তু হঠাৎ কপালের গোড়ায় বাঁটের ঘা পড়তেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে, তার শিঙের চাঞ্চল্য দেখা গেল, সে কুন্দনকে দিল গুঁতিয়ে। কুন্দন আর এক ঘা তাকে কষাল, সেও কুন্দনকে দিল আর এক গুঁতো। একদিকে বিরাটদেহ ভোজপুরি, অন্যদিকে বিপুলকায় বড়বাজারের ষাঁড়—কেউই কম যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ রোমাঞ্চকর সংঘর্ষ এর আগে কেউ দ্যাখেনি।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। একটু পরেই দেখা গেল কুন্দন সিং হাতিয়ার ফেলে দিয়ে দুহাতে কোমর চেপে ধরে ধুলোর উপরেই বসে পড়েছে। এহেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিমাণ এই রকমটাই হবে আলেকজেন্ডার আশঙ্কা করছিল। 'হঠকারিতার কুফল' নামে যে রচনাটা তাকে লিখতে দিয়েছে তাতে কুন্দনের উদাহরণটা যুতসই মতো সে লাগিয়ে দেবে এঁচে রাখল।

কুন্দনকে কাত করে ষাঁড়টা এতক্ষণে আলেকজেন্ডারের প্রতি মনোযোগ দিল, কিন্তু কিছু বলবার আগেই কেবল পেছন ফিরে তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেই আলেকজেন্ডার তৎক্ষণাৎ তার লেজ ছেড়ে দিয়েছে। ষাঁড়টার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, এই যুদ্ধের আগাগোড়া পেছন থেকে একজনের লেজ ধরে থাকাটা সে আদৌ পছন্দ করেনি—এই পিছুটান না থাকলে এ-যুদ্ধে সে আরো অনেক সুবিধা করতে পারত।

ষাঁড়টা বিজয়ী বীরের মতো ধীর পদবিক্ষেপে সেখান থেকে চলে যাবার পর আলেকজেন্ডার নিশ্বাস ফেলে উপরে চেয়ে দেখে—কী আশ্চর্য! খোকা হাসছে, ভীষণ হাসছে—খিল খিল করে হাসছে।

কুন্দন সিং এদিকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, ধুলোর উপরেই। সম্ভবত সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু—

কিন্তু তার নাক ডাকছে তখন দস্তুরমতন।

পণ্ডিত-বিদায়

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হলো পথে।

—তোর হাতে ওসব কি রে?

পদ্মলোচন বলল—যত রাজ্যের খবরের কাগজ। স্টেটসম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মানকে, পন্ডিত মশাই আমাদের খাতা দেখেছেন? কত নম্বর পেয়েছি আমি?

মানস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বোধহয় এগারো।

মোটে? আর তুই?

—পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেবখন। ভাগ্যিস এগোরো পাইনি, তাহলে কি মুশকিল যে হতো। একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর পাওয়া যায় না?

—আর সব ছেলেরা?

—তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস পাঁচ, মাইনাস সাত পেয়েছে; তারা সব 'ফ্রিজিং পয়েন্ট' সব 'বিলো জিরো'।

পদ্মলোচন হাসতে পারল না! —তোর আর কি, তুই পণ্ডিতের ছেলে; তোকে তো আর কিছু বলবেন না! মার খেয়ে মারা যাব আমরা।

পদ্মলোচন বাড়ি ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগোরো পেয়েছে! তার উপর পণ্ডিত মশায়ের আবার সব চেয়ে বেশি রাগ তারই উপর—সে তাঁর কথার চোটপাট জবাব দেয় বলে। সেদিন তো বেঞ্চির নড়ড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কষাবেন এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষে—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয়নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সে যাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যে রাগ সে দেখেছে, এর পরে ফের ইস্কুলে গেলে কি আর নিস্তার আছে?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হলো না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হলো একটা পথ যেন পাওয়া গেল পণ্ডিত মশাইকে জব্দ করবার...একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠল।

ইস্কুলে গিয়ে শুনল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেডমাস্টার এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে আসবেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুশিই হলো। সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই; তার নাম পালটে ধূম্রলোচন বলে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক পিটিন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাসে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন মরিয়া আজ।

হেডপণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টার মশাই ক্লাসে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল করলে কি করে হে?

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল না কি?

পদ্মলোচন জবাব দিল—পণ্ডিত মশাই আমাদের পড়ান না সার।

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন—কি? অধ্যাপনা করি না? যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা!

হেডমাস্টার মশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—আপনি থামুন। কি বলবার আছে তোমার বলো।

—সেদিন আমি পণ্ডিত মশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করলুম, অবশ্যি পড়ার বইয়ের বাহিরে। আনসিন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে। তা পণ্ডিত মশাই তার মানেই বললেন না।

পণ্ডিত মশাই রাগে ফুলতে লাগলেন—কি? কোনো শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই? শ্লোকার্থ জানি না—আমি!

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিত মশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—নিয়ে আয় তোর কোন শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই!

হেডমাস্টার আশ্বাস দিলেন—বলো ভয় কি! তোমার মনে নেই বুঝি?

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, আছে আমার। এই শ্লোকটা সার—

হবার্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আন্ডীব ঃ অভ্রফ্রয়েণ মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিত মশায়ের চোখ কপালে উঠল। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেডমাস্টার মশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন— একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিম্বা পাঁজির বোধহয়, কি বলেন?

পণ্ডিত মশাই মাথা চুলকাতে লাগলেন—কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে দেব, ও যেন মানকের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ি যায়।

পদ্মলোচন বলল—না সার, সামনে দুর্গা পুজো, আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না সার।

পণ্ডিত মশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেডমাস্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাসতে লাগলেন—পণ্ডিত মশাই, ওটা কাল আপনি স্কুলে বলবেন তাহলেই হবে। আমার জানার কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখবেন, পাঁজির কিংবা উপনিষদের হবে—ওই দুটোই তো আমাদের যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ত!

পণ্ডিত মশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—বেশ, আমার স্মরণে রইল।

বাড়ি ফিরে পণ্ডিত মশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভট-সংগ্রহটাও পাতি পাতি করে খুঁজলেন। কোনোদিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হলো না। নাকে এক টিপ নস্য দিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগলেন—'হবার্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নাই! বার্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ...বা'র মাঝখানে পড়ে এ তো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা?' হিপ্ত ছিল আশা হোলো হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কি? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গ বঃ— কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ'ই বা কি আর ওই 'শকেডুয়ে'...?

পণ্ডিত মশাই অসুখের অজুহাতে তিন দিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিন দিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই! তখনো তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠতে পারেন নি। সেদিনই সকালে উদ্ভটকল্পতরু নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে আসতেই হুংকার দিয়ে উঠেছেন—কে যাচ্ছিস ওখান দিয়ে? টেটো?

—উঁহু।

—মানকে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বলত। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস বলল—টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে!

—তবে তুই সাজ। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন তো একবার।

—সে আসবে না।

—বলিস, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই অতঃপর।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন কিন্তু ক্রমশই তাঁর কাছে সব আরো ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগল। 'আন্তীবঃ অণ্ডক্রয়েণ'—এ যে কি বস্তু তার রহস্য ভেদ করা থাক অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

—এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বোসো। তুমি কি শ্লোকটার সদর্থ জানো? জানো না কি?

জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার?

—তাতো বটে, তাও তো বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আন্তীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার হয়তো অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে সব্যসাচী।



—কথাটা আন্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিত মশাই ঘন ঘন তামাক টানতে লাগলেন—সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও কিছু ভুল করোনি? তাই তো—তবে—তাই!

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিত মশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থ সংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় করে বলল—আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি, বাবা!

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুললেন—কোন লাইনের?

দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আন্ডীব'-এর জায়গায় আন্ডিল আর, 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না, তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন আর কিনা এই দুগ্ধপোষ্য বালক—মূঢ়তা দেখ! আগে হলে তিনি মেরেই বসতেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা মজ্জমান লোকের মতো, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন। —কি শুনি?

মানস তথাপি ইতস্তত করতে থাকে—বলব?

—বলতেই ত বলছি।

আন্ডিল ঃ! মানে এক আন্ডিল, কিনা এক গাদা, অন্ডক্রয়েণ অর্থাৎ অন্ড মানে ডিম্ব...ক্রয়েণ মানে ফ্রাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে, মানষ্টেটঃ মানষ্টেট...

—ওইখানে তো আমারও আটকাচ্ছে রে! —পণ্ডিত মশাই বিজ্ঞের মতো এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—ওই মানষ্টেটই হলো মারাত্মক যত নষ্টের গোড়া।

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা! মানষ্টেটঃ—বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের উপর কটাক্ষ করেছে, অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

—বটে? গম্ভীরভাবে পণ্ডিত মশাই বললেন—সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হলো তবে?

—অর্থাৎ কিনা, এক গাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ—গব গব করে গিলছে। ...বোধহয় ও দেখেছিল।

দেখতে দেখতে পন্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন কি? আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করে তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটান্ড কে জানে!

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠ-পোষকতার মতলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করেছেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে বলল—ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই তো বললাম।

—মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! আর, এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হলো, তার কি!

পণ্ডিত মহাশয়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিত-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে-ভাবে ও যে-ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অন্ড-ক্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তাঁর সহানুভূতিই নয়, দস্তুর মতো সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জনা করে দিয়ে পণ্ডিত মশাই আবার তাঁর শ্লোকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেডমাস্টার মশাই লোক পাঠিয়েছিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল, কেন তিনি ইস্কুলে আসছেন না—তাঁর কী হয়েছে?

পণ্ডিত মশাই উত্তর পাঠালেন—সমস্তই হয়েছে, বাকি কেবল 'শকেড়ুয়ে'—ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেডমাস্টার তো হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবেই ভুলে গেছেন; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—তা উপনিষদেরই কি আর পাঁজিরই বা কি! তিনি ভাবলেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? কাল নিজে গিয়ে দেখতে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সদর দরজায় তালা লাগানো, তারই উপরে ঝুলছে—To Let। পন্ডিতের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়ে, প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোষ্টাপিস থেকে ফিরছে, যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হলো। সরিৎ বলল—আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলিস ভাই! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচল।

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

—দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিত মশায় একেবারে 'টজেগেণঃ'! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!

পদ্মলোচন তবু হাসে।

—অবশ্যি মানকে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ করে ওটা বেঁধেছিস?

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না—মানকের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে!

সমুৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞেস করে—তবে আসল মানেটা কি ভাই? বলবিনে আমাদের?

—মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে!

—ও তো সব খবরের কাগজ।

—আরে এই নামগুলোই তো ওলটপালট করে দিয়েছি! উল্টো দিক থেকে একটু এদিক ওদিক করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান আর ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া।...

অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ!

পাশের বাড়ি বেরিবেরি হওয়ার পর থেকেই মন খারাপ যাচ্ছিল। পাশের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যে ছিল তা নয়, সম্পর্ক হবার আশঙ্কাও ছিল না, কিন্তু বেরিবেরির সঙ্গে সম্পর্ক হতে কতক্ষণ? যে বেপরোয়া ব্যারাম কোনদেশ থেকে এসে এতদূর পর্যন্ত এগুতে পেরেছে, তার পক্ষে আর একটু কষ্টস্বীকার করা এমনকি কঠিন!

কদিন থেকে শরীরটাও খারাপ বোধ করতে লাগলাম। মনের মধ্যে স্বগতোক্তি শুরু হয়ে গেল—"ভালো করছ না হে অশ্বিনী! সময় থাকতে ডাক্তার-টাক্তার দেখাও।'

মনের পরামর্শ মানতে হলো। ডাক্তারের কাছেই গেলাম। বিখ্যাত গজেন ডাক্তারের কাছে। আমাদের পাড়ায় ডাক্তার এবং টাক্তার বলতে একমাত্র তাঁকেই বোঝায়।

তিনি নানারকমে পরীক্ষা করলেন, পালসের বিট গুনলেন, ব্লাডপ্রেসার নিলেন, স্টেথিসকোপ বসালেন, অবশেষে নিছক আঙুলের সাহায্যে বুকের নানাস্থান বাজাতে শুরু করে দিলেন। বাজনা শেষ হলে বললেন, "আর কিছু না, আপনার হার্ট ডায়ালেট করেছে।"

"বলেনকি গজেনবাবু?"—আমার পিলে পর্যন্ত চমকে যায়।

তিনি দারুণ গম্ভীর হয়ে বলেন—"কখনো বেরিবেরি হয়েছিল কি?"

"হুঁ হয়েছিল। পাশের বাড়িতে।" ভয়ে ভয়ে বলতে হলো। ডাক্তারের কাছে ব্যারাম লুকিয়ে লাভ নেই!

"ঠিকই ধরেছি বেরিবেরির আফটার-এফেক্টই এই।"

"তা হলে কি হবে?" আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম: "তা হলে কি আমি আর বাঁচব না?"

"একটু শক্ত বটে। সঙ্গীন কেস। এরকম অবস্থায় যে-কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করা সম্ভব!"

"অ্যাঁ! বলেন কি গজেনবাবু! না, আপনার কোনো কথা শুনব না। আমাকে বাঁচাতেই হবে আপনাকে;" করুণকণ্ঠে বলি, "তা যে করেই পারেন—আমি না বেঁচে থাকলে আমাকে দেখবে কে? আমাকে দেখবার আর কেউ থাকবে না যে! কেউ আমার নেই।"

পাঁচটাকা ভিজিট দিয়ে ফেললাম। "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখা যাক;" গজেন ডাক্তার বললেন, "একটা ডিজিটালিসের মিকশ্চার দিচ্ছি আপনাকে। নিয়মিতভাবে খাবেন, সারলে ওতেই সারবে।"

আমি আর পাঁচটাকা ওঁর হাতে গুঁজে দিলাম—"তবে তাই কয়েক বোতল বানিয়ে দিন আমায়, আমি হরদম খাব।"

"না, হরদম নয়। দিনে তিনবার। আর, কোথাও চেঞ্জে যান। চলে যান—পশ্চিম টশ্চিম। গেলে ভালো হয়। সেখানে গিয়ে আর কিছু নয়, একদম কমপ্লিট রেস্ট।

প্রাণের জন্য মরিয়া হতে বেশি দেরি লাগে না মানুষের। বললাম, "আচ্ছা, তাই যাচ্ছি না হয়। ডালটনগঞ্জে আমার মামার বাড়ি, সেখানেই যাব।"

"কমপ্লিট রেস্ট, বুঝেছেন তো? হাঁটা-চলা, কি ঘোরাফেরা, কি দৌড়-ঝাঁপ, কি কোনো পরিশ্রমের কাজ—একদম না। করেছেন কি মরেছেন—যাকে বলে হার্টফেল—দেখতে শুনতে দেবে না—সঙ্গে সঙ্গে খতম। বুঝেছেন তো অশ্বিনীবাবু?"

অশ্বিনীবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, ডাক্তার দেখাবার আগে বুঝেছেন এবং পরে বুঝেছেন—যেদিনই পাশের বাড়িতে বেরিবেরির সূত্রপাত হয়েছে, সেদিনই তিনি জেনেছেন তাঁর জীবন সংশয়। তবু গজেনবাবুকে আশ্বস্ত করি, "নিশ্চয়! পরিশ্রম না করার জন্যই যা পরিশ্রম, তাই করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন থেকে অলস হবার জন্যই আমার নিরলস চেষ্টা থাকবে।" এই বলে আমি, ওরফে অশ্বিনীবাবু, বিদায় নিলাম।

মামারা থাকেন ডালটনগঞ্জ। সেখানে তাঁদের ক্ষেত-খামার। মোটা বেতনের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে জমিটমি কিনে চাষবাস নিয়ে পড়েছেন। বেকার-সমস্যা-সমাধানের মতলব ছোটোবেলা থেকেই মামাদের মনে ছিল, কিন্তু চাকরির জন্য তা করতে পারছিলেন না। চাকরি করলে আর বেকার কি করে? সমস্যাই নেই তো, সমাধান করবেন কীসের? অনেকদিন মনোকষ্টে থেকে অবশেষে তাঁরা চাকরিই ছাড়লেন।

তারপরেই এই চাষবাস। কলকাতার বাজারে তাঁদের তরকারি চালান আসে। সরকারি-গর্বে অনেককে গর্বিত দেখেছি, কিন্তু তরকারির গর্ব কেবল আমার মামাদের! একচেটে ব্যবসা, অনেকদিন থেকেই শোনা ছিল, দেখার বাসনাও ছিল; এবার এই রোগের অপূর্ব সুযোগে ডালটনগঞ্জে গেলাম, মামার বাড়িও যাওয়া হোলো, চেঞ্জেও যাওয়া হোলো এবং চাই কি, তাঁদের তরকারির সাম্রাজ্য চোখেও দেখতে পারি, চেখেও দেখতে পারি হয়তো বা।

মামারা আমাকে দেখে খুশি হয়ে ওঠেন। "বেশ বেশ, এসেছ যখন, তখন থাক কিছুদিন।" বড়োমামা বলেন।

"থাকবই তো!" পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলি—"চেঞ্জের জন্যই তো এলাম!"

মেজমামা বলেন, "এসেছ, ভালোই করেছ, এতদিনে পটলের একটা ব্যবস্থা হোলো।"

ছোটোমামা সায় দেন, "হ্যাঁ, একটা দুর্ভাবনাই ছিল, যাক, তা ভালোই হয়েছে।" তিন মামাই যুগপৎ ঘাড় নাড়তে থাকেন।

বুঝলাম, মামাতো ভাইদের কারো গুরুভার আমায় বহন করতে হবে; হয়তো

তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। তা বেশ তো, ছেলে পড়ানো এমন কিছু শক্ত কাজ নয় যে, হার্টফেল হয়ে যাবে। গুরুতর পরিশ্রম কিছু না করলেই হলো; টিউশানের যেগুলো শ্রমসাধ্য অংশ—পড়া নেওয়া, ভুল করলে শোধরাবার চেষ্টা করা, কিছুতেই ভুল না শোধরালে শেষে পাখাপেটা করা এবং মাস ফুরোলে প্রাণপণে বেতন বাগানো, এখন থেকেই এগুলো বাদ দিতে সতর্ক থাকলাম। হ্যাঁ, সাবধানই থাকব, রীতিমতোই, যাতে কান মলবার কষ্টস্বীকারটুকুও না করতে হয়, বরঞ্চ প্রশ্রয়ই দেব পটলকে—যদি পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে থাকে, কিম্বা কাঠফাটা রোদ চেগে উঠলেই ওর যদি ডাণ্ডাগুলি-খেলার প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে, ভেগে পড়তে চায়, আমার উৎসাহই থাকবে ওর তরফে। ভ্রাতৃপ্রীতি আমার যতই থাক, প্রাণের চেয়ে পটল কিছু আমার আপনার নয়, তা মামাতো পটলই কি, আর মাসতুতো পটলই কি!

মামাতো ভাইদের সঙ্গে মুলাকাত হতে দেরি হলো না। তিনটে ডানপিটে বাচ্চা—মামা-পিছু একটি করে—গুনে দেখলাম। এর মধ্যে কোনটি পটল, বাজিয়ে দেখতে হয়। আলাপ শুরু করা গেল—"তোমার নাম কি খোকা?"

"রাম ঠনাঠন্।"

"অ্যাঁ! সে আবার কি?" পরিচয়ের সূত্রপাতেই পিলে চমকে যায় আমার।

দ্বিতীয় জনের অযাচিত জবাব আসে—'হমার নাম ভট্রি দাস হো।"

আমার তো দম আটকাবার জোগাড়!—বাঙালির ছেলের এ সব আবার কী নাম! এমন বিদ্‌ঘুটে—এরকম বদনাম কেন বাঙালির?

বড়োমামা পরিষ্কার করে দেন—"যে দেশে থাকতে হবে, সেই দেশের দস্তুর মানতে হবে না? তা নইলে বড়ো হয়ে এরা এখানকার দশজনের সাথে মিলে মিশে খাবে কীসে, মানিয়ে চলবেই বা কি করে?"

মেজমামা বলেন—"এ সব বাবা, ডাল্‌টনী নাম। যে দেশের যা দস্তুর।"

ছোটোমামা বলেন—"এখানকার সবাই বাঙালিকে বড়ো ভয় করে। আমরা ব্যবসা করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে আসিনি তো! তাই এদের পক্ষে ভয়ঙ্কর বাঙালি নাম সব বাদ দিয়ে এদেশি সাদাসিধে নাম রাখা।"

তৃতীয়টিকে প্রশ্ন করতে আমার ভয় করে—"তুমিই তবে পটল?"

ছেলেটির দিক থেকে একটা ঝটকা আসে—"অহঃ! হমার নাম গিধৌড় বা!"

হার্টফেলের একটা বিষম ধাক্কা ভয়ানকভাবে কেটে যায়। পকেট থেকে বের করে চট করে এক দাগ ডিজিটালিস খেয়ে নিই—"পটল তবে কার নাম?"

তিনজনেই ঘাড় নাড়ে—"জানহি না তো।"

"তুমহারা নাম কেয়া জি?" জিজ্ঞেস করে ওদের একজন।

"আমার নাম? আমার নাম?" আমতা আমতা করে কই, "আমার নাম শিব্রাম্ ঠনাঠন্!"

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। ডালটনগঞ্জের ড়ালভাঙা কায়দায় আমার নামটার একটা হিন্দি সংস্করণ বার করতে হয়।

ভটরি দাস এগিয়ে এসে আমার হাতের শিশিটি হস্তগত করে—"সিরপ্ হ্যায় কেয়া?"

তিনটি বোতল ওদের তিনজনের হাতে দিই—মেজমামা একটি লেবেলের উপর দৃকপাত করে বলেন, "সিরপ নেহি। ডিজটলিস হ্যায়। খাও মৎ—তাক্কা উপর ধর দেও।"

ভটরি দাস রাম ঠনাঠনকে বুঝিয়ে দেয়—"সমঝা কুছ? ইসসে হি ডিজ্ লনঠন বনতি। এহি দবাই সে।"

বড়োমামা বলেন, "শিবু, সেই কাল বিকেলে গাড়ীতে উঠেছ, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়? কিছু খেয়ে টেয়ে নাও আগে।"

ত্র্যম্বক ওঝার ডাক পড়ল। ছোটোমামা আমার বিস্মিত দৃষ্টির জবাব দেন—'তোমার দাদমশায়ের সঙ্গে মামিরা সব তীর্থে গেছেন কিনা, তাই দিনকত'র জন্য এই মহারাজকে কাজ চালানো মতন রাখা হয়েছে।"

তেইশটা চাপাটি আর কুছ তরকারি নিয়ে মহারাজের আবির্ভাব হয়। তিনটি চাপাটি বা চপেটাঘাত সহ্য করতেই প্রাণ যায় যায়, তারপর কিছুতেই আর টানতে পারি না। মামারা হাসতে থাকেন। অগত্যা লজ্জায় পড়ে আর আড়াইটা কোনো রকমে গলাধঃকরণ করি। টেনে টুনে পাঠাই গলার তলায় ঠেলে ঠুলে।

মামা ভয়ানক হাসেন—"তোমার যে দেখি পাখির খোরাক হে!"

আমি বলি, "খেতে পারতাম। কিন্তু পরিশ্রম করা আমার ডাক্তারের নিষেধ কিনা।"

আঁচিয়ে এসে লক্ষ করি, আমার ভুক্তাবশেষ সেই সাড়ে সতেরটা চাপাটি ক্রম রাম ঠনাঠন্ টু গিধৌড় চক্ষের পলকে নিঃশেষ করে এনেছে। এই দৃশ্য দেখাও কম শ্রমসাধ্য নয়, তৎক্ষণাৎ আর এক দাগ ড়িজিটালিস খেতে হয়।

বড়োমামা বলেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। নতুন দেশে এসেছ জায়গাটা দেখবে না?" আমাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেই বেরুতে হয়। ডাক্তারের মতে বিশ্রাম দরকার—একেবারে কমপ্লিট রেস্ট; কিন্তু মামারা রেস্ট কাকে বলে, জানেন না, আলস্য ওঁদের দুচক্ষের বিষ—নিজেরা অলস তো থাকবেই না, অন্য-কাউকে থাকতেও দেবেন না।

সারা ডালটনগঞ্জটা ঘুরলাম, অনেক দ্রষ্টব্য জায়গা দেখা গেল, যা দেখবার কোনো প্রয়োজনই আমার ছিল না কোনোদিন। পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টায় পাক্কা এগারো মাইল ঘোরা হলো। প্রতি-পদক্ষেপেই মনে হয়, এই বুঝি হার্টফেল করল! কিন্তু কোনোরকমে আত্মসংবরণ করে ফেলি, কি করে যে করি, আমি নিজেই বুঝতে পারি না।

বাড়ি ফিরে এবার বিয়াল্লিশটা চাপাটির সম্মুখীন হতে হয়। পাখির খোরাক বলে আমাকেই সব থেকে কম দেওয়া হয়েছে। পরে খাব জানিয়ে এক ফাঁকে ওগুলো ছাদে ফেলে দিয়ে আসি, একটু পরে গিয়ে দেখি, তার চিহ্নমাত্রও নেই, পাখির খোরাক তাহলে সত্যিই!

খাবার পর শোবার আয়োজন করছি, বড়োমামা বলেন, "আমাদের ক্ষেত-খামার দেখবে চল।'

ছোটোমামা বলেন, "দিবানিদ্রা খারাপ। ভারী খারাপ! ওতে শরীর ভেঙে পড়ে।"

আমি বলি, "আজ আর না, কাল দেখব।"

"তবে চল, দেহাতে গিয়ে আখের রস খাওয়া যাক, আখের ক্ষেত দেখেছ কখনও?"

আখের রসের লালসা ছিল, জিজ্ঞাসা করলুম, "খুব বেশি দূরে নয় তো?"

"আরে, দূর কীসের? কাছেই তো—দু কদম মোটে।"

ক দমে কদম হয় জানি নে, পাক্কা চোদ্দো মাইল হাঁটা হলো, চোখে কদম ফুল দেখছি! তবু শুনি—"এই কাছেই। এসে পড়লাম বলে।"

প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছি, মামার পাল্লায় পড়লে প্রাণ প্রায়ই থাকে না, রামায়ণ-মহাভারতে তার প্রমাণ আছে।

আরো দু মাইল পরে দেহাত। আখের রস খেয়ে দেহ কাত করলাম। আমার অবস্থা দেখে মামাদের করুণা হলো বোধ হয়, দেহাতি রাস্তা ধরে এক্কা যাচ্ছিল একটা, সেটাকে ভাড়া করে ফেললেন।

এক্কায় কখনও চড়িনি; কিন্তু চাপবার পর মনে হলো, এর চেয়ে হেঁটে ফেরাই ছিল ভালো। এক্কার এমনি দাপট যে, প্রতি মুহূর্তেই আমি আকাশে উদ্ধৃত হতে লাগলাম। এ যাত্রায় এতক্ষণ টিকে থাকলেও এ-ধাক্কায় এবার গেলাম নির্ঘাত, সজ্ঞানে এক্কা-প্রাপ্তির আর দেরি নেই—টের পেলাম বেশ।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল—এক্কায় যতক্ষণ এসেছি, তার দুই-তৃতীয়াংশ সময় আকাশে আকাশেই ছিলাম, একথা বলতে পারি; কিন্তু সেই আকাশের ধাক্কাতেই সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। হাড়পাঁজরা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে বোধ হতে লাগল। তেত্রিশটা চাপাটির মধ্যে সওয়া তিনখানা আত্মসাৎ করে শুয়ে পড়লাম। কোথায় রামলীলা হচ্ছিল, মামারা দেখতে গেলেন। আমায় সঙ্গে যেতে সাধলেন, বার বার অভয় দিলেন যে, এক কদমের বেশি হবে না; আমি কিন্তু ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকলাম। ডালটনি ভাষায় এক কদম মানে যে একুশ মাইল, তা আমি ভালো রকমই বুঝেছি।

আলাদা বিছানা ছিল না, একটিমাত্র বড়ো বিছানা পাতা, তাতেই ছেলেদের সঙ্গে শুতে হলো। খানিকক্ষণেই বুঝতে পারলাম যে, হ্যাঁ, সৌরজগতেই বাস করছি বটে—আমার আশেপাশে তিনটি ছেলে যেন তিনটি গ্রহ! তাদের কক্ষ পরিবর্তনের কামাই নেই! এই যেখানে একজনের মাথা দেখি, একটু পরেই দেখি, সেখানে তার পা; খানিক বাদে মাথা বা পা'র কোনোটাই দেখতে পাই না—তারপরেই অকস্মাৎ তার কোনো একটার সঙ্গে আমার দারুণ সংঘর্ষ লাগে। চটকা ভেঙে যায়, আহত স্থানের শুশ্রূষা করতে থাকি; কিন্তু ওদের কারুর নিদ্রার বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় ঘটে না। ঘুমের ঘোরে যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ওরা—আমিও যদি ওদের সঙ্গে ঘুরতে পারতাম, তা হলে

বোধহয় তাল বজায় থাকত, ঠোকাঠুকি বাধার সম্ভাবনাও কমত কিছু; কিন্তু মুশকিল এই, ঘুরতে গেলে আমার ঘুমোনো হয় না, আর ঘুমিয়ে পড়লে ঘোরার কথা একদম ভুলে যাই।

ছেলেগুলোর দেখছি পা দিয়েও বক্সিং করার বেশ অভ্যেস আছে এবং সব সময়ে 'নট্-টু-হিট বিলো-দি-বেল্ট'-এর নিয়ম মেনে চলে বলেও মনে হয় না। নাক এবং দাঁত খুব সতর্কভাবে রক্ষা করছি—ওদের ধাক্কায় কখন যে দেহচ্যুত হয়, কেবলি এই ভয়। ঘুমানোর দফা তো রফা।

ভাবছি, আর 'চৌকিদারি'তে কাজ নেই, মাটিতে নেমে সটান 'জমিদার' হয়ে পড়ি। প্রাণ হাতে নিয়ে এমন করে ঘুমোনো যায় না। পোষায় না আমার। এদিকে দুটো তো বাজে। নীচে নেমে শোবার উদ্যোগে আছি, এমন সময়ে নেপথ্যে মামাদের শোরগোল শোনা গেল—রামলীলা দেখে আড়াইটা বাজিয়ে ফিরছেন এখন। অগত্যা মাটি থেকে পুনরায় প্রমোশন নিতে হলো বিছানায়।

মামারা আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন, অর্থাৎ তাঁদের ধারণা যে, জাগালেন। তারপর ঝাড়া দুঘণ্টা রামলীলার গল্প চলল। হনুমানের লম্ফঝম্ফ তিন মামাকেই ভারি খুশি করেছে—সে সমস্তই আমাকে শুনতে হলো। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল, কেবল হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক মামা প্রশ্ন করে বসলেন—"হনুমানের বাবা কে জানো তো শিব্রাম?"



ঘুমের ঝোঁকে ইতিহাসটা ঠিক মনে আসছিল না, হনুমান প্লুরাল হলে মামাদের নাম করে দিতাম, কিন্তু সিঙ্গুলার অবস্থায় কার নাম করি। সঙ্কোচের সহিত বললাম, "জাম্বুবান নয়তো?"

বড়োমামা বললেন, "পাগলা!"

মেজমামা বললেন, "যা আমরা নিশ্বাস টানছি, তাই।"

"ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি!"—হঠাৎ আমার বুদ্ধি খুলে যায়, বলে ফেলি চট করে, "ও! যত সব রোগের জীবাণু!"

বড়োমামা আবার বলেন, "পাগলা!"

"উহুঁ-হুঁ!"— মেজমামাও আমায় দমিয়ে দেন, বলেন, "না ও সব নয়। জীবাণু টীবাণু না।"

"জীবাণু টীবাণুও না। তা হলে কি তবে? আমার তো ধারণা ছিল, ওই সব প্রাণীরাই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে যাতায়াত করে।" —আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলি।

ছোটোমামা বলেন, "পবনদেব।"

সাক্ষাৎ পবনদেবকে নিশ্বাসে টানছি এই কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়েছি, কিংবা হয়তো ঘুমুইনি। বড়োমামা আমাকে টেনে তুললেন—"ওঠো, ওঠো; চারটে বেজে গেছে, ভোর হয়ে এল। মুখ-হাত ধুয়ে নাও, চলো বেরিয়ে পড়ি। আমরা সকলেই প্রাতঃভ্রমণ করি রোজ। তুমিও বেড়াবে আমাদের সঙ্গে।"

মেজমামা বললেন, "বিশেষ করে চেঞ্জে এসেছ যখন। হাওয়া বদলাতেই এসেছ তো?"

ছোটোমামাও সায় দেন—"ডালটনগঞ্জের হাওয়াই হলো আসল! হাওয়া খেতে এসে হাওয়াই যদি না খেলে, তবে আর খেলে কি?"

চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে মামাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সাড়ে সাত মাইল হাঁটবার পর বড়োমামা দুধারে যতদূর যায়, বাহু বিস্তার করলেন—"এই সব—সবই আমাদের জমি।"

যতদূর চোখ যায়, জমি! কেবল জমিই চোখে পড়ে। মেজমামা বলেন, "এবারে যা আলু ফলেছিল, তা যদি দেখতে! পটলও খুব হবে এবার।"

ছোটোমামা ঘাড় নাড়েন—"আমরা সব নিজেরাই করি তো! জন-মজুরের সাহায্য নিই না। স্বাবলম্বনের মতো আর কী আছে? গতবারে আমরা তিন ভায়ে তুলে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না, প্রায় আড়াই লক্ষ পটল এঁচোড়েই পেকে গেল। বিলকুল বরবাদ। পাকা পটল তো চালান যায় না, কে কিনবে?"

বড়োমা । দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—"তবুও তো প্রত্যেকে দশলাখ করে তুলেছিলাম।"

মেজমামা আশ্বাস দেন—"যাক, এবার আর নষ্ট যাবার ভয় নেই, ভাগ্নেটা এসে পড়েছে, বাড়তির ভাগটা ওই তুলতে পারবে।"

ছোটোমামা বলেন, "কিন্তু এবার পটল ফলেছেও দেড়া।"

"তা ও পারবে। জোয়ান ছেলে—উঠে-পড়ে লাগলে ও আমাদের ডবল তুলতে পারে। পারবে না?" বড়োমামা আমার পিঠ চাপড়ান।

পৃষ্ঠপোষকতার ধাক্কা সামলে ক্ষীণস্বরে বলি, "পটলের সিজনটা কবে?"

"আর কি, দিন-সাতেক পরেই পটল-তোলার পালা শুরু হবে" ছোটমামার কাছে ভরসা পাই।

চোদ্দো মাইল হেঁটে টলতে টলতে বাড়ি ফিরি। ফিরেই ডিজিটালিসের অন্বেষণে গিয়ে দেখি, তিন বোতলই ফাঁক। গিধৌড়কে জিজ্ঞাসা করি—"ক্যা হুয়া?

গিধৌড় জবাব দেয়—"উ দোনো খা ডালা।"

ভট্‌রি দাস প্রতিবাদ করে—"নেহি জি। উ ভি খায়া! আপ্‌কো ডিজ্ টালিস উ ভি খাইস্।"

কেবল খাইস্ নয়, আমাকেও খেয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি, এই দারুণ প্ররিশ্রমের পর এখন কি করে হার্টফেলের হাত থেকে বাঁচি? আত্মরক্ষা করি আপনার?

গজেন ডাক্তারকে চিঠি লিখতে বসলাম—কাল এসে অবধি আদ্যোপান্ত সব ইতিহাস সবিশেষ দিয়ে অবশেষে জানাই—

"ডিজিটালিস নেই, ভালোই হয়েছে, আমার আর বাঁচবার সাধও নেই। বাঁচতে গেলে আমায় পটল তুলতে হবে। পটল তুলতে পারলে আমি বাঁচলাম। এক-আধটা নয়, সাড়ে তিনলাখ পটল—তার বেশিও হতে পারে। তুলতে হবে আমাকে। পত্রপাঠ এমন একটা ওষুধ চট করে পাঠাবেন, যাতে এই পটল-তোলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হার্টফেল করে। এ পর্যন্ত যা দারুণ খাটুনি গেছে, তাতেও যখন এই ডায়ালেটেড হার্ট আমার ফেল করেনি, তখন ওর ভরসা আমি ছেড়েই দিয়েছি। ওর ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। সাড়ে তিনলাখ পটল তোলা আমার সাধ্য নয়, তার চেয়ে আমি একবার একটিমাত্র পটল তুলতে চাই—পটলের সিজন আসার ঢের আগেই। যখন মরবারও আশা নেই, বাঁচবারও ভরসা নাস্তি—তখন এ জীবন রাখে লাভ? ইতি মরণাপন্ন (কিংবা জীবনাপন্ন) বিনীত—ইত্যাদি।"

এক সপ্তাহ গেল, দু সপ্তাহ কেটে গেল, তবু ডাক্তারের কোনো জবাব নেই, ওষুধ পাঠাবারও নাম নেই। কাল সকাল থেকে পটল-পর্ব শুরু হবে ভেবে এখন থেকেই আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হয়েছে। এঁচে রেখেছি মামারা রাত্রে রামলীলা দেখতে গেলেই সেই সুযোগে কলকাতার গাড়িতে সটকান দেব।

কলকাতায় ফিরেই গজেন ডাক্তারের কাছে ছুটি। গিয়ে দেখি কম্পাউন্ডার দুজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে, রোগীপত্তর কিচ্ছু নেই। জিজ্ঞাসা করলাম—"গজেনবাবু আসেননি আজ? কোথায় তিনি?"

দু-তিনবার প্রশ্নের পর অঙ্গুলিনির্দেশে জবাব পাই।

"ও! এই বাড়ির তেতলায় গেছেন! রোগী দেখতে বুঝি?"

উত্তর আসে—"না রোগী দেখতে নয়, আরো উপরে।"

"আরো উপরে? আরো উপরে কি রকম? বাড়ির ছাদে নাকি?"—আমি অবাক হয়ে যাই। "ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন বুঝি?"

"আজ্ঞে না, তারও উপরে।"

"ছাদেরও উপরে? তবে কি এরোপ্লেনের সাহায্যে তিনি আকাশেই উড়ছেন এখন?" ডাক্তার মানুষের এ আবার কি ব্যারাম! বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠি; এমন সময়ে ছোটো কম্পাউন্ডারটি গুরুগম্ভীরভাবে, অথচ সংক্ষেপে জানান—"তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! সে কি রকম!!"—দশদিনের মধ্যে তৃতীয়বার আমার পিলে চমকায়। হার্টফেল ফেল হয়।

বুড়ো কম্পাউন্ডারটি বলেন—"কি আর বলব মশায়! এক চিঠি—এক সর্বনেশে চিঠি—ডালটনগঞ্জ থেকে—অশ্বিনীর না ভরণীর—কার এলো যেন—তাই পড়তে পড়তে ডাক্তারবাবুর চোখ উল্টে গেল। বার তিনেক শুধু বললেন, 'কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!!' ...তার পরে আর কিচ্ছুই বললেন না। তাঁর হার্টফেল হলো।

নিজের পাড়ায় যতটা অপরিচিত থাকা যায়! এইজন্যেই গজেন ডাক্তারের কাছে আমি অশ্বিনীরূপ ধারণ করেছিলাম। আজ সেই ছদ্মনামের মুখোশ আর খুললাম না, নিজের কোনো পরিচয় না দিয়েই বাড়ি ফিরলাম। একবার ভাবলাম, বলি যে সেই সঙ্কট-মুহূর্তে ডাক্তারবাবুকে এক ডোজ ডিজিটালিস দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন আর বলে কি লাভ!

স্বাবলম্বনের অনেক সুবিধা

টুনুর পিসেমশাই বেজায় কড়া-মেজাজের লোক। স্বাবলম্বী মানুষ। স্বাবলম্বনের সম্বন্ধে রচনা লিখে, ওর কি কি সুবিধা আছে—জানিয়ে দিয়ে ছোটোবেলায় ইস্কুল থেকে তিনি এক রুপোর মেডেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি স্বাবলম্বনের ভারী পক্ষপাতী।

টুনুকে সেই কথাই তিনি বোঝাতে চান।—"মেডেলটা কি আমাকে অমনি অমনি দিয়েছিল? খুব ভালো লিখেছিলাম বলেই কি? মোটেই না। স্রেফ স্বাবলম্বনের জন্যেই ওটা পেয়ে গেলাম তো।

বড়ো বড়ো দুটো চোখ আরো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে টুনু।

"আর সব ছেলেরা মাথা ঘামিয়ে লিখতে লেগে গেল। আমি করলুম কি, জানিস? কেবলমাত্র নিজেকে অবলম্বন করলুম। যার নামই কিনা স্বাবলম্বন। পুরোনো যত মাসিকপত্রের পাতা ঘেঁটে এখান থেকে, ওখান থেকে নিয়ে দিব্যি এক এস্‌এ দাঁড় করিয়ে দিলুম। পড়ে হেডমাস্টারমশাই তো থ। তাঁর সে কী তারিফ! আমাকে কিন্তু একফোঁটাও মাথা ঘামাতে হয়নি। সেরেফ স্বাবলম্বন করেছি।"

টুনুকে দেখান তিনি মেডেলটা—"তুই চাস এমনি একটা মেডেল?"

চোখ আর বড়ো করা যায় না, অতএব হাঁ-কেই টুনু বিস্তারিত করে। সে ঘাড় নাড়ে। এ রকম একটা মেডেল হলে পিনের সঙ্গে জামায় গেঁথে ওকে মানায় ভালো।

"তুই কি করে পাবি মেডেল! স্বাবলম্বনের তুই কিছু জানিস্?"

"বানান করতে পারিস। স-য়ে ব-ফলা আকার—"

"আরে, বানান নয়!" ওর পিসেমশাই বাধা দ্যান, "স্বাবলম্বন কি শুধু বানান করা? স্বাবলম্বন হচ্ছে কিছু বানানো—নিজের চেষ্টায়; নিজের মাথা নিজের বুদ্ধি—এই সব খাটিয়ে কাজ হাঁসিল করার নামই হলো গিয়ে স্বাবলম্বন।"

এ কথার পরে, বানানটা শেষ করার আর কোনো প্রয়োজন আছে কি না, টুনু মনে মনে ভাবে।

টুনুর মৌনতায় ওর পিসেমশাই মর্মাহত হন—"নাঃ, তুই কিচ্ছু জানিস না। একেবারেই কিচ্ছু না।" ওর মূর্খতার পরিচয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি।

"কি করে যে তুই মানুষ হবি!" পুনশ্চ তাঁর অনুযোগ। "নাঃ, মেডেল টেডেল কিচ্ছুই নেই তোর বরাতে।"

"আচ্ছা পিসেমশাই, আমি যদি পুরোনো খবরের কাগজ জোগাড় করতে পারি—" টুনুর উৎসাহ আর ঔৎসুক্য আতিশয্যে এসে মিশ খায়—"তাহলে দেবে তুমি আমায় ওই মেডেলটা ?"

"খবরের কাগজ নিয়ে কি করব আমি ?"

"আমিও একটা স্বাবলম্বনের এস্‌এ বানিয়ে দেব তোমাকে। কেবল একটা কাঁচি আর কিছু আঠা তো ? এ-কাগজ থেকে খানিক কেটে, ও-কাগজ থেকে খানিক ছেঁটে, আঠা দিয়ে এঁটে আমিও ভালো এস্‌এ বানাতে পারি।"

"সে এস্‌এ-র কি কোনো মানে হবে ?" ভারী অবাক হয়ে যান পিসেমশাই।

"তা কি জানি!" তারপর একটু সে ভেবে নেয়—"মানে না হোক, এসএ কিন্তু হবে ঠিকই পিসেমশাই! মেডেল পাবার মতোই এস্‌এ হবে।"

টুনু জোর দিয়েই বলে। কিন্তু ওর পিসেমশায়ের বিশ্বাস হয় না। তিনি মুখ ব্যাঁকান—"এস্‌এ হবে না, ছাই হবে।"

টুনু নিশ্বাস ফেলে বলে—"তাহলে ঘুড়িই বানাবো না হয়। ঘুড়িও বানানো যায় এস্‌এ জুড়ে।"

এবার পিসেমশায়ের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। "ঘুড়ি আর ঘুড়ি! ঘুড়ি উড়িয়ে কি কেউ বড়োলোক হয়েছে ?" দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বিতীয় কিস্তি। "নাঃ মানুষ তোকে করতেই হবে আমায়। মা নেই তোর, বাপ আমার হাতে সঁপে দিয়ে চাকরি করতে চলে গেছে কলকাতায়—আমি যদি তোকে মানুষ করতে না পারি. তাহলে সে-ই বা এসে বলবে কি ? আমিই বা কি জবাব দেব তার কাছে ?" এবারকার নিশ্বাস সুদীর্ঘতর।

"নাঃ, আজই তোর স্বাবলম্বনের হাতেখড়ি হোক। ওই চুনের বালতি দেখেছিস—ওই কোণটায় ?"

টুনু ঘাড় নাড়ে।

"আর ওই লম্বা পোঁচড়াটা ?"

"ওই তো—ওর পাশেই তো।" টুনু বলে।

"ভাবছিলুম মজুর লাগাব; কিন্তু মজুর খাটালে আর স্বাবলম্বন কি হলো ? মজুর নয়, তোকে দিয়েই করাতে হবে। কি করে চুনকাম করতে হয়, দেখেছিস তো ?"

টুনু অস্বীকার করতে পারে না।

"তাহলে ওই চুনের বালতি আর পোঁচড়াটা নিয়ে যা। বাইরের পাঁচিলটা চুনকাম করগে। সমস্তটাই! খুব বেশি উঁচু তো নয়, তোর নাগালের মধ্যেই পাঁচিলটা। কোনো অসুবিধা হবে না তোর। এখন তো সবে সওয়া সাত; সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অগাধ সময় পড়ে আছে, এর মধ্যে সেরে ফেলতে পারবি। পারবি নে ?"

টুনু ইতস্তত করে—"তাহলে ওই মেডেলটা আমায় দেবে তো তুমি ?"

"দেব বই কি! আলবত্ত দেব। স্বাবলম্বন করতে পারলে দেব না আবার। এ তো স্বাবলম্বনেরই মেডেল রে।"

বালতি আর পোঁচড়া নিয়ে টুনু প্রায় লাফাতে লাফাতে বাহির হয়।

বাইরে এসে পাঁচিলের দৈর্ঘ্য আয় প্রস্থ পর্যবেক্ষণ করে ওর উৎসাহের আগুন দপ করে নিবে যায় মুহূর্তেই। লম্বায়-চওড়ায় এত বড়ো পাঁচিলটা—স্বাবলম্বন করতে হবে ওকে! তাহলে হয়েছে। মেডেল পাবার উচ্চাশাও উবে যায় ওর।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও পোঁচড়াটা ডুবায় বালতিতে। তারপর লম্বা করে এক টান মারে পাঁচিলের মাথায়। আবার ডোবায়, আবার টানে। আবার ওর দীর্ঘনিশ্বাস।

কিছুক্ষণ পুনরাবৃত্তির পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ে টুনু। পাঁচিলের চুনকাম করা নামমাত্র অংশের সঙ্গে চুনকাম-না-করা বিরাট মহাপ্রদেশের পরিমাণ সে তুলনা করে। হতাশ হয়ে সে বসে পড়ে একটা উঁচু ঢিবির উপর।

গাছে গাছে পাখি ডাকছে। ফুরফুরে হাওয়া। দূরের মাঠ কেমন সবুজ। এমন দিনে ঘুড়ি ওড়াবার কিরকম মজা। ঘাড় পেতে এতখানি স্বাবলম্বনের দায় না নিলেই সে ভালো করত আজ। ভারী মন খারাপ হয়ে যায় ওর।

কিন্তু এখন আর উপায় কি? যে-করেই হোক সারা পাঁচিলটা চুনকাম করে তবেই ওর নিস্তার। পিসেমশায়ের যা কড়া মেজাজ! এমনি ভালো তো ভালো, কিন্তু রাগলেই অস্থির! টুনু আবার গিয়ে তার পোঁচড়ায় লাগে।

ওর কান্না পেতে থাকে। কতরকম খেলাধুলার আইডিয়াই না মাথায় ছিল, সব মাটি আজ। এখুনি তো পাড়ার ছেলেরা খেলতে বেরুবে, এই পথ দিয়েই যাবে সব।



একেবারে মুক্ত, স্বাধীন। কোনো রকম স্বাবলম্বনের ধারই ধারে না তারা। টুনুকে কিন্তু তখনো পোঁচড়ায় লেগে থাকতে হবে।

এমন সময়ে অদূরে বেণুর টিকি দেখা যায়। লাফাতে লাফাতে সে আসছে। এই দিকেই আসছে। একমনে চুনকাম করে চলে টুনু।

পেয়ারা চিবোতে চিবোতে আসছে বেণু—আর ক্ষণে ক্ষণে ছাড়ছে লম্বা খনখনে আওয়াজ। সেই সঙ্গে ভোঁস ভোঁস শব্দের একটা আমেজ লেগেই রয়েছে। এর মানে আর কিছু না, বেণু আমাদের রেলগাড়ি সেজেছে। হুইশল দিতে দিতে আসছে সে।

যতই সে এগিয়ে আসে ততই তার গতিবেগ মন্দ হতে থাকে, খটাখট, খট খট, খটাখট খট খট—চূড়ান্ত ভোঁস করে অবশেষে একেবারেই থেমে যায় এসে। টুনু স্টেশনে থামে।

"কুলি! কুলি!" "মাল উতারো!" "এই—পানিপাঁড়ে! পানিপাঁড়ে!" "দাঁড়িয়ে যাবো, একটু জায়গা দেবেন মশাই?" "সিগ্‌ন্যাল ডাউন, সিগন্যাল!" "এই, ঘনটি লাগাও—ঘনটি!" "ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং ঢং!" "গাড়ি ছোড় দিয়া—" "ভোঁ-ও-ওস—ভোঁ-ওস-ভোঁস—" "খটাখট খট খট—খটাখট খট খট—" "ভাঁপ ভাঁপ ভাঁপ ভাপ..."

বেণুর শোরগোল থামে না। একাধারে সে এখন প্রকাণ্ড এক রেলগাড়ি—এঞ্জিন থেকে গার্ডস ভ্যান পর্যন্ত। মায় প্যাসেঞ্জার, পানিপাঁড়ে, কুলি স্টেশনমাস্টার, স্টেশন—একাই সব সে। এমন কি, ওই ঘণ্টাটাও।

টুনু চুনকাম করেই চলে। রেলগাড়ির দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না।

স্টেশন ছাড়িয়ে একটু গিয়েই চেন টেনে গাড়িকে থামতে হয় হঠাৎ। "এই, ও তোর কি হচ্ছে রে টুনু?"

জবাব নেই। শিল্পী যেমন করে তুলি বুলোয়, তেমনি একান্ত মনঃসংযোগে টুনুর পোঁচড়া চলে। আলগোছা একটা টান টেনে ঘুরে ফিরে, হেলে দুলে, এঁকে বেঁকে সেটাকে ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখে টুনু।

বাধ্য হয়ে ট্রেনকে পিছিয়ে আসতে হয় স্টেশনে।

একেবারে টুনুর প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষেই দাঁড়ায় এসে। পেয়ারা দেখে জল আসে টুনুর জিভে, কিন্তু স্বাবলম্বনেই একনিষ্ঠ হয়ে থাকে সে।

"বুঝেছি। তোর পিসে বুঝি কাজে লাগিয়ে দিয়েছে?"

"কে? বেণু?" হঠাৎ টুনু ঘুরে দাঁড়ায়, "দেখতে পাইনি ভাই!"

"ভারী কাজের লোক হয়েছিস তুই!"

"কাজ না আরো কিছু!" টুনু বলে, "আমি তো খেলা করছি।"

"খেলা?" আগাগোড়া গোটা রেলগাড়ি অবাক হয়ে যায়, মায় এঞ্জিন পর্যন্ত। একজন প্যাসেঞ্জারও বাদ থাকে না। "এ আবার কি রকম খেলা রে?"

"চুনকাম-চুনকাম খেলা। আজ সকালেই মাথা খাটিয়ে বার করেছি আমি।"

"চুনকাম খেলা।" রেলগাড়ির হাঁ আর বুজতে চায় না। পেয়ারা খসে পড়ে মুখের থেকে।

"হ্যাঁ, খেলাই তো! কটা ছেলে এমন খেলা খেলতে পায় শুনি? এ রকম খেলার সুযোগ কজন পেয়েছে তাদের ক্ষুদ্র জীবনে?"

বেণু ভেবে দ্যাখে। পেয়ারা খাওয়া স্থগিত হয়ে যায় ওর। টুনু পোঁচড়া টেনেই চলে—এখানে লাগায় এক পোঁচ, ওখানে আরেক, নিঁখুত শিল্পীর স্টাইলে। দেখে দেখে বেণু আর থাকতে পারে না, ওর উৎসাহ জমে ওঠে।

"আমাকে দিবি ভাই, খেলতে একটু?" সে সাধে, "আমি পোঁচড়া লাগাবো?"

টুনু বিবেচনা করে, প্রায় সম্মতি দিয়ে ফেলে আর কি, কিন্তু মত বদলে যায় ওর। "না—না। তা কি করে হয়? আদ্ধেকটা পাঁচিলই যদি লাগাতে না পারলুম, তাহলে আর কি খেলা হলো? কতটাই বা হয়েছে আমার? তুমিই বলো!"

"দিবিনে? এটা কি ভালো হচ্ছে তোর? আচ্ছা—দশ পোঁচ—মোটে দশটা—? পাঁচটা? দুটো? আচ্ছা, এক পোঁচ কেবল? আমি হলে নিশ্চয় দিতুম তোকে।" বেণু হাত বাড়িয়ে দ্যায়, "এই পেয়ারার আধখানা তোকে দেব। আচ্ছা আধখানা পোঁচ?"

এত কাকুতি-মিনতিতে টুনুর মন টলে; কিন্তু তবু সে আপত্তি করতে থাকে—"না, ভাই! সে কি করে হয়—এখনো খেলা শেষ হয়নি আমার—"

"আচ্ছা একটা গোটা পেয়ারাই দিচ্ছি তোকে?" হাফপ্যান্টের পকেটে সে হাত পুরে দ্যায়—"আচ্ছা, দুটোই নে তুই! এই দুটোই!"

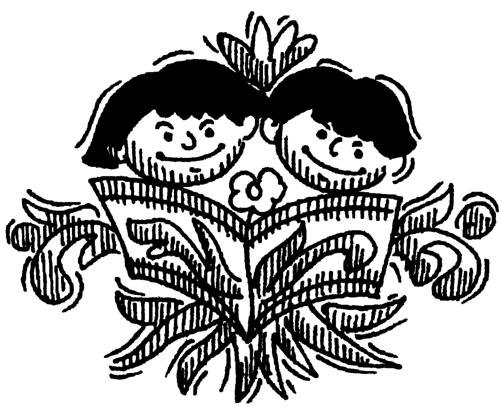
পেয়ারা নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় পোঁচড়াটা ছেড়ে দ্যায় টুনু। উঁচু ঢিবিতে গিয়ে বসে গাছের ছায়ায়। ডাউন দিল্লি-এক্সপ্রেস দারুণ রোদে চুনকাম করতে করতে যখন ঘেমে নেয়ে উঠেছে, তখন সে ঠাণ্ডায় বসে আরাম করে পেয়ারায় কামড় দিচ্ছে এবং কি করে আরো সব ছেলেদের বধ করা যায়, মতলব ভাঁজছে তার।

ক্রমশ একটা-দুটো করে আরো সব ছেলে আসতেই থাকে—ওই পথেই। ঠাট্টা করতেই তারা আসে, কিন্তু অবশেষে চুনকাম করতেই থেকে যায়। বেণু কাহিল হয়ে পড়তে না পড়তে বেতসের সঙ্গে পরের ক্ষেপটা বন্দোবস্ত করে ফ্যালে টুনু—আগাগোড়া তালি-মারা এক ঘুড়ির বদলে। বেতসের খেলা শেষ হতে না হতে কনক। চারটে মার্বেল দিতে হয় তাকে। কনক নক্ আউট হবার আগেই—ঢের আগেই সমীর এসে হাজির। একটা নেংটি ইঁদুরকে সলেজ দড়িতে বেঁধে নিয়ে এসেছে সে। ওইটেই ওর খেলবার মাশুল।

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে আসে। সমস্ত পাঁচিল জুড়ে ছেলেদের খেলা তখন শেষ হয়েছে। একফোঁটা জায়গাও বাকি নেই চুন লাগাবার; কিন্তু তখনো কুড়িজন ছেলে দাঁড়িয়ে—বেশ ক্ষুণ্নমনেই দাঁড়িয়ে। তাদের ক্ষেপ আর এল না। এক ইঞ্চিও ফাঁক রাখেনি কেউ এমনি সব হিংসুটে পাড়ার ছেলেরা। প্রায় ক্ষেপে যেতে হয় এরকম দেখলে।

টুনু এখন রীতিমত ধনী! সকালে যে-টুনু ছিল, সে টুনু আর এখন নেই! অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে সে গড়াগড়ি দিচ্ছে এখন। আগে যে-সব সম্পদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাদেও এখন তার দখলে আছে—পনেরোটা রঙিন গুলি, একটা ভাঙা ফাউন্টেনপেন (মেরামত হবার ভরসা কম), একটুকরো সবুজ কাচ (তার ভেতর দিয়ে সূয্যি দেখার ভয়ানক সুবিধে), একটা পিতলের পিচকারি, একটা চাবি (যা দিয়ে কোনো তালাই খুলবার নয়), একটুকরো চক, একটা সেফটিপিন, ছেঁড়া মানিব্যাগ একটা, হাতভাঙা চিনেমাটির পুতুল দেড়খানা, কয়েকটা সোডার বোতলের ঢাকনি, একটা একপেয়ে তালপাতার সেপাই, জনৈক একচোখো বেড়াল, তিনটে কমলালেবুর কোয়া (সম্প্রতি একটা ছিবড়েয় পরিণত), একটি হুইশল (বাজে না, একেবারেই বাজে), আর একটা বগলস—কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার মধ্যে কোনো কুকুর নেইকো...!

এছাড়া সেই মেডেলটা তো রয়েছেই। স্বাবলম্বনের সুবিধা অনেক, টুনু ভেবে দ্যাখে।



পাতালে বছর পাঁচেক

তখনই বারণ করেছিলাম গোরাকে সঙ্গে নিতে। ছোটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোনো বড়ো কাজে যাওয়া আমি পছন্দ করিনে।

আর ওই অপয়া বইখানা। প্রেমেন মিত্তিরের 'পাতালে পাঁচ বছর'! যখনই ওটা ওর বগলে দেখেছি, তখনই জানি যে, বেশ গোলে পড়তে হবে।

বেরিয়েছি সমুদ্র-যাত্রায়, পাতাল-যাত্রায় তো নয়! সুতরাং কী দরকার ছিল ও-বই সঙ্গে নেবার? আর যদি নিতেই হয়, তবে আমার 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' কী দোষ করল? যত সব বিদঘুটে কাণ্ড ওই ছেলেটার! মনে মনে আমি চটেই গেলাম।

শেষে কিন্তু ভড়কাতে হলো—জাহাজে উঠেই যখন বইয়ের কারণ ও ব্যক্ত করলে। আমাকে রেলিং-এর একপাশে ডেকে এনে চোখ বড়ো করে চাপাগলায় বললে, "মেজামামাকে বলবেন না কিন্তু। খুব ভালো হয়, যদি জাহাজটা ডুবে যায়!"

আমি বললাম, "কি ভালোটা হয়?"

"সটান পাতালে চলে যাওয়া যায় এবং সেখানে"—এই বলেই গোরা উৎসাহের সহিত বইখানার পাতা ওলটাতে শুরু করে—গোড়ার থেকেই।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, নিতান্তই অকস্মাৎ প্রচণ্ড সাইক্লোন কিংবা বরফের পাহাড়ের ধাক্কা যদি না লাগে, তাহলে সে রকম সুযোগ পাওয়াই যাবে কিনা সন্দেহ। আর সেই দুরাশা পোষণ করেই যদি ওই বই এনে থাকে, তবে তো সে খুবই ভুল করেছে, কারণ আজকালকার নিরাপদ সমুদ্র-যাত্রায় পাতালের ভ্রমণ-কাহিনীকে কাজে লাগানো ভারী কঠিন।

আমার কথায় সে দমে গেল। গুম হয়ে থেকে অবশেষে বললে—"তাহলে কি কোনোই আশা নেই একেবারে?"

"দেখছি না তো!" নিস্পৃহকণ্ঠে আমি জবাব দিই—"তাছাড়া, তুমি ব্যতীত জাহাজের এতগুলি প্রাণীর মধ্যে কারো ভুলে পাতালে যাবার সখ আছে বলেও আমার মনে হয় না।"

"বলেন কি?" গোরা যেন আকাশ থেকে পড়ল;—"তা কখনো হয়? আপনিও কি যেতে চান না পাতালে?"

আমি প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লাম—"পাতল দূরে থাক, হাসপাতালেও না।" মুখ ফাঁক করলাম আমার। —"কেউ কি মরতে যায় ওসব জায়গায়?"

"আপনি মিথ্যে বলছেন।" গোরা অবিশ্বাসের হাসি হাসল, "পাতালে যাবার ইচ্ছা আবার হয় না মানুষের।"

"আমার হয় না। আমাকে জানো না তুমি।" আমি জানালাম, "আমার পাতালে যাবার ইচ্ছা হয় না, মোটর চাপা পড়বার ইচ্ছা হয় না, রেলে কাটা যাবারও ইচ্ছা করে না। আমি যেন কিরকম!"

"আমি সঙ্গে থাকব, ভয় কি আপনার!" ও আমাকেও উৎসাহ দেয়।— "মেজমামাকে দেখে আসি, আপনি ততক্ষণ পড়ুন বইখানা।

বইটা হাতে নিয়ে ভাবলাম এটাকে এখনই, আমাদের আগেই পাতালে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি, সিঙ্গা ফুঁকতে তো যাচ্ছিনে, আকাশ-পাতালের বৃত্তান্ত আমার কি কাজে লাগবে? তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বইটা পড়তে শুরু করি শেষের দিক থেকে। গোড়ার দিক থেকে পড়ব না বলেই শেষের দিকটাই ধরি আগে।

শেষপৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে একশো চৌত্রিশ পাতা পর্যন্ত এগিয়েছি—কিংবা পিছিয়েছি—এমন সময়ে কর্ণবিদারী এক আওয়াজ এল। সেই মুহূর্তেই আমার হাত থেকে খসে পড়ল বইটা এবং আমি খসে পড়লাম চেয়ার থেকে। অত বড়ো জাহাজটা থর থর করে কাঁপতে লাগল মুহুর্মুহু।

উঠব কিংবা অমনি করে পড়েই থাকব, অর্থাৎ উঠবার আদৌ আবশ্যক হবে কিনা, ইত্যাকার চিন্তা করছি, এমন সময় গোরার মেজমামা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

"এই যে, বেঁচে আছো? বেঁচেই আছো তাহলে! হার্টফেল করোনি এখনো?"

"উঁহু।" সংক্ষেপে সারি।

"আমার তো পিলে ফাটার উপক্রম।" জানান গোরার মামা।

"ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এঞ্জিন বার্স্ট করল নাকি।"

"উঁহুঁ, আরেকখানা জাহাজ। জাহাজে-জাহাজে ঠোকাঠুকি।"

"কী সর্বনাশ!"

"মনে হচ্ছে কোনো চোরা জাহাজ। চোরাই মালের জাহাজ টাহাজ হবে বোধহয়। ধাক্কা মেরেই ছুটেছে। ওই দ্যাখো না!"

ওই অবস্থাতেই ঘাড় উঁচু করে তাকালাম, আরেকখানা জাহাজের মতোই দেখতে, সুদূর দিকচক্রবালের দিকে নক্ষত্রবেগে পালাচ্ছে। আমাদের শ্রীমান ততক্ষণে কাঁপুনি থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—স্তম্ভিত হয়ে।

দুধারেই এনতার ফাঁকা, দুশো জাহাজ যাবার মতন চওড়া পথ, তবু যে এরা কি করে মুখোমুখি আসে, মারামারি করে, আমি তো ভেবে পাই না। আমি বিরক্তি প্রকাশ করি।

"উপকূল থেকে আমরা এখন কদ্দূরে?" মেজমামার প্রশ্ন।

"দেড়শো কি দুশো মাইল হবে বোধহয়!" আমি বলি, "ছসাত ঘণ্টা তো চলছে আমাদের জাহাজখানা!"

বলতে বলতে ঢং ঢং করে অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করল এবং শ্রীমদগৌরাঙ্গ দেব লাফাতে লাফাতে আবির্ভূত হলেন। —"মেজমামা, দেখবে এসো, কী মজা। আপনিও আসুন শিব্রামবাবু! জাহাজের খোলে হুস হুস করে জল ঢুকছে। কী চমৎকার!" তার হাততালি আর থামে না।

অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি, কাপ্তেন সেখানে দাঁড়িয়ে। খালাসিরা পাম্পের সাহায্যে জলনিকাশ করছে। চারদিকেই দারুণ ত্রাস আর ত্রস্ততা। যাত্রীরা ভীত-বিবর্ণমুখে খালাসিদের কাজ দেখছে। সমস্ত জনপ্রাণীর মধ্যে আমাদের গোরাই কেবল আনন্দে আত্মহারা। পাতালে যাবার পথ পরিষ্কার হচ্ছে কিনা ওর। কাজেই ওর ফূর্তি।

"কেন অনর্থক পাম্প করে মরছে?" আমাকেই প্রশ্ন করে গোরা। "জাহাজটা ডুবে গেলেই তো ভালো হয়।"

"ভালোটা যাতে সহজে না হয়, তারই চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছ না?" আমার কণ্ঠস্বর উষ্মা প্রকাশ পায়। —"কলিযুগে কেউ কি কারো ভালো চায়?"

"যা বলেছেন! ভারী অন্যায় কিন্তু।" একমুহূর্তের জন্য থামে না; "আচ্ছা, ডাঙা এখান থেকে কদ্দুর?"

"তা—দু-তিন মাইল হবে বোধহয়।" আমি ভেবে বলি।

"মোট্টে! তাহলে তো সাঁতরেই চলে যেতে পারব।" সে যেন একটু হতাশ হয়। "কোন দিকে বলুন তো ডাঙাটা?"

"সোজা নীচের দিকে।"

"ও, তাই বলুন!" ওর মুখে হাসি ফোটে আবার। "আপনি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!"

"না, ভয় কীসের!" আমি জোর করে হাসি।

"পাতালে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচবচ্ছর থাকতে হবে সেখানে। তার আগে আসা চলছে না। কি বলুন? তাই তো?" আমার মতের অপেক্ষা করে গোরা। সমুদ্রটা তলিয়ে দেখতে সে অস্থির।

পাতাল যে রকম জায়গা, তাতে সেখানে পুরো পাঁচমিনিটও থাকা যাবে কিনা এই রকম একটা সংশয় আমার বহুদিন থেকে ছিল, পাতাল-কাহিনীর একশো চৌত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়েও সে সন্দেহ আমার টলেনি, কিন্তু আমার অবিশ্বাস ব্যক্ত করে ওকে আর ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।

হঠাৎ সে সচকিত হয়ে ওঠে—"বইটা? সেই বইখানা?"

"ডেকেই পড়ে রয়েছে বোধহয়।" আমি বলি।

"ডেকে ফেলে এসেছেন? কী সর্বনাশ!—কত কাজে লাগবে এখন ওই বইটা। কেউ যদি নেয়—সরিয়ে ফ্যালে?" বলে গোরা বইয়ের খোঁজে দৌড়োয়।

"কি রকম বুঝছ গতিকটা?" মেজমামা এগিয়ে আসেন।

স্বয়ং জাহাজ তাঁর কথার জবাব দেয়। তার একটা ধার ক্রমশ কাত হতে থাকে, ডেকের সেই ধারটা পাহাড়ের গায়ের মতো ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। সে-ধারটা

দিয়ে জলাঞ্জলি যাওয়া খুবই সোজা বলে মনে হয়। বসে বসেই সুড়ুৎ করে নেমে গেলেই হলো। অ্যালার্ম বেল্ আরো জোর জোর বাজতে থাকে। কাপ্তেন লাইফবোটগুলো নামাবার হুকুম দ্যান। জাহাজ পরিত্যাগের জন্য যাত্রীদের প্রস্তুত হতে বলেন।

লাইফবোট নামানোর জন্য তেমন হাঙ্গাম পোহাতে হলো না। জাহাজ তো কাত হয়েই ছিল, সেই ধার দিয়ে দড়ায় বেঁধে ওগুলো ছেড়ে দিতেই সটান জলে গিয়ে দাঁড়ালো। আরোহীরাও সন্তর্পণে লাইফবোটের অনুসরণে প্রস্তুত হলেন। সাবধানতা এইজন্য যে, একটু পা ফসকালেই একেবারে লাইফ আর লাইফবোটের বাইরে—সমুদ্রগর্ভেই সটান।

গোরার মেজমামা এবং আমি—আমাদেরও বিশেষ দেরি ছিল না। যেমন ছিলাম, তেমনি বোটে যাবার জন্যে তৈরি হলাম। এমন দুঃসময়ে লাগেজ, হোল্ড-অল্ বা সুটকেসের ভাবনা কে ভাবে? সন্দেশের বাক্সের কথাই কি কেউ মনে রাখে? কেই-বা সঙ্গে নিতে চায় সেসব?

কিন্তু গোরা? গোরা? কোথায় গেল সে এই সঙ্কট-মুহূর্তে? আমি গলা ফাটাই এবং মেজমামা আকাশ ফাটান—গোরার কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।

"কে জানে হয়তো কেবিনে বসেই বই পড়ছে!" আমার আশঙ্কা প্রকাশ পায়।

"এই কি পড়বার সময়?" মেজমামা খাপ্পা হয়ে ওঠেন। —"পড়াশুনা করার সময় কি এই?"

"ওর কি সময়-অসময়-জ্ঞান আছে?" আমি বলি, "যা ওর পড়ার ঝোঁক!"

দুজনে আমরা কেবিনের দিকে দৌড়োই, নাঃ কেবিনে তো নেই, তখন এদিকে-ওদিকে, দিগ্‌বিদিকে ছোটাছুটি শুরু করি—কিন্তু কোথায় গোরা! অবশেষে আমাদের জন্য সবুর না করে শেষ বোটখানাও ছেড়ে দেয়।

সবগুলি বোটকেই দিকচক্রান্তে একে একে অন্তর্হিত হতে দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মেজমামা বসে পড়েন। আমি পড়ি শুয়ে। সেই পরিত্যক্ত জাহাজের প্রান্তসীমায় তখন কেবলি আমরা দুজন। গোরা অথবা লাইফ বোট—কার বিরহ আমাদের বেশি কাতর করে, বলা তখন শক্ত।

খট করে হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চমকে উঠি। দেখি শ্রীমান গৌরাঙ্গ হাসতে হাসতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। সমুন্নত ডেকের চূড়ায় গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

"কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ?" গোরাকে দেখতে পাবামাত্র সেখানে বসেই মেজমামা যেন কামান দাগেন।

"কতক্ষণে বোটগুলো ছাড়ে, দেখছিলাম।" গোরার উত্তর আসে, "সবগুলো চলে যাবার পর তবে আমি নেবেছি।"

"কৃতার্থ করেছো।" মনে মনে আমি কই।

মেজমামার দিক থেকে সহানুভূতির আশা কম দেখে ছেলেটা আমার গা ঘেঁষে



দাঁড়ায়। কানে কানে বলে, "পাতালে যাবার এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে মশাই? আপনিই বলুন না!"

আমি চুপ করে থাকি। কী আর বলব? আশঙ্কা হয় এখন কথা বলতে গেলেই হয়তো তা কান্নার মতো শোনাবে। নিশ্চিত-মৃত্যুর সম্মুখে কান্নাকাটি করে লাভ।

"ঘাবড়াবেন না," ওর চাপা-গলার সান্ত্বনা পাই। "ফিরে এসে আপনিও প্রেমেনবাবুর মতো অমনি একখানা—বইয়ের মতো বই—লিখতে পারবেন।"

আমি শুধু বলি—"হ্যাঁ, ফিরে এসে! ফিরে আসতে পারি যদি!" মুখ ফুটে এর বেশি বলতে পারি না, মুখের ফুটো বুজে আসছিল আমার।

ক্রমশ বিকাল হয়ে আসে। অনেকক্ষণ বসে থেকে অবশেষে আমরা উঠি। খাওয়ার এবং শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো! যতক্ষণ অথবা যতদিন এই জাহাজের এমনি ভেসে থাকার মতি-গতি থাকবে, আর এই পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্য কোনো জাহাজ আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে না নেবে, ততক্ষণ বা ততদিন টিকে থাকার একটা বন্দোবস্ত করতে হবে বই কি।

আফশোশ করে আর ফল কি এখন?

জাহাজকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তিনি সেই রূপ কাত হয়েই রইলেন, বেশি আর তলাবার চেষ্টা করলেন না। আমরা তিনজনে এধারে ওধারে এবং কেবিনে কেবিনে পরিভ্রমণ শুরু করলাম।

নাঃ, খাবার-দাবার অপর্যাপ্তই রয়েছে। পাঁচ বছর না হোক, পাঁচ হপ্তা টেকার মতো নিশ্চয়ই! বিস্কুট, রুটি, মাখন, চকোলেট, জ্যাম, ঠাণ্ডা মাংস টিন কে টিন। গোরার পুলক আর ধরে না। তার কলরব আমাদের একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলল প্রায়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা প্রথম শ্রেণীর কেবিনে শয়নের আয়োজন করা গেল! ডেকের টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া কতখানি সুবিধার, নরম গদির আরামের মধ্যে গদগদ হয়ে গোরা আমাদের তাই বোঝাতে চায়, কিন্তু তার সূত্রপাতেই এক ধমকে মেজমামা থামিয়ে দেন ওকে।

পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙলে সবাই আমরা চমৎকৃত হলাম। এ কি! কেবিনের দরজা কেবিন ছাড়িয়ে এত উঁচুতে গেল কি করে! রাতারাতি জাহাজটা কি আরেক ডিগবাজি খেলো না কি! বাইরে বেরিয়ে যে কারণ বের করব, তারও জো নেই। কেননা দরজা গেছে কড়িকাঠের জায়গায়, কিন্তু আমরা দরজার জায়গায় নেই। আমরা যে কোথায় আছি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোরা কিন্তু আমাদের কাজের ছেলে। কোত্থেকে একটা দাড়ি বাগিয়ে এনে হুক লাগিয়ে ফাঁসের মতো করে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল। কয়েকবার ছুঁড়তেই আটকালো ফাঁসটা। তারপর তাই ধরে সে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে গেল। ফাঁসটাকে দরজার সঙ্গে ভালো করে বেঁধে দড়িটা নামিয়ে দিল সে আমাদের উঠবার জন্য।

যে দড়ি-পথ গোরার পক্ষে মিনিটখানেকের পরিশ্রম, তাই বেয়ে উঠতে দুজনেই আমরা নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণে, অনেক উঠে পড়ে, বিস্তর ধস্তাধস্তি করে, এ ওর ঘাড়ে পড়ে, পরম্পরায়, বহুৎ কায়দা-কসরতে, ঘর্মাক্ত-কলেবরে অবশেষে আমরা উপরে এলাম। এসে দেখি জাহাজ এবার অন্যধারে কাত হয়েছেন। অন্যদিকে হেলেছেন, তাই আমাদের প্রতি এই অবহেলা। সেইজন্যেই কেবিনের মেজে পরিণত হয়েছে দেয়ালে, আর দেয়ালায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাদ—জাহাজের মেজাজে।

জাহাজের এই রকম দোলায় অতঃপর কি করা যায়, তাই হলো আমাদের ভাবনা। "ব্রেকফাস্ট করা যাক।" গোরা প্রস্তাব করল।

এই রে! মেজমামা বাজের মতন ফাটবেন এইবার! মুখ না ধুতেই প্রাতরাশের সম্মুখে! এ-প্রস্তাবে—নাঃ, আর রক্ষা নেই! কিন্তু আমার আশঙ্কা ভুল, মেজমামার দিক থেকে কোনোই প্রতিবাদ এল না। কাল থেকে গোরার প্রত্যেক কথাতেই তিনি চটছিলেন, কিন্তু একথায় তাঁর সর্বান্তঃকরণ সায় দেখা গেল।

প্রাতরাশ সেরে সবচেয়ে উঁচু এবং ওরই মধ্যে আরামপ্রদ একটা স্থান বেছে নিয়ে সেখানে আমরা তিনটি প্রাণী গিয়ে বসলাম। বসে বসে সারাদিন জাহাজটার আচার-ব্যবহার লক্ষ করি। প্রত্যেক ঘণ্টায়ই একটু একটু করে জলের তলায় তিনি সমাধিস্থ হচ্ছেন। এইভাবে চললে তাঁর আপাদমস্তক তলানো কঘণ্টার বা কদিনের মামলা, মনে মনে হিসাব করি।

"হয়েছে হয়েছে।" মেজমামা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন, "যখন আমরা জাহাজে

উঠলাম, মনে নেই তোমার? জাহাজের খোলে যত রাজ্যের লোহা-লক্কর বোঝাই করছিল—মনে নেই?"

"হ্যাঁ, আছে। তা কি হয়েছে তার?"

"লক্করগুলো তো ভেগেছে, এখন ওই লোহার ভারেই জাহাজ ডুবছে। খোলের ভেতর থেকে লোহাগুলো তুলে এনে যদি জলে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো জাহাজটাকে ভাসিয়ে রাখা যায়।"

আমি ঘাড় নাড়ি—"তা বটে। তাহলে হতে পারে; কিন্তু কে আনবে সেই লোহা? এবং কি করেই বা আনবে?"

গোরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—"আনবো? আনবো আমি?" তার কেবল মাত্র আদেশের অপেক্ষা!

"থাম!" মেজমামা প্রচণ্ড এক ধমক লাগান।

"লক্করদের সবাই কি গেছে? আপাত একে জলে ফেলে দিলেও জাহাজটা কিছু হালকা হতে পারে বোধহয়? দেব ফেলে?" আমি বললাম।

"থামো তুমি।" মেজমামা গরম হলেন আরো—"তোমরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে তুলবে দেখছি।"

"তার চেয়ে এক কাজ করা যাক।" আমি গম্ভীরভাবে বলি, "জাহাজের কেবিনগুলো ওয়াটার-টাইট বলে শুনেছি। বড়ো দেখে একটার মধ্যে ঢুকেভালো করে দরজা এঁটে আজকের রাতটা তো কাটানো যাক—তারপর কালকের কথা কাল। কাল যদি ফের বেঁচে থাকি, তখন।"

তাই করা গেল। স্টোর-রুম থেকে প্রচুর খাবার এনে সব চেয়ে বড়ো একটা কেবিনের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম। গোরা কতকগুলো টর্চ বাতি নিয়ে এসেছিল, তাদের আর আমাদের একসঙ্গে জ্বালাতে শুরু করল। "টর্চের সাহায্যে টর্চার করার নামই হচ্ছে জ্বালানো", মেজমামা বললেন, "এর চেয়ে জ্বালাতন আর কী আছে? আর ঠিক এই ঘুমোবার সময়টাতেই!" বললেন মেজমামা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু রাত যেন আর কাটে না। যতক্ষণ সম্ভব এবং যতদূর সাধ্য, প্রাণপণে আমরা ঘুমিয়েছি; কিন্তু ঘুমানোর তো একটা সীমা আছে! গোরা সেই সীমানায় এসে পৌছয়, আর পৌছেই ঘোষণা করে, "এইবার ব্রেকফাস্ট করা যাক।"

"অ্যাঁ। এই রাত থাকতেই!" শুয়ে শুয়েই আমি চমকে উঠি।

"কী রাক্ষুসে ছেলে রে বাবা!" মেজমামাও গর্জন করেন, তোর কি ভোর হতেও তর সইছে না রে?"

"খিদে পেয়েছে যে!" গোরা বলে "ভোর না হলে বুঝি খিদে পেতে নেই?"

"খিদে কি আমারও পায়নি?" মেজমামা ফোঁস করেন; "কিন্তু—কিন্তু তা বলে কি রাত থাকতেই ব্রেকফাস্ট,—এ রকম বে-আক্কেলে কথা কেউ শুনেছে কখনো? কারো বাপের জন্মে? ভদ্রলোকে শুনলে বলবে কি?"

"আহা, ছেলেমানুষ, খিদে পেয়েছে, খাক না। এখানে তো ভদ্রলোক কেউ নেই। কে শুনছে?" বিস্কুটের টিনটা গোরার দিকে আগিয়ে দিই।

"বা-রে, আমি বুঝি বাদ?" মেজমামা আমার দিকে হাত বাড়ান, "ছেলেমানুষ বলে কি ও মাথা কিনেছে নাকি? ছেলেমানুষ না হলে কি খিদে পেতে নেইকো?"

মেজমামাকেও একটা টিন দিতে হয় এবং নিজেও আমি একটা টিন শেষ করি। তারপর আবার ঘুম। তারপর আবার অনেকক্ষণ কাটে। আবার ঘুম ভাঙে। আবার খাবার পালা। এইভাবে বারবার তিনবার ব্রেকফাস্টের দাবি মিটিয়েও সকালের মুখ দেখা যায় না। বারোটা বিস্কুটের টিন ফুরোয়, কিন্তু বারো ঘণ্টার রাত আর ফুরোয় না, তখন বিচলিত হতে হয় সত্যিই।

"গোরা, জ্বালতো টর্চটা একবার। কি ব্যাপার দেখা যাক—"

টর্চের আলো ফেলে কেবিনের পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে যা দেখি, তাতে চোখ কপালে উঠে যায়। জল, কেবল সমুদ্রের কালো জল। তাছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

"সর্বনাশ হয়েছে!" মেজমামা কন—খুব সংক্ষেপেই।

"হ্যাঁ। আমরা জলের তলায়—ডুবে গেছি। আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে কখন!"

কিন্তু একথা মুখ ফুটে না বললেও চলত, কেননা এ তথ্য আর অস্পষ্ট ছিল না যে, আমাদের আর আশেপাশের কেবিনগুলো সব ওয়াটার-টাইট্ বলেই আমরা বেঁচে আছি এখনো পর্যন্ত! পোর্টহোলের কাছের শার্সিটা পুরু, এত পুরু যে, তা ভেঙে জল ঢুকতে পারবে না; তাই রক্ষা।

"এবার কিন্তু মারা গেলাম আমরা।" কান্নার উপক্রম হয় মেজমামার।

'অনেকটা নীচেই তলিয়েছি মনে হয়। এত নীচে যে, সুয্যির রশ্মিও এখানে এসে পৌঁছোয় না। দিন কি রাত, বোঝবার জো নেই।"

"কতক্ষণ আছি, তাই বা কে জানে!" মেজমামার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"ব্রেক্‌ফাস্টের সংখ্যা ধরে হিসেব করলে মনে হয়, এক রাত কেটে গিয়ে গোটা দিনটা কাটিয়ে এখন আমরা আরেক রাতে এসে পৌঁছেছি।"

"তবে। তবে আর কি হবে!" মেজমামার হতাশার স্বর শুনে দুঃখ হলো। তারপরে নিজেই তিনি নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"তবে আর কি হবে! দাও আমায় রুটি-মাখনের বাক্সটা, সাবাড় করা যাক তাহলে!"

মুখ থেকে কথা খস্‌তে-না-খস্‌তেই গোরা মাতুল-আজ্ঞা পালন করে। এসব দিকে ওর খুব তৎপরতা।

"এইভাবে কতদিন এখানে কাটাতে হবে, কে জানে! হয়তো বা যাবজ্জীবনই।" পাঁউরুটির পেষণে মুখের কথা স্পষ্ট হয়ে আসে মেজমামার।—"না খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না। অতএব খাওয়াই যাক—কী করা যাবে।"

তারপর থেকে উদরকেই আমরা ঘড়ির কাজে লাগাই। আবার খিদে পেলেই বুঝি,

আরো ছঘণ্টা কাটল। এই করেই দিনরাত্রির হিসেব রাখা হয়। এসব বিষয়ে গোরার পেট সব চেয়ে নিখুঁত—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় চলে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাড়া দেয়।

এইভাবে কয়েকটা ব্রেক্‌ফাস্ট কেটে যাবার পর মনে হলো, কেবিনের অন্ধকার যেন অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। হ্যাঁ. এই যে বেশ আলো আসছে পোর্টহোল দিয়ে।

কী ব্যাপার? ব্যগ্র হয়ে ছোটেন মেজমামা পোর্টহোলের দিকে, "কই, আকাশ তো দেখা যাচ্ছে না। চারদিকেই জল যে!" তাঁর করুণধ্বনি আমাদের কানে বাজে।

নাঃ, এখনো জলের তলাতেই আছি বটে, তবে কিছুটা উপরে উঠেছি। সূর্যরশ্মি-প্রবেশের আওতার মধ্যে এসেছি। আমার মনে হয়, ইতিমধ্যে উপরের মাস্তুল-টাস্তুলগুলো খসে গিয়ে ভার কমে যাওয়ায় খানিকটা হাল্‌কা হয়ে নিমজ্জিত জাহাজটা কিছু উপরে উঠতে পেরেছে। যাক, একটু আলো তো পাওয়া গেল, এই লাভ!

"থাক না জল চারদিকে, আমাদের কেবিনের মধ্যে তো নেই। এই বা কি কম বাঁচোয়া।" সান্ত্বনার স্বরে এই বলে মেজমামার কথার আমি জবাব দিই।

প্রত্যুত্তরে মেজমামা শুধু আরেকটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন।

"আমার কিন্তু এম্‌নি জলের তলায় থাকতেই ভালো লাগে। কিরকম মাথার উপরে, তলায়, চারধারেই—অথই জল। কেমন মজা! যদ্দূর চাও—খালি সমুদ্দুর—আর সমুদ্দুর!" গোরা এতক্ষণে একটা কথা কয়— "বাড়ির চেয়ে এখানে—এখন ঢের ভালো!"

"হ্যাঁ! বাড়ির চেয়ে ভালো বই কি!" মেজমামা নতুন বিস্কুটের টিন খুলতে খুলতে বলেন, "জলে ডুবে বসে আছি—জলাঞ্জলি হয়ে গেছে আমাদের—ভালো না?"

"জলে ডুবে কী রকম?" গোরা প্রতিবাদ করে—"ডুবে গেলেও আমরা করতে নীচে আছি শিব্রামবাবু?"

"বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ ফিট, কিং আরো বেশিই হবে—কে জানে!" আমি জানাই।

"ডুবন্ত লোকের কাছে ত্রিশ ফিট জলের তলাও যা, আর হাজার ফিটও তাই! সবই সমান! কোনোটাই ভালো নয়।" আবার মেজমামার দীর্ঘ-নিশ্বাস।

"কিন্তু মেজমামা, আমাদের কেবিনের মধ্যে তো এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারছে না। তাহলে ডুবলামই বা কি করে?" আবার গোরার জিজ্ঞাস্য হয়।—"জলে যদি না পড়ি—না যদি হাবুডুবু খাই—আমরা মরব কেন?"বলেই সে আমার দিকে প্রশ্নবাণ ছাড়ে, "হ্যাঁ, শিব্রামবাবু, বলুন না। জলে ডুবে গেলে কি বাঁচে মানুষ? আমরা যদি ডুবেছি, তাহলে বেঁচে অছি কি করে?"

"আহা, জল ঢুকছে না যেমন, হাওয়াও ঢুকতে পারছে না যে তেমনি।" আমি ওকে বোঝাবার প্রয়াস পাই। "আর আমার মনে হয়, মানুষে জলে ডুবে যে মারা যায়, সে জলের প্রভাবে নয়, হাওয়ার অভাবেই। এই কারণেই গায়ে জলের আঁচড়টিও না লাগিয়ে আমরা শান্‌পাঁপড়ির মতো শুকনো থেকেও সমুদ্রগর্ভে ডুবে মারা যেতে পারি। আজই হোক কিংবা কালই হোক—বঞ্চিত হাওয়ার অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গেলেই—অক্সিজেন-বঞ্চিত হলেই আমরা......"



গুরুতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাঝখানেই গোরা সশব্দে লাফিয়ে ওঠে— "একি? কে ওখানে? ওকে?"

আমাদর সবার দৃষ্টি পোর্টহোলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওর শার্সির ওধারে বদন ব্যাদান করে এ আবার কোন্ প্রাণী বাবা? অজানা কোন্ জানোয়ার? সমুদ্রের তলায় এমন বিচ্ছিরি বিটকেল বিদ্ঘুটে চেহারা—ভয় দেখাচ্ছে এসে আমাদের!

"শার্ক!" মেজমামা পর্যবেক্ষণ করে কন। "এরই নাম শার্ক।"

"হ্যাঁ, বইয়ে পড়েছি বটে। এই সেই শার্ক?" গোরার উৎসাহের সীমা থাকে না। পোর্টহোলের উপর সে ঝুঁকে পড়ে একেবারে।

"উঁহু, অতো না। অতো কাছে নয়, কামড়ে দিতে পারে।" আমি সতর্ক করে দিই, "এমনকি, না কামড়ে একেবারে গিলে ফেলাও অসম্ভব নয়।"

"বাঃ, শার্সি রয়েছে না মাঝখানে?" গোরা মোটেই ভয় খাবার ছেলে নয়।

"তোকে দেখলেই সুখাদ্য মনে করবে।" মেজমামাও সাবধান করতে চান — "তখন শার্সি ফার্সি ভাঙতে ওর কতক্ষণ! মাঝখান থেকে আমরাও মারা পড়ব তোর জন্যেই।"

গোরা কিন্তু ততক্ষণে অতিথির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান শুরু করেছে।

সেদিন বিকেল থেকেই কেবিনের বাতাস দুর্গন্ধ হয়ে উঠল। —"এইবার কমে

আসছে অক্সিজেন—বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস।" আমি বললাম, "এর পর নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হবে আমাদের।"

"তাহলে উপায় ?" মুখখানা সমস্যার মতো করে তোলেন মেজমামা। "তাহলে এক কাজ করা যাক", তিনি নিজেই সমাধান করে দেন, "যত টিন আর বিস্কুট আছে, সব খেয়ে শেষ করা যাক এস। খেয়ে দেয়ে তারপর গলায় দড়ি দিলেই হবে। খাবি খেয়ে অল্পে অল্পে মরার চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো।"

"ঠিক অতো উপাদেয় না হলেও আরেকটা উপায় আছে এখনো!" মেজমামাকে আশ্বস্ত করি, 'আমাদের দুধারেই কেবিন, উপরে আর নীচের তলাতেও। আপাতত দেয়ালে এবং মেজেয় ছ্যাঁদা করে ওই সব ঘরের বিশুদ্ধ বাতাস আমদানি করা যাক। এ-ঘরের দূষিত বায়ু সব দূর করে দিই। তারপর শেষে ছাদ ফুটো করলেই হবে। আপাতত এতেই এখন চলে যাবে দিনকতক।"

মেজমামা স্বস্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন। গোরা বলে, "তার চেয়ে আমরা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলি না কেন। তাতেও তো কিছু বাতাস বাড়তে পারে! কি বলেন ?"

মেজমামা কট্ মট্ করে তাকান ওর দিকে, আমি কোনো উত্তর দিই না।

এরপরের কদিনের ইতিহাস সংক্ষেপে এই ঃ ঘরের বাতাস ফুরিয়ে এলেই এক-একধারে একটা করে গর্ত বাড়ে। বাতাসের কমতি গর্তের বাড়তির দ্বারা পুষিয়ে যায়। গোটা জাহাজটা আমাদের ভাগ্যক্রমে এয়ার-ওয়াটার-টাইট্ ছিল বলেই এই বাঁচোয়া।

শার্কটা গোরার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়েছিল নিশ্চয়। সে কেবলি ঘুরে ঘুরে আসে। গোরা তার শার্ক-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে সময় কাটায়। ইতিমধ্যেই দুজনের ভাব বেশ জমে উঠেছে। সামুদ্রিক সব বিষয়কর্ম ফেলে ঘুল্‌ঘুলির কাছেই ঘোরা-ফেরা করছে শার্কটা। আর গোরার তরফেও আগ্রহের অভাব নেই, সুযোগ পেলেই সে সমুদ্রচর বন্ধুর আদর-আপ্যায়নের কসুর করে না। বেশির ভাগ সময়ই ওদের মুখোমুখি দেখা যায়—মাঝে শার্সির ব্যবধান মাত্র। কোন্ দুর্বোধ্য ভাষায় যে ওরা আলোচনা করে, তা ওরাই জানে কেবল।

মেজমামা একটার পর একটা বিস্কুটের বাক্স উজাড় করে চলেন। আর কারো হস্তক্ষেপ করার জো নেই ওদিকে। মেজমামার প্রসাদ পায় গোরা। আর কখনো-সখনো নিজের প্রসাদের দু-এক টুকরো আমাকে দ্যায়। আমি হাঁ করেই থাকি, উঠে কি হাত বাড়িয়ে খাবার কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতাও যেন নেই আমার। গোরার ভুলবশত ক্বচিৎ কখনো এক-আধখানা যা গোঁফের তলায় এসে পড়ে, তাতেই আমার জীবিকা-নির্বাহ হয়ে যায়।

শুয়ে শুয়ে প্রেমেনের বইখানা পড়ি। দুবার পড়ে ফেলেছি এর মধ্যেই—একবার শেষ থেকে গোড়ার দিকে, আরেকবার গোড়া থেকে শেষের দিকে। এবার মাঝখান থেকে দুদিকে পড়তে শুরু করেছি—যুগপৎ।

কদিন এইভাবে কাটে, জানি না। খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া তো কোনো কাজ নেই—শুয়ে পড়া, আর শুয়ে শুয়ে পড়া। এম্নি করে একদিন যখন বইটার দিগ্বিদিকে

পড়ছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ সমুদ্রতল যেন তোল্‌পাড় হয়ে উঠল। আমাদের কেবিন কাঁপতে লাগল, একটা গমগমে আওয়াজ শুনতে পেলাম। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলাম আমরা—কী ব্যাপার? প্রশ্নের পরমুহূর্তেই পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলো আমাদের কেবিনের মধ্যে ঢুকল। এ কী! এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই আমরা চমকে গেলাম।

"আকাশ, আকাশ!" মেজমামা চিৎকার করে আকাশ ফাটান।

তাইতো! আকাশই তো বটে! ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে দেখি—রৌদ্র-করোজ্জ্বল সুনীল আকাশ! নীলাভ শূন্যের তলায় দিগন্তবিস্তার সমুদ্রের কালচে নীল জল! আবার যে এইসব নীলিমার সাক্ষাৎ পাবো, এমন আশঙ্কা করিনি।

ভেসে উঠেছি আমরা! ভাসছি আবার! কিন্তু ভেসে উঠলাম কি করে? মেজমামা হঠাৎ কঠোরভাবে চিন্তা করেন—অনেক ভেবেচিন্তে বলেন, "হয়েছে, ঠিক হয়েছে। জাহাজের খোলটা গেছে খসে, সেই সঙ্গে যত লোহালক্কর বোঝাই ছিল, সব গেছে জলের তলায়। তার জন্যই ওই বিচ্ছিরি আওয়াজটা হলো তখন, তাইতেই, —বুঝেছিস গোরা!"

গোরা ততক্ষণে কেবিনের দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারও আর্তনাদ শোনা যায় সঙ্গে সঙ্গেই—"জাহাজ! মেজমামা, জাহাজ! এদিক্ দিয়েই যাচ্ছে! দ্যাখোসে—"

এতদিনে ও একটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে। হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে লাল সিল্কের রুমালটা বার করে নাড়তে শুরু করে দ্যায়। আমিই ওটা ওকে একদা উপহার দিয়েছিলাম। ওর জন্মদিনে।

আমাদের নব জন্মদিনে সেটা এখন কাজে লাগে।

রেঙ্গুন থেকে চাল বোঝাই হয়ে জাহাজটা কলকাতা ফিরছিল। জাহাজে উঠে হাফ ছেড়ে বাঁচি, অচেনা মানুষের মুখ দেখে আনন্দ হয়। ক্যালেন্ডারের তারিখ মিলিয়ে জানা যায়, পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আমরা জলের তলায় ছিলাম।

"যাহোক পাতাল-বাস হলো বাবা!" মেজমামা ঘাড় নাড়েন, "পাঁচদিন না তো—পাঁচবচ্ছর।"

"পাতালে তো অ্যাদ্দিন কাটল, এখন হাসপাতালে কদিন কাটে, কে জানে!" আমি বলি, "যা বিস্কুট পেটে গেছে এই কদিনে! শুকনো বিস্কুট চিবুতে হয়েছে দিনরাত!—"

গোরা বলে, "বা-রে, বিস্কুট বুঝি খারাপ? ও তো খুউব ভালো জিনিস। বিস্কুট খেতে পেলে ভাত আবার খায় নাকি মানুষ!"

· গোরার মামা গুম হয়ে থাকেন। তাঁর ভোট যে বিস্কুট আর গোরার পক্ষেই, সেটা বোঝা যায় বেশ।

বিহার-মন্ত্রীর সান্ধ্য-বিহার

সেবার পুজোয় সেই বিহারেই যেতে হল আবার।

ভূমিকম্পের পর থেকে বিহারের নাম করলেই আমার হৃৎকম্প হয়। আর্থকোয়েক আর হার্টফেল নোটিশ না দিয়েই এসে পড়ে, আর নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতে কাজ সেরে চলে যায়।

তুমি হয়তো বলবে, 'ও-দুটোরই দরকার আছে। প্রাচীন বাড়ি-ঘর যেমন শহরের বুকে কদর্যতা, তেমনি সেকেলে শহর-টহর পৃথিবীর পিঠে আবর্জনা—ভূপৃষ্ঠ থেকে ওরা কি সহজে সরতো ভূমিকম্প না থাকলে? এ তো আর এক-আধখানা পুরোনো ইমারত নয় যে, মেরামত করেটরে বদ্‌লে ফেলবে? একে তো সারিয়ে সরানো যায় না, সরিয়ে সারাতে হয়—আর ভেঙে গড়বার জন্য শহরকে-শহর সরিয়ে ফেলা কি চারটিখানি কথা?'

তারপর হার্টফেল—'হ্যাঁ—ওটাও সেকেলে লোকদের জন্যেই', তুমি বলবে। 'নিজের হৃদয়ের কাছে হেলাফেলা না পেলে বুড়ো মানুষরা কি মরতে চাইত সহজে? আধমরা হয়েও আধাখ্যাঁচরা জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকত'—বল্‌বে তুমি।

তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু আমি যে নিজেকে যথেষ্ট সেকেলে মনে করতে পারছিনে, নতুবা বিহারে পা বাড়াতে আর কি আপত্তি ছিল আমার? হৃৎকম্প থেকে হৃৎঝম্প—একটার থেকে আরেকটার—কতখানি বা দূরত্ব?

যাক—সেই বিহারেই যেতে হল—বেড়াতে।

গেছলাম যেখানে, জায়গাটার নাম আর করব না, আমার পিসেমশাই সেখানে দারোগা আর হাসপাতালের ডাক্তার হচ্ছেন সাক্ষাৎ আমার মেসোমশাই।

দারোগার দোর্দণ্ড প্রতাপে যারা রোগা হয়ে পড়ে, অচিরাৎ ডাক্তারের কবলে তাদের আসতে হয়; কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে তারা কোথায় যায়, ডাকঘরে খবর নিয়েও তার হদিস মেলে না। অর্থাৎ তরা একেবারে সুদূরপরাহত হয়ে যায়। রোগী আর রোগ দুজনকেই যুগপৎ আরোগ্য করার দিকে কেমন যেন একটা গোঁ আছে মেসোমশায়ের!

পই পই করে বলে দিয়েছিলেন মা—'মরে গেলেও ওষুধ খাস্‌নে। হাজার অসুখ করলেও মেসোমশায়ের কাছে যাস্‌নে।

আর পিসেমশাই? তার কাছে গেছি কি, অম্‌নি তিনি ছাতুখোর পাহারাওয়ালারদের

দিয়ে আমাকেপিসে ফেলে আরেক প্রস্থ ছাতু বানিয়ে থানায় পুরে রাখবেন আমায়; কিন্তু এসে দেখলাম, যতটা ভয় করা গেছল, ততটা না; তেমন মারাত্মক কিছু না। মেসোমশায়ের তো মায়ার শরীর, রোগযন্ত্রণা রুগির যদি বা সয়, ওঁর আদপেই সহ্য হয় না, রোগের যাতনা লঘু করতে গিয়ে রুগিকেই লাঘব করে ফেলেন তিনি—আর পিসেমশাই? সারা পৃথিবীটাই তাঁর কাছে মায়া! দুনিয়াটাই জেলখানা তাঁর কাছে। তাই দুনিয়াটাকেই জেলখানায় পুরতে পারলে তিনি বাঁচেন।

তবে আমার অন্তত ভয়ের কিছু ছিল না কোনো পক্ষ থেকেই। আমার প্রতি ভয়ানক অমায়িক ওঁরা দুজনেই। দু-একদিনেই খুব ভাব জমে গেল আমাদের।

একদা পড়ন্ত বিকেলে হাসপাতালের ডাক্তারখানায় বসে মেসোমশায়ের সঙ্গে খোশগল্প করছি, এমন সময় এক খোট্টাই-মার্কা রুগি আস্তে আস্তে এসে হাজির হল সেখানে। দেখলেই বোঝা যায়, দেহাতি লোক, যন্ত্রণাবিকৃত মুখ। এসেই বিরাট এক সেলাম ঠুকল মেসোমশাইকে।

মেসোমশাই তাকে আমলই দিলেন না—"তোর মনে থাকবার কথা না, তুই আর তখন কতটুকু! তবে তোর মাকে জিজ্ঞেস করিস। অনেকরকম খোস্ দেখেছি, সারিয়েছিও, কিন্তু সে কি খোশ রে বাবা—!"

যে খোশ-গল্পের সঙ্গে স্বয়ং আমি জড়িত, তা আমার ভালো লাগবার কথা নয়। আমি তেমন উৎসাহ দেখাই না; কিন্তু মেসোমশাইকে উৎসাহ দেখাতে হয় না।

"যেন আমাদের দেলখোশ। কত বৈদ্য-হাকিম হদ্দ হয়ে গেল! কিন্তু সারিয়েছিল কে তোর সেই খোস-পাঁচড়া? শুনি? এই শর্মাই! সবে তখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি—তখনই! তুই মরিস খোশের জ্বালায়, আর আমরা মরি খোশবুর জ্বালায়—!"

"খোশবু কি মেসোমশাই?" অনুসন্ধিৎসু হতে হয়, জেনারেল নলেজের পরিধি বাড়াবার প্রয়াস পাই।

"তোর সেই খোস্ পচে গিয়ে কী গন্ধই না বেরিয়েছিল, বাপস! আমি যতই বোঝাই তোর মাকে যে আগে আম ডাঁসা থাকে, তারপর পাকে, তারপর পচে, তারপরে শুকোয়, তারপরেই তো হয় আমসি—তখনই হল গিয়ে আমের আরাম! আমাশা সারাতেও সেই কথা। তোর মা ততই বলেন, 'ছেলেটাকে তুমিই সারলে সনাতন!' আরে বাপু, বলো যে সারালে, তা না, সারলে! সারলে আর সারালে কি এক হল? দুটে কি এক ক্রিয়াপদ? আ-কারের তফাত নেই দুজনের?"

"তবে সারল কীসে?" এবার আর নিজের খোশগল্পে সাগ্রহে যোগ না দিয়ে পারি না।

"সারল যেমন করে যাবতীয় ঘা সারে—যেমন করে ডাক্তারি-মতে সারিয়ে থাকি আমরা। খোস পচে হল শোষ, শোষ থেকে হল কার্বাঙ্কল—তারপরে সারলো, সহজেই সারলো, শুকিয়ে গিয়ে সেরে গেল শেষে। সারবেই, ও তো জানা কথা, কলেরা হলেই আমাশা সেরে যায়—সারছে না আমাশা—কলেরা করে দাও, তারপর তখন নুন-

জল দাও ঠেসে। হামেশাই এই করে সারাচ্ছি—আরে, চিকিচ্ছে কি চারটিখানি কথা? হয় এস্পার, নয় ওস্পার! ডাক্তারকে ধরে দুর্গা বলে ঝুলে পড়তে হয়।"

"তা বটে।"

"সারানোর পদ্ধতিই এই। বাতের কি কোনো চিকিচ্ছে আছে? মানে, সোজাসুজি চিকিচ্ছে? উহুঁ। কেবল পক্ষাঘাত হলেই বাত সারে। তারপর পক্ষাঘাতের ওষুধ হলোগে ম্যালেরিয়া। জ্বরের যা কাঁপুনি বাপু, সাতখানা কম্বল চাপা দিলেও বাগ্ মানে না, লাফিয়ে ওঠে রোগী। আর যাঁহাতক্ লাফানো, তাঁহাতক্ পক্ষাঘাত-সারা।"

"কিন্তু ম্যালেরিয়া থেকে গেল যে?"

"পাগল! জ্বর সারাতে কতক্ষণ? দুশো গ্রেন্ কুইনিন্ ঠেসে দাও, এক-দিনেই দুশো! তারপর আর দেখতে শুনতে হবে না—"

"কিন্তু ম্যালেরিয়া আবার সময়মত পাওয়া গেলে হয়!" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি।

"আরে, ম্যালেরিয়ার আবার অভাব আছে এদেশে? এনোফিলিস্ তো চারধারেই কিলবিল করছে। ডাক্তারের চেয়ে তাদের সংখ্যা কি কিছু কম, তুই ভেবেছিস? তবু যদি বেহারের এ-অঞ্চলে নিতান্তই না মেলে, পক্ষাঘাতের রুগিকে আমি চেঞ্জে পাঠিয়ে দিই বর্ধমানে। আমার কাত হয়ে থাকা কত রুগি যে বাত সারিয়ে ফিরে এসেছে বর্ধমান থেকে! তবে—"

অকস্মাৎ থেমে যান মেসোমশাই। তারপর কতিপয় হ্রস্ব-নিশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—"কতক আর ফেরেনি রে! তাদের শেষটা নিউমোনিয়া ধরে গেল কিনা!"

"ও! নিউমোনিয়া হলে বুঝি আর সারে না মেসোমশাই?" আমার কৌতূহল হয়। "না কি, টাইফয়েড হলে তবেই তা সারবার?"

মেসোমশাই নিরুত্তর।

"গোদ কিংবা গলগণ্ড হলে সারে বুঝি?"

মেসোমশাই মাথা নেড়ে বাধা দেন।

"তবে কি—তবে কি—সর্দিগর্মিই হওয়া চাই?"

"উঁহু। হার্টফেল হলে তবেই সারে নিউমোনিয়া।" বলেই মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে যান বেজায়।

"তাহলে তো মারাই গেল? গেল নাকি?" আমার সংশয় ব্যক্ত হয়।

"গেলই তো!" মেসোমশাই কোপান্বিত হন—"যাবেই তো! যত সব আনাড়িকেষ্ট বর্ধমানের! কেন যে রুগিদের নিউমোনিয়া হতে দ্যায় ভেবেই পাই না। সারানো না যাক; নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক ছিল তো!"

"ছিল! প্রতিষেধক থাকতে বেচারা বেতো-রুগিরা মারা গেল অমন বেঘোরে? বলেন কি মেসোমশাই?" আমি প্রায় লাফিয়ে উঠি। "ছিল প্রতিষেধক?"

"ছিলই তো! ম্যালেরিয়া থেকে কালাজ্বর করে দিতে পারত। কালাজ্বরের এতো

ভালো চিকিচ্ছেই রয়েছে। ইউরিয়া স্টিবামাইন। আমাদের উপেন ব্রহ্মচারীর বের করা। নেহাৎপক্ষে যক্ষ্মা তো ছিল—যক্ষ্মা হলে আর নিউমোনিয়া হয় না। হাতি যেখান দিয়ে যায়, ইঁদুর কি সে-ধার মাড়ায় রে? ঘোড়া যেখানে ঘাস খায়, বাছুর কি সে জায়গায় ঘেঁসে কখনো?"

আমি একটু হতাশ হয়েই পড়ি। "কিন্তু যক্ষ্মা হলে আর কি হল! যক্ষ্মা কি সারে আর?"

"সারে না আবার! তেমন গা ঝেড়ে বসন্ত হয়ে গেলে যক্ষ্মা তো যক্ষ্মা, যক্ষ্মার বাবা অব্দি সেরে যায়! পক্সের জার্মের কাছে লাগে আবার যক্ষ্মার ব্যাসিলি—হুঁঃ!"

"বসন্ত!" শুয়ে আরো দমে যাই আমি। —'বসন্ত কি আর ইচ্ছে করলেই হয় সবার?"

"আল্‌বৎ হয়—হবে না কেন?" মেসোমশাই বেশ জোরালো হয়ে ওঠেন—'টীকে না নিলেও হবে। আর টীকে যদি নিয়েছ, তাহলে তো কথাই নেই।"

সেই পাগড়ি-পরা লোকটি এতক্ষণ অস্ফুট কাতরোক্তি দিয়ে মেসোমশায়ের মনোযোগ-আকর্ষণের দুশ্চেষ্টা করছিল, এবার সে অর্ধস্ফুট হয়ে ওঠে—"বাবুজি!"

মেসোমশাই কিন্তু কর্ণপাত করেন না— "এসব তথ্য বুঝতে হলে ডাক্তার হওয়া লাগে। তাই তো ডাক্তার হতে বলছি তোকে। বলি যে, ডাক্তারি পড়্ বোকচন্দর!"

মেসোমশায়ের আদুরে ডাকে আমার রোমাঞ্চ হয়।

"আপনার চিকিচ্ছে তো খাসা মেসোমশাই, ওষুধ খরচা হয় না! রোগ দিয়েই রোগ সারিয়ে দ্যান! যাকে বলে রোগারোগ্য, বাঃ!"

"বিলক্ষণ! ওষুধ দিয়েই তো সারাই—বিনা ওষুধে কি সারে? কিন্তু ওষুধের কাজটা হল কী? আরেকটা ব্যামো দেহে ঢুকিয়ে তবেই না একটা সারানো। উকিলদের যেমন। আরেকটা মামলার পথ পরিষ্কার করে, তাহলেই তাদের একটা মেটে! আমাদের ডাক্তারদেরও তাই! ওষুধ দিয়ে আন্‌কোরা একটা ব্যারামের আমদানি না করলে কি—"

দেহাতি লোকটির দেহ হঠাৎ যেন কুঁক্‌ড়ে যায়। তার আর্তনাদে আমাদের আলোচনা ব্যাহত হয়। "বাবুজি, হম্ মর্ গিয়া!"

মেসোমশাই চটেই যান—"ক্যা হুয়া, হুয়া ক্যা?"

"বহুৎ শির্ দুখাতা, আউর্ পিঠ্‌মে ভি দরদ্—"

· "আভি কেয়া? কল্ ফজির্‌মে আও! যো বখৎ হস্‌পতাল খুলা রহ্‌তা—"

"নেহি বাবুজি, মর্ যায়গা, গোড় লাগি। হমারা বোখার্ ভি আ গয়ী—"

কাকুতি-মিনতিতে মেসোমশাই ঈষৎ টলেন। থার্মোমিটারটা বার করেন; কিন্তু থার্মোমিটারের কাটিটাকে খাপ থেকে বার করার কথা তিনি বিস্মৃত হন, খাপ-সমেত সমস্তটাই অবহেলাভরে দ্যান বেচারার বগলে ভরে।

তারপর সখাপ সেটাকে বগল থেকে বহিষ্কৃত করে সামনে এনে মনোযোগ-সহকারে কি যেন পাঠ করেন। অতঃপর ওঁর মন্তব্য হয়—"হুম্, বোখর্ ভি হুয়া জারাসে!"

প্রয়োজন ছিল না, তবু আমিও কিঞ্চিৎ ডাক্তারি বিদ্যা ফলাই—"হুয়া বই কি! জারা লাগতি তো? জরা জারা?"

মেসোমশাই ছাপানো ফর্মে খস্ খস্ করে দুলাইন ঝেড়ে দ্যান। ও প্রেসক্রিপশন আমিও লিখে দিতে পারতুম্। ব্যবস্থাপত্রের বাঁধা গৎ আমার জানা। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে ডিস্পেন্সিং রুমের প্রকাণ্ড কাচের জার এবং তার আভ্যন্তরীণ অদ্বিতীয় মহৌষধ—যার রঙ্ কখনো লাল, কখনো বেগুনি, কখনো বা ফিকে জর্দা। সর্দি-কাশি কি পেটব্যথা, পিত্তশূল কি পিলে-জ্বর, জ্বরবিকার কি গলগন্ড—যারই রুগি আসুক না কেন, সবারই সেই এক দাবাই,—সর্বজীবে সমদৃষ্টি মেসোমশায়ের, ভদ্রলোকের এক কথার মতো একমাত্র ব্যবস্থা।

পিঠে দরদ্ওয়ালার বেলাও অবশ্য তার অন্যথা হয়নি, সেই একমাত্র ওষুধের একমাত্রা বা একাধিক নিশ্চয়ই তিনি বরাদ্দ করে দিয়েছেন—অকাতরেই।

সে-বেচারা চিরকুট নিয়ে দাবাইখানার দিকে এগুতেই আমিও মেসোমশায়ের কাছ থেকে কেটে পড়ি। ডাক্তারি-বিদ্যা এক ধাক্কায় অনেকখানি হজম করা সহজ নয় আমার পক্ষে।

হাওয়াটাওয়া খেয়ে ফিরতে একটু রাতই হয়। পিসেমশায়ের নিকটে যাই—রাত্রের আহারটা তার আস্তানাতেই চলে কিনা। ইয়া ইয়া মাছ, মুরগি আর পাঁঠা কোত্থেকে না



কোথেকে প্রায় প্রত্যহ জুটে যায়—পিসেমশায়ের পয়সা খরচ করে কিনতে হয় না। নৈশ-পর্বটা আমাদের জোরালো হয় স্বভাবতই।

থানায় পৌঁছেই দেখি, সেখানেও এসে জুটেছে সেই পাগড়ি-পরা লোকটা। আড়াই মাইল দূরে কোথায় তার আত্মীয়ের বাড়ি কি চুরি গেছে না কোন্ হাঙ্গাম হয়েছে, তারই তদন্তে নিয়ে যেতে চায় পিসেমশাইকে। পিসেমশাই তাকে খুব বকেছেন, ধমকেছেন, দাব্‌ড়ি দিয়েছেন, হাজতে পোরবার ভয় দেখিয়েছেন—কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা, দারোগা দেখে সহজে রোগা হবার পাত্র না। পিসেমশাই এই রাত্রে এক পা নড়তেও নারাজ, অগত্যা, সেই পাগ্‌ড়ি-পরা দশটা টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছে, তখন তিনি কেস্‌টা কেবল ডায়েরিতে টুকে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন। এখানে আসা অবধি বরাবর আমি লক্ষ্য করেছি, পিসেমশায়ের বামহাত দক্ষিণের জন্যে ভারী কাতর—বেশ একটু উদ্‌গ্র বললেই হয়—আর দক্ষিণ হাত কি ইতর, কি ভদ্র—সবার প্রতি স্বভবতই কেমন বাম—সবাইকে গলহস্ত দেবার জন্যে সর্বদাই যেন শশব্যস্ত হয়ে আছে।

ডায়েরি লেখা সুরু করেন পিসেমশাই। নামধাম জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর প্রশ্ন হয়— 'কেয়া কাম করতে হো?''

''মন্ত্রীকা কাম!''

''কেয়া? মিস্ত্রিকা কাম?'' কানটাকে চাগিয়ে নেন পিসেমশাই।

''নেহি নেহি, জি! মিস্ত্রি নেহি—মন্ত্রী!''

''সমঝ্ গিয়া!'' পিসেমশাই লিখে নেন তাঁর ডায়েরিতে। আমাকে বলেন—''আমরা যাদের মিস্তিরি বলি, এইসব দেহাতি লোকেরা তাদেরই মন্ত্রী বলে, বুঝেছিস? লেখাপড়া জানে না তো, আকাট মূখ্য, আবার সমস্‌কৃত করে বলা হচ্ছে 'মন্ত্রীকা কাম'!''

তারপর পাগ্‌ড়ি-পরার দিকে ফেরেন : ''সমঝ্ গিয়া! কেয়া মন্ত্রী? রাজমন্ত্রী, না ছুতোর-মন্ত্রী?''

''রাজমন্ত্রী!'' বিরক্ত হয়েই বুঝি জবাব দ্যায় পাগ্‌ড়ি-পরা।

''ওই যো লোক্ দেশ্‌কা ইমারত্ বনাতা? বাঁশ্‌কো ভারা বাঁধ্‌কে মাথা-পর ইঁটকো বোঝা লেকে উপর্ উঠ্‌তা—?'' পিসেমশাই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রণিধান করতে চান।

''জি হ্যাঁ! বহুত ভারী বোঝা!'' সায় দ্যায় সে।

''উসি বাস্তে তুমারা শির্ দুখাতা? নেহি জি?'' আমি জিজ্ঞাসা করি। এতক্ষণে ওর দাবাইখানা যাবার কারণ আমি টের পাই।

'পিঠ্ মে ভি দরদ্!'' সে বলে একটু মুচ্‌কি হেসে।— ''উসি বাস্তে।''

পিসেমশাই তাঁর জেরা চালিয়ে যান—''উঠ্‌নেকা বখৎ কভি কভি গির্‌ভি যাতা উলোক—ওই রাজমন্ত্রী-লোক? কেয়া নেহি?''

''ঠিক হ্যায়।'' পাগ্‌ড়ি-পরা ঘাড় নাড়ে। —''কভি কভি।''

বহুৎ ধস্তাধস্তি, বিস্তর বাদানুবাদের পর ডায়েরি লেখা শেষ হয়। লোকটা চলে গেলে পিসেমশাই নোটখানা খুলে দ্যাখেন, পরীক্ষা করেন আসল কি জাল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন তিনি ঃ "না, আসলই বটে, তবে চোরাই কিনা, কে জানে। কোনো মিনিস্টারের পকেট মেরে আনা নয় তো?"

"কি করে জানলেন?" শার্লক হোম্‌সের জুড়িদার বলে সন্দেহ হয় আমার পিসেমশাইকে।

"ক্যাবিনেটের একজনের নামের মতো নাম লেখা নোটের গায়ে। তবে নাও হতে পারে। এসব তো এধারের বাজার-চলতি চালু নাম, অনেক ব্যাটারই এমন আছে।"

সকালবেলার খাওয়াটা মেসোমশায়ের বাড়িতেই হয় আমার। রাত্রের গুরু-ভোজনের পর ঘুম থেকে উঠে পিসেমশায়ের সঙ্গে একচোট দাবা খেলে স্নানটান সেরে যেতে প্রায় বারোটাই বেজে যায়।

আজ গিয়ে দেখি মাসিমা বিচলিত ভারী। মেসোমশাই হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে সেই যে সাতসকালে হাসপাতালে গেছেন, ফেরেননি এখনো। কারণ জিজ্ঞাসা করি।

মাসিমা বলেন—"কাল বিকেলে হাসপাতালে কে একটা উট্‌মুখো এসেছিল না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তখন ছিলাম তো। কে এক রাজমিস্ত্রি না ছুতোর মিস্ত্রি!"

"সেই সর্বনেশের কান্ড দ্যাখো!" টেবিলের উপর খোলা চিঠিটার দিকে দৃক্‌পাত করেন মাসিমা—খুব বিরক্তিভরেই।

আগাপাশতলা পড়ে দেখি চিঠিটা। বিহারের জনৈক মন্ত্রী লিখেছেন—নামটা নাই করলাম—লিখেছেন অনেক কথাই। তিনি জানিয়েছেন যে, থার্মোমিটারের খাপের, যে কোনো নামী মেকারের যত দামি জিনিসই হোক না কেন, বগলে গলিয়ে দিলেই কিছু জ্বর-উত্তোলনের ক্ষমতা জন্মে না, বরং তাকে বগলদাবাই করাই এক বিড়ম্বনা! উপরন্তু, আরো বিশেষ করে এই কথাও তিনি জানাতে চেয়েছেন যে, সেবাই হচ্ছে চিকিৎসকের ধর্ম; যখন, যে সময়ে, যে অবস্থাতেই রোগার্ত আসুক না কেন, তাকে সুস্থ না করা পর্যন্ত ডাক্তার তটস্থ থাকবেন, তা সে রুগী ইতরই হোক্‌ কি ভদ্রই হোক্‌; গরিবই হোক্‌; আর বড়োলোকই হোক সরকারি ভারী চাকুরেই হোক্‌; কি সে বেসরকারি ভবঘুরেই হোক—।

তাছাড়া আরো তিনি বলেছেন ঃ আমরা—সরকারি কর্মচারীরা, তা মন্ত্রীই হই, কি ডাক্তারই হই; দারোগাই হই বা পাহারাওয়ালাই হই; ভুলেও যেন কখনো না মনে ভাবি যে, আমরাই জনসাধারণের মনিব। জনসাধারণেরই নিমক খাই, তারি সেবার জন্যেই আছি, আমরা তাদের ভৃত্য মাত্র।

ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ সদুপদেশের পর তাঁর সার কথাটি আছে সর্বশেষে। নিজের দুরবস্থা তো তিনি স্বচক্ষেই কাল দেখে গেছেন, হাসপাতালের আর সব রুগিরা কিভাবে আছে, তাদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করতে আজ স্বয়ং তিনি—সেই তিনিই আসবেন.......ছদ্মবেশে নয় অবিশ্যি এবার—ভদ্রবেশে, প্রকাশ্যরূপে!

ছুটি হাসপাতালে।

গিয়ে দেখি বিপর্যয় ব্যাপার! বেজায় হৈ চৈ, ভারী শশব্যস্ততা সবদিকে। প্রেসক্রিপশন সব পাল্টানো হচ্ছে, বদ্লানো হচ্ছে খাতা-পত্র, রঙ-বেরঙের ভালো ভালো দাবাই পড়ছে রুগিদের শিশিতে শিশিতে। মিনিস্টার আসছেন হাসপাতাল-পরিদর্শনে! বহুরূপী সেজে নয়—দস্তুরমত সরকারি কেতায়! অফিসিয়াল্ ভিজিট্—যা তা না!

কজেই, নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই মেসোমশায়ের। হাসপাতালের কায়েমী রুগিদের অনেক করে জপানো হচ্ছে—চিকিৎসার কীরকম সুব্যবস্থা করা হয় এখানে ওদের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কি সব সুপাচ্য ও সুপথ্য ওদের দেওয়া হয়; এই যেমন—আঙ্গুর-বেদানা, সাগু-মিছরি, দুধ-বার্লি, মাখন-পাঁউরুটি, সুপ-সুরুয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি!

অনাস্বাদিত তালিকা মুখস্থ করতে করতে হাঁপ ধরে যাচ্ছে—নাভিশ্বাস উঠছে বেচারাদের, মনে মনে তারা গাল পাড়ছে মিনিস্টারকে।

ওদের মধ্যে দু-একজন আবার হয়তো যুধিষ্ঠির সেজে বসেছে, তারা দাবি করেছে, শুধু শুধু মিথ্যেকথা বলা তাদের ধাতে পোষাবে না, উপরোক্ত খাদ্যাখাদ্যগুলি বস্তুত যে কি চিজ, কেবল কানে শুনে সঠিক ধারণা করা যায় না, এমনকি চোখে দেখাও যথেষ্ট নয়, চেখে দেখার দরকার। ওই তালিকা মনে রাখবার মতো মুখস্থ করতে হলে সত্যি-সত্যিই ওদের মুখ-স্থ করে দেখতে হবে। তাদের সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা বজায় রাখতে র'ন্নার তেড়াজোড় করতে হয়েছে। নাজেহাল হয়ে পড়েছেন মেসোমশাই!

ডাক্তারখানায় তো এই দৃশ্য সেখান থেকে সটান্ ছুটি থানায়। সেখানে আবার কি দুর্ঘটনা, কে জানে!

গিয়ে দেখি পিসেমশাই তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। তিনিও পেয়েছেন এক চিঠি।

চিঠির আসল মর্ম—আসল মর্ম তিনিই জানেন কেবল! কাউকে জানতে দিচ্ছেন না তিনি। দাবাবোড়েরা তাঁর পাশেই গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের মতোই তাঁর মুখ—বেশ থম্থমে। কার সাধ্য, তাঁর কাছ ঘেঁসে! মনে হয়—কে যেন—মশাই! পিসে ফেলেছে আমার পিসেমশাইকে—আপাদমস্তক—একেবারে পা থেকে শিরোপা অব্দি।

ওধারে হাসপাতালে ভূমিকম্প দেখে এলাম, এখানে যা দেখছি, তাতে তো হৃৎকম্পের ধাক্কা!

পিসেমশায়ের এক দাবা, আর মেসোমশায়ের একমাত্র দাবাই—এসে অবধি কেবল এই দেখেছি এঁদের দুজনের। এই দিয়েই এতদিন এখানকার সবাইকে ওঁরা দাবিয়ে এসেছেন; কিন্তু আজ যেন ওঁরাই দাবিত—নিজের চালে নিজেরাই মাত হয়ে গেছেন কিরকমে! ওঁদের কাত দেখে আমারো ভারী রাগ হয়—কিন্তু কার উপর যে, বুঝতে পারি না সঠিক!

ভূমিকম্পেরই দেশ বটে বিহার। ছোটখাটো ভূমিকম্প যেখানে সেখানে যখন তখন লেগেই রয়েছে ও অঞ্চলে আজকাল!

প্রকৃতি-রসিকের রসিক প্রকৃতি

হীরু নিজের নামই পালটে ফেলল—মনে মনে। পালটে রাখল কণ্ঠভূতি। গুরুভক্তি গুরুতর ভক্তি হয়ে দাঁড়ালে যা হয়।

গোমো-প্যাসেঞ্জারের ইন্টারক্লাসে দুজন মোটে যাত্রী। একজন আধাবয়সী, অপর জনের বয়স বাইশ থেকে বিয়াল্লিশ—এর মধ্যে যা-কিছু আন্দাজ করে নেয়া যায়। এই অপরজন অপর কেউ নয়, আমাদের হীরু।

রামরাজাতলা পেরুতেই আধাবয়সীটি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে আধপোড়া বিড়িটা বার করেছেন। সহযাত্রীর দিকে নেক্‌নজর দিয়েছেন তারপর—"দেশলাই আছে মশাই?"

হীরু যেন শুনতেই পায় ন।

আধাবয়সীর দ্বিতীয় বার মনোযোগ-আকর্ষণের প্রচেষ্টা—"দেশলাই— ম্যাচিস্?"

"নাঃ।" ভুরু কুঁচকেই বলে হীরু —"ভালো জ্বালাতন!" এই দ্বিতীয় বক্তব্যটা অর্ধস্ফুটস্বরেই ব্যক্ত হয় ওর।

বিড়ি-হাতে বহুক্ষণ ইতস্তত করেন ভদ্রলোক, কিন্তু মৌড়িগ্রাম পেরুবার পর আর তাঁর ধৈর্য থাকে না। বাঁ-পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটাকে বাহির করেন। এতক্ষণ পরে অগত্যা অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটা কাঠি তাঁকে বরবাদ করতে হয়। দুনিয়ার যা গতিক—বাজে খরচ এড়াবার যো কি! সামান্য একটা দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে সাহায্য করবে, এমন কেউ কি আছে কোনোখানে? দেশের কোত্থাও নেই। পরের বাড়া-ভাতে কাঠি দেয়ার লোক আছে, কিন্তু পরের বারকরা বিড়িতে কাঠি দিয়ে উপকার করবে, তেমন মতিগতি কি আছে কারো এই স্বার্থপ্রবণ সংসারে?

দুজনেরই দৃষ্টি জানালার বাইরে। অনেকক্ষণ থেকেই। দেখতে দেখতে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আধাবয়সী—"দেখছেন মশাই, দেখছেন? কী সুন্দর, কী অবর্ণনীয়!"

হীরু ভালো করে দ্যাখে—"কোথায় বলুন তো?" স্বভাবতই তার কৌতূহল হয়।

"কেন, ওই। ওই মাঠেই তো! ওই মাঠের ধারে। দেখুন না, আমার শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

"কই দেখি।" উৎসাহবোধ না করলেও সে রোমাঞ্চ দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়।

"আহা, আমার গায়ে কি দেখচেন? ওই মাঠে! মাঠেই দেখেন না!"

"হ্যাঁ, দেখেছি। গাইগুলো বেশ পুরুষ্টু পুরুষ্টু।" হীরু মাঠের দিকে তাকায়, তাকিয়ে আরো গম্ভীর হয়ে যায় হীরু।

"গোরু কি মশাই, ঘেঁটু—ঘেঁটু।"

এবার হীরু খুব মনোযোগ দিয়েই দেখার চেষ্টা করে। চোখ পাকিয়েই দ্যাখে; কিন্তু যতই পাকিয়ে দেখুক, প্যাসেঞ্জার-গাড়ি হলেও তত আর কিছু আস্তে চালাচ্ছে না যে, গোরুর সঙ্গে গোরুর অপভ্রংশ ইত্যাদিও তার চক্ষুগোচর হবে।

"গোরুই দেখ্‌ছি, ঘুঁটে তো দেখতে পাচ্ছি না মশাই?"

"ঘুঁটে নয়, ঘেঁটু—ঘেঁটুফুল! ওই যে এন্‌তার ফুটে রয়েছে—মাঠ ছেয়ে।"

"ওঃ—তাই বলুন।" হীরু তেমন উদ্দীপনা পায় না! ঘেটু তো কি! কি হয়েছে তাদের নিয়ে এমন ঘোঁট পাকাবার? সারা মাঠ যদি ঘেঁটুফুলে ঘুট ঘুট করে—তাহলেই বা কি? ঘুটে হলেও কথা ছিল বরং কাজে লাগে।

"হায়! ফুলের চোখ নেই আপনার!" আধাবয়সী দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতোই একটি সুদীর্ঘ বাক্য ত্যাগ করেন—"ফুলের চোখ কজনের আছে, ফুলের মর্ম বোঝে কজন, প্রকৃতি রসিক কজনা হয়?"

হীরু কান খাড়া করে শুনে যায়, বুঝতে পারে না কিছু। মুখ বুজে থাকে চুপ করে।

"আপনি বুঝি ফুল ভালোবাসেন না?"

হীরু একটু হকচকিয়েই গেছে। এত মাথাব্যথা কেন রে বাপু, ফুল টুল নিয়ে? হঠাৎ সে কিছু বলে বসতে চায় না। কে জানে, ফুলকে না চেনা হয়তো অমার্জনীয় একট অপরাধ; ফুলকে ভালো না বাসা বোধ হয় ঘোরতর বোকামি! কে জানে!

অনেক ভেবেচিন্তে, স্মৃতি-সমুদ্র তোলপাড় করে বেশ ওয়াকিব্‌-হাল্‌ হয়ে তবে সে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, ভালোবাসি—"মাথা নেড়ে সে বলে—"ভালোবাসি বই কি!"

আপ্যায়িত হন আধবয়সী —কোন্‌ ফুল আপনার সবচেয়ে প্রিয়? বলুন শুনি?"

হীরু আঙুল কামড়ায় আর ভাবে। মাস্টারের দুরূহ প্রশ্নের সামনে বিগত শতাব্দীতে ক্লাসের বেঞ্চে দাঁড়িয়ে যা ছিল তার চিরকালের বদভ্যাস।

"কোন্‌ ফুল?" ভদ্রলোক একে একে নাম জাহির করেন, "কুমুদ, কহ্লার, করবী? বেলি....চামেলী যুঁই? মালতী, বেলা, বকুল? জবা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ? হেনা, কেয়া, হাস্নুহানা? জলপদ্ম? না স্থলপদ্ম?"

হীরু তখনও দাঁত খুঁটছে—তার প্রিয়তম ফুলের নামটি সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা করবে কিনা ভাবছে মনে মনে।

ভদ্রলোকের দ্বিতীয় দফার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ততক্ষণে—"চাঁপা, ডেইজি, ভায়োলেট? রোজ, টিউলিপ্‌, ড্যাফোডিল্‌? ক্রিসেন্‌থিমাম্‌, ডালিয়া, রডোডেন্‌ড্রন্‌?"

এবার পিলে চম্‌কে যায় হীরুর। মরিয়া হয়ে সে বেফাঁস করে ফ্যালে ফস্‌ করে—"আমি? আমি ভালোবাসি—বলব? কুমড়োর ফুল। ব্যাসমে ভেজে কেমন বড়া করেন মা। খেতে বে—শ।"

বড়াই করার মতোই ভালোবাসো, কিন্তু তারই আঘাত যেন বজ্রাঘাত। বিনামেঘেই মাথার উপর। সামলে উঠতে সময় লাগে ফুল-দরদীর।

ততক্ষণে আঁদুল ছাড়িয়েছে গাড়ি। ভাবতে ভাবতে চলেছেন ভদ্রলোক। প্রকৃতির প্রতি প্রেমই প্রকৃত প্রেম—এ সেই রসের রসিক কি করে নেবেন এই আনাড়িকেও? এই নেহাৎ কুমড়ো-কাতরকে তাঁর স্বধর্মে দীক্ষিত করা কি সহজ হবে? এই কুমড়ো পটাশকে নিয়ে করবেন কি তিনি সেই মহৎ দুশ্চেষ্টা?

অবশেষে বহুৎ—বিবিধ চিন্তার পর প্রকৃতি-প্রেমের প্রথম ভাগ তিনি খুলে ধরেন—"ওই যে, দূরে—দেখতে পাচ্ছেন? কী দেখছেন?"

ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে হীরু—"ঘেঁটু? কই ঘেঁটু তো আর দেখছি না?"

"আহা, ঘেঁটু কেন গো? গাছপালা! গাছপালা দেখছেন না?"

"দেখব কি, পালায় যে। রেলগাড়িতে বসে কি দেখবার জো আছে মশাই?"

অক্ষর-পরিচয়ের গোড়াতেই বাধা! বৃক্ষ-বিশারদ একটু বিচলিতই হন —"এখন গাড়ি ছুটছে কিনা, তাই গাড়ির তাড়ায় পালাচ্ছে অমন করে। নইলে ওরা পালায় না, দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। নড়ে না চড়ে না পর্যন্ত, মানুষের চেয়ে প্রকৃতিকে ভালোবাসার ওই তো সুবিধে। ওইখানেই তো! মানুষ পালিয়ে যায়, প্রকৃতি পালায় না! তাড়া করলেও না।"

হীরু বলে—"হুঁ।"

"মানুষকে আমরা ভালোবাসি কেন?" শিক্ষা এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে —গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে—"হাত-পা আছে বলেই তো? তাও তো মোটে দুটো হাত আর দুখানি পা, তার বেশি আর একটাও না। কিন্তু গাছ-পালার? শত শত হাত—কত শত বাহু! ওইগুলোই তো ওর শাখা-প্রশাখা। তবে গাছপালা ফেলে মানুষকে ভালোবাসতে যাব কেন?"

"গাছের কিন্তু পা নেই।" হীরু ক্ষোভ প্রকাশ করে। পাহাড় প্রমাণ এই খুঁতটির জন্যই খুঁতখুঁতে হয়ে ওঠে।

"তাই তো পালাতে পারে না, তাই তো ওর নাম পাদপ। সেই কারণেই তো মানুষের চেয়ে ওরা উপাদেয়!"

হীরু ঘাড় নাড়ে—"তা বটে।"

ফুল না ধরুক, এতক্ষণে ফল ধরেছে দেখে ভদ্রলোক পুলকিত হন। শিক্ষাদানের পর এবার পরীক্ষা শুরু হয় তাঁর—"আপনি কি মানুষকে ভালোবাসেন?"

"মানুষকে?" সন্দিগ্ধ হয় হীরু। "মানুষকে ভালোবাসবো কেন?"

তারপর একটু ভেবে নিয়ে কয়ঃ "অবশ্যি একেবারে যে ভালোবাসা যায় না তা নয়। হাতে কোনো কাজ না থাকলে নাহক খইভাজার বদলে মানুষকে হয়তো ভালোবাসা যায়। কিন্তু তাকে ভালোবাসার কী আছে বলুন?"

"তাই বলে কে! মানুষকে ভালোবাস্‌তে যাব কেন? কী আছে মানুষের। প্রকৃতির রূপগুণের কাছে মানুষের রূপগুণ? আরে ছ্যা। প্রকৃতির ভালো বাসার কাছে মানুষের

ভালোবাসা?....মানুষকে ভালোবাসার ঝক্কি কত? ঝামেলা কম নাকি? তাকে চপ কাটলেট খাওয়াও, বায়োস্কোপ দেখাও। তাকে প্রেজেন্ট দাও, তার কাছে প্রেজেন্ট থাকো! কেবল খরচা আর খরচা! দূর দূর! মানুষকে আবার ভালোবাসে মানুষ! তার পর সে যদি ভুলে প্রতিদান দিতে শুরু করে, তখন আবার আর এক ঠ্যালা—তার ভালোবাসার ঠ্যালা সামলাও তখন! মানুষ একবার ক্ষেপলে—ভালোবাসতে লাগলে রক্ষে আছে আর? তখন পালিয়ে বাঁচো—পারো যদি! বাব্‌বা, সে কী ঝন্‌ঝাট্‌!"

"যা বলেছেন!" হীরুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যেন খাপে খাপ মিলে যায়।

"প্রকৃতির বেলা এসব মুশকিল নেই কিন্তু! এক পয়সার বাজে খরচাও হয় না।"

রসিক লোক প্রথমে রসি দিয়ে বাঁধেন, পরে সিক্‌ দিয়ে বেঁধেন—আসল কথাটি তিনি ব্যক্ত করেন অবশেষে—"নিখরচায় ভালোবেসে নাও—যত পারো। যেমন খুশি।"

হীরু মুহ্যমান হয়ে পড়ে— "আমিও আজ থেকে মানুষকে তালাক্‌ দিয়ে দিলাম!"

"আমি বন ভালোবাসি, জঙ্গল ভালোবাসি, বুনো জংলিদের ভালোবাসি — বনমানুষকেও ভালোবাসি। কিন্তু মানুষ? মানুষ আমার দুচক্ষের বিষ! টাকা ধার নেয়, নিয়ে সুদ দেয়, ওই দিনকতক—দু এক মাসই কেবল —তার পর আর সুদও দেয় না। শোধ তো দেয়ই না, দেখাই দেয় না, শেষটায়! হাড় ভাজাভাজা করে খায়! নাঃ, হাড় হাভাতেদের উপর আমি চটে গেছি।"

"আমিও!" হীরুও ঘোরতর রেগে যায় অকস্মাৎ। যদিও টাকাকড়ি নিয়ে কিংবা দিয়ে কোনোদিন কেউ তার সঙ্গে ছলনা করেনি কখনো, তবুও রাগবার কথাই বটে!

"ছোটোবেলা থেকেই আমি প্রকৃতির বুকে লালিত, প্রকৃতির স্তন্যে পালিত, প্রকৃতির কোলেই মানুষ। আমার খান দুই বই আছে, পড়ে দেখবেন, 'গাছপালার ভালোবাসা', আর 'বনজঙ্গলের বাহুপাশে'—বাই ভবভূতি ভট্টাচার্য। দেখবেন পড়ে, অনেক কিছু শেখবার রয়েছে তাতে।"

ভবভূতি ভট্টাচার্য! ইনিই—ইনিই কি সেই সুবিখ্যাত—সেই প্রায়-অপরাজেয়—? হীরু অবিভূত হয়ে পড়ে; নিজের নামই বদলে ফেলে, বদলে রাখে কণ্ঠভূতি! গুরু বলে মনে মনে মেনে নেয় ভবভূতিকে—এতদিনে, সৌভাগ্য-বশে, নিজের গাড়িতে বসেই সে অকস্মাৎ পেয়ে গেছে বনের মানুষকে—তার মনের মানুষকে। কণ্ঠভূতি! কী মানে হয়, কে জানে! কিন্তু গুরুর নামের সঙ্গে গুরুতর মিলে মিলিত করে নিজেকে সে সম্মানিত করে। বিগলিত হয়ে বলে— "আমিও! আমিও প্রকৃতির বুকে খুব দৌড়েছি ছেলেবেলায়! কত কাপ আর মেডেলই না উইন্‌ করলাম! গড়ের মাঠে কি কম প্র্যাকটিসটাই করেছি মশাই?"

"গড়ের মাঠে?"

"কেন, গড়ের মাঠ কি প্রকৃতি নয়?" হীরুর সংশয়াকুল প্রশ্ন।

"হ্যাঁ, প্রকৃতি বই কি! প্রকৃতিই। তবে কেল্লার কাছে, এই যা!"

"একটু কঠোর প্রকৃতি! এই তো? তা, যা বলেছেন! পা হড়কে গিয়ে কত আছাড়ই

না খেতাম—বাপ্‌স্! তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম যে, জায়গাটার প্রকৃতি ভালো নয়। তত সুবিধে প্রকৃতির নয়!"

"আপনি বুঝি দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন্ ছিলেন এককালে? নামটি কি, জান্‌তে পারি আপনার?"

"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকণ্ঠভূতি চট্টোপাধ্যায়।"

"কণ্ঠভূতি? কণ্ঠভূতি আবার কি?" ভবভূতিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়।—"এ রকম নাম আবার হয় নাকি? মানে কি এ নামের?"

"খুব টানা-হ্যাঁচড়া করলে মানে একটা বেরয় অবিশ্যি। কণ্ঠভূতি, কিনা কাঁঠালের ভূতি!" হীরু প্রকাশ করে বলে— "বেশ একটু প্রাকৃতিক গন্ধও আছে, নয় কি?... হেঁ হেঁ...! কাঁঠালের কোয়াটোয়া খেয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিন না, দেখবেন, কেমন মাছি ভন্ ভন্ করছে—রাজ্যের মাছি! প্রকৃতির রাজ্য থেকেই আমদানি সব। আমদানি বা কাঁঠালদানি—যাই বলুন!"

যাকে আনাড়ি ভেবেছিলেন, তার নাড়িতে পর্যন্ত প্রকৃতির ছাপ—পেল্লায় রকমের! ভবভূতি ধাক্কা খান এবার! অতি কষ্টে আত্মসংবরণের পর তাঁর প্রশ্ন হয়—"তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে মশায়ের?"

"আজ্ঞে, রাঁচি। মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি কিনা!'

"আমিও রাঁচিতেই। তবে মামা-টামার বাড়ি নয়—প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে। শুনেছি ভারী সুন্দর—সুঠাম জায়গাটা।"



এইভাবে ওদের আলাপ আর গোমো-প্যাসেঞ্জার সবেগে এগিয়ে চলে। প্রকৃতির মারপ্যাঁচটা একবার বুঝে নিতেই কঠভূতি তার পর অনেক বিষয়েই ভবভূতির তুরুপের পিঠে নিজের টেক্কা মেরে বসেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কটভূতির টক্করে—বেটক্করে পড়ে কতবার যে নাজেহাল হতে হয়েছে ভবভূতিকে!

পরদিন প্রাতঃকালে মুড়ি-জংশন—গাড়ি অদল-বদলের জায়গা। ভবভূতি ও কঠভূতি দুজনেই নেমে পড়েন। ওপারের ছোটো লাইনে রাঁচির গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

নেমেই এদিক-ওদিক কী যেন খোঁজাখুজি করেন ভবভূতি। "নাঃ, কোথায় আছে, কে জানে!"

"ও! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? প্রকৃতিকে খুঁজছেন?" গুরুদক্ষিণা-দানে উদ্‌গ্রীব কঠভূতি—"কেন, ওই যে সামনে, এই যে পিছনে—ওই উপরে—আশে-পাশে চারিদিকেই তো! নেই কোথায়? ওই দেখুন, ওধারে পাহাড়, এধারে রাঙ্গামাটির পথ, কত দেখবেন! আর ওই দূরে ঘন—ঘনায়মান ঘনীভূত অরণ্য!"

"থামুন মশাই!" ভবভূতি বাধা দ্যান—একটু বিরক্ত হয়েই।

"থামব? থামব কেন? প্রকৃতির সামনে কেউ কখনো থামতে পারে? এমন হৃদয়াবেগ থামানো যায় কখনও? ওই-ওই দূরে দিগ্বলয়রেখা—সুনীল আকাশের গায়ে ভাঙা মেঘের—? কি বলব—? ভাঙা মেঘের কারচুপি! কিন্তু ওই কারচুপি ভেঙে শিশু-সূর্যের পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ? প্রকৃতির শিশুকে কি লুকিয়ে রাখা যায়? রাখতে পারে—ঢাকতে পারে—রুখতে পারে কেউ? আর—আর সূর্য—সূর্য তো প্রকৃতিরই শিশু! নয় কি?" সন্দেহজনক জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায় কঠভূতি। "প্রকৃতির নগ্নশিশু, কি বলেন?"

"আপনি যে—আপনি যে—"কঠভূতির প্রতি কঠোর হতে হয় তাঁকে। —"আমাকেও ডিঙিয়ে যাচ্ছেন একলাফে। চোখ আমাদেরও আছে মশাই! আমি খুঁজছি—কোথায় মুড়ি পাওয়া যায়, আর উনি লাগিয়েছেন প্রকৃতির ব্যাখ্যানা!"

"মুড়ি? মুড়ি কেন? মুড়ি কি এখানে মেলে?"

"বাঃ, মুড়ি-জংশন যে! মুড়ি থাকবেন না? কাল সারারাত তো পেটে কিল মেরে কেটেছে—!"

"মুড়ির দরকার কি! আমার সঙ্গে এক বাক্স খাবার আছে। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ—কত কি! টিফিন্-ক্যারিয়ার ভর্তি একেবারে।"

"বাঃ, বলেননি এতক্ষণ একথা?" ভবভূতি লুফে নেন কথাটা—লাফিয়ে ওঠেন কথার সঙ্গে—"বেশ লোক তো আপনি!"

"কাল রাত্রে আপনিও খাওয়ার কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না, আমি ভাবলাম, প্রকৃতি-প্রেমিকদের বুঝি খাবার লালসা থাকতে নেই। তাদের হয়তো একবেলা খেলেই হয়!" হীরু আস্তে আস্তে বিশদ হয়—"তাই—তাই আমিও—আপনার দেখাদেখি—খেলাম না আর।"

"তা না খেয়েছেন, ভালো করেছেন"—বলতে না বলতে রাঁচির ছোটো গাড়িতে উঠেই না আহারের বহর ছোটান ভবভূতি। টিফিন ক্যারিয়ারের তিন তালা একাই তিনি ফাঁক করেন, কণ্ঠভূতির তাল দেবার জন্যে কেবল নীচের তালাটা অবশিষ্ট থাকে।

পেট ঠাণ্ডা হবার পর প্রকৃতির সৌন্দর্য আবার পরিব্যক্ত হতে থাকে। রাঁচির গাড়ি চলেছে ঢিমে তেতালায়। দুধারেই শালবন—শাল দোশালার সমারোহ! উত্তুঙ্গ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে ভবভূতির প্রকৃতি তুঙ্গী হয় আবার—"কণ্ঠভূতিবাবু, দেখুন দেখুন! চেয়ে দেখুন! না চাইতেই ঢেলে দিচ্ছে! মেলে দিচ্ছে। প্রকৃতির লীলা বলতে হয় তো একেই। আমি কেবল আশ্চর্য হয়ে এই ভাবি, যেখানে জনমানবের বসতি নেই, সেখানেই প্রকৃতিরাণীর এমন অগাধ ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রাখার কী মানে! কে দেখবে এত রূপ বুঝবে কে?"

কণ্ঠভূতিও উত্তাল হয়ে ওঠে—"কেন, বাঘ-ভালুকে? তাদের জন্যেই তো এত! চোখ আছে মশাই তাদের—তাদেরও। বেশ ধারালো চোখ—মানুষের চাইতেও চোখা! প্রকৃতির মর্ম পশুতেই বোঝে—মানুষ কি বুঝবে বলুন?"

"তা বটে!" সখেদে বলেন ভবভূতি—"বিউটি এ্যান্ড দি বিসট" বলে একটা বয়েতেই রয়েছে বটে! কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হচ্ছে, যখন চালশে ধরবে, চোখে ছানি পড়বে, ভালো দেখতে পাব না—এই শালগাছের সার, ওই দূরের পাহাড় আর আমার চোখে ধরা দেবে না তখন—তখন আমি বাঁচব কি করে! কী নিয়ে বাঁচব—কীসের জন্যেই বা! এই কেবল আমি ভাবি।"

তাঁর পরিত্যক্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গেই কণ্ঠভূতির ব্যবস্থাপত্র বেরিয়ে যায়—"কেন! আপনি আত্মহত্যা করবেন তখন। কিজন্যে বাঁচতে যাবেন আর?"

"আত্মহত্যা!" ভবভূতির প্রাকৃতিক পিত্ত জ্বলে ওঠে—"মরা কি এতই সোজা নাকি মশাই? তাহলে আর ভাবনা ছিল না।"

"এমন আর শক্ত কি? টীকে না নিয়ে বসন্ত-রুগির মড়া ফেলুন, কাঁঠাল খেয়ে কলেরা রুগির সেবায় লেগে যান—তাহলেই আর দেখতে শুনতে হবে না। আত্মহত্যার পাপও ফসকাবে, অথচ বেশ সহজেই টেঁসে যেতে পারবেন।"

দেহরক্ষার এই অবলীলাক্রম—ঘুরিয়ে নাক দেখার এই ঘোরালো কায়দা একেবারেই ভালো লাগে না ভবভূতির! আত্মমেধের একটা রাজসূয় ব্যাপার এ যেন! তিনি পাশ কাটিয়ে কেটে পড়তে চান—"নাঃ, কি দরকার! চালশে আর হবে না। এই বয়সে কি চালশে হবার ভয় আছে আমার? ষাটের পর কি চালশে হয় কারো? পাগোল!"

ষাটের বাছাদের চালশে-গ্রস্ত হবার অপূর্ব সুযোগলাভের এমনই বা কি অসম্ভব ও অসঙ্গত রকমের বাধা আছে, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোরতর তর্কের উপক্রম বাধাতেই সিল্লি ইষ্টিশন প্রসঙ্গের মাঝখানে এসে পড়ে, মাঝে পড়ে বিরলদর্শনের সমস্যাকে বেমালুম চাপা দ্যায়।

সিল্লি পেরুতেই ফের সেই দীর্ঘকায় শালগাছের জনতা—দুধারে সেই দিগন্তবিস্তারী

বিশালতার দিকে তাকিয়ে আচম্বিতে উথলে ওঠেন ভবভূতি—"কতক্ষণই বা এই অপরূপ রূপসুধা পান করতে পাবো। কী জোরেই যে ছুটছে গাড়িটা। এক্ষুনি সব পেরিয়ে যাবে, এড়িয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে, ছাড়িয়ে যাবে, উড়িয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে—চিরদিনের মতোই!"

"দেবো চেন টেনে?" গাড়ির শেকলের চিকে ভ্রুকুটি-কুটিল ভ্রূক্ষেপ কঠভূতির।

"চেন? চেন কেন?"

"তাহলে এখনই থেমে যাবে গাড়িটা—এইখেনেই! থেমে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে খানিক।"

"বাঃ, আর পঞ্চাশ টাকা গুণোগার দিতে হবে না?" কঠভূতির উদ্ধত হস্তকে তিনি শশব্যস্তে বিনীত করে আনেন। "কে? টাকাটা দেবে কে শুনি?"

ভবভূতির কথায় কঠভূতির খুবই ঘা লাগে, সে অবাক হয়ে যায়। বাস্তবিক, ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকে তার কাছে! টাকার জরিপে যারা সুষমার পরিমাপ করে—জরিমানার ভয়ে হাত গুটিয়ে নেয়, কঠভূতি তাদের কখনও মাপ করতে পারে না। তাদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই। রূপের রাজ্য হুহু-শব্দে হটেই চলে, কঠভূতিও ক্রমেই আরো গুম হতে থাকে।

এরপরেই একটা ওয়াটারিং ইস্টিশন ইঞ্জিনের জলযোগের সুযোগে গাড়ি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। 'আসছি' বলে উঠে পড়ে কঠভূতি ইস্টিশনের উলটো দিকে নেমে অন্তর্হিত হয় হঠাৎ। বহুক্ষণ আর দেখাই নেই তার, ভবভূতি ভারি ব্যতিব্যস্ত হন। এখুনি ছেড়ে দেবে যে গাড়ি!

গুরুই বড় বটেন, কিন্তু শিষ্য দড় হয়ে উঠলে গুরুকে লঘুপাক করতে কতক্ষণ? গুরুর লঘুকরণে চ্যালারা খুব মজবুত! ফিফথ ক্লাসের ছেলে যখন ফিফথ ইয়ারে পড়ে, তখন একেবারে ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায়। এক নম্বরের ইয়ার। প্রাক্তন ইস্কুলের ফিফথ মাস্টারের কি পুনরায় কান মলতে পাবার কোনো প্রত্যাশা আছে তার কাছে? কঠভূতির প্রকৃতি-প্রীতির উন্মাদনার কাছে নিজেকে পরাস্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয় ভবভূতির!

এই প্রকৃতির সাম্রাজ্যে হারিয়ে গেল না তো ছোকরা? চতুর্দিকে ব্যাকুলদৃষ্টি ভবভূতির, মায় শালগাছগুলোর আপাদমস্তক। বন্য-প্রকৃতিকে তন্নতন্ন করে তিনি দ্যাখেন। কে জানে, কোথায় কোন গাছের ডগায় চড়েই বসে আছে কিংবা ডাল ধরেই দোল খাচ্ছে হয়তো বা—ক্ষেপে গেলে অসম্ভব কিছুই তো নয়।

কিন্তু ছাড়বার মুখেই হাঁসফাঁস করতে করতে গাড়িতে এসে উঠে পড়ে কঠভূতি।

"কাজ সেরেই এলাম।" হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে—"আফশোশ আর রাখলাম না।"

"কিসের আফশোশ?"

"কোথায় গেছলুম, বলুন দেখি?"

"কি করে বলব?" ভবভূতির মেজাজ তখনও বেশ তেতে, "কোনো গাছের সঙ্গে পটে গিয়ে লটকে গেছলে নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"যা গেছো কাণ্ডকারখানা দেখিয়েছ, আশ্চর্য নয়!"

"এই কুড়ি মিনিটে আমি দেড় মাইল দৌড়ে গেছি আর দৌড়ে এসেছি, জানেন?"

"এই ফাঁকে একটু হাওয়া খেয়ে এলে বুঝি!"

"হাওয়া নয় মশাই, দেড় মাইল দূরে এক জায়গায় রেলের লাইনটা বেঁকে গেছে সেই বাঁকের মুখের ফিসপ্লেট-টা সরিয়ে রেখে এলুম!"

"কেন বলতো? ফিস্‌প্লেট যতদূর বুঝছি, তোমার এক প্লেট ফিস নয় যে, সরিয়ে রেখে খাবে—খেয়ে আরাম পাবে?" ভবভূতির বিশ্বাস হয় না। "ফিসপ্লেট কি জিনিস?" জিজ্ঞেস করেন তিনি।

"ফিসপ্লেট হচ্ছে লাইনের জোড়। জোড়ের মুখের প্যাঁচ। গাড়ির মারপ্যাঁচ।" হীরু জানায়—"গাড়িকে মারবার মারপ্যাঁচ।"

"তার মানে?" কথাটা যেন কেমনতর লাগে ভবভূতির।

"মানে, ওখান দিয়ে গেলেই গাড়িটা ডিরেলড হবে, উল্টেও যেতে পারে— -ব্যস্ তখন বসে বসে মজাসে প্রকৃতির রূপসুধা পান করুন। কারও খেসারত গুনতে হবে না। একপয়সা খরচা নেই—তোফা!"

এতক্ষণে সমস্ত রহস্যভেদ হয়। মুখে বাক সরে না, ভবভূতির দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। অ্যাঁ! তিনি কি তবে শুধু রাঁচিই যাচ্ছেন না, রাঁচিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন—এক কামরায়, নিজের কাছাকাছি বসিয়ে? বিদ্যেমাত্রই গুরুমারা, কিন্তু তার চোট কি এতদূর—গুরুকে প্রাণে মারা অবদি গড়াবে—কী সর্বনাশ! কঠভূতির প্রকৃতি-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখে তাঁর তাক লাগে।

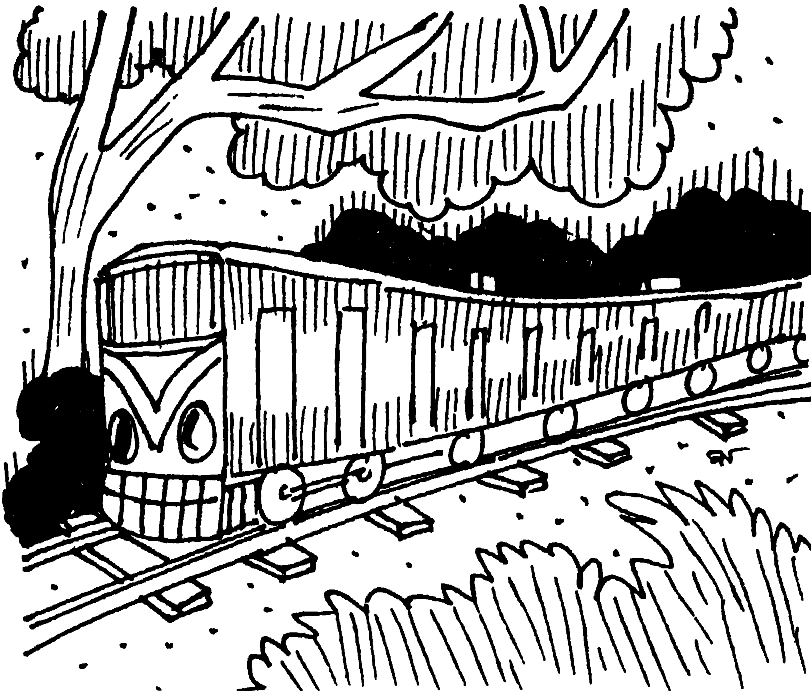
"এবার আমাদের সৌন্দর্যের স্বর্গ থেকে এক পা সরায় কার সাধ্যি! চেন টানতেও হবে না, জরিমানারও ভয় নেই, বেশ মজাসে—হেঁ—হেঁ!" টেনে টেনে হাসে হীরু।

হীরুর প্রাণ-টানা হাসির ধমকে অব্যক্ত আতঙ্কে সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে ভবভূতির! কী ভয়ঙ্কর! আর কমুহূর্তই বা বাকি রয়েছে লাইনের বাঁকে পৌঁছাতে? ওলটাতেই বা কত দেরি আর? ভাববারই কি সময় রেখেছে ছাই! কী করবেন ভবভূতি? সময় থাকতে চেন টেনে গাড়ি থামাবেন? তাহলে আবার জরিমানার দায় আছে! এক-আধ টাকা নয়—নগদ করকরে পঞ্চাশ! গুনে বাজিয়ে নেবে! না দিলে ফের জেলেই দেয়, কি পাগলা-গারদেই পোরে, খোদাই জানে!

ভারী সমস্যায় পড়ে গেলেন ভবভূতি! প্রাণরক্ষা ও ধনহানি—না—ধনরক্ষা ও প্রাণহানি—এর কোনটা তিনি বাছবেন?

গাড়ির এবং মুহূর্তের চাকা এগিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে; কিন্তু তিনিও ভাবতে ভাবতে চলেছেন—নিজের আবেগে। ভাবনার কূলকিনারা পাচ্ছেন না কোথাও। মহামারি ব্যাপার!

গাড়ি বলেই চলেছে—"ঘট ঘটাঘট—ঘট ঘটাঘট"—খুব ঘটা করেই চলেছে গাড়িটা, কিন্তু কি করা যায় এখন? ওধারে অতগুলো টাকা যায় আর এধারে যায়



কেবল একখানি প্রাণ—একমাত্র এবং একমাত্রার একটু খানি প্রাণ। আপাতত নিজের প্রাণটাকেই তিনি গণনা করছেন—গাড়ির আর সব প্রাণীর নিয়ে তাঁর কোনো দুর্ভাবনা নেই। . .বাস্তবিক কী করা যায় ?

"ঘটাং ঘট্—ঘটে ঘটুক—ঘটং ঘট্—ঘটে ঘটুক!" গাড়িটার একঘেয়ে আওয়াজ একটু যেন পালটেছে মনে হয়। যেন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে বেচারা!

টানবেন তিনি চেন, রুখবেন গাড়ির গতি—করবেন ক্ষতিস্বীকার? কেবল প্রাণহানি হলেও কথা ছিল, কিন্তু এ যে ধনপ্রাণহানি—একাধাবে ধনান্তকর ও প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ! এহেন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে একান্ত কাতর আমাদের ভবভূতি।

"ঘটাং ঘট্—ঘটাং ঘট্—" আচমকা গাড়িটা আর্তনাদ ছাড়তে থাকে—"ঘটাং ঘট্ট—ঘট্—ঘট্ ঘটাং—ঘটাং দুর্ঘটাং!—দুর্ঘটাং—ঘটাৎ!" অর্থাৎ "যা ঘটবার, ঘটে গেল, মাভৈঃ!" রেলগাড়ির ভাষায়।

বিরাট এক চিৎকার, তারপরেই বিকট বিপর্যয়! চক্ষের পলকে পিছন দিকের কামরাগুলো নেমেছে পাশের খাদে, কয়েকটা কামরার উঠবার দুশ্চেষ্টা ব্রেকভ্যানের ছাদে এবং খোদ ইঞ্জিন-সাহেব তাঁর চাকার বাহুগুলি ঊর্ধ্বে তুলে করতাল বাজাবার কায়দায় উবু হয়ে বসে গেছেন! মাঝের কামরাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন কোলাকুলি বাঁধিয়েছে যে, সেই মারাত্মক আলিঙ্গন থেকে তাদের টেনে ছাড়াবার কথা ভাবাও যায় না। চারধারেই দারুণ চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, হাহাকার! খবরের কাগজে এহেন ব্যাপারের বর্ণনা যেমন-যেমনটি আমরা পড়ে থাকি, অবিকল সেই সব কাণ্ড!

কিন্তু এই ইলাহি দৃশ্য উপভোগ করার অবকাশ তখন কোথায় ভবভূতির? তিনি গড়িয়ে পড়েছেন এক গভীর গর্তে। পড়ে-পড়েই প্রথমেই তিনি পকেট দেখেছেন, তারপরে ট্যাঁক হাতড়েছেন, তার পরেই কাছাকে অনুভব করেছেন—কাছাই তাঁর তৃতীয় মানিব্যাগ কিনা। আর এ সবের পরেই তিনি নিজেকে চিমটি কেটে দেখেছেন। "উঃ, বাপরে!" নিজের চিমটির ঠেলায় ককিয়ে উঠেছেন ভবভূতি। নাঃ, ধনে-প্রাণে মারা যাননি তাহলে—এযাত্রা।

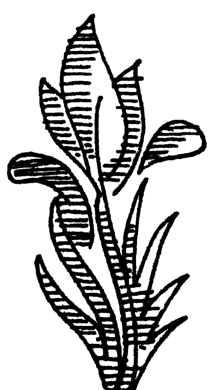
সারা দেহ তাঁর ছেঁচড়ে, ছড়ে ছড়িয়ে একাকার! সর্বাঙ্গে একটা জ্বালাময়ী অনুভূতি! করুণসুরে তাঁর কাতরোক্তি হতে থাকে—"বাবা কঠভূতি, এ কী করলি বাপা? এই কি তোর মনে ছিল রে হতভাগা!"

কঠভূতি গড়াগড়ি যাচ্ছিল অদূরেই—তেমন কিছুই তার হয়নি। একেবারে যথাযথই রয়েছে সে। কেবল ল্যাজের কাছটায়—কঠভূতির ল্যাজ নেই, কিন্তু থাকলে ঠিক যেখানে থাকত, সেইখানটায়—কেমন যেন একটা সূচিভেদ্য যাতনা! হাসিমুখ বার করেই সে জবাব দেয়—"ভবভূতি দা, চারধারে একবার তাকিয়ে দ্যাখো দিকি! কী অপূর্ব—কী অপরূপ—কী অপরিসীম—আহা, কী খাসা গো! একেবারে প্রকৃতির গর্ভে এসে পড়েছি আমরা—প্রকৃতি-রসের রসাতলে! প্রকৃত রসের রসগোল্লায়। এখন খুব মজাসে—আরাম করে—মশগুল হয়ে—হেঁ...হেঁ...হেঁ...হে..."

সেই প্রাণকাড়া টানা-টানা হাসি তার!

ভবভূতি রোষ-কষায়িতনেত্রে তাকিয়ে থাকেন।

প্রকৃতির প্রতি নয় কিন্তু—তাঁর কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবল কঠভূতির দিকে।



নকুড় বাবুর অনিদ্রা-দূর

নকুড়ের মতো ঘুমোতে ওস্তাদ দুটি ছিল না। ওর মতো একনিষ্ঠ 'ঘুমিয়ে' ভূভারতে বিরল। ওরকম ঘনঘন আর অমন ঘুমকাতুরে বড়ো একটা দেখা যায় না। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো অবস্থায়, এমনকি যে-কোনো দুরবস্থায় ওকে একবার ঘুমোতে বলো না! অবিশ্যি না বললেও চলে—বলবার অপেক্ষা রাখে না সে। মোষের মতো ঘুম দিতে বাহাদুর আমাদের এই নকুড়। চাই কি, মোষকেও হারিয়ে দ্যায় মোশাই!

ঘুমানর বিষয়ে কোনো খুঁতখুঁতপনা ওর কোনোদিন দেখিনি। যে কোনো জায়গায়—স্থানে, অস্থানে—কেবল একটু শুতে পেলেই হল। ইটের বালিশ হলে তো কথাই নেই, বেঞ্চির হাতলে মাথা দিয়েও ওর সুখশয্যা—স্ট্রিলট্রাঙ্কে মাথা রেখেও ওকে অকাতরে ঘুমুতে দেখেছি। বলবো কি, চলন্ত বাসে গাদাগাদি যাত্রী, দাঁড়াবার জায়গা নেই, এমন কি ভিড়ের চাপে বাসের পাটাতনে পা রাখবারও ঠাঁই হয় না—ঠেকানো দূরে থাক, পা ছোঁয়ানোর জো নেই পর্যন্ত—সেই ঠাসাঠাসির ভেতরে স্রেফ আকাশে দাঁড়িয়েই আরাম করে ঘুমিয়ে চলেছে সে, এমনও দেখা গেছে।

এমন যে আমাদের নকুড়বাবু, শুনলে তোমরা অবাক হবে, তারও কি না একদিন—দিনেও যার নিদ্রার সীমা ছিল না—একরাত্রে অনিদ্রা দেখা দিল। সারারাত ওর দুচোখের পাতা এক হল না—এমন কি শেষ অবধি সে বিস্ফারিতনেত্রে মোরগের ডাক শুনতে পেলো। মোরগের ডাক আর ভোরের কা-কা ধ্বনি শুনলো! বেশ উৎকর্ণ হয়েই শুনলো—তার জীবনে এই প্রথম। তার চোকের সামনেই জানালার ফাঁক দিয়ে কালো আকাশকে ক্রমশ ফিকে হয়ে—ফাঁকা হয়ে—পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখল। আস্তে আস্তে সবই তার চোখে পড়ল। আর মুহ্যমান হয়ে পড়ল আমাদের নকুড়। এই বিরাট বিশ্বে এমন দৃশ্যও যে তাকে দেখতে হবে, এও তার জীবনে ছিল, তা সে কোনোদিনই ভাবতে পারেনি।

এই ব্যাপারে যারপরনাই বিস্ময় হল নকুড়ের—বিস্মিতের চেয়ে বেশি হল সে বিমূঢ়। কিন্তু সব চেয়ে বেশি হল তার অসোয়াস্তি। এরকম তো হয় না! এমনটা তো কদাচ হয়নি। কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে ছটফট করতে লাগল নকুড়।

সেদিন সকালেই নকুড় আমাদের আড্ডায় এসে তার এই বিস্ময়কর আর বিরক্তি-জনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল। চোখে ঘুম না এলে প্রতিটি মুহূর্ত কিরকম এক-এক যুগ বলে মনে হয়—এ-রাত যেন আর কাটবে না বলে মনে হতে থাকে—তার সবিস্তার

কাহিনী চোখ বড়ো বড়ো করে শোনাল সে। মনে হয়, পলগুলি যেন পলায়ন করছে না, আগের মতন চপল নয় যেন আর! প্রত্যেকটি দণ্ড—হ্যাঁ, দণ্ডই যেন সত্যিকারের! ঠ্যাঙাচ্ছে ধরে তাকে। ভোরের মোরগ কি রকম ডাকে—কাকের ঐক্যতানই বা কি ধরনের হয়—বিশদ বিবরণে কান পেতে ধৈর্য ধরে শুনতে হল আমাদের। একে-একে সবকিছু সে শুনিয়ে ছাড়ল—কাকস্য পরিবেদনা! শুনলে মনে হয়, ধরিত্রীতে, সে-ই যেন এই প্রথম এইসব তথ্য আবিষ্কার করেছে। আদ্যোপান্ত জানিয়ে অবশেষে সে জানাল, নিশ্চয়ই ভাগ্য বিরূপ, গ্রহরা সব্বাই তার বিপক্ষে আর রাহু তুঙ্গী—তাই তার অদূর-ভবিষ্যতে নিশ্চিতরূপে দারুণ এক বিপর্যয় অনিবার্য হয়েছে—সেই অবধারিত আসন্নতার কথা অভিব্যক্ত করে আমাদের সকলের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করল সে।

"এরকমটা কক্‌খনো হয়নি এর আগে।" মুখ ভার করে বলল নকুড় ঃ "কিচ্ছু এর মানে বুঝচিনে।"

আমাদের তরফ থেকে উপদেশ-প্রদানের কোনো কার্পণ্য হল না, অনিদ্রাব্যাধি বিদূরিত করার প্রত্যেকেই আমরা এক-একটা উপায় বাতলে দিলুম। কেউ যাচ্ঞা করলে তো কথাই নেই, অযাচিতভাবে পরামর্শদানের সুযোগ পেলেও পেছপা হওয়া স্বভাব নয় আমাদের। সবগুলো ব্যবস্থাপত্র মন দিয়ে শুনে গম্ভীরভবে মাথা নাড়ল নকুড়। তার ব্যারাম এতদূর এগিয়েছে যে, এসবে আর শানাবে কি না সন্দেহ! এ-রোগ আরোগ্যের বাইরেই এখন—তাকে সারানো না, দূরীভূত করা নয়—আদপে তাকে আসতে না দেওয়াই হচ্ছে এর উপযুক্ত দাওয়াই। প্রতিষেধক-হিসেবে যদি কিছু থাকে, তো তাই এখন বলো—তাতেই নকুড়ের দরকার। জীবনের বাকি কটা দিন (এবং রাতও ধর্তব্যের মধ্যে) বিনিদ্র-দশাতেই তাকে কাটাতে হবে—এর মধ্যেই এই বিশ্বাস তার বদ্ধমূল হয়েছে। চিরনিদ্রার এধারে, বাদবাকি রাত (এবং দিনও ইনক্লুডেড) না ঘুমিয়ে তাকে অতিবাহিত করতে হবে, এই অদৃষ্টলিপিতে আস্থা পোষণ করে ফোঁস ফোঁস করছে নকুড়।

নকুড় বলছে—"কী আশ্চয্যি বলব ভাই! মোরগের ডাক শুনতে পেলুম! মুরগী ডাকছে—কোঁকর কোঁ—কোঁকর কোঁ—! এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি কানের কাছে!—" বলছে, আর শিউরে উঠছে নকুড়—বারংবার।

অগত্যা আমাকেই ও-রোগের চিকিৎসায় এগুতে হল। বিজ্ঞাপনের পেটেন্ট আর টোটকা ওষুধের ব্যবস্থায় সুখ্যাতি ছিল আমার—আগেকার যশ অম্লান রাখতে—পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার খাতিরেই নিজের ফর্দ নিয়ে আমায় এগুতে হল! আমি অবিশ্যি ওকে বিলিতি একটা পেটেন্টই বাতলে দিলাম—বিনিদ্রা-রোগের যেটি চিরাচরিত দাওয়াই—ভ্যাড়া-গোনার দস্তুর। ঘুম না এলে ভ্যাড়াদের এক-দুই করে গুনতে হবে, খালি গুনে যাও, আর কিচ্ছু না! ভ্যাড়ারা একটা বেড়া টপকে আসছে—একে-একে—

তাদের গুনতে থাক; তারা নিজগুণেই লাফাবে, তোমার খালি না লাফিয়ে গুনে যাওয়া—দেখবে, নদশ গুনতে না গুনতেই তুমি অবশ হয়ে পড়েছ। বিশের আগেই ঘুমে বেহুঁশ। উক্ত অব্যর্থ আর একমাত্র মহৌষধের একমাত্রা ওকে দিয়ে দিলুম।

আমাদের পাঁচজনের পঞ্চাশ রকমের প্রেসক্রিপশনের মধ্যে আমারটাই নকুড়ের মনে ধরেছে বলে মনে হল। এটার জন্যে ডাক্তারখানায় যেতে হবে না, পয়সা খরচ নেই, অতএব আমার ব্যবস্থাটাই আজ রাত্রে বাজিয়ে দেখবে, বলল নকুড়।

"তোমার ওষুধটায় খরচা কম।" এই কথা বলল সে।

"টোটকা ওষুধের মজাই তো ওই!" আমি জবাব দিলুম; "চট করে লেগে যায়, অথচ কোনো খরচা নেই! স্বচ্ছন্দে তুমি পরীক্ষে করো, 'ফলেন পরিচীয়তে'।"

"তাছাড়া, ভ্যাড়াদের আমি ভালোবাসি। গুনতে পারব খুব। বিস্তর খেয়েছি তো! খেতে বেশ।" এই বলে সকৃতজ্ঞ মুগ্ধনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল নকুড়।

তার বাধিত-দৃষ্টি লাভ করে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলুম। যদিও মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়ে গেছেন—'মানুষ আমরা নহি তো, মেষ!'— আর বলে গেছেন বেশ-একটু সগর্বেই বলতে হয়; তবুও এখন থেকে, আর এখান থেকেই যে সে গণনা শুরু করবে, এমনটা আমি আশা করিনি। এতটা সে তালিম হবে আমার হুকুম-তামিলের জন্যে, এতখানি প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমি ওর কৃতজ্ঞতার বোঝাটা হালকা করবার মানসে জানালাম, "গুনে দ্যাখোই না রাত্রে! রাত্রেই গুনো—হাতে হাতে গুণ দেখবে।"

বুক ফুলিয়ে বলল নকুড়—"দ্যাখো, গর্ব আমি করতে চাইনে, চালমারা আমার অভ্যেস নয়। মুখে মুখে বড়ো বড়ো যোগ কষতে পারি, এমন বাহাদুরিও আমি করব না। সোমেশ বোসও নই আমি; কিন্তু এও তোমাদের বলে দিচ্ছি, আমার গণনার ভেতর থেকে একটা ভ্যাড়াও যে কোনো ফাঁক দিয়ে ফসকে বেরিয়ে যাবে, সেটি হতে দেব না! আমার সেন্সাস এড়িয়ে পাশ কাটিযে একজনও যদি যেতে পারে, তাহলে জানবো যে—হ্যাঁ! সে বাহাদুর তা সে ভ্যাড়াই হোক, মেষই হোক, আর দুম্বাই হোক!..."

সারাদিন আমাদের আড্ডায় কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে সন্ধের মুখে নকুড় বিদায় নিল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, এমনি তার অবস্থা তখন, শুতে পারলেই বাঁচে।

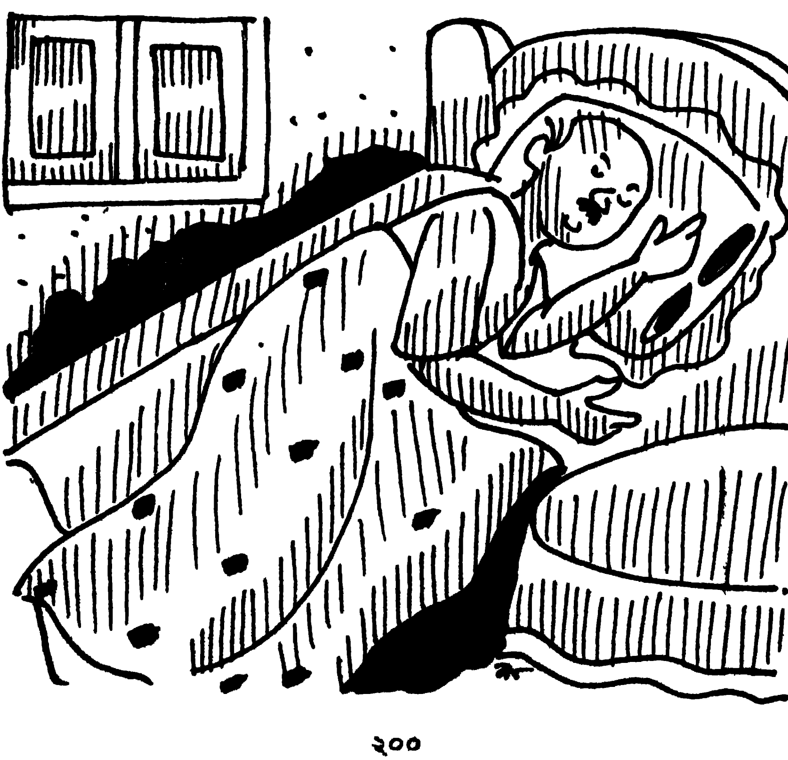
"বাড়ি যাই। তোমার সেই ভ্যাড়া-গোনা রয়েছে আবার।" দুচোখ ভারী, সে ঢুলছে; টলতে টলতে বলে গেল নকুড়।

বাড়ি গিয়ে বালিশ আঁকড়ে আশ্রয় নিতে না নিতেই সারাদেহ তার ঘুমে আর ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে এসেছে। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গত কালকের ঘুম না হবার কারণ সে ভাবতে চেষ্টা করল। এখন তার মনে হল, গতরাত্রের গুরুভোজন—বেশি রাত্তির করে বেশিরকম খাওয়াই ওর জন্যে দায়ি। বিশেষ করে গুরুতর-চর্বিওয়ালা সেই মটনচপ কটাই। তারাই তার দেহের মধ্যপ্রদেশে চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর মটনের কথা মনে পড়তেই—তার পূর্বপুরুষ—ভ্যাড়ার কথাটা তার মনে পড়ে গেল তক্ষুনি।

"ওই যাঃ! ভ্যাড়াদের গুনতে হবে না?" আপনমনে বলে উঠল নকুড়; "গোনাগুনির কাজ শেষ না করেই ঘুমোতে যাচ্ছি—বেশ তো!"

পরের দিন সকালে নকুড়কে দেখে আগের নকুড় বলে চেনাই যায় না আর! যেন কতকালের রুগি বলে মনে হয়! সারারাত কাল মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা বুজোতে পারেনি নকুড়। অঢেল ঘুমের ঢেউয়ে যেই না সে তলিয়ে যেতে চলেছে, অমনি সেই মেষ-গণনার কথা তার মনে উদয় হয়েছে; আর তার উন্মেষ হতেই তারপর থেকে চোখের ঘুম যে কোথায় পালাল, তার পাত্তা নেই। তবে পঁয়তাল্লিশ হাজারের ওপর ভ্যাড়া গুনে সে শেষ করেছে—এইটুকুই তার সান্ত্বনা! সেই পঁয়তাল্লিশ হাজারের ভেতর একটা আবার যা বেয়াড়া! বিশ্রী-রকমের! কিছুতেই সেটা বেড়ার উপর দিয়ে টপকে আসতে রাজি হয়নি। বেড়ার তলায় কোথায় একটুখানি ফাঁক ছিল, তারই তলা দিয়ে গুটি-সুটি মেরে কোনোগতিকে এসেছে সে। তার যথারীতি না আসার কথাটা এখনো নকুড় ভুলতে পারেনি। সেই অসৌজন্যের কথা স্মরণ করতেই নকুড়ের এখন হাই উঠছে আরো।

"এরকম কাণ্ড কখনো দেখিনি ভাই!" আমাদের আড্ডায় এসে পাংশুমুখে প্রকাশ করল সে; "যেই না মনে করছি এই খতম, গোনাগাঁথা সব ফিনিশ হল আমার, ঘুমবো এবার—ও-মা! আবার দেখি, কোত্থেকে আরেক পাল ভ্যাড়া লাফাতে লাফাতে এসে



হাজির! পঙ্গপালের মতোই আসতে শুরু করে দিয়েছে! পালের পর পাল। যেন পাল-রাজ্য। এবং—"

এবং আর কী? সেই লম্ফমানদের সেন্সাস না নিয়ে কনসেনসাস নকুড় আমাদের কী করে? এইভাবে দলের পর দল—নব-নব দলবলে আগুয়ান পালবংশীয়দের তালিকাভুক্ত করতে করতেই গোটা রাতটা বেচারার কাবার হয়ে গেল।

"কী বলব ভাই, এতখানি পরিশ্রম করলুম!" নকুড় আফশোশ করে; "কিন্তু পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ একটুখানি যে বিশ্রাম করব, তার আর ফুরসত হল না!"

"ভেবো না কিস্‌সু।" আড্ডার সবাই ওকে উৎসাহ দিতে লাগল; "সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গুনতে থাক। ঘুমোবার পক্ষে ওর চেয়ে মোক্ষম ওষুধ আর নেই। চকরবরতিটা বাতলালে কি হয়, আমরা সক্কলেই জানতুম ওই দাবাইয়ের কথা। সব্বার জানা। ঘুম না এলে আমরাও তো তাই করি হে! সক্কলেই করে, বিশ্বশুদ্ধ মানুষ। অতএব কোনোদিকে না তাকিয়ে তুমি খালি গুণে যাও, দেখতে পাবে, খুব শীগ্‌গিরই তুমি আঁতুড়ের শিশুর মতো অকাতরে ঘুম দিচ্ছ।"

"কালকেই তো দিতুম।" হাই তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নকুড়; "যদি না ওইসব বিচ্ছিরি বদ্ ভ্যাড়ার পালদের গুণতে হত আমায়। তার মধ্যে একজন আবার এমন ত্যাঁদোড় যে, তার ভদ্রতা বলে কোনো বোধ নেই। ভ্যাড়া হয়ে জন্মেছিস, ভ্যাড়ার মতো থাক—সবাই যা করছে, তাই কর; সবার ফলো কর! সবাই লাফাচ্ছে, তুইও লাফা! তা না—কোথায় বেড়ার তলায় সামান্য একটু ফাঁক রয়েছে, কখন থেকে পড়ে আছে, খেয়াল করিনি—বোজাবার কথা মনেও ছিল না—সত্যি কথা বলতে কি, ওটা আগে চোখেই পড়েনি আমার—আর সে ব্যাটা করেছে কি, না সেই গর্ত দিয়ে গলে হামাগুড়ি মেরে—আরে ছি-ছি-ছি! সেই মেষ-শাবকের অপচেষ্টাই আরো বেশি কাহিল করে দিয়েছে আমায়।"

তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, ওই ভ্যাড়ারাই নকুড়কে সারা সপ্তাহ ধরে বিব্রত করে রাখল। নকুড় চোখ বুজতে গেলেই তারা ভিড় করে আসে, অবুঝের মতো এসে ভিড়ে যায়—দলে দলে, পালে-পালে, কাতারে-কাতারে। চোখ বুজেও রেহাই নেই—চেষ্টা না করতেই সেই মেষপাল তার আধবোজা অনিমেষ-দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত স্পষ্টাকারে বারে বারে দেখা দিতে থাকে।

একসপ্তাহের মধ্যেই নকুড় আধখানা হয়ে গেল। নকুড়কে দেখলে নকুড় না মনে হয়ে নকুড়ের ছায়া বলেই ভ্রম হয়। নাদুস-নুদুস, নিদ্রায় ঢল-ঢল, অমায়িক নকুড়ের আমাদের এ কী হল—এ যে তার প্রেতমূর্তি!

নকুড় বলে—"বলব কি ভায়া, পৃথিবীর যত মেষ ছিল, সব আমি গুনে শেষ করেছি!"

এ বিষয়ে তার অনড় বিশ্বাস। তবে এখনো তারা ফুরোচ্ছে না কেন? তার কারণ এই, তার মনে হয়, ভ্যাড়ারা নকুড়ের সঙ্গে ছলনা করতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই

তারা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে ফিরে আবার তার সামনে এসে হাজির হচ্ছে—এহেন পুনঃপুনঃ হাজিরা দেবার তলায় কোনো রাজনৈতিক মতলব নেই তো? নইলে এইভাবে সেন্সাসে গোলমাল বাধিয়ে তলে তলে সংখ্যা-বাড়ানোর এহেন অপচেষ্টা কেন? নকুড় আমাকে জিজ্ঞেস করে—

আমাকেই জিজ্ঞেস করে! ওদের মতলব আমার কাছে জানতে চায়! আমি যেন ভ্যাড়াদের দলের এক মাতব্বর! তাদের ভেতরের খবর সব জানি!

"না কি, পৃথিবী গোল বলেই এত গোলযোগ?"

আমি এর কী জবাব দেব? সাতদিন যে ঘুমুতে পায়নি, তার মাথা কীভাবে যে নিজেকে ঘামায়, আমার তো তা জানা নেই। ঘুমানর ব্যাপারে অতদূর না হলেও প্রায় নকুড়ের সগোত্রই আমি। এক হাফ নকুড়। তবে সুখের বিষয়—আমাকে কদাপি ভ্যাড়া গুনতে হয় না। ঘুম না এলে আমি আমার প্রিয়পাত্রদের কথা ভাবি—তাদের গণনা করার প্রয়াস পাই আর তাতেই আমার ঘুম এসে যায়—চোখের নিমেষেই। আমার স্মৃতিশক্তিই বিস্মৃতিশক্তি এনে দেয়।

নকুড় নিজেই তার প্রশ্নের সমাধান করে দিল। পৃথিবী গোলাকার বলেই এইটা হচ্ছে, বলল সে। বার বার পৃথিবী পরিক্রমা করে পরাক্রমী ভ্রমণকারীর দল ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে আবার। ঘুরে ফিরে হানা দিচ্ছে। পার্থিব গোলত্ব পৃথিবীর যাবতীয় গোলমালের মতো এই গণ্ডগোলেরও মূলে।

"নিশ্চয়ই তারা ঘুরে ঘুরে আসছে! আলবৎ!" নকুড় সুদৃঢ়কণ্ঠে আমায় বলল; "একথা আদালতে গিয়ে আমি হলপ করে বলব। একটা কানকাটা দুম্বাকে আমি সাতবাব গুনেছি। একহাজার দুম্বার মধ্যে দেখলে তাকে চেনা যায়। কক্‌খনো আমার ভুল হতে পারে না।"

"তা না হোক"—আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

"না হোক, তার মানে? সেই অবাধ্যটাও তার পরে আবার! সেটাও আছে! এত জায়গা থাকতে বেড়ার তলার সেই ফাঁকটা দিয়ে গুড়ি মেরে আসবেই সে ব্যাটা!"

আমিই ওকে দাওয়াই দিয়েছিলাম—আমাকেই বাধ্য হয়ে প্রেসক্রিপশন পালটাতে হয়।

"দিন-কতক ওষুধ বন্ধ থাক এখন। তুমি আপাতক দুম্বাগোনা ছেড়ে দাও।" কাতরকণ্ঠে আমি বলি।

"ছাড়ব, তার জো কি!" বিষণ্ণমুখে সে ঘাড় নাড়ে; "না গুনে কি আমার নিস্তার আছে? একমুহূর্তের জন্যেও কি ওরা রেহাই দিচ্ছে?"

এইবার একেবারে উপসংহারে আসা যাক। যদিও লম্বা গল্পকে খাটো করে বলা আমার অভ্যেস নয়, স্বভাব-বিরুদ্ধ আমার, তবুও এক্ষেত্রে তার অন্যথা করে এইখানেই দাঁড়ি টানব।

...দিনকয়েক আগে নকুড়ের সাথে দেখা হয়েছিল। দেখে নকুড়ের ছায়ার চেয়ে

নকুড় বলেই বেশি সন্দেহ হল। শুষ্ক-বিবর্ণ গালে ফের রক্তমাংস লেগেছে। প্রেতমূর্তির বদলে তার অভিপ্রেত মূর্তিই দেখলাম আবার; দেখে খুশিই হলাম। ঘুমোনর পুরোনো দক্ষতা আবার সে লাভ করেছে, মনে হল। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনো সংশয়ই ছিল না। নষ্ট-ক্ষমতা কি করে সে পুনরুদ্ধার করল, জানতে চাইলাম আমি।

"আশ্চয্যি একটা উপায় বের করেছি ভাই!" লম্বা একখানা হাসি হেসে জানাল নকুড়; "একহপ্তা আগেই যে কেন এটা বের করতে পারিনি, তাই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছি আমার। এই বলে দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বহস্তে নিজেকে পুনঃপুনঃ চর্চড়িত করে নকুড় বলল—"আর যাই হই না, আমি যে এক চতুর লোক, এটা তো তুমি মানবে?'

"নিশ্চয়ই! অঙ্কে যে তুমি সোমেশ বোস, একথা তো মানতেই হয়।" আমি মুক্তকণ্ঠে সায় দিই; "আর যোগবলে ত্রৈলঙ্গ স্বামী!" ওর চাতুর্যের প্রশংসাপত্র চাউড় না করে পারা যায় না।

"ঠিক বলেছ। ওই যোগবলে!—যোগবলেই আমি অদ্বিতীয়। মাত্তর কাল রাত্তিরে এই যোগ-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি ভায়া! মাথার তলায় বালিশ দিয়ে চোখ বুজেছি কি বুজিনি, এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি বেড়াটা আমার চোখের উপর ভেসে উঠল—আর তার পরমুহূর্তেই সেই ভ্যাড়ার পাল! পালবংশের ভ্যাড়ারা। এক-আধটা না! লক্ষ-লক্ষভ্যাড়া!—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাড়া করে তারা ছুটে আসছে দেখতে পেলাম। সক্কলের চক্ষে সেই এক ক্ষুধিত-দৃষ্টি—সেন্সাসের তালিকায় ভর্তি হবার সকরুণ আবেদন! দলে-দলে, পালে-পালে—রেজিমেন্ট আফ্‌টার রেজিমেন্ট—তিরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। দেখেই তো আমার চক্ষুস্থির! তার ভেতর সেই কান-কাটাটাও রয়েছে আবার—হামাগুড়ি-দেয়াটাকেও দেখতে পাওয়া গেল। 'এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' তক্ষুনি আমি করলাম কি আমার কুকুরটাকে তাদের পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। তাদের বললাম —'স্থিরো ভব! থোরা ঠহ্‌ব যাও!' সহজে বুঝবে বলে রাষ্ট্র-ভাষাতেই বললাম! আর সেই ফাঁকে বেড়ার তলাকার ফাঁকটা বন্ধ করে ফেললাম—সেই বাচ্চা মেষটি তার তলা ঘেঁষে ফের না আমাকে কলা দেখায়! এদিকে সেই কানকাটা দুম্বার উপরেও নজর রেখেছি—ব্যাটা ভারী ফিচেল—বেজায় হুঁশিয়ার. খালি লুকিয়ে-চুরিয়ে আসে পাছে সে কোনো পাশ দিয়ে কেটে পড়ে—তীব্র লক্ষ রেখেছি তার উপর। তারপর এদিকে করলাম কি শোনো!"

আমি অধীর-আগ্রহে উদগ্রীব হয়ে তার সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনি।

সুচতুর নকুড় প্রকাশ করে যায়—"এদিকে করলাম কি, বেড়ার দুধারে দুটো গেট না করে দিয়ে তার সামনে শেয়ালদা আর হাওড়ার মতো বড়ো বড়ো দুটো ইস্টিশন খাড়া করে দিলাম। সবই রাতারাতি—সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর ভ্যাড়াদের সার বেঁধে দিয়ে সারবন্দী করে—সেই দুই পথে একে-একে ছাড়বার ব্যবস্থা করলাম। আর ইস্টিশনে ঢুকলেই টিকিটই কোনো—তা তুমি যেখানেই যাও না কেন—ভাগলপুর

কি মোগলসরাই, দমদম কি দুমদুমা—আর কোথাও না গেলেও প্ল্যাটফর্ম টিকিট তো তোমায় কাটতেই হবে। টিকিট কেনবার কড়াক্কড়িনিয়ম করে কয়েকজন টিকিট-চেকার বাহাল করে দিলাম। দিয়ে বেড়ার আর ভ্যাড়ার পথ মুক্ত করে নিশ্চিন্তমনে ঘুমোতে গেলাম আমি। তারপর—"

দম নিতে একটুখানি থামল নকুড়—"তারপর আর কি? সকালে উঠেই আমার ইস্টিশনের কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে সর্বসমেত কতগুলো টিকিট বিক্রি হয়েছে, জেনে নিয়েছি। কত, জানতে চাও? কাল এক রাত্তিরেই পাঁচলাখ ভ্যাড়া পার হয়েছে। নিখুঁত সংখ্যা হচ্ছে পাঁচলাখ আশি হাজার চারশো পঁচাশি।"

নকুড়ের অপূর্ব কাহিনী শুনে বিস্ময়ে আমি হতবাক।

"একটু মাথা ঘামালেই, বুঝলে কিনা, পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। এমনকি, তোমার ওই অনিদ্রা-ব্যামোরও। দেখলে তো, ভ্যাড়া-গোনা আর ঘুম-আনার—একটিলে এই দুই পাখি মারার—কেমন খুব সহজে উপায় বের করে ফেললাম! আমি যে বেশ চালাক, খুব বেশি চালাক না হলেও, এটা তোমাকে মানতেই হবে।"

নকুড়ের মুখে হাসি আর ধরে না।

অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ

আমার বাবা রেখে গেছলেন বাইশ হাজার টাকা নগদ; আর একেবারে বড়োরকমের না হলেও মেজরকমের একখানা বাড়ি। এই তাঁর স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তি—এ-ছাড়া আমি। আমি ঠিক পৈতৃক-সম্পত্তির মধ্যে বিবেচ্য হবো কিনা জানিনে, তবে আমাকেও তিনি রেখেই গেছলেন।

অবিশ্যি এখন আমি আর স্থাবর নই, অস্থাবরও নই— বরং আমাকে এখন যাযাবর বলাই উচিত। আমি এখন যাবার মুখে।

বাবার থোক বাইশ হাজার আর মেজ কিংবা সেজরকমের একটা বাড়ি নগদ পেয়েও আমি যে সুস্থশরীরে বাহাল-তবিয়তে এমনভাবে না খেতে পেয়ে মারা যাব, একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

কেন যে মারা গেলাম (অবশ্য এখনো ঠিক মারা পড়িনি যদিও, তবে কেন যে মরতে বসেছি), তা এখন অদ্ভুত রহস্যই আমার কাছে। কেবল আমার কাছে না—আমার বন্ধুদের কাছে, কলকাতার যাবতীয় ডাক্তারের কাছে —রাস্তা দিয়ে যে লোক হন্যে হয়ে ছুটছে, তার যদি খবর-কাগজ পড়ার বাতিক থাকে, তবে তার কাছেও।

খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধ হলেও খাদ্যের সঙ্গে বনিবনা করেই বেঁচে থাকে মানুষ। আমার বেলায় শুধু একটু ব্যত্যয় ঘটেছিল এর। এইটুকুই শুধু!

তবে অবনিবনা বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তেমন-কিছু নয় অবিশ্যিই!

খাদ্যের অভাব আমি বোধ করিনি কোনোদিন। প্রচুর খাদ্য পুঞ্জিভূত থাকত সর্বদা আমাদের বাড়িতে। স্বদেশি, বিদেশি, সর্বদেশী খাদ্যেরা মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে এসেছিল আমার জীবনে। বাবা তো বেঁচে থাকতে খাবারের চূড়ান্তই করে ছেড়েছিলেন। আমাদের রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আর খাবারঘর একরকম বিভীষিকাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে!

আর-খেলে, খেতে পারলে, হজম করতেও পারতুম। গরহজমের গোলযোগ তো নয়ই, পৈটিক কোনো ব্যারামের বালাই পর্যন্ত ছিল না আমার।

সত্যিকথা বলতে কি, খাবার কথায় ভয়ই খেতাতাম দস্তুরমতো। কোনো-কিছু খেতে হলে এত আমার খারাপ লাগত যে, তা আর কহতব্য নয়। কি সুখে যে লোক খায়—ঘন্টায়-ঘন্টায় খায়, দিবারাত্রই খায় এবং প্রায় আমাদের প্রথম ভাগের গোপালের মতন যাহা পায়, তাহাই খায়—সুযোগ পেলেই খায় এবং সখ করেই খায়, আমি তো তা ভেবেই পাই না! আর আমি? খাবারের সঙ্গে আমার একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। খাদ্যকে অন্তরঙ্গ করতে হলেই আমার হয়েছে!

বাবা বেঁচে থাকতে তো খাদ্যের কবলে পড়ে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়েছিল আমাকে!

সকালবেলা চোখ মেলতে না মেলতেই বিছানার পাশে ছোট্টো টিপয়ে চা আর বিস্কুট এসে হাজির!

ধূমায়মান চায়ের আবেদন নীরবেই আমি অগ্রাহ্য করতাম ঘুমায়মান হয়ে। ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকতাম পাশ ফিরে।

তারপরে আসত ব্রেক্‌ফাস্টের তলব। বাবার সঙ্গে যোগ দিতে হতমুখ-হাত ধুয়ে, কিন্তু আমার তরফের টোস্ট, পোচ আর ওভালটিন অবহেলায় পড়ে থাকত। উৎসাহই পেতাম না খাবার।

বাবা বলতেন— "একটা অম্‌লেট করে দেবে তোকে? দিক না!"

"অম্‌লেট? না, থাক্।" খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি করতাম আমি। পৃথিবীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়তাম হঠাৎ।

দুপুরে তো ফলাও রকমের ফলার! এক অন্ন আর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে দস্তুরমতন মধ্যাহ্ন-ভোজ! বাবার সঙ্গে খাবার টেবিলে গিয়ে বসতে হতআমাকে। ব্যঞ্জনবর্ণ সব বাদ দিয়ে স্বরবর্ণের সামান্য এক-আধটু সাধনায়, দু একচামচ চেখেই চটপট উঠে পড়তাম।

বাবা আফশোশ করতেন—"সবই পড়ে থাকল যে!"

"ওঃ, যা খাওয়া হয়েছে!" প্রকাণ্ড এক ঢেঁকুর উঠত আমার—"উব্-ব্-ব্-বৌ—ঔ!" সঙ্গে-সঙ্গে আমিও উঠতাম।

"ও-বাবা!" ঢেঁকুরের বহর দেখে বাবা নিজেকেই উচ্চারণ করে বসতেন!

দুঘন্টা যেতে না যেতেই ফের লাঞ্চ। ওজোর করে কাটাতাম—"দুপুরের খাওয়াই হজম হয়নি, এর মধ্যেই এক্ষুনি আবার খেতে পারে কেউ?"

বিকেলের টিফিনের বেলা কিন্তু জোর করেই পাশ কাটাতে হত। "অ্যাতো খাওয়া কি ভালো বাবা? রাক্কোস্ বলবে যে লোকে!"

"হ্যাঁ বলবে! বললেই হল! লোকের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই!" বাবা বলতেন—"যা-যা, একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আয়গে! ঘুরে-ফিরে এলে খিদে হবে তখন!"

বেরুতে না বেরুতেই বন্ধুরা এসে ছেঁকে ধরে। সবার মুখেই ওই এক বুলি—"খাওয়া ভাই, খাওয়া আজকে!" "চল্ চাঙ্গোয়ায় যাই!" কিংবা—"আমাদের পাড়ার রেস্তরাঁতেই খাওয়া যাক না আজ? বেশ মটন-চপ বানায় কিন্তু!"

খাওয়া-খাওয়া করেই এই দুনিয়াটা গেল! খাবার জন্যেই সবাই পাগল এখানে! কি খাব, কখন খাব, কেমন করে খাব, কার ঘাড় ভেঙ্গে খাব এই ভেবেই নাস্তানাবুদ! এমন খারাপ লাগে আমার এক-এক সময়ে—এই খেয়োখেয়িকাণ্ডে! অ্যাতো খেয়ে এরা কী সুখ পায়? খোদাই খালি জানেন!

কই, আমার তো খাবার ইচ্ছেও হয় না কখনো। ভালোই লাগে না খেতে। খাবার নাম করলেই গায়ে জ্বর আসে, খেতে হলে ভয়ে কাঁপতে থাকি। এক অ-খিদের কষ্ট ছাড়া (সে-কষ্ট আমার নিজের চেয়ে আমার আশ-পাশের আর সবারই যেন বেশি-বেশি আমার জন্যে—বাবার তো বিশেষ করে আরো)—অন্য কোনো কষ্টই নেই আমার। বেশ তো আছি।

বন্ধুদের নিয়ে রেস্তরাঁয় সেঁধুতে হয়। আমাব সামনেই অম্লানবদনে ওরা ডিশের পর ডিশ পোলাও আর রোস্ট শেষ কবে কারি আর কোর্মা, চপ আর কাটলেট ঝড়ের মতো উড়িয়ে যায়। নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই নিঃশেষ! টেবিলে পড়তে না পড়তেই লোপাট! আর আমি এদিকে বসে থাকি চুপ করে হাত গুটিয়ে—একদম কোনো প্রেরণা পাইনে উদর থেকে।

অবিশ্যি রেস্তরাঁর বিল আমাকেই মেটাতে হত। আর তাতেই ছিল আমার আনন্দ—হ্যাঁ, তাতেই যা-কিছু!

একবার ওরা খাবার জন্যে আমাকে খুব চেপে ধরায় চটেমটে চলে এসেছিলাম রেস্তরাঁ থেকে। সেদিন ওদের রাত বারোটা পর্যন্ত বাঁধা থাকতে হয়েছিল সেই আড়তে, সেখান থেকে—সেই খানার সীমা থেকে ছাড়া পেয়েছিল থানার সীমান্তে—দারোগার জিম্মায়। সেই থেকে আর ওরা আমাকে খেতে বলে না কক্খনো, পীড়াপীড়িও করে না আর।

আমিও বেঁচেছি।

বেড়িয়ে ফিরলেই বাবা বলতেন—"বেশ খিদে হয়েছে তো? চন্‌চনে খিদে—অ্যাঁ? হবেই। তখনি বলেছিলাম না—বেড়ানো খুব ভালো ব্যায়াম! দুবেলা বেড়াবি, বেড়িয়ে খাবি, খেয়ে বেড়াবি—তাহলেই খিদে হবে! না বেড়ালে-চেড়ালে কি খিদে হয় রে পাগ্‌লা?"

"খিদে হয়েই বা কি হবে! আর বেড়িয়েই বা হবেটা কি?"

"বাঃ, খিদে হলে খেতে পারবি। আর—খেলে-দেলে গায়ে জোর হবে, তখন বেড়াতে পারবি আরো। আমি এই ঘরের মধ্যেই কত হাঁটি, রোজ কত মাইল পায়চারি করি জানিস? তবেই না খিদে হয়! বেড়িয়ে খাই, আবার খেয়ে বেড়াই—এই ঘরের মধ্যেই বসে।"

"তোমরা তো খিদে-খিদে করেই অস্থির, আমি তো বুঝতেই পারি না যে, খিদে হলে কি হয়? আর না হলেই বা কি? কেনই বা তার জন্যে এত কষ্ট করে দৌড়োদৌড়ি করব? করতেই বা যাব কেন? কেন?"

'বুঝবি, বুঝবি—বড়ো হ, বুড়ো হ আগে, বুঝবি তখন! এখন যা, জামা-কাপড় ছেড়ে আয়গে। ডিনারের সময় বয়ে যাচ্ছে। খেতে বসা যাক। খিদে পেয়েছে বেজার, দেরি করিসনে। খেতে যখন হবেই, দেরি করে লাভ কি?"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলির পাঁঠার মতো খাদ্য-খাদকের সম্মুখীন হই। খাদ্য?

তা সে কম নয় নেহাৎ! লুচি, পাঁঠা, দুধ, ক্ষীর, দই, রাবড়ি, পায়েস, সন্দেশ—কী নেই সে-তালিকায়? আর খাদক? তিনি স্বয়ং আমার পিতৃদেব। অবশ্য আমার খাদক নন, নিখিল খাদ্য-জগতের।

উক্ত জগতের সৃজন-পালনে অনেকের অধ্যবসায় আছে জানি; যোগাযোগ থাকাও সম্ভব। কিন্তু ওর ধ্বংসকর্তা-হিসেবে বাবাকেই আমার কেবল সন্দেহ হয়। খাবার টেবিলে গিয়ে বসি, সভয়ে তাকাই বাবার দিকে।

খেতেও পারেন এমন!—ঘন্টায়-ঘন্টায় খাচ্ছেন! আর সঙ্গে-সঙ্গেই হজম! আবার খিদেও হচ্ছে বেশ! দেখতে না দেখতেই! আশ্চয্যি!

বাবার অভিযোগ শুনতে হত— "কই, খাচ্ছিস্ কই রে? ঠোকরাচ্ছিস কেবল। এই না বললি—'বেড়িয়ে এসে খিদে হয়েছে বেশ!"

"আমি কোথায় বললুম? তুমিই তো বললে!" আমিও আমার অনুযোগ শোনাতাম। —"বেড়িয়ে এলেই বেশ খিদে হবে—এতো তোমার কথা।"

বাবা শুনতেন, কিন্তু দ্বিরুক্তি করতেন না। খাবার সময়ে বাবার যা ওই দু-একটি বাক্যব্যয়, তা কেবল গোড়ার দিকেই—তারপরেই তাঁর অখণ্ড মনোযোগ গিয়ে পড়ত খাদ্যাখাদ্যের উপর। আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার, কি কথাবার্তা অপব্যয় করবার ফুরসত পেতেন না আর। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম। তবে আমিও যে নিতান্তই পেছিয়ে



নেইকো, প্রায় সমতালেই তাঁর সঙ্গে এগুচ্ছি আমার, কাঁটা-চামচের ঠুনঠুনিতে তাঁর কানকে মাঝে-মাঝে জানান দিলেই চলে যেত।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও নিস্তার নেই। প্রকাণ্ড দু'গেলাস হর্‌লিক্‌স্ নিয়ে দশটা বাজতে না বাজতেই বাবা এসে পৌঁছতেন—"নাইট্-স্টারভেশান—বেজায় সাংঘাতিক! ভারি খারাপ জিনিস, ভীষণ হচ্ছে আজকাল! রাত-উপোসে হাতিও পড়ে, জানিস তা? নাও, এখন চোঁ-চোঁ করে এইটুকু মেরে দাও তো বাপু!"

তখন আর ঠনৎকারের দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় থাকত না। বাবা নিজের গেলাসে না তাকিয়েই সোজা আমার দিকে চোখ রেখে দিব্যি ঢক্-ঢক্ করে হরলিকস খেতে পারতেন।

"কী বলছ বাবা! ডিনারই হজম হয়নি এখনো, তা আবার নাইট-স্টারভেশান! এর মধ্যেই এই টাম্‌ব্লার্-ভর্তি—উব্-ব্-ব্-বো-ও-ঔ!" বাধ্য হয়ে আরেকটা রাম-ঢেঁকুর ছাড়তে হত আমায়।

"যা-যাঃ! আর তোর বৌকে ডাকতে হবে না। এইটুকু খাবেন, তার জন্যে মা, বৌ—কত কি! নে-নে, অনেক হাঁকডাক হয়েছে। ক্ষেপে উঠতেন বাবা—"বিয়েই হল না, তার আবার বৌ! বুদ্ধি দ্যাখো না বাঁদরের!'

পান করতে হতআমায় প্রতিবাদ না করে। তারপর শেষ চুমুক খেয়ে ঢেঁকুর চেপে বলতাম—"জানো বাবা, কে-একজন খুব বড়ো ডাক্তার নাকি বলেছেন—'না খেয়ে মানুষ মরে না, বরং খেয়েই—বেশি-বেশি খেয়েই মারা যায়।' এইভাবে প্রায়ই মারা পড়ে কত লোক—তা জানো?"

"ধুত্তোর তোর বড়ো ডাক্তার!" বাবার জবাব আসত—"খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যায় দেখিসনি, নাইট-স্টারভেশান—ভারী মারাত্মক! জীবনের চেয়ে বড়ো ডাক্তার আবার আছে নাকি? আর, সেই জীবনকে জানা যায় শুধু বিজ্ঞাপন পড়লে। আর সেই বিজ্ঞাপন পড়ে আমার জানা।" বাবা জানাতেন—"না খেয়ে কি বললি? না খেয়ে মারা পড়ে না মানুষ? না খেয়ে মারা পড়ে কি লাভ—বেঁচে থেকেই বা কি সুখ? তার চেয়ে খেয়ে-দেয়ে বেঁচে থাকা—ঢের ঢের ভালো। হ্যাঁ, ঢের-ঢের! আমার নিজের মতে অন্তত।"

বাবা মারা যাবার আগে আমার প্রতিদিনের খাবার ইতিহাস এই। তার পরের ব্যাপারটা এইবার বলি—

দেহরক্ষার আগে বাবার শেষবাণী— "দ্যাখ্, কক্‌খনো খাওয়া-দাওয়ায় অবহেলা করিসনে। কদাপি না। খাবি। মাঝে-মাঝেই খাবি। সুযোগ পেলেই খাবি। খিদে হোক আর না হোক! খাবি। খাওয়া-দাওয়া যেন একেবারে ছেড়ে দিসনে, বুঝলি?"

অন্তিমকালে বাবাকে আশ্বস্ত করতেই হয়েছিল—"খাব বইকি বাবা! সুযোগ পেলেই খাবো। ফাঁক পেলেই—ফুরসত হলেই খাবো—ফাঁকি দেব না মোটেই। কিচ্ছু ভেব না তুমি।"

বাবা আমাকে আবার বোঝাতেন— "না খেলে-দেলে বাঁচবি কি করে রে? না খেয়ে কি বাঁচা যায়? খাবি—বুঝলি? দ্যাখ্, অ্যাতো অ্যাতো খেয়েও আমি মারা পড়লাম। মরতে হল আমায়। দেখছিস তো।

"আমি মরব না—কিছুতেই না—ভয় নেই তোমার।" ভরসা দিয়েছিলাম বাবাকে। "সে তুমি দেখে নিয়ো।"

"তা যদি নিশ্চিত হতুম, তবে তো নিশ্চিন্তে মরতে পারতুম! আমি চলে যাচ্ছি, এখন কে আর তোকে ধরে-বেঁধে খাওয়াবে এর পর।"

তারপরেই বাবা দীর্ঘনিশ্বাস; সে-ই তাঁর শেষ দীর্ঘনিশ্বাস।

বাবা গতাসু হবার পরেই উঠে-পড়ে লাগি আমি। নাঃ, বাবার অন্তিম আদেশ রাখতেই হবে আমাকে। বাপের কথায় রামচন্দ্র বনেই গেছলেন সোজা, আমি না হয় পেটুক বনে যাব—এ আর এমন বেশি কি? যেমন করেই হোক, খেতেই হবে আমায়—কসে খাব, গিলে খাবো, ধরে খাবো, কোঁৎকোঁৎ করে খাব, বিনাবাক্যব্যয়েই খাব, হন্যে হয়ে খাব, হন্ত-দন্ত হয়ে খাব, তেড়ে-ফুঁড়ে খাব, ধস্তাধস্তি করে খাব। হ্যাঁ, খাবই—আস্ত খাব, আস্তে আস্তে খাব, ধীরে সুস্থে খাব—গিলে খাব তার কী হয়েছে!

কিন্তু খাব কি ছাই, খিদেই নেই আসলে! মরিয়া হয়ে খেতে বসি, কিন্তু হায়! খিদেই পায় না আমার।

খাবার অনিচ্ছা যদিই-বা কোনোরকমে দূর করলুম, খাবার সদিচ্ছা আর জাগে না। ভারী মুশকিল তো।

কলকাতার বড়ো-বড়ো ডাক্তার আমাদের বাড়ি এল। এল আর গেল—কেউ কিচ্ছু কিনারা করতে পারল না।

ভারী রাগ হয় আমার! খাই, আর না খাই, সে আমার খুশি—কিন্তু খিদে হবে না কেন? খিদের আপত্তিটা কিসের? বাধাটাই বা কোনখানে? সবারই খিদে হয়, মানুষ-মাত্রেই হয়-জন্তু—জানোয়ারেরও হয়ে থাকে, কীটপতঙ্গরাও বাদ যায় না—আমি কি তবে একটা জীবের মধ্যেই গণ্য নই?

রাগ থেকে আসে তখন বৈরাগ্য! দূর, যখন মানুষের মধ্যেই নই, ইতরপ্রাণীর মধ্যেও না—তখন ইতর-ভদ্রের যে-সবে দরকার, কী দরকার আমার তাতে? কী হবে এই বাড়ি-ঘরে, এতবড়ো বাড়িতে—এই টাকার কাঁড়িতে? এত টাকাকড়িরই-বা কী প্রয়োজন আমার? খাবার জন্যেই তো পয়সা! খেলেই তো পয়সা খরচ! খাব কি—খিদেই তো পায় না আমার—খিদের নাম-গন্ধই নেই! তবে?

ধুত্তোর! ঝোঁকের মাথায় সব দানখয়রাত করে বসলাম। বাড়িখানা দিয়ে দিলাম এক অনাথ-আশ্রমে। আর নগদ যা-কিছু এক নামজাদা মঠের সেবাশ্রমে—শ্রীশ্রীঅমুকের নামে, তাঁদের নিজেদের সেবার জন্যে।

ব্যস্, এইবার নিশ্চিন্তি! পকেটেও নেই একটা পয়সা, পেটেও নেই কোনো ধান্দা। সটান এক পার্কে গিয়ে উঠি। হ্যাঁ, পার্কেই। দিনের বেলাটা ঘুরে-ফিরে, আর রাত্রে

ওখানকারই এক বেঞ্চে ঘুমিয়ে, এখন থেকে হাওয়া খেয়ে বেশ আরামেই কাটবে আমার।

হ্যাঁ, মিথ্যে নয়, হাওয়া যথার্থই একটা খাদ্যের মধ্যেই। বিনে পয়সায় এন্তার মিললেও কেন যে লোকে এত খরচপত্তর করে, এত তোড়জোড় করে, এত শোরগোল করে, এমন ঘটা করে এদেশে-সেদেশে এই হাওয়া খেতে দৌড়োয়, বুঝতে পারি এখন। একরাত্রের বায়ুভোজনেই কেমন যেন ফুর্তি লাগে। বেশ হালকা—ঝরঝরে মনে হয় শরীরটা! বাঃ, বেশ তো! বেড়ে মজাই তো! এই হাওয়া-খাওয়াই তো ভালো!

কিন্তু রোদ-বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পেটের মধ্যে একটা যাতনা বোধ করি। কেমন একটা সূচিভেদ্য যাতনা! পেটের মধ্যে যেন ছুঁচ ফুট্‌ছে, টের পেতে থাকি।

প্রভাত—আমাদের পাড়ারই প্রভাত—ভারি খাদ্যবাগীশ ছেলে। পাতায় করে কি যেন একটা চাখতে চাখতে পার্কে এসে ঢোকে। হরদমই দেখি তার মুখ চলছে, চলছেই ভরদম।

আমি লোলুপ-দৃষ্টিপাত করি ওর দিকে—"কি খাওয়া হচ্ছে হে?"

"আলু-কাবলি। খাবেন?" ওর নিস্পৃহ নিমন্ত্রণ।

"দেবে? তা দাও একটু! খেতে পারব কি? খাওয়া-টাওয়া আমার সয় না আবার। তবু দেখি চেষ্টা করে।"

নিই একটুখানি। "বাঃ, বেশ তো খেতে! দিব্যি তো—খাসাই!—কী বললে। আলু-কাবলি? চমৎকার জিনিস তো! আছে আর?"

"উঁহুঁ।" পাতাটা চটপট চেটে নিয়ে সে বলে—"খাবেন? আনব আরো? তবে দিন—দিন দুটো পয়সা। মোটে দুটোই দেবেন? চারটেই দিন না! অনেকখানি হবে তাহলে।"

পয়সা? হায়! পয়সা আমার কই! যখন পয়সা ছিল, তখন কি জানতুম যে, এমন সব উপাদেয় খাদ্য আছে এই ধরাধামে। আর এতই সস্তা-দামে? খাবার ইচ্ছাই ছিল না তখন আমার, সন্ধানও পাইনি তাই। প্রভাতও তখন উদয় হয়নি আমার জীবনে।

"না—থাক। খেলে আবার হজম করতে পারব কিনা, কে জানে!"

"কী যে বলেন! খেলে আরু খিদে বাড়ে। আরু খেতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছি—অসুখ করে না পর্যন্ত—" আলু-কাবলির ওকালতি আর থামতে চায় না ওর।

আমি পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ি এবার শহরের হাওয়া খেতে। স্রেফ হাওয়া খেলেও মাঝে-মাঝে মুখ বদলে না নিলে চলবে কেন? একরকমের হাওয়া কি ভালো লাগে সব সময়ে? হাওয়া খাওয়াতেও অরুচি ধরে যায়।

· আমার সেই ভূতপূর্ব বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই পুরোনো দারোয়ানের সাথে মূলাকাত। প্রকাণ্ড একটা বর্তনে একগাদা হলদে গুঁড়ো নিয়ে ভারী দলাই-মলাই লাগিয়েছে সে।

"পাঁড়েজি, ও কী বানানো হচ্ছে তোমার?"

"সাত্তু, বাবুসাহেব!"—বসতে পিঁড়ি দিয়ে সে বলে। আমি বসি।

"সাত্তু? সে আবার কি জিনিস? কি করবে ও দিয়ে?"

"আপনারা যে-কে ছাতু বোলেন না? হাম্‌লোক্‌ ওই-কেই সাত্তু বোলে বাবুজি!" দারোয়ানজি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে দ্যায়। একেবারে প্রাণ-জল-করা ব্যাখ্যা।

"ছাতু? সে তো ছাত থেকে পড়লেই হয় জানি!" আমি অবাক হই। "আর ছাতু হলেই মানুষ আর বাঁচে না। তক্ষুণি মারা যায়।"

"মানুষ মোর্‌বে কেনো বাবুজি? কেতো কেতো লোক এই সাত্তু খাকে জিন্দা আছে। কেত্‌না আমীর-ওম্‌রাভি!"

"বলো কি? তোমার ও-কি খাবার জিনিস নাকি? বটে?"

"আল্‌বোৎ খাবার জিনিস। বহুৎ উম্‌দা খানা। বঢ়িয়া। আপনি তো খাবন্‌ না, আপনকে তো ভুখ্‌ না লাগে, নেহি তো হামি আপনকে দিতম্‌ জারাসে। খাইয়ে দেখ্‌তন্‌!"

"না-না—খাবো না কেন? নতুন জিনিস খেতে কার না সখ হয়? বেশ তো—দাও না একটু দেখি। খুব অল্প করে—জানো তো আমার খিদেই হয় না একদম। এর উপরে আবার অগ্নিমান্দ্য হলে আর বাঁচব না!"

প্রথমে একটু চাখি। বাঃ! খাসা তো! আলু-কাবলির চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। তারপরে আরো একটু—বাঃ!—তোফাই! উম্‌দা চিজই বটে, আমীর-ওম্‌রাদের আর অপরাধ কি—দস্তুরমতোই চোস্তো খাবার। দোষ তো আর দেওয়া যায় না তাদের।

ক্রমশ ওর সমস্ত খোরাটাই ফাঁক করে আনি, থোড়াই পড়ে থাকে বর্তনে। আমার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। উৎসাহ জাগে কেমন! এতক্ষণে পেটের সেই অদ্ভুত জ্বালাটারও যেন অনেকখানি লাঘব হয়ে আসে; আর, কেন জানি না, ভারী ভালো লাগতে থাকে।

বেশ লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে পড়ি। এঃ, আজ এ কী হয়েছে আমার? খালি খালি খাবার ইচ্ছে, যা দেখছি সামনে, আশপাশে, দোকানের হাতায়, হকারের মাথায়—ছেলে-পিলেদের হাতে অব্দি।

এরকম তো আমার করে না কোনোদিনও! শ-খানেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পারলে দুনিয়ার খাদ্যসম্ভার আর আমার পকেটের ভার এতক্ষণে হালকা করে ফেলতে পারতাম! কিন্তু হায়! কানাকড়িটাও ট্যাঁকে নেই আজকে!

এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠি— "আমাকে কিছু খাওয়া না ভাই!" —বলেই ফেলি অকাতরে! —"বড্ডো খিদে পেয়েছে।"

"হ্যাঁঃ, তুই আবার খাবি! তুই খাস নাকি!" অম্লানবদনেই সে বলে— 'ইয়ার্কি করছিস! তোর নাকি আবার খিদে পায়! হুঁঃ!"

বন্ধু আমাকে সন্দেহের চোখে দ্যাখে।

"হ্যাঁরে, ভারী খিদে পেয়েছে ভাই—পাগলের মত কিদে! সত্যি বলছি তোকে কেন জানিনা, খালি খালি খিদে পাচ্ছে আজ!"

"বললেই হল!" সে আমায় হেসেই উড়িয়ে দ্যায়। "হ্যাঃ, কোনো- দিন চর্মচক্ষে তোকে খেতে দেখলুম না, তুই আবার খাবি।•যা-যাঃ। ঠাট্টা করছিস, বুঝেছি।"

দ্বিতীয় আরেক বন্ধুকে পাকড়াই ফিরতি-পথে। অনুরোধের উপক্রমেই সে বলে ওঠে—"খাবি? এই তো কথা? তা বললেই তো হয়। খাওয়া তো পড়েই রয়েছে। গদাম্—গদাম্—গুম্—।"

আমার পিঠের উপর ওর খাদ্যের অকাল-বর্ষণ শুরু হয়! দস্তুরমতন অখাদ্যই! দোস্তের মতন নয়!

উপরোধে ঢেঁকি গলা যায় বলে, কিন্তু এরকম ঢেঁকির পাড় পিঠের উপর সয়বা কার?

তারপর আর কোনো বন্ধুকে উপরোধ করি না। অবারিত পৃষ্ঠদেশ নিয়ে সে-কথা ভাবতেই ভয় খাই। সোজা ফিরে আসি আমার আস্তানায়। আমার সেই পার্কে।

এসে জলবায়ু সেবন করি। মাঠের হাওয়া আর পার্কের ঘাটের জল। কিন্তু কেবল জলবায়ু সেবা করে কতদিন—কতক্ষণ আর টেকা যাবে, কে জানে। খাদ্য হিসেবে বেশ উপাদেয় হলেও হাওয়াই যথেষ্ট কিনা, সে-বিষয়ে স্বভাবতই আমার সংশয় জাগছে এখন। মনে হয় বেশিদিন—কিংবা বেশিক্ষণ আর সংশয়াকুল থাকতে হবে না। অধিক আর বিলম্ব নেই, চরম খাদ্যই খেতে হবে আমাকে। খাবি, খাবি, খাবি—বারবার করে বলে গেছেন বাবা। বাবার সেই কথাই শেষ পর্যন্ত রাখতে হবে আমায়। খাবিই খেতে হবে হয়তো।

পৃথিবীতে সুখ নেই

হেডমাস্টারমশাই রোলকল করে চলেছেন—"...থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন..."

টেন-এ এসে তিনি হোঁচট খেলেন।

"টেন? নম্বর টেন? সমীর? আসেনি সমীর? আজো আসেনি সে?"

সমীরের পাশের বাড়ির ছেলে অশোক দাঁড়িয়ে বলল—"তার অসুক করেছে স্যার।"

"অসুখ? সমীরের অসুখ?" হেডমাস্টার বিস্মিত হয়ে উঠলেন—"সে তো খুব হেলদি ছেলে। তার আবার কী অসুখ হল?"

"আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারব না।" অশোক ইতস্তত করে "অপস্মার, না—কী।"

"অপস্মার? সে আবার কী ব্যারাম?" হেডমাস্টারমশায়ের বিস্ময় যারপরনাই।

"কি জানি স্যার। ও-তো তাই বলল।" তারপর কি যেন ভেবে নিয়ে অশোক একটা কৈফিয়ত দিতে যায়—"পরশু দিন একটা ষাঁড় ওকে তাড়া করেছিল, তাই থেকেই হয়েছে কিনা, কে জানে।"

"ষাঁড় থেকে অপস্মার?" হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়েন—"সে আবার কি? আচ্ছা, আমাদের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখব।"

পরের দিনও সমীর গরহাজির ফের। হেডমাস্টারমশায়ের ফার্স্ট পিরিয়ড, রোলকল করতে গিয়ে আবার তাঁর চোট লাগে—"টেন? নম্বর টেন? রোলনম্বব টেন? আজো—আজো আসেনি সমীর?"

অশোক উত্তর জোগায়—"না স্যার। তার শরীর আজ আরো খারাপ।"

"ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। অপস্মার। ষাঁড়ের অপভ্রংশ না—কি। তুমিই কাল বলছিলে না?"

"না স্যার, আজ অন্য অসুখ।" মুখখানা কিরকম করে অশোক রাফখাতার একখানা পাতা বার করে। "টুকে এনেছি আমি স্যার। আজ হলীমক। পত্রপাঠ জানায়।

"হলীমক? সে আবার কী?" হেডমাস্টারমশাই এবার তো ঘাবড়েই যান—"সে আবার কী অসুখ—অ্যাঁ? হোলিখেলার থেকে কিছু হয়েছে না কি ওর?"

"আমিও তো তাই ওকে জিজ্ঞেস করতে গেছলাম। ও বললে—'সে তুই বুঝবিনে

রে। হলীমক ভারী শক্ত ব্যারাম। হোলির সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই এর। ও একটা কোবরেজি অসুখ।" বিরসমুখে অশোক বিবৃতি দ্যায়।

"কোবরেজি অসুখ? আমাদের ডাক্তারকে যেতে বলবো আজ তাহলে ওদের বাড়ি।" হেডমাস্টারমশায়ের ভাবনা হয়—"কিন্তু কোবরেজি অসুখ কি ডাক্তারি-ওষুধে সারবে? আমি নিজেই একবার যাব না হয়।"

"যাবেন স্যার। নিশ্চয়ই যাবেন। ও ভারী ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে!" অশোক জানালো।

সমীরের অসুখ নিয়ে সারা ইস্কুলে শোরগোল পড়ে গেল বেজায়। এমন কি মাস্টারদের মধ্যেও। ফোর্থক্লাসে ভর্তি হয়ে এই ফার্স্টক্লাসে ওঠা অবধি একটি দিনের জন্যেও তার কোনো অসুখ করেনি, একদিনও তার ইস্কুল-কামাই নেইকো। রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্সের প্রাইজ পর-পর তিনবছর একা সমীরই মেরেছে। সেই সমীরেরই উপর্যুপরি তিন-তিনদিন কামাই! অসুখের অজুহাত করে—সমীরের মতো ছেলের গাফিলতি! ভাবতেই পারা যায় না যে!

সমীর সে-ধরনের ছেলেই নয় যে, যতই দশটার দিকে কাঁটা এগোয়, ততই তার গায় কাঁটা দিতে থাকে, কেমন যেন মাথা ধরে ওঠে, আর পেট কামড়াতে লেগে যায়। ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে। সে ধরনের ছেলেই সে নয়। অসুখের ছুতোনাতা করে একটা বাঁধা প্রাইজ—একচেটেই তার—এমন হাতধরা বাৎসরিক পুরস্কার একখানা—সে যে এত সহজে হাতছাড়া করবে, সে ছেলেই নয় সে।

হলো কি তবে সমীরের? ড্রিলমাস্টার হেডমাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলেন। বলতে কি, সমীর-বিহনে তাঁরও মন খারাপ, ড্রিল করানোর উৎসাহই নেইকো আর। সমীরের ড্রিল ছিল একটা দেখবার মতো। তার অ্যাটেনশান, তার অ্যাবাউট-টার্ন, তার ফলইন—সে যে কি জিনিষ, না দেখলে বোঝা যায় না। এমন এক মিলিটারি কায়দা যে, দেখলেই চমক লাগে; এমনকি ড্রিলমাস্টারমশাই নিজেই এক-একবার চমকে যান। বয়স্কাউট-দলের সমীরই তো ছিল আদর্শ। সেই সমীরেরই এ-কি কাণ্ড!

সমীরের অভাবে ড্রিলমাস্টারের ড্রিলের কোনো উদ্দীপনাই আসছে না আদৌ। সমীরের ফলইন ছাড়া সমস্তই যেন বিফল!

"হোলি হায়, না—কি-যেন একটা বিদঘুটে ব্যারাম হয়েছে তার, অশোক বলল আমায়।" গম্ভীরমুখে প্রকাশ করছেন হেডমাস্টার: "কাল বিকেলে দেখতে যাব আমি, যদি কালকেও সে না আসে।"

তারপর দিন সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সেই সমীরই বটে—কিন্তু অশোক যা বলেছিল, তার চেয়েও বেশি—তার ডবল ম্রিয়মাণ।

হেডমাস্টারমশাই তাকে দেখে রোলকল বন্ধ রেখেই বললেন—"এই যে সমীর! এসেছ আজ! কি খবর বল তো তোমার? হোলির হাঙ্গামা টাঙ্গামা চুকেছে সব?"

"না, স্যার! হলীমক নয়। যা ভেবেছিলাম, তা নয়। আমার লক্ষণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল।" বিবর্ণ মুখে সমীর বিবৃত করে—"খুব সম্ভব এটা আমার পাণ্ডুরোগ; কিংবা গুল্মও হতে পারে পেটে।"

পাশ থেকে অশোক ফিসফাস করে—"কোন গুল্ম? লতাগুল্ম নাকিরে? পাদপ নয় তো? পেট ফুঁড়ে তোর গাছ বেরোবে? পা দিয়ে না মাথা দিয়ে?" সবিস্ময়ে জানতে চায় সে।

"সে তুই বুঝবিনে! শক্ত কোবরেজি অসুখ।" সমীরের কণ্ঠস্বরে গম্ভীর বিষণ্ণতা।

"এক কাজ করো।" হেডমাস্টারমশাই বলেন—"আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলে রেখেছি। যেও তাঁর কাছে। তিনি ভালো করে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন।"

সেদিন বিকেলেই ড্রিলমাস্টার এসে জানালেন—"নাঃ, সমীরের গতিক সুবিধের না। সে সমীর আর নেই সার্। ড্রিল করতে গিয়ে তার পা-ই ওঠে না আর। বলে যে—কি যেন বললে—কী না কি হয়েছে তার পায়ে!" বলে কোনোরকমে তিনি দুঃখের কথাটা উচ্চারণ করলেন।

'শ্লীপদ?" হেডমাস্টারমশাই হকচকিয়ে যান—"তবে যে বলল—গুল্ম না কি? এর মধ্যেই—এই কঘণ্টার মধ্যেই—অসুখ আবার বদলে গেল কিরকম?"

"কি করে বলব! সমীরই জানে!" বললেন ড্রিলমাস্টার।

"কি বলল সমীর?" হেডমাস্টার দুচোখ তাঁর কপালে তুলেন—"কি হয়েছে বলল? এর মধ্যেই আবার কি বিপদ হলো তার?"

"শ্লীপদ, না—কি!" ড্রিলমাস্টারমশাই স্মরণশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করেন আবার—"বলছে যে—'স্যার, বোধহয় আমার শ্লীপদ হয়েছে, কই পা তেমন আর তুলতে পারছিনে তো!"

"শ্লীপদ কি বস্তু?" বিশদরূপে জানতে চান হেডমাস্টারমশাই—"কি জাতীয় অসুখ?"

"কি করে জানব?" ড্রিলমাস্টারমশাই মুখ ব্যাঁকান—"বলছে যে, শ্লীপদ কিংবা ধনুঃস্তম্ভ—এই দুটোর একটা-কিছু হবে বোধহয়। শুনে তো মশাই আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি!"

"এসব আবার কী ব্যামো? কোত্থেকে আসে?"

"কি করে জানব মশাই? পক্ষাঘাত হলেও বুঝতুম। ধনুষ্টঙ্কার হলেও বোঝা যেত।" ড্রিলমাস্টার জানান—"আবার বলছে—'এই শ্লীপদ থেকে শেষটায় নাকি গৃধ্রসীও দাঁড়াতে পারে!' এই বলে ড্রিল ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে সমীর।

বসে আছে তখন থেকেই।" ড্রিল মাস্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন—"মুখ চুন করে এককোণে গিয়ে বসে রয়েছে! দেখে-দেখে এমন বিচ্ছিরি লাগছে আমার!"

"কী সর্বনাশ! কী বললেন—গৃধিনী, না—কিঞ্চুসি? যাকগে, তাহলে তো ওকে গাড়ি করে বাড়ি পাঠানো দরকার!" হেডমাস্টারমশাই তক্ষুনি ওকে ছুটি দিতে ব্যস্ত হন।

পরদিন সমীর ফের অ্যাবসেন্ট। আবার তার দেখা নেই!

অশোক বলল, রাফখাতার পাতা উল্টে, ভালো করে খতিয়ে দেখে সে বলল—"ওর অশ্মরী হয়েছে স্যার! পাছে আমার মাথায় না থাকে, তাই আমি খাতায় টুকে নিয়ে এসেছি!"

হেডমাস্টারমশাই এবার আর ভড়কান না, বোধহয় এমনই একটা বিজাতীয় কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন মনে হয়। সহজেই ধাক্কাটা সামলে নেন তিনি—"অশ্মরী? কোনো অশ্ব-টশ্ব তাড়া করেছিল নাকি এবার?"

"কি করে জানব স্যার! আমিও তাই জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু— কিন্তু—কি বলব! আগে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে আসত, এখন কেবল মুখ কাচু-মাচু করে চুপ করে থাকে, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় আর বলে—'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে'।"

"আমি মানে—সে।" অশোক আরো ভালো করে খোলসা করে—"আমি নিজে মরতে যাচ্ছিনে স্যার! সমীর যাচ্ছে। সে খালি বলছে স্যার—'তোদের সঙ্গে এই আমার শেষ-দেখা হয়তো।"

'অশ্মরী? কস্মিনকালেও শুনিনি এমন। কোনো অমানুষিক ব্যাধি নিশ্চয়! মানুষের তো এসব রোগ হবার কথা নয়। অশ্ব-টশ্বরই হয়তো এসব হয়ে থাকে।"

"গাধাদেরও তো হয় না, যদ্দূর জানা গিয়েছে, কি বলেন স্যার?" অশোক জানতে চায়। "আমিও তো সেই কথাই বলেছি ওকে।"

"কি করে বলব! নামও শুনিনি কখনো। বিলিয়াস্-ফিভার, কি বিলিয়ারি-কলিক হলেও না-হয় বুঝতুম।" বলেন হেডমাস্টার—"এমন কি, মেলিনজাইটিস-ফেলিনজাইটিস, হুপিংকাফ, ব্রংকাইটিস—এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।"

ইস্কুল-ছুটির পর বাড়ি ফিরে অশোক সমীরের কাছে গেল। "এই যে, তুই এখনো বেঁচে রয়েছিস দেখছি! মরিসনি তো এখনো তাহলে?"

"না, এখন পর্যন্ত না।" ম্লানমুখে সমীর জানায়।

"কেন? মরছিস না কেন? এমন-সব তোর শক্ত-শক্ত ব্যামো! ভারী-ভারী উচ্চারণ! শুনে হেডমাস্টারমশাই পর্যন্ত উল্টে পড়েছেন! কী হলো তোর? মরছিস না যে?" অশোক জবাবদিহি চায়।

"কি করে বলব!" সমীর বিষণ্ণসুরে বলে—"আমিও তো তাই ভাবছি।"



"ভেবেছিলাম এসে দেখব—তুই মারা গেছিস।" অশোক ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রকাশ করে। তার স্বরে হতাশার সুর।

সমীর কিছু বলে না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

"আচ্ছা, মরলি কিনা, কাল আবার এসে খোঁজ নেবো!" অশোক নিজের মুখখানা যদ্দূরসম্ভব করুণ করে আনে—"এখন খেলতে যাই? কেমন?"

পরদিন ক্লাসে সমীরকে দেখতে পেয়েই হেডমাষ্টারমশাই উসকে ওঠেন—"আজ—আজ আবার কি অসুখ তোমার? বিসূচিকা নয়তো?"

"অ্যাঁ? আজ্ঞে?" সমীর একটু চমকেই যায় বলতে কি!

"মানে, কলেরা-টলেরা হয়নি তো?" হেডমাস্টারমশায়ের ব্যাখ্যায় একেবারে প্রাণ-জল-করা প্রাঞ্জলতা—"কলেরা আরো কঠিন হলে কোবরেজি হয়ে ওঠে কিনা। তখন বিসূচিকা হয়ে দাঁড়ায়—বিসূচিকা দাঁড়ালেই মারা পড়ে মানুষ, বাঁচে না আর!"

"বিসূচিকা বুঝি কিছুতেই সারে না স্যার?" জিজ্ঞেস করে অশোক।

"হ্যাঁ, সারে বইকি। সূচিকা দিয়ে নুন-জল ভরলে তবেই সারে। কিন্তু সে ভারী হ্যাঙ্গাম।" হেডমাস্টারমশাই জানান—"তার চেয়ে মারা যাওয়া ঢের সহজ। হ্যাঁ; ঢের-ঢের সোজা।"

"না স্যার। কোনো অসুখ না স্যার।" সমীর জানালো—"আমি ডাক্তারবাবুর

কাছে গেছলাম। তিনি বললেন, ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, আমার নাকি কোনো অসুখই হয়নি।" সমীর বলল, বেশ একটু ক্ষুণ্নস্বরেই বলল।

"অসুখ হয়নি? যাক, বাঁচা গেল!" হেডমাস্টারমশাই উছলে উঠলেন—"তবে আর কি। তবে তো ভালোই! খাও-দাও, আর পড়াশুনা করো মন দিয়ে। আর হ্যাঁ ড্রিল! ড্রিলটাও কোরো।"

"না স্যার, ভালো না। আমি নিজে বুঝতে পারছি—আমার শরীর ভালো নেইকো।" সমীর চিঁ-চিঁ করে।

"তোমার কিচ্ছু হয়নি সমীর! সত্যি কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ধরতে পারতেন। এসব তোমার কাল্পনিক অসুখ। তুমি আমাদের ইস্কুলের আদর্শ ছেলে, তোমার কি এরকম সাজে কখনো?" হেডমাস্টারমশাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।

তবুও সমীর কোনো প্রেরণা পায় না। কাতরদেহে সারা পৃথিবীর সমস্ত পীড়া বহন করে প্রপীড়িত সমীর মলিনমুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর সমীর—ইস্কুলের আদর্শ ছেলে সমীর উপরো-উপরি চারদিন ইস্কুল কামাই করল।

আর অশোক তার রাফখাতা উল্টে, পাতার পর পাতা পাল্টেচারদিনে চাররকমের অসুখের ফিরিস্তি দিল। শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত আর কামলা। সেই সঙ্গে এও জানালো যে, এই চারদিনেই তার হাড়-ক'খানা ছাড়া দেখবার মতো আর কিচ্ছুই নেই।'

ড্রিলমাস্টার বললেন—"অগ্নিমান্দ্য হলেও বুঝতুম। কামলা আবার কি ব্যামো মশাই?"

"কানমলা দিলেই সারবে।" জানালেন হেডমাস্টার—"তবে মনে হচ্ছে, বেশ কসে মলা দরকার।"

সেই মতলবে হাত কসে রোষ কষায়িত হয়ে সেদিন বিকেলেই সমীরের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন তিনি।

"সমীর, বাড়ি আছো?" বলে একখানা বাজখাঁই ডাক চাড়লেন। হেডমাস্টারি জাদরেল হাঁক!

"রয়েছি স্যার!" উপর থেকে কাহিল-গলায় জবাব এল সমীরের—"এখনো রয়েছি স্যার!"

জীর্ণ-শীর্ণ সমীর কম্পিত-চরণে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। শরীরে তার কিচ্ছুই নেই, এই গরমের দিনেও মোটা একটা কোট—সেই কোট ছাড়া আর কিচ্ছুই নেই তার শরীরে। আর তার কোটের কোটরে একতাড়া কী যেন সব। দেখলে তাকে চেনাই যায় না সত্যি।

কান মলবেন কি, হাতই উঠল না তাঁর। হেডমাস্টারের মনে হলো, ডাক্তারেরই

ভুল, একটা কোনো শক্ত অসুখ নিশ্চয়ই সমীরের হয়েছে—না হয়ে যায় না। না হলে তা হতে আর বাকি নেই।

"এ-কি! কী হয়েছে তোমার?" তিনি আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কী যে হয়েছে, তাই তো ঠিক ধরতে পারছিনে স্যার! খুব যে শক্ত অসুখ, তার কোনো ভুল নেই আর, কিন্তু একটা তো অসুখ নয়—একসঙ্গে একশোটা আমাকে ধরেছে। আমি আর বাঁচবো না স্যার!"

"আরে না-না, বাঁচবে বইকি! বাঁচবে বইকি! অসুখ হলে কি আর সারে না? সারবার জন্যেই তো অসুখ! শরীরটাকে আরো ভালো করে সারাবার জন্যেই তো অসুখরা আসে।" হেডমাস্টারমশাই ওকে উৎসাহ দ্যান "কী হয়েছে সব খুলে বলো তো তোমার?"

"কী হয়েছে, তাই তো জানিনে স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা—" খানিক ইতস্তত করে সমীর অবশেষে প্রবাহিত হয়—"আচ্ছা, আমার কি অকাল-বার্ধক্য হতে পারে?"

"অকাল বার্ধক্য? তোমার? এই বয়সে?" তবু একবার ওর আগাপাশ-তলা ভালো করে তাকিয়ে তিনি দেখে নেন। "অকালবার্ধক্য তোমার হতেই পারে না। অসম্ভব!"

"তাহলে কী যে হলো, সেই তো এক মুশকিল!" সমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে "বাতরক্ত—না রক্তপিত্ত এর কোনটা যে-কি করে বলব? আচ্ছা স্যার, আমবাত আর আমাশা কি একই ব্যাপার? ওরই একটা, কিংবা দুটোই হয়তো একসঙ্গে আমার হয়ে থাকবে। তাকি কখনো হয় না?"

"কিরকম হয় বলো তো? পেট কামড়ায় খুব? মোচড় দিতে থাকে?"

"হয়তো দেয়, কিন্তু কিছুই টের পাই না।" সমীর জানায়—"তবে—তবে মনে হচ্ছে হয়তো সন্ন্যাস হওয়াও সম্ভব। আমার কি এ-বয়সে সন্ন্যাস হতে পারে না?"

"সন্ন্যাস? তা—এমন আর অসম্ভব কি? শ্রীচৈতন্যের প্রায় এই বয়সেই তো হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যাট্রিক পাস করবার বছর, এখন সন্ন্যাসের কথা ভাবছ কেন?"

"না স্যার, সে সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাস-ব্যামো। হঠাৎ হয়—হলে মানুষ শ্রীচৈতন্য নয়, একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু স্যার, আজ কদিন ধরে আমার গলার ভেতরটা ভারী খুসখুস করছে, গলগণ্ড হয়েছে কিনা, কে জানে! না কি গোদ—না কি আপনি বলেন অন্য-কিছু? গলার ভেতর কি গোদ হয় না স্যার? গলগণ্ড কি বুঝি পিঠেই হয় কেবল? দিনরাত এইসব ভেবে—ভেবে ভেবেই আমি আরো কাহিল হয়ে পড়ছি। এত রকমের অসুখ আছে এই পৃথিবীতে—এত বিচ্ছিরি সব অসুখ—নাঃ, পৃথিবীতে আর সুখ নেই সার। চোখটাও কেমন যেন করকর করছে তখন থেকে।"

"চোখ? কেন চোখে আবার কি হলো তোমার?"

"কত-কিছুই তো হতে পারে! ইন্দ্রলুপ্ত হলেই বা কে আটকাচ্ছে?"

"ইন্দ্রলুপ্ত? চোখে ইন্দ্রলুপ্ত?" হেডমাস্টারমশায়ের চোখ কপালে ওঠে—"আমার

যদ্দুর ধারণা, চোখ যদিও একটা ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়ই বটে, তবু চোখে কদাচ ইন্দ্রলুপ্ত হয় না, হতে পারে না, কারো কক্‌খনো হয়নি।"

"তাহলে ছানিই পড়ছে হয়তো!" সমীর করুণচক্ষে তাকায়।

"হ্যাঁ, সেটা বরং সম্ভব।" হেডমাস্টার সমর্থন করেন—"কিংবা চাল্‌সেও হতে পারে। আমার একবার হয়েছিল; কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি? তার জন্যে অত ভাবছ কেন তুমি? অতো ভয়ই বা কীসের? ঘাবড়াবার কিছু নেই। ছানার মতো ছানিও তো কাটানো যায়!"

"চোখ কাটালে কি আর বাঁচব স্যার?" সমীরের দৃষ্টি আরো কাতর হয়ে আসে—"চোখ গেলে আর কী থাকবে আমার? সেইজন্যেই বুঝি কদিন ধরে খালি চোখের জল পড়ছে। সেইজন্যেই, না—কি হে? না—চোখের মধ্যে উদরী হয়েছে? আপনি কি বলেন?"

উদরীর উচ্চারণেই সমীরের উদরের দিকে হেডমাস্টারের নজর পড়ে।

"তোমার কোটের পকেটে উঁচু হয়ে রয়েছেওটা কী হে? টেলিফোন ডিরেক্টরি?" হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমীর পকেটের জঠোর থেকে মোটা একখানা বই বের করল।

হেডমাস্টারমশাই হাতে নিয়ে দেখলেন—বইটার মলাটে বড়ো-বড়ো, মেজ-মেজ, ছোটো-ছোটো হরফে লেখা—'শরীর সুস্থ রাখুন! পাঁচশত বিষম-ব্যাধির সরল কবিরাজি-চিকিৎসা। প্রথম সংস্করণ—সন ১২৯২ সাল। মূল্য মাত্র একমুদ্রা।"

"বুঝেছি।" হেডমাস্টারমশাই ঘাড় নাড়লেন—"কোনো পুরোনো বইয়ের দোকান কি ফুটপাথ থেকে কিনেছ নিশ্চয়। এতক্ষণে তোমার সব ব্যারামের হদিশ পেলাম। আসল কারণ বোঝাগ্যালো এখন। সমস্ত রহস্য পরিষ্কার এতক্ষণে। এ-বই আমি বাজেয়াপ্ত করলুম। আজ থেকে তোমার কোনো অসুখই নেই। আর। বুঝেছো?" হেসে-হেসে বললেন হেডমাষ্টারমশাই—"তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল—আমি হস্তগত করে নিয়ে চললুম। বুঝলে; যাও খ্যালোগে এখন—খ্যালাধুলো করোগে।"

সমীর বলল—"হ্যাঁ স্যার!" প্রকান্ড একটা ঘাড় নেড়ে বলল সে। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যেতেই ঘাড়টা যেন হালকা হয়ে গেছে তার।

তার তারপরেই—হেডমাস্টারমশায়ের অন্তর্ধানের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে-লাফাতে খেলতে চলে গ্যালো সে।

হেডমাস্টারমশাই ফেরবার পথে ড্রিলমাস্টারের বাড়ি গিয়ে চড়াও হলেন—সদ্যলব্ধ সেই 'শরীর ভালো রাখুন' খানা বগলদাবাই করে।

"এই দেখুন মশাই, আপনার সমীরের যতো আধিব্যাধি—এই দেখুন—এই আমার শ্রীহস্তে। দেখেছেন?"

"ও বাবা! এ যে খালি অসুখ! অসুখেই ভর্তি! পাঁচশো রকমের ব্যামো দেখছি এখানে! নিদারুণ যতো ব্যায়রাম! অ্যাঁ? ড্রিলমাস্টারের বাক্‌স্ফূর্তি লোপ পায়।

"হ্যাঁ, সমীরের শুধু দশটার উপর দিয়েই গেছে। চারশো নব্বইটার বাকি ছিল এখনো—কিন্তু তাদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি— একধাক্কায় সারিয়ে দিয়েছি সবকটাই!" হেডমাস্টারমশাই ড্রিলমাস্টারকে হাসতে হাসতে বলেন।

পরদিন প্রথম-ঘন্টা পড়বার ঢের আগেই সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সারা ইস্কুলে কেবল দুজন সেদিন অনুপস্থিত। ড্রিলমাস্টারমশাই আর হেডমাস্টারমশাই! তাঁরা এখনো এসে পৌঁছোতে পারেননি এবং আসতে পারবেন না বলে, খবর পাঠিয়েছেন।

দুজনেই ভারী অসুস্থ।

ড্রিলমাষ্টারমশায়ের পিত্তবিকার হয়েছে। পিত্তশূলও হতে পারে—এমন কি জ্বরাতিসর হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়! আর হেডমাস্টারমশায়ের—

কী হয়েছে, ভেবে তিনি কূল পাচ্ছেন না। বিছানায় শুয়ে তিনি কুলকুল করে ঘামছেন—সেই সকাল থেকেই! সারাদিন কিচ্ছুটি খাননি, টি পর্যন্ত না, কেবল একবার বুকে, একবার পেটে, আরেকবার মাথায়— নিজের মাথাতেই — হাতা বুলোচ্ছেন থেকে-থেকে।

হৃদ্রোগ কিংবা উদরাধ্মন—দুটোর কোনো-একটা যে তাঁকে পেয়ে বসেছে, সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই। শিরঃশূলও হতে পারে।

খুব শক্ত অসুখ যে, তার আর সন্দেহ কি?

কালান্তক লালফিতা

আমি আত্মহত্যা করার পর দিনকতক তাই নিয়ে বেজায় হৈ-চৈ হয়েছিল। গত ১৯৩৩ সালের দোসরা এপ্রিলের কাগজে-কাগজে কেবল এই কথাই ছিল। বেশিদিনের কাণ্ড নয়, অতএব তোমাদের মনে থাকতেও পারে।

আত্মহত্যার খবরটাই শুধু তোমরা পেয়েছ, কিন্তু কেন এবং কোন্ দুঃখে যে এজন্যে আর কাউকে না বেছে নিয়ে হঠাৎ নিজেকেই খুন করে বসলাম—তার নিগূঢ় রহস্য তোমরা কেউই জানো না। সেই মর্মন্তুদ কাহিনীই বলব এখানে। খুব সংক্ষেপেই বলব।

রেড-টেপিজম্ কাকে বলে, হয়তো তোমরা জানো। যদি কোনো আপিসে কখনো গিয়ে থাক, তাহলে লালফিতায় বাঁধা ফাইল নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ, ফাইলের পর ফাইল সাজানো, বড়ো-বড়ো বাণ্ডিলের থাক্‌ও তোমাদের চোখে পড়ে থাকবে হয়তো বা, কিন্তু সরকারি দপ্তরখানায় তোমরা কখনো ঢুকেছ কিনা, জানি না, সেখানে একবার আমার ঢোকার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। আর, তখন ওইরকম লালফিতার ফাইল—ফাইলের স্তূপাকার আর বাণ্ডিলের আণ্ডিল দেখেই হঠাৎ কেমন যে আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল; আর আমি ওই মারাত্মক কাণ্ড করে বসলাম!

লালফিতার একটা নিজের ধর্ম আছে। পৃথিবীতে যত ism আবিষ্কৃত হয়েছে, Buddhism থেকে শুরু করে rheumatism পর্যন্ত, Red-Tapism তাদের কারুর চেয়ে কিছু কম যায় না। আমার মতে এই লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, কেননা, পরকে আক্রমণ করতে আর করে কাবু করতে এর জুড়ি আর নেইকো।

এখন আসল ঘটনায় আসা যাক—

টিপু সুলতানই হোন বা তাঁর বাবা হায়দর আলিই হোন, অবিশ্যি আজকের কথা নয়, কোম্পানির আমলে কাহিনী—যাই হোক, ওঁদের একজন ওয়ারেন হেস্টিংসের বেজায় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ান। হেস্টিংসসাহেব সেই বিরক্তি দমন করতে না পেরে হায়দর আলিকেই দমন করবেন—এই স্থির করলেন। স্থির করেই তিনি কর্নেল কুটকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন হায়দরের উদ্দেশ্যে। সেই সময়ে অর্থাৎ সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ, বিক্রমপুরের বলরাম পাঠকের সঙ্গে হেস্টিংস সরকারের এই চুক্তি হয় যে, উক্ত পাঠক উক্ত কর্নেল কুটকে গোরাপল্টনের রসদ-বাবদে একহাজার খাসী অথবা পাঁঠা সরবরাহ করবেন।

এই হল গিয়ে গোড়ার ইতিহাস অথবা আদিম কাণ্ড।

এত আগে শুরু করবার কারণ এই যে, এর সঙ্গে আমার অন্তিম কাণ্ড ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ক্রমশই সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

এখন, বলরাম পাঠক প্রাণান্ত পরিশ্রমে একহাজার খাসী এবং পাঁঠা দিগ্বিদিক থেকে সংগ্রহ করে কলকাতার কেল্লার দরজা পর্যন্ত যখন তাড়িয়ে এনেছেন, তখন শুনতে পেলেন, কর্নেল কুট পাঁঠাদের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করে সসৈন্যে মহীশূরের দিকে সটকে পড়েছেন কখন।

বলরাম ভাবিত হয়ে পড়লেন, কী করবেন? সরকারি চুক্তি তো অবহেলার বস্তু নয়! পাঁঠার টাকা জোগাতে হয়েছে—কম টাকা না! আর অতগুলো পাঁঠা (কিংবা খাসীই হোক) একা কিংবা সপরিবারে খেয়ে খতম করা বলরামের একপুরুষের কম্মো নয়!

অনেক ভেবে-চিন্তে বলরাম স্থির করলেন, পাঁঠাদের সমভিব্যাহারে তিনিও কুটের অনুসরণ করবেন এবং কোথাও না কোথাও তাঁকে পাকড়াতে পারবেনই—তাহলেই তাঁর চুক্তি বজায় রইবে আর চুক্তি খেলাপের দায়ে পড়তে হবে না।

অতএব যেমন এসেছিলেন, তেমনি তিনি চললেন পাঁঠা তাড়িয়ে—কুটের পেছন-পেছন ধাওয়া করে মহীশূরের দিকে।

কটকে উপনীত হয়ে তিনি শুনলেন, কুট আরও দক্ষিণে বহরমপুরের দিকে পাড়ি মেরেছেন! তখন তিনিও পাঁঠাদের সঙ্গে নিয়ে পড়ি কি মরি বহরমপুরের উদ্দেশে ধাবিত হলেন; কিন্তু সেখানেও পৌঁছলেন দেরি করে—দিনকয়েক আগে কুট চলে গেছেন হায়দ্রাবাদের অভিমুখে। অদ্ভুত এই কূটনীতি! কুটের চাল-চলনে বলরাম তো নাজেহাল হয়ে পড়লেনই, পাঁঠারাও হিমসিম খেয়ে গেল।

তারপর—তারপর আর কি? হায়দ্রাবাদ থেকে এলোর, এলোর থেকে মছলিপত্তন, সেখান থেকে কোন্দাপা (হাঁটতে হাঁটতে পাঁঠাদেরই চার হাজার পায়ে খিল ধরে গেল, বলরামের তো মোটে দুটো পা)! এইভাবে তিনি কর্নেলের পশ্চাদ্ধাবন করে চললেন, কিন্তু গোদা-পা নিয়ে কোন্দাপা পার হয়েও কর্নেলের পাত্তা তিনি পেলেন না। পল্টনের নাগাল পাওয়া তাঁর আর হল না। তিনি তো হয়রান হয়ে হাঁপিয়ে উঠলেনই, পাঁঠারাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাহাত্তরদিন এইভাবে দারুণ দৌড়োদৌড়ির পর মহীশূরের প্রায় সীমান্তে এসে অবশেষে যখন তিনি কর্নেল কুটের কাছাকাছি অর্থাৎ তাঁর ফৌজের ছাউনির চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছেন, তখন এক বর্গীর দল এসে তাঁর দলে হানা দিল। আক্রান্ত হয়ে তাঁর দলবল এমন চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করল যে, সে আর কহতব্য নয়! সেই দারুণ গন্ডগোল আর ছত্রভঙ্গের ভেতর পাঠকমহাশয় (পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তখন তাঁরই এক সহযাত্রীর ঝোল বানিয়ে সবেমাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন।) ভাতের থালার অন্তরালে আত্মগোপন করতে যাবেন, এমন সময় অতর্কিতে বর্শাবিদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রাণত্যাগ করতে হলো!

বর্গীরা পাঁঠাদের নিয়ে পিঠটান দিল। সেই পলায়নের মুখে কয়েকটা পাঁঠা (অথবা খাসী) পথ ভুলেই হোক বা বর্গীদের সঙ্গ না-পছন্দ করেই হোক (সংখ্যায় অবিশ্যি তারা মুষ্টিমেয়), ছট্‌কে ছিট্‌কে কর্নেল কুটের ছাউনির ভেতর গিয়ে পড়ে এবং ধৃত হয়। বলা বাহুল্য, কর্নেল সাহেব সসৈন্যে তাদের উদরসাৎ করতে দ্বিধা করেননি। সুতরাং রসদরূপে তাদের সদ্ব্যববার হয়েছিল, বলতে হবে। এইরূপে বীর বলরাম পাঠক মারা গিয়েও পাঁঠাদের সাহায্যে কোনো-প্রকারে আংশিকভাবে তাঁর চুক্তি বজায় রেখেছিলেন।

পাঠকমহাশয় মহীশূর-মহাপ্রস্থানের প্রাক্কালেই সরকারি চুক্তি-পত্রটি তাঁর ছেলে বাবুরামকে উইল করে দিয়ে যান। বাবুরাম তাঁর বাবা মারা যাবার খবর পাবামাত্র নিম্নলিখিত বিলটি ওয়ারেন হেস্টিংসের দরবারে পেশ করেন, করবার পর তিনিও খতম হন। বিলটি এই—

মহামান্য কোম্পানি-সরকার বরাবরেষু—

বিক্রমপুরের বাবু বলরাম পাঠক, সম্প্রতি বিগত, উক্ত মহাশয়ের প্রাপ্য—সম্পর্কে হিসাব...........হিঃ—

মান্যবর কর্নেল কুটসাহেবের ফৌজের রসদের জন্য এক-হাজার পাঁঠা কিংবা

খাসী প্রত্যেকটির মূল্য ৫.০০ হিসাবে	৫০০০.০০
মহীশূর পর্যন্ত তাহাদের যাতায়াত	
এবং খোরপোষের খরচ—বাবদে	১৬০০০.০০
একুনে, মোট—	২১০০০.০০

বাবুরাম তো মরলেন, কিন্তু মরবার আগে তাঁর ভাগনে ত্রিবিক্রম মহাপাত্রকে ডেকে তার উপর ভার দিয়ে গেলেন বিলের টাকাটা আদায় করবার। ত্রিবিক্রম উপযুক্ত পাত্র; আদায়ের জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিক্রমের সূত্রপাতেই তাঁকে দেহরক্ষা করতে হয়। তাঁর থেকে দিগম্বর তরফদারের হাতে এলো ঐ বিল। কিন্তু তিনিও বেশিদিন বাঁচলেন না। তস্য ভ্রাতা সুদর্শন তরফদার ঐ উত্তরাধিকারসূত্রটি লাভ করলেন, কিছুদুর ঐ সূত্র টেনেও ছিলেন তিনি, এমন কি খাজাঞ্চিখানার সপ্তম সেরেস্তাদার পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে কালের কঠোর হস্ত এমন আদর্শ অধ্যবসায়ের মাঝখানে অকস্মাৎ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

সুদর্শন তাঁর এক আত্মীয়ের হাতে এই বিল সমর্পণ করে যান, সে-বেচারা তার ঠেলায় মাত্র পাঁচ-হপ্তা পৃথিবীতে টিকতে পারল। তবে এই অল্প সময়ের ভেতরেই সে রেকর্ড রেখে গেছে। লালফিতা-দপ্তরখানার তেরো নম্বর সেরেস্তা সে পার হয়েছিল। তার উইলে এই বিল সে নিজের মামা আনন্দময় চৌধুরীকে উৎসর্গ করে যায়। আনন্দময়ের পক্ষে এই আনন্দের ধাক্কা সামলানো সহজ হয়নি। তারপর খুব অল্পদিনই তিনি এই ধরাধামে ছিলেন। অন্তিম-নিশ্বাসের আগে তাঁর বিদায়-বাক্য হচ্ছে এই—

"তোমরা আমার জন্যে কেঁদো না, আনন্দেই আমি যেতে পারছি। মৃত্যু—হ্যাঁ—মৃত্যুই আমার পক্ষে এখন একমাত্র কাম্য।"

তিনি তো মরে বাঁচলেন, কিন্তু মেরে গেলেন আরো অনেককে। তারপর সাতজনের দখলে এই বিল আসে, কিন্তু তাদের কেউই আর এখন ইহলোকে নেই। অবশেষে এই বস্তু এল আমার হাতে। আমার এক মামার হাত হয়ে।

আমার দূরসম্পর্কের খুড়তুতো মামা—গুরুদাস গাঙ্গুলি—হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে আমাকে তার পাঠালেন। কোনোদিনই যে আমাদের মধ্যে প্রাণের টান ছিল, এমন কথা বলা যায় না; বরং বলতে গেলে বলতে হয়, বরাবরই তিনি আমার প্রতি অহেতুক বিরাগ পোষণ করতেন; কখনো তিনি সইতে পারতেন না আমাকে, চিরকাল এইটেই দেখেছি, কাজেই টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি মৃত্যু-শয্যায়। কিন্তু অবাক হবার তখনো বুঝি কিছুটা বাকি ছিল। তিনি তো সর্বান্তঃকরণে আমাকে মার্জনা করলেনই, এমনকি তাঁর প্রিয়পাত্রদের আর নিজের প্রিয়পুত্রদের বঞ্চিত করেই এই মূল্যবান সম্পত্তি অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

আমার কবলে আসা পর্যন্ত এর ইতিহাস হচ্ছে এই।

মামাতো ভাইদের ডবল শোকাতুর করে একুশ হাজার টাকার এই বিল নিয়ে তো আমি লাফাতে-লাফাতে কলকাতা ফিরলাম। ফিরেই উঠে-পড়ে গেলে গেলাম টাকাটার উদ্ধারের চেষ্টায়। এক-আধ টাকা নয়, একুশ হাজার। ইয়াল্লা!

প্রথমেই গিয়ে লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলাম। কার্ড পাঠাতেই কিছু পরে আমাকে তাঁর খাস-কামরায় নিয়ে গেল।

আমাকে দেখবামাত্র তিনি প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁ, কি দরকার আমার কাছে? আমার সময় খুব কম, ভারী ব্যস্ত আমি, তা কি করতে পারি আমি তোমার জন্যে বলো দেখি?"

সবিনয়ে বললাম—"আজ্ঞে হুজুর, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল তারিখে বা ওই রকম সময়ে বিক্রমপুর জিলার ববু বলরাম পাঠক কর্নেল কুটসাহেবের সঙ্গে মোট এক হাজার পাঁঠা কিংবা খাসী সরবরাহের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন—"

এই পর্যন্ত শোনামাত্র তিনি আমাকে বিদায় নিতে বাধ্য করলেন। এর বেশি কিছুতেই তাঁকে শোনানো গেল না। আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর টেবিলের কাগজপত্রে এমন গভীরভাবে মন দিলেন যে, স্পষ্টই বোঝা গেল—বলরাম, আমার বা পাঁঠার—কারো ব্যাপারেই তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ বা সহানুভূতি নেই।

পরের দিন আমি কৃষি-মন্ত্রীর সঙ্গে মুলাকাত করলাম।

"কি চাই?" দেখেই আমাকে প্রশ্ন হল তাঁর।

"আজ্ঞে মহাশয়, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল নাগাদ বিক্রমপুর জেলার বাবু বলরাম—"

তিনি আমাকে বাধা দিলেন—"আমার মন্ত্রিত্ব তো মাত্র তিন বছরের তিন শতাব্দীর তো নয়। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।'



তবে? তিনশো বছরের প্রাচীন লোক আর কে আছে এখন? কার কাছে যাব আমি? ওয়ারেন হেস্টিংসও তো এখন বেঁচে নেই? তবে? তাহলে? আমি মনে-মনে ভাবি।

কি করব? নমস্কার করে সেখান থেকে সরে পড়লাম।

পরের দিন ভয়ানক ভেবে-চিন্তে ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি মন দিয়ে আনুপূর্বিক শুনলেন। একটু চিন্তাও করলেন মনে হল। শেষে বললেন—"চতুষ্পদ পাঁঠা তো? তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি সম্পর্ক? তারা তো আমাদের ছাত্র না। ও-ব্যাপারে আমরা আর কি করতে পারি বল?"

অগত্যা সেখান থেকেও চলে আসতে হল।

কন্ট্রাক্ট নিয়ে কর্পোরেশন চলে, এইরকম একটা কথা কানে এসেছিল, সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হদিস মিলতে পারে, এইরকম ভেবে মেয়রের সঙ্গে দেখা করলাম তার পরদিন।

"মহাশয়, সতেরোশো সাতাত্তর খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিলে বা ওর কিছু আগে বা পরে বিক্রমপুর-জিলানিবাসী, সম্প্রতি বিগত শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম পাঠকের সঙ্গে কর্নেল কুটসাহেবের এক চুক্তি হয় যে—"

এই পর্যন্ত কোনোরকমে এগুতে পেরেছি, মেয়রমহাশয় আমাকে থামিয়ে দিলেন—

"কর্নেল কুটের সঙ্গে কর্পোরেশনের কি? ওসব ব্যাপার এখানে নয়। তাছাড়া, কোনো কূটকচালে ব্যাপারে আমরা নেই।"

সব্বাই এক কথাই বলে। এখানে নয়, ওখানে নয়, সেখানে নয়, তবে কোন্‌খানে? চুক্তি হয়েছিল, এতো আলবৎ; সে-চুক্তি পাঁঠাদের তরফ থেকে যদ্দূরসম্ভব বজায় রাখাও হয়েছে। এখন টাকা দেবার বেলায় এই ভাবে দায়-এড়ানোর অপচেষ্টা আমার একেবারেই ভালো লাগে না। এ যেন আমার একুশ হাজারের দাবি মেনে না নিয়ে টাকাটা না দিয়ে মেরে দেবার মতলব। আমাকেই দাবিয়ে মারার ফন্দী!

পরদিন জেনারেল পোস্টাপিসের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। পোস্ট-মাস্টার-জেনারেল তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর মোটরের সম্মুখে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়লাম।

"কি চাও বাপু, চাকরি?" গাড়ির জানলা দিয়ে তিনি মুখ বাড়ালেন— "দুঃখের বিষয়, এখন কিচ্ছুই খালি নেই।"

"আজ্ঞে না, চাকরি নয়।"

ভরসা পেয়ে তখন তিনি আরো একটু মুখ বাড়ান—"তবে কী চাই?"

"আজ্ঞে, ১৭৭৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে—"

"১৭৭৭ সাল?" ঈষৎ যেন ভ্রূকুঞ্চিত হল ওঁর— "সে তো তাহলে এখানে নয়, ডেডলেটার-আপিসে। সেখানে খোঁজ করো গিয়ে।"

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মোটর দিল ছেড়ে।

এর পর আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। যেমন করে পারি, এই বিলের কিনারা করবই, এই আমার হল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। যদি প্রাণ যায় সেই দুশ্চেষ্টায়, সেও স্বীকার। হয় বিলের সাধন, নয় শরীর-পাতন! বিল নিয়ে আমি দিগ্বিদিকে হানা দিতে লাগলাম; এ-ডিপার্টমেন্টে, সে-ডিপার্টমেন্টে, এ-আপিসে, সে-আপিসে—একে-ওকে-তাকে ধরপাকড় শুরু করে দিলাম!

কোথায় না গেলাম? ক্যাম্বেল-হাসপাতাল, গভর্নমেন্ট আর্টস্কুল, ডেডলেটার-আপিস, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, মেডিক্যাল কলেজ, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, টেক্সটাইল্ ডিপার্টমেন্ট, টেক্সট্‌বুক-কমিটি, পলতা-ওয়াটার-ওয়ার্কস্—কত আর নাম করব? আলিপুরের আবহাওয়াখানা থেকে আরম্ভ করে (এসপ্ল্যানেডের ট্রামডিপোর আপিস ধরে) বেলগেছের ভেটার্‌নারি কলেজ পর্যন্ত কোন্‌খানে না ঢুঁ মারলাম? এককথায়, এক জেলখানা ছাড়া কোথাও যেতে আর বাকি রাখলাম না।

ক্রমশ আমার বিলের ব্যাপার কলকাতার কারু আর অবিদিত রইল না। টাকাটা কেউ দেবে কিনা, কে দেবে এবং কেনই বা দেবে, আর যদি সে না দেয়, তাহলেই বা কি হবে, এই নিয়ে সবাই মাথা ঘামাতে লাগল; খবরের কাগজে-কাগজেও হৈ-চৈ পড়ে গেল খুব। একহাজার পাঁঠা আর একুশ হাজার টাকা—সামান্য কথা তো নয়। ভাবতে গেলে আপনা থেকেই জিহ্বা লালায়িত আর পকেট বিস্ফারিত হয়ে যায়।

অবশেষে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের অ-স্বাক্ষরিত পত্রে একটু যেন আশার আলোক পাওয়া গেল।

তিনি লিখেছেন—"আমি আপনার ব্যথার ব্যথী। আপনার মতোই ভুক্তভোগী একজন। আমারো এক পুরোনো বিল ছিল, এখন তা খালে পরিণত হয়েছে। এখন আমি সেই খালে সাঁতার কাটছি, কিন্তু কতক্ষণ আর কাটব? কতক্ষণ কাটতে পারব আর? আমি তো শ্রীবোকা ঘোষ নই! শীঘ্রই ডুবে যাব, এরূপ আশা পোষণ করি। যাই হোকআপনি সরকারি দপ্তরখানাটা দেখেছেন একবার?"

তাইতো, ওইটেই তো দ্যাখা হয়নি। গোলেমালে অনেক কিছুই দেখেছি—দেখে ফেলেছি, শুধু ওইটা বাদে! খোঁজখবর নিয়ে ছুটলাম দপ্তরখানায়। গিয়ে সোজা একেবারে সেখানকার বড়োবাবুর কাছে আমার সেলাম ঠুকলাম সটান।

"মশাই, বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা এপ্রিলে বিক্রমপুরের স্বর্গীয়—"

"বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। আপনিই সেই পাঁঠা তো?"

"আজ্ঞে, আমি পাঁঠা.....? আমি...." আমতা আমতা করি আমি— "আজ্ঞে, পাঁঠা ঠিক না হলেও পাঁঠার তরফ থেকে আমার একটা আর্জি আছে। বিগত ১৭৭৭ সালের পয়লা—"

"জানি, সমস্তই জানি। কর্নেল কূটের রসদ-সংক্রান্ত ব্যাপার তো? বটে কিনা? ওর হাড়হদ্দ সমস্তই আমার জানা। সব এই নখদর্পণে। কই, দেখি আপনার কাগজপত্র?"

এরকম সাদর-আপ্যায়ন এ পর্যন্ত কোথাও পাইনি। আমি উল্লসিত হয়ে উঠি। বলরামের বহু পুরাতন চুক্তিপত্রটা বাড়িয়ে দিই। বাবুরামের আমলের বিলও। হাতে নিয়ে দেখে-শুনে তিনি বলেন— "হ্যাঁ, এই কন্ট্রাক্টই বটে।"

তাঁর প্রসন্ন-হাসি দেখে আমার প্রাণে ভরসার সঞ্চার হয়। হ্যাঁ, এতদিনে ঠিক জায়গায়, একেবারে যথাস্থানে পৌঁছতে পেরেছি বটে। তখন সেই ভুক্তভোগীটিকে আমি মনে-মনে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদের সঙ্গে সাধুবাদ।

তারপরই তিনি কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করলেন। এ-ফাইল, সে-ফাইল, এ-দপ্তর, সে-দপ্তর! এর লালফিতা খোলেন, ওর লালফিতা বাঁধেন। দপ্তরীকে তলব দেন, আরো ফাইল আসে। আরো—আরো ফাইল। গভীরভাবে দেখা-শোনা চলে সব। আবার তলব, আরো বহুপুরাতন বাণ্ডিলরা এসে পড়ে।

হ্যাঁ, এইবার কাজ এগুচ্ছে বটে। আমারই কাজ। সমস্ত মন ভয়ানক খুশিতে ভরে ওঠে। সারা কড়িকাঠ জুড়ে যেন ঝমাঝম আওয়াজ শোনা যায় টাকার। এক্ষুনি সশব্দে আমার মাথায় ভেঙে পড়ল বলে। আমিও সেই দৈবদুর্ঘটনার তলায় চাপা পড়বার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হতে থাকি। হৃদয়কে সবল করি।

অনেক অন্বেষণের পরে বলরামী চুক্তিপত্রের সরকারি ডুপ্লিকেট অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ করতে বাধ্য হয়।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত মিলিয়ে দেখে তিনি ঘাড় নাড়েন—"কাজ তো অনেকটা এগিয়েই রয়েছে, তা এতদিনে আপনারা কোনো খবর ন্যাননি কেন?

"আজ্ঞে, আমি নিজেই এ বিষয়ের খবর পেয়েছি খুব অল্পদিন হল।"

সরকারি দপ্তরের ডুপ্লিকেটটা সসম্ভ্রমে হাতে নিই। হ্যাঁ, এই সেই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ, যার দরজায় মাথা ঠুকে আমার উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ ইতিপূর্বে গতাসু হয়েছেন এবং আমিও প্রায় যাবার দাখিল। ভাবের ধাক্কায় আমার সমস্ত অন্তর যেন উথলে ওঠে—যাক, এই রক্ষে যে, আমাকে আর তাঁদের অনুসরণ করতে হবে না। এ-আনন্দ আমার কম নয়। আমি তো বেঁচেই গেছি এবং আরো ঘোরতরভাবে বাঁচব অতঃপর—বালিগঞ্জের বড়ো-লোকদের ভেতর সটান নবাবী স্টাইলে। পুলকের আতিশয্যে আমি কাবু হয়ে পড়ি।

ভদ্রলোক সমস্তই উল্টে-পাল্টে দ্যাখেন—"হ্যাঁ, সুদর্শন তরফদার। সুদর্শনবাবুই তো কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছেন দেখছি। সাতটা সেরেস্তার সই তাঁর সময়েই হয়েছে। তাঁর পরে এলেন—কি নাম ভদ্রলোকের? ভালো পড়াও যায় না! পুরন্দর পত্রনবিশ? হ্যাঁ, পুরন্দরই বটে, তা তিনিও তো ছটা সই বাগাতে পেরেছেন দেখছি। আর বাকি ছিল মাত্র চারটে সই। চারজন বড়োকত্তার। তারপরের ভদ্রলোক তো আনন্দময় চৌধুরী! আপনার কে হন তিনি?"

"আজ্ঞে, তা ঠিক বলতে পারব না।" আমি নিজের মাথা চুলকোই—"অনেকদিন আগেকার কথা। তবে কেউ হন নিশ্চয়ই!"

"তা, তিনিও দুটো সই আদায় করেছেন। বাকি ছিল আর দুটো সই। তিনি আর একটু উঠে-পড়ে লাগলেই তো কাজটা হয়ে যেত। তা, তিনি আর চেষ্টা করলেন না কেন? এরকম করে হাল ছেড়ে দিলে কি চলে?"

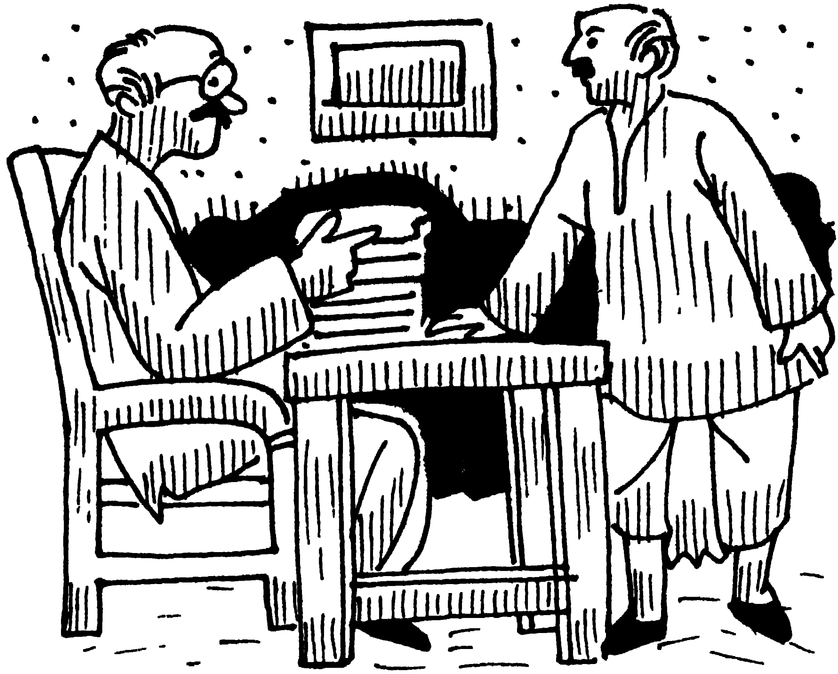
"খুব সম্ভব তিনি আর চেষ্টা করতে পারলেন না। কারণ তিনি মারা গেলেন কি না! চেষ্টা করতে-করতেই মারা গেলেন।"

"ও, তাই নাকি? কিন্তু তার পরে কাজ আর বিশেষ এগোয়নি। দুজন বড়োকত্তার সই এখনো বাকিই রয়েছে। তবে এইবার হয়ে যাবে সব।"

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ! মশাই, যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়, অনুগ্রহ করে—"

তিনি বাধা দিয়ে বললেন—"দেখুন, তাড়াতাড়ির আশা করবেন না। এসব হচ্ছে সরকারি কাজ—দরকারী কাজ—বুঝতেই তো পারছেন? অতএব ধীরে-সুস্থে হবে। স্লোলি, বাট্ শিওরলি। এর বাঁধা-দস্তুর চাল আছে, সবই রুটিন-মাফিক, একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। একেবারে কেতা-দুরস্ত।" এই বলে মৃদুহাস্যে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন—"আস্তে-আস্তে হয়ে যাবে সব কিছু, ভয় নেই আপনার।"

অভয় পেয়ে আমার কিন্তু হৃৎকম্প শুরু হল। "তবু একটু স্মরণ রাখবেন অধীনকে,



যাতে ওর মধ্যে একটু চটপট—" করুণসুরে বলতে গেলাম। "যাতে এই জীবদ্দশাতেই...।"

"বলতে হবে না, বলতে হবে না অত করে। সেদিকে আমাদের লক্ষ থাকে বইকি! এতো বড়ো দপ্তরখানা তবে হয়েছে কিজন্যে বলুন? আর আমরাই বা এখানে বসে করছি কি? রয়েছি কিজন্যে? তবে আর একবার আগাগোড়া সব চেক হবে কিনা, সেইটুকু হলেই যথাসময়েই আপনি কল পাবেন। আপনাকে বার-বার আসতে হবে না কষ্ট করে, আমরাই চিঠি দিয়ে জানাবো আপনাকে। আর দুটো সই বইতো নয়! আবার কি?"

অন্তরে বল সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরি। তারপর একে-একে দশবছর কেটে যায়। খবর আর আসে না। বিলের ভাবনা ভেবে-ভেবে চুল-দাড়ি সব পেকে ওঠে, পেকে, ঝরে, ফাঁকা হয়ে যায় সব। কেবল থাকে—মাথার উপরে টাক, আর মাথার মধ্যে টাকা; কিন্তু খবর আর আসে না।

বিলক্ষণ দেরি দেখে আর বিলের কোনো লক্ষণ না দেখে মাঝে-মাঝে আমি নিজেই তাড়া করে যাই, খবরের খোঁজে হানা দিই গিয়ে। "অনেকটা এগিয়েছে", "আর একটু বাকি", "আরে, হয়ে এল মশাই, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?", "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? হয়ে যাবে—হয়ে যাবে।", "সময় হলেই হবে, ভাববেন না, ঠিক হবে!", "সবুরে

মেওয়া ফলে, জানেন তো?" ইত্যাদি সব আশার বাণী শুনে চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসি। তারপর আবার বছর ঘুরে যায়। আরেক বছর ঘুরে আসে দেখতে না দেখতে।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের শেষ-সপ্তাহে বহুবাঞ্ছিত চিঠি এল। তাতে পরবর্তী মাসের পয়লা তারিখে উক্ত বিল সম্পর্কে দপ্তরখানায় দেখা করবার জন্যে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যাক, এতদিনে তাহলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। আমি মনে-মনে লাফাতে শুরু করে দিলাম। আর কি, মার দিয়া কেল্লা, কে আর পায় আমায়! সটান বালিগঞ্জ! কি সোজা নিউইয়র্ক! কিংবা হলিউডই বা নয় কেন? জীবনের ধারাই এবার পাল্টে দেব বিলকুল—বিলের যখন কূল পেয়েছি! হ্যাঁ! আধঘণ্টা পরে পা মচকে বসে পড়বার পর খেয়াল হল যে, ও হরি! কেবল মনেই নয়, বাইরেও লাফাতে আরম্ভ করেছি কখন।

পয়লা এপ্রিল তারিখে দুরু-দুরু-বক্ষে দপ্তরখানার দিকে এগুলাম। সতেরোশো সাতাত্তর সালের পয়লা এপ্রিলে যে নাটক শুরু হয়েছিল, আজ উনিশশো তেত্রিশ সালের আর এক পয়লা এপ্রিলে সেই বিরাট, ঐতিহাসিক পরিহাসের যবনিকা পড়ে কিনা, কে জানে!

দপ্তরখানার সেই বাবুটি সহাস্যমুখে এগিয়ে আসেন। "ভাগ্যবান পুরুষ মশাই আপনি! কাজটা উদ্ধার করেছেন বটে!" বলে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দ্যান একবার।

"একুশ হাজারই পাবো তো মশাই?" ভয়ে-ভয়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

"একুশ হাজার কি মশাই! এই দেড়শো বছরে সুদে-আসলে আড়াই লাখের উপর দাঁড়িয়েছে যে! বলছি না—আপনি লাকি লোক!" তিনি বলেন।

আড়াই লাখ! আমার মাথা ঝিম-ঝিম করে—"তা, চেকটা আজই পাচ্ছি তাহলে?"

"চেক? এখনই? তবে হ্যাঁ, আর বেশি দেরি নেই।"

"বেশ, আমি অপেক্ষা করছি—সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত।"

"না, আজ হবার আশা কম। আপনি শুধু সই করে যান এখানে পরে আমরা খবর দেব আপনাকে।"

"অ্যাঁ! এখনো পরে? পরে-খবরের ধাক্কায় তো দশবছর কাটল, আবার পরে-খবর? সসঙ্কোচে বলি—"আজ্ঞে, আজ আপনাদের অসুবিধাটা কি হচ্ছে, জানতে পারি কি?"

"এখনো একটা সই বাকি আছে কিনা!" গূঢ়-রহস্যটা অগত্যা তিনি ব্যক্ত করেন।

"এখনো একটা সই বাকি!" শুনে আমার মাথা ঘুরে যায়! এখনো আরো একটা। তবেই হয়েছে। ও আড়াই লাখ আমার কাছে তাহলে আড়াই পয়সার সামিল।

ক্যালেন্ডারে আজকের তারিখের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটু হাসবার ভান করি—"পয়লা এপ্রিল বলে পরিহাস করছেন না তো মশাই?"

"না-না, পরিহাস কীসের!" তিনি গম্ভীরভাবেই বলেন—"শুধু সেই ফাইনাল সইটা হলেই হয়ে যায়।"

ততক্ষণে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে; আমি বলতে শুরু করেছি—"তবে দিন মশাই, দিন আমাকে কাগজ-কলম। আমার এই বহুমূল্য সম্পত্তি আমি এই দণ্ডে আপনাকে ও ভগবানকে সাক্ষী রেখে উইল করে দিয়ে যাচ্ছি আমার জাতিকে, মানে—আমার দেশবাসীকে—অনাগত-কালের যত ভারতীয়দের! দেখুন, আমরা সব নশ্বর জীব। অল্পদিনের আমাদের জীবন, বেশিদিন অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। বিল মানেই বিলম্ব—বিলক্ষণ বিলম্ব! জাতির অখণ্ড পরমায়ু—কেবল সে-ই অপেক্ষা করতে পারে অনন্ত-কাল, মানে—যদ্দিন তার খুশি।"

এই কথা বলে সামনের টেবিল থেকে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা তুলে নিয়ে আঙুল বসিয়ে দিই আমার নিজের বুকে অম্লানবদনে।

"উইল করে দিলাম বটে, তবে আমাদের স্বদেশবাসী যেন ভুল না বোঝে যে, তাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম—আমাকে যেন তারা অকাতরে মার্জনা করে!" এই বলে সবশেষ সুদীর্ঘ নিশ্বাস দিয়ে আমার অন্তিম-বাণীর উপসংহার করি।

আড়াই লাখের বিল, আমার বিলকুল আখের, আমার দেশবাসীকে বিলিয়ে দিয়ে সেই-ই আমার শেষ-বিলাসিতা।

হাতির সঙ্গে হাতাহাতি

তেলেভাজা, পাঁপড়আর মুড়ির সঙ্গে বাদলার সন্ধেটা জমে উঠেছিল বেশ। সলিল, আলো, লুনা—এরাও এসে জমেছিল সবাই।

লুনা বললে, এই সময় কেউ যদি ভূতের গল্প জমায় তাহলে আরো বেশ জমাটি হয়।

'প্রস্তাবটা লুনার হলেও নিতান্ত লুনাটিক বলে মনে হচ্ছে না।' মন্তব্য করল সলিল। 'তুমি কেন একটা গল্প ফাঁদো না শিব্রামদা?'

'গল্প নয়, তবে একটা সত্যিকার কাহিনী আমি বলতে পারি।' আমি জানাই ঃ 'আমার এক কাকার গল্প।'

'কাকার ভূত?'

'না, ভুতুড়ে কাকা নয় রীতিমতন জলজ্যান্ত। তবে অভূতপূর্ব বলা যায় বটে!'

'তাই বল তাহলে।' জমিয়ে বসল সবাই ঃ 'গল্প হলেই হল।'

শুরু করলাম আমি...

এক

সংগ্রহ করার বাতিক কোনো কালেই ছিল না কাকার! কেবল টাকা ছাড়া! কিন্তু টাকা এমন জিনিস যে যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হলে আপনিই অনেক গ্রহ এসে জোটে এবং তখন থেকেই সংগ্রহ শুরু।

একদিন ওদেরই একজন কাকাকে বললে, দেখুন, সব বড়ো-লোকেরই একটা না একটা কিছু সংগ্রহ করার ঝোঁক থাকে। তা না হলে বড়োলোক আর বড়োলোকে তফাত কোথায়? টাকায় তো নেই। ওইখানেই তফাত, ওখানেই বিশেষ বড়োলোকের বৈশিষ্ট্য। আর ধরুন, বৈশিষ্ট্যই যদি না থাকল তবে আর বড়োলোক কিসের? আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জেরও কলেকসনের 'হবি' ছিল।

কাকা বিস্মিত হয়ে গ্রহের দিকে তাকান—'পঞ্চম জর্জও?'

'নিশ্চয়! কেন, তিনি কি বড়োলোক ছিলেন না? কেবল সম্রাটই নন, দারুণ বড়োলোকও যে! অনেকগুলো জমিদারকেই একসঙ্গে কিনতে পারতেন।'

'ও! তাই বুঝি জমিদার সংগ্রহ করার বাতিক ছিল তাঁর?

কাকা আরও বিস্ময়ান্বিত—বলতে কি!

'উহু হুঁ। জমিদার নিয়ে তিনি করবেন কি? রাখবেন কোথায়? ও চিজ তো চিড়িয়াখানায় রাখা যায় না! তিনি কেবল স্ট্যামপো কলেক্ট করতেন—'

'ইস্ট্যাম্পো? ওই যা পোস্টাপিসে পাওয়া যায়? না, দলিলের—?'

'দলিলের নয়। নানা দেশের রাজ্যের ডাকটিকিট, একশো বছর আগের, তারো আগের—তারো পরের—এমনি নানান কালের নানা আকারের, রং-বেরঙের যত ডাকটিকিট।'

'বাঃ, বেশ তো।'' কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—'আমারও তা করতে ক্ষতি কি?'

'কিছু না। তবে এক একটা পুরোনো টিকিটের দাম আছে বেশ। দুপাঁচ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ দশ বিশ হাজার দুলাখ চারলাখ পর্যন্ত।'

'অ্যাঁ, এমন?' কাকা কিছু ভড়কে যান; 'তা হোক, তবুও করতেই হবে আমায়। টাকার ক্ষতি কি আবার একটা ক্ষতি নাকি?'

'নিশ্চয় নয়। আর তা না হলে বড়োলোক কীসের?' এই বলে গ্রহটি উপসংহার করে। এবং আমার কাকাকেও প্রায় সংহার করে আনে।

কাকা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করছেন—এ খবর রটতে বাকি থাকে না। পঞ্চাশখানা অ্যালবাম যখন প্রায় ভরিয়ে এনেছেন তখন একদিন সকালে উঠে দেখেন বাড়ির সামনে পাঁচশো ছেলে দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওরা সবাই এসেছে কাকার কাছে—কেউ স্ট্যাম্প বিক্রি করতে, কেউ বা কিনতে। সবারই হাতে স্ট্যাম্পের অ্যালবাম।

কাকা তখন গ্রহকে ডাকিয়ে পাঠান। 'একি কাণ্ড? এরাও সব ইস্টাম্পো সংগ্রহ করছে যে? করছে বলে করছে, অনেকদিন ধরে করছে—আমার ঢের আগের থেকেই—একি কাণ্ড?'

'কি হয়েছে তাতে?' গ্রহটি ভয়ে ভয়ে বলে, কাকার ভাবভঙ্গি তাকে ভীত করে তুলেছে তখন, 'কেন, ওদের কি ও কাজ করতে নেই?'

'সবাই যা করছে, পাড়ার পুঁচকে ছোঁড়াটা পর্যন্ত'—কাকা এবার একেবারে ফেটে পড়েন, 'তুমি আমাকে লাগিয়েছ সেই কাজে? ছ্যা! কেন, এরাও কি সব বড়োলোক নাকি?

'বড়ো বালকও তো নয়।' আমি কাকাকে উসকে দিই তার উপর।—'নেহাৎ কাচ্চাবাচ্চা যত।'

কাকা আমার আপশোশ করতে থাকেন, 'ইস্টাম্পে আমার দশ দশ হাজার টাকা তুমি জলে দিলে হ্যা! ছ্যা!'

গ্রহ আর কি জবাব দেবে? সে তখন বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। পাথরের প্রতিমূর্তির মতোই তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই আর। তিত-বিরক্ত হয়ে কাকা নিজের যত অ্যালবাম খুলে ছিঁড়ে চ্যাঙড়াদের ভেতর স্টাম্পের লুট লাগিয়ে দ্যান সেই দণ্ডেই।

কিন্তু স্ট্যাম্প ছাড়লেও বাতিক তাঁকে ছাড়ল না! বাতিক জিনিসটা প্রায় বাতের মতোই, একবার ধরলে ছাড়ানো দায়! তিনি বললেন, 'ইসস্ট্যাম্পো নয়—এমন জিনিস সংগ্রহ করতে হবে যা কেউ করে না, করতে পারেও না। সেইরকম কিছু থাকে তো তোমরা আমায় বাতলাও!'

তখন নবগ্রহ মিলে মাথা ঘামাতে শুরু করল। তাদের প্রেরণায়, তাদেরই, আরো নব্বই জন উপগ্রহের মাথা ঘামতে লাগল। নতুন 'হবি' বের করতে হবে এবার রীতিমতন বুদ্ধি খাটিয়ে।

নানারকমের প্রস্তাব হয়! খেচরের ভেতর থেকে প্রজাপতি, পাখির পালক, জলচরের ভেতর থেকে রঙিন মাছ, কচ্ছপের খোলা ইত্যাদি; ভূচরের ভেতর থেকে পুরোনো আসবাবপত্র, সেকেলে ঢাল তলোয়ার, চীনে বাসন, গোরুর গলার ঘণ্টা, রঙ বেরঙের নুড়ি, যত রাজ্যের খ্যালনা—

কাকা সমস্তই বাতিল করে দ্যান। সবাই পারে সংগ্রহ করতে এসব।

কেউ না কেউ করেছেই।

তখন পকেটচরদের উল্লেখ হয়। নানাদেশের একালের সেকালের মোহর টাকা পয়সা সিকি দুয়ানি ইত্যাদি। ফাউন্টেন পেন দেশলায়ের বাক্সকেও পকেটচরদের মধ্যে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু কাকাকে রাজি করানো যায় না। কেউ না কেউ করেছেই এসব; এতদিন ধরে ফেলে রাখেনি নিশ্চয়।

কেউ কেউ মরিয়া হয়ে বলে—'কেরোসিনের ক্যানেস্তারা?' 'নস্যির ডিবে?' 'জগঝম্প?' 'কিম্বা গাঁজার কলকে?' অর্থাৎ চরাচরের কিছুই তখন বাকি থাকে না। কাকা তথাপি ঘাড় নাড়েন।

নানারকমের খাবার-দাবার? চপ, কাটলেট, সন্দেশ, শনপাপড়ি, বিস্কুট, টফি, চকোলেট, লেবেনচুস? মানে খাদ্যে অখাদ্যে যত রকমের আর যত রঙের হতে পারে। আমি বাতলাই তখন। তবুও কাকার উৎসাহ হয় না।

অবশেষে চটেমটে একজনের মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়ে যায়—'তবে আর কি করবেন? শ্বেতহস্তীই সংগ্রহ করুন।'

কিন্তু পরিহাস বলে একে গ্রহণ করতে পারেন না কাকা। তিনি বারম্বার ঘাড় নাড়তে থাকেন—'শ্বেতহস্তী। শ্বেতহস্তী! সোনার পাথর বাটির মতো ও-কথাটাও আমার কানে এসেছে বটে। ব্রহ্মদেশে না শ্যামরাজে কোথায় যেন ওর পুজোও হয়ে থাকে শুনেছি। হ্যাঁ, যদি সংগ্রহ করতে হয় তবে ওই জিনিস! বড়োলোকের আস্তাবল দূরে থাক, বিলাতের চিড়িয়াখানাতে এক আধটা আছে কিনা সন্দেহ। হ্যাঁ, ওই শ্বেতহস্তীই চাই আমার।'

কাকা সর্বশেষ ঘোষণা করেন, তাঁকে শ্বেতহস্তীই দিতে হবে এনে, শ্যামরাজ্য কি রামরাজ্য থেকেই হোক, হাতিপোতা কি হস্তিনা থেকেই হোক, হস্তী ওঁর চাই। চাই-ই। যেখান থেকে হোক যে করেই হোক জোগাড় করে দিতেই হবে, তা যত টাকা লাগে লাগুক। এক আধখানা হলে হবে না, অন্তত ডজন খানেক চাই তাঁর, তা না হলে কলেকশন আবার কাকে বলে?

এই ঘোষণাপূর্বক তৎক্ষণাৎ তিনি ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টার ডাকিয়ে আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্য বড়ো করে আস্তাবল বানাবার হুকুম দিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! দু সপ্তাহের ভেতর জনৈক শ্বেতহস্তীও এসে হাজির। নবগ্রহের একজন উপগ্রহ কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনে যেন।

কাকা তো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—'বটে বটে? এই শ্বেতহস্তী! এই সেই বাঃ! দিব্যি ফরসা রঙ তো! বাঃ বাঃ!'

অনেকক্ষণ তাঁর মুখ থেকে বাহবা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। হাতিটাও সাদা শুঁড় নেড়ে তাঁর কথায় সমর্থন জানায়!

আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'জানিস, বার্মায়—না না, শ্যামরাজ্যে এরকম একটা হাতি পেলে রাজারা মাথায় করে রাখে। রাজার চেয়ে বেশি খাতির এই হাতির; রীতিমতো পুজো হয়—হুঁ হুঁ! শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে রাজা নিজে পুজো করেন। যার নামে রাজপূজা। তা জানিস?'

এমন সময় হাতিটা একটা ডাক ছাড়ে। যেন কাকার গবেষণায় তার সায় দিতে চায়।

হাতির ডাক? কিরকম সে ডাক? ঘোড়ার চিঁ-হিঁ-হিঁ গোরুর হাম্বার মতো নয়, ঘোড়ার ডাকের বিশ ডবল, গোরুর অন্তত পঞ্চাশগুণ একটা হাতির আওয়াজ। বেড়ালের কি শেয়ালের ধ্বনি নয় যে একমুখে তা ব্যক্ত করা যাবে। সহজে প্রকাশ করা যায় না সে-ডাক।

হাতির ডাক ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর।

ডাক শুনেই আমরা দু-চার-দশ হাত ছিটকে পড়ি। কাকাও পাঁচগজ পিছিয়ে আসেন।

'বাবাঃ! যেন মেঘ ডাকল কড়াককড়।' কাকা বলেন, 'সিংহের ডাক কখনো শুনিনি, তবে বাঘ কোথায় লাগে! হ্যাঁ, এমন না হলে একখানা ডাক।'

"এটাকে হাতির সিংহনাদ হয়তো বলা যায়? না কাকা?" আমি কই।

উপগ্রহটি, যিনি হাতির সমভিব্যাহারে এসেছিলেন, এতক্ষণে একটি কথা বলার সুযোগ পান—'প্রায়ই ডাকবে এরকম। শুনতে পাবেন যখন তখন।'

'প্রায়ই ডাকবে? রাত্রেও তাহলে তো ঘুমোনোর দফা—' কাকা যেন একটু দুর্ভাবিতই হন।

'উঁহু, রাত্রে ডাকে না। হাতিও ঘুমোয় কিনা। রাত্রে কেবল ওর শুঁড় ডাকে।'

'তা ডাকে ডাকুক। কিন্তু এর কিরকম রঙ বলত।' আবার আমার প্রতি কাকার দৃকপাত—'ফর্সা ধবধব করছে। আর সব হাতি কি আর হাতি? এর কাছে তারা সব জানোয়ার! তাহলে বিলাতি সাহেবের কাছে যেমন সাঁওতাল। এই ফর্সা রঙটি এর বজায় রাখতে হলে সাবান মাখিয়ে একে চান করাতে হবে দুবেলা—ভাল বিলিতি সাবান, হুঁ হুঁ, পয়সার জন্য পরোয়া করলে চলবে না। হায়, আমার এমন সোনার হাতি কালো হয়ে যেতে কতক্ষণ?'

'অমন কাজটিও করবেন না।' উপগ্রহটি সবিনয়ে প্রতিবাদ করে।—'ওইটিই বারণ। স্নানটান একেবারে বন্ধ এর। শ্বেতহস্তীর গায়ে জল ছোঁয়ানই নিষেধ, তাহলেই গলগণ্ড হয়ে মারা পড়বে।'

''ওই গলায় আবার গলগণ্ড?'' আমি শুধাই। তাহলে তো ভারী গণ্ডগোল।

'অ্যাঁ, বল কি?' কাকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'তাহলে, তাহলে?'

'সাধারণ হাতির মতো নয়তো যে রাত দিন পুকুরের জলে পড়ে থাকবে। শ্যামরাজ্যে রীতিমতো মন্দিরে লোহার সিংহাসনের উপরে বসানো থাকে। সেখানে হরদম ধূপধুনো পুজো আরতি চলে। কেবল চন্নামৃত তৈরির সময়েই যা এক আধ ফোঁটা জল ওর পায়ে ঠেকানো হয়। এখানে তো সে রকমটি হবে না।'

কাকা তার কথা শেষ করতে দ্যান না—'এখানে পুরুত কি করে? রাতারাতি মন্দিরই বা বানাচ্ছে কে, আর লোহার সিংহাসনই বা পাচ্ছি কোথায়? তবে পূজারি জোগাড় করা হয়তো কঠিন হবে না, পুরুত বামুনের তো আর অভাব নেই পাড়ায়, কিন্তু হাতি পুজোর মন্তর কি তারা জানে?'

কাকার প্রশ্নটা আমার প্রতিই হয়। আমি জবাব দিই—'হাতির চন্নামেতা আমি কিন্তু খেতে পারব না কাকা!'

গোড়াতেই বলে করে রাখা ভালো। সেফটি ফাস্ট! বলেই দিয়েছে কথায়।

'পারবি না? কেন খেতে পারবি না? এ কি তোর গুজরাটি হাতি? কালো আর ভূত? এ হল গিয়ে ঐরাবতের বংশধর, স্বর্গের দেবতাদের একজন। খেতেই হবে তোকে—তা না হলে পরীক্ষায় তুই পাশ করতেই পারবিনে।'

পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারে মেড-ইজির কাজ করবে ভেবে আমি একটু নরম হই। কম্প্রমাইজের প্রস্তাব পাড়তে যাচ্ছি, এমন সময়ে উপগ্রহটি বলে ওঠে—'না না, পুজো করবার আবশ্যক নেই। হস্তী পুজোর ব্যবস্থা তো নেই এদেশে। নিত্যকর্ম পদ্ধতিতেও তার বিধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুজো করার দরকার নেই, এমনি আস্তাবলে ওকে বেঁধে রাখলেই হবে। গায়ে জলের ছোঁয়াচটিও না লাগে, সহিস কেবল এই দিকে কড়া নজর রাখে যেন।'

'সহিস? হাতির আবার সহিস কি? মাহুতের কথা বলছ বুঝি?' কাকা জিজ্ঞেসা করেন।

'সহিস মানে যে ওর সেবা করবে, সইবে ওকে। সহিস কাঁধে বসলেই মাহুত হয়ে যায়। কিন্তু ওর কাঁধে বসা যাবে না তো। ভয়ানক অপরাধ তাতে।' উপগ্রহটি ব্যাখ্যা করে দ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাতির উদ্দেশেই হাত তুলে নমস্কার জানায় কিম্বা মাথায় চুলকায় কে জানে!

'ওর স্নানের ব্যবস্থা তো হল, স্নানটা নাস্তি। আচ্ছা, এবার ওর আহারের ব্যবস্থাটা শুনি'—কাকা উৎগ্রীব হন, 'সাধারণ হাতি তো নয় যে সাধারণ খাবার খাবে?'—তারপর কি যেন একটু ভাবেন—'খায়টায় তো? না তাও বন্ধ?'

তাঁর অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা সবাই অবাক হই। বলে ফেলি, 'খাবে না কি বলছেন? না খেলে অত বড়ো দেহ টেঁকে কখনো তাহলে? হাতির খোরাক বলে থাকে কথায়।'

'আমি ভাবছিলাম, চানটানের পাট যখন নেই তখন খাওয়া-টাওয়ার হাঙ্গামা আছে কিনা কে জানে।' কাকা ব্যক্ত করেন, 'তা কী খায় ও বলত?'

উপগ্রহটি বলে, 'সব কিছুই খায়, সে বিষয়ে ওর রুচি খুব উদার। মানুষ পেলে মানুষ খাবে, মহাভারত পেলে মহাভারত। মানে, মানুষ আর মহাভারতের মাঝামাঝি ভূভারতে যা কিছু আছে সবই খেতে পারে।'

আমি টিপ্পনী কাটি, 'তা হলে হজম শক্তিও বেশ ওর।'

'ভালো, খুবই ভালো।' কাকা সন্তোষ প্রকাশ করেন, 'যদি মানুষ পায়, কতগুলো খাবে? টাটকা মানুষ অবশ্যি।'

'যতগুলো ওর কাছাকাছি আসবে। টাটকা বাসি নিয়ে বড়ো বিশেষ মাথা ঘামাবে না। বলেছি তো খুব উদার রুচি।'

'তুই ওর কাছে যাসনে যেন, খবরদার!' কাকা আমাকে সাবধান করেন, 'তবে তোকে ও মানুষের মধ্যেই ধরবে কিনা কে জানে!'

হ্যাঁ, তা ধরবে কেন? আমি মনে মনে রাগি, তা যদি ও না ধরতে পারে, তাহলে ওকেই বা কে মানুষের মধ্যে ধরতে যাচ্ছে? ওর রুচি যেমনই হোক, ওর বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসা তো আমি করতে পারব না। কাকার মধ্যেই বরং ওকে গণ্য করব আজ থেকে।

তবে একেবারেই নিশ্চিত হতে চান কাকা, 'খাদ্য হিসাবে কি ধরনের মানুষের উপর ওর বেশি ঝোঁক?'

একবার কটাক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে নেন, আমার জন্যেই ওঁর যত ভাবনা যেন।

'চেনা লোকেরই পক্ষাপাতী, চেনাদেরই পছন্দ করবে বেশি। তবে অচেনার উপরেও বিশেষ আক্রোশ নেই। পেলে তাদেরো ধরে খাবে।'

'ভালো ভালো। আর কতগুলো মহাভারত? প্রত্যেক ক্ষেপে?'

'পুরো একটা সংস্করণই সাবড়ে দেবে।'

'বলছ কি? অষ্টাদশ পর্ব ইয়া ইয়া মোটা এক হাজার কপি—?'

'অনায়াসে।' উপগ্রহটি জোরের সঙ্গে বলে, 'অনায়াসে।'

'—সচিত্র মহাভারত?' কাকা বাক্যটাকে শেষ করে আনেন।

'ছবিটবির মর্ম বোঝে না!' আমি যোগ করি।

'সেই রকম বলেই বোধ হচ্ছে।' কাকা মন্তব্য করেন, 'আরে, সবাই কি আর চিত্রকলার সমঝদার হতে পারে?'

উপগ্রহের প্রতি প্রশ্ন হয়, 'সে কথা থাক! মানুষ আর মহাভারত ছাড়া আর কী খাবে? খুঁটিনাটি সব জেনে রাখা ভালো।'

'ইট পাটকেল পেলে মহাভারত ছোঁবেও না; শালদোশালা পেলে ইট পাটকেলের দিকে তাকাবে না, শালদোশালা ছেড়ে বেড়ালকেই বেশি পছন্দ করবে, কিন্তু রসগোল্লা যদি পায় তো বেড়ালকেও ছেড়ে দেবে, রসগোল্লা ফেলে কলাগাছ খেতে চাইবে, মানে, এক আলিগড়ের মাখন ছাড়া সব কিছুই খাবে।'

'কেন, মাখন নয় কেন? মাখন তো সুখাদ্য।'

'মাখনকে যুতমতো ঠিক পাকড়াতে পারবে না কিনা। শুঁড়েই লেপটে থাকবে, ওকে কায়দায় আনা কঠিন হবে ওর পক্ষে।'

'ও!' কাকা এইবার বুঝতে পারেন।

'হ্যাঁ, যা বলেছেন। মাখন বাগানো সহজ নয় বটে।' আমি বলি, 'এক পাউরুটি ছাড়া আর কেউ তা বাগাতে পারে না।'

'যাক খাদ্য তো হল, এখন পানীয়?' কাকা জিজ্ঞাসু হন।

'তরল পদার্থ যা কিছু আছে। দুধ, জল, ঘোলের শরবতক্যাস্টর অয়েল, মেথিলেটেড স্পিরিট—কত আর বলব? কার্বলিক অ্যাসিডেও কিচ্ছু হবে না ওর, তারও দু-দশ বোতল দু-এক চুমুকে নিঃশেষ করতে পারে। কেবল এক চা খায় না।'

'ওটা গুড হ্যাবিট। ভালো ছেলের লক্ষণ।' কাকা ঈষৎ খুশি হন, 'সিগারেট টানতেও শেখেনি নিশ্চয়। সবই তো জানা হল, কিন্তু কী পরিমাণ খায় তা তো কই বললে না হে।'

'যত জুগিয়ে উঠতে পারবেন। এক আধ মণ, এক আধ নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবে।'

'তাতে আর কি হয়েছে। কেবল এক মানুষটাই পেরে উঠব না বাপু, ইংরেজ রাজত্ব কিনা। হাতিকে কিম্বা আমাকেই—কাকে ধরে ফাঁসিতে লটকে দ্যায় কে জানে। তবে আজই বাজারে যত মহাভারত আছে সব বইয়ের দোকানে অর্ডার দিচ্ছি। ময়রাদের বলে দিচ্ছি রসগোল্লার ভিয়েন বসিয়ে দিতে। আমার কলা বাগানটাও ওরই নামে উইল করে দিলাম। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করুক। আর ইট পাটকেল? ইট পাটকেলের অভাব কি? আস্তাবল বানিয়ে যা বেঁচেছে আস্তাবলের পাশেই পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। যত ওর পেটে ধরে ইচ্ছামত বেছে খাক, কোনো আপত্তি নেই আমার।'

অতঃপর মহাসমারোহে হস্তীপ্রভুকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা সবাই শোভাযাত্রা করে পেছনে পেছনে যাই। শেকল দিয়ে ওর চার পা বেঁধে আটকানো হয় শক্ত খুঁটির সঙ্গে, শুঁড়টাকেও, বাঁধা হবে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করি। শুঁড় ছাড়া থাকবে জানতে পারা যায়। শুঁড় দিয়েই ওরা খায় কিনা, কেবল তরল ও স্থূল খাদ্যই নয়; হাওয়া খেতে হলেও ওই শুঁড়ের দরকার।

হাতির দাম শুনে তো আমার চক্ষুস্থির! পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নয়। যে লোকটা বেচেছে সে থাকে দুশো ক্রোশ দূরে, তার এক আত্মীয় শ্যামরাজ্যের জঙ্গল বিভাগে কাজ করে—সেখান থেকে ধরে ধরে চালান পাঠায়। উপগ্রহটি অনেক কষ্টে বহুৎ জপিয়ে আরো কেনার লোভ দেখিয়ে তবে এটি তার কাছ থেকে এত কমে আদায় করতে পেরেছেন। নইলে পুরো লাখটাকাই এর দাম লাগত! এই হস্তীরত্নের আসলে যথার্থ দামই হয় না, অমূল্য পদার্থ বলতে গেলে।

হাতিকে এতদূর হাঁটিয়ে আনতে, তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসতেও ভদ্রলোকের কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু কাকার হুকুম,—কেবল সেই জন্যই—নইলে কে আর প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এহেন বিশ্বগ্রাসী মারাত্মক শ্বেতহস্তীর সঙ্গে—

তা তো বটেই, কাকা অম্লান বদনে তখুনি তাকে একটা পঞ্চাশ হাজারের চেক কেটে দ্যান।

'আরো আছে এমন, আরো আনা যায়', উপগ্রহটি জানান, 'এরকম শ্বেতহস্তী যত চান, দশ বিশ পঞ্চাশ—ওই এক দর কিন্তু।'

'আরো আছে এমন?' কাকা এক মুহূর্তে একটু ভাবেন, 'বেশ, তুমি আনাবার ব্যবস্থা কর। তাতে আর কি হয়েছে, পঁচিশ লাখ টাকার শ্বেত হস্তীই কিনব না হয়—হয়েছে কি।'

'বড়ো মানুষের বড়ো খেয়াল!' সেই পুরাতন গ্রহটি এতক্ষণে বাঙ্‌নিস্পত্তি করে, 'তা না হলে আর বড়োলোক কীসের!'

দুদিন যায়, পাঁচদিন যায়। হাতিটাও বেশ সুখেই আছে। আমরা দুবেলা দর্শন করি। কাকা ও আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, কাকিমা বিশেষ ভক্তিভরে। কাকিমা অনেক কিছু মানতও করেছেন, হাতির কাছে ঘটা করে পুজো এবং জোড়া বেড়াল দেবেন বলেছেন। কাকিমার এখনো ছেলেপুলে হয়নি কিনা।

কলাগাছ খেতেই ওর উৎসাহ বেশি যেন। ইট পাটকেল পড়েই রয়েছে, স্পর্শও করেনি। দু একটা বেড়ালও এদিক ওদিক দিয়ে গেছল, হাতিকে তারা ভালো করেই লক্ষ করেছে, ও কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। গাদা গাদা মহাভারত কোণে পুঁজি করা—তার থেকে একখানা নিয়ে আমি দিতে গেছলাম একদিন। পাওয়ামাত্র উদরস্থ করবে আশা করেছি আমি। কিন্তু মুখে পোরা দূরে থাক, বইখানা শুঁড়তলগত করেই না এমন সজোরে আমার দিকে ছুঁড়েছিল যে আর একটু হলেই আমার দফা রফা হত।

কাকা বললেন, 'বুঝতে পারলি না বোকা? তোকে পড়তে বলছে! ধর্মপুস্তক কিনা! মুখ্যু হয়ে রইলি, ধর্মশিক্ষা তো হল না তোর!'

ধর্মশিক্ষা মাথায় থাক। কাকার পুণ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছি সেই রক্ষা! না, এর পর থেকে এই ধর্মাত্মা হাতির কাছ থেকে সন্তর্পণে সুদূরে থাকতে হবে। সাত হাত দূর থেকে বাতচিত।

এইভাবে হপ্তাতিনেক কাটার পর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামল। মুড়ি পাঁপরভাজা দিয়ে অকাল বর্ষণটা উপভোগ করছি আমরা। এমন সময়ে মাহুত ওরফে সহিস এসে খবর দিল বাদলার সঙ্গে সঙ্গে হাতিটার ভয়ানক ছটফটানি আর হাঁকডাক শুরু হয়েছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটলাম আমরা সবাই।

কী ব্যাপার? সত্যিই ভারী ছটফট করছে তো হাতিটা। মনে হয় যেন লাফাতে চাইছে চার পায়ে।

কাকা মাথা ঘামালো খানিকক্ষণ। 'বুঝতে পারা গেছে। মেঘ ডাকছে কিনা। মেঘ ডাকলে ময়ূর নাচে। হাতিও নাচতে চাইবে তার আশ্চর্য কি? ময়ূর আর হাতি—বোধহয় একজাতীয়? কার্তিক ঠাকুরের পাছার তলায় ময়ূর আর গণেশ ঠাকুরের মাথায় মাথায় ওই হাতি আত্মীয়তা থাকাই স্বাভাবিক। যাই হোক, ওর তিন পায়ের শেকল খুলে দাও, কেবল এক পায়ের থাক, নাচুক একটুখানি।'

তিন পায়ের শেকল খুলে দিতেই ও যা শুরু করল, হাতির ভাষায় তাকে নাচই

বলা যায় হয়তো। কিন্তু সেই নাচের উপক্রমেই, আরেক পায়ের শেকল ভাঙতে দেরি হয় না। মুক্তি পাবামাত্র হাতিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়ে, সহিস বাধা দেবার সামান্য প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু এক শুঁড়ের ঝাপটায় তাকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে চলে যায়।

তারপর দারুণ আর্তনাদ করতে করতে মুক্তকচ্ছ হাতিটা শুঁড় তুলে ছুটতে থাকে সদর রাস্তায়। আমরাও দস্তুর মতো ব্যবধান রেখে, পেছনে পেছনে ছুটি। কিন্তু হাতির সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে পারব কেন? আমাদের মানুষদের দুটি করে পা মাত্র সম্বল। হাতির তুলনায় তাও খুব সরু সরু। খব শীঘ্রই হাতিকে আর দেখা যায় না। কেবল তার ডাক শোনা যায়। অতি দূর দূবান্ত থেকে।

তিনঘণ্টা পরে খবর আসে, মাইল পাঁচেক দূরে, এক পুষ্করিণীতে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আত্মহত্যা করবে না তো হাতিটা? শ্বেতহস্তির কাণ্ড, কিছুই বোঝা যায় না। কাকিমা কাঁদতে শুরু করেন, পুজো আচ্ছা করা হয়নি ঠিকমতন, হস্তিদের তাই হয়তো এমন ক্ষেপে গেছেন, এখন কী সর্বনাশ হয় কে জানে! বংশলোপই হবে গিয়ে হয়তো।

বংশ বলতে তো সর্বসাকুল্যে আমি, যদিও পরস্মৈপদী। কাকিমার কান্নায় আমারই ভয় করতে থাকে।

কাকা এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ছোটেন শ্বেতহস্তীকে প্রসন্ন করতে। আমরা সকলেই চলি কাকার সঙ্গে। কিন্তু হাতিব যেবকম নাচ আমি দেখেছি তাতে সহজে ওকে হাতানো যাবে বলে আমার ভরসা হয় না।



পথের ধারে মাঝে মাঝে ভাঙা আটচালা চোখে পড়ে, সেগুলো ঝড়ে উড়েছে কি হাতিতে উড়িয়েছে বোঝ যায় না সঠিক। আশেপাশে জন প্রাণীও নেই যে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে। যতদূর সম্ভব হস্তীবরেরই কীর্তি যত! শ্বেতশুণ্ডের প্রাদুর্ভাব দেখেই বাসিন্দারা মুল্লুক ছেড়ে সটকেছে এই রকমই সন্দেহ হয় আমাদের।

কিছুদূর গিয়ে হস্তীলীলার আরো ইতিহাস জানা যায়। একদল গঙ্গাযাত্রী একটি আধমড়াকে নিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গাযাত্রায় এমন সময়ে, মহাপ্রভু এসে পড়েন। অমন ঘটা করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে রাস্তা জুড়ে যাওয়াটা ওঁর মনঃপূত হয় না, উনি ওদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। শোনা গেল এক একজনকে, অনেক দূর অবধি তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। কেবল বাদ দিয়েছেন, কেন জানা যায়নি, সেই গঙ্গাযাত্রীকে। সেই বেচারা অনেকক্ষণ অবহেলায় পড়ে থেকে, অগত্যা উঠে বসে দেহরক্ষা কাজটা এ যাত্রা স্থগিত রেখে একলা হেঁটে বাড়ি ফিরে গেছে।

অবশেষে সেই পুকুরের ধারে এসে পড়া গেল। কাকা বহু সাধ্য-সাধনা, অনেক স্তব-স্তুতি করেন। হাতিটা শুঁড় খাড়া করে শোনেন, কিন্তু নড়েচড়ে না। রসগোল্লার হাঁড়ি ওকে দেখানো হয়, ঘাড় বাঁকিয়ে দ্যাখে, কিন্তু বিশেষ উৎসাহ দ্যাখায় না।

পুকুরটা তেমন বড়ো নয়। কাকা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ান—কাছাকাছি গিয়ে কথা কইলে ফল হয় যদি। কিছু ফল হয়. কেননা হাতিটা কাকা বরাবর তার শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়।

আমি বলি—'পালিয়ে এস কাকা। ধরে ফেলবে।'

'দূর! আমি কি ভয় খাবার ছেলে? তোর মতন অত ভীতু নই আমি।' কাকার সাহস দেখা যায়; 'কেন, ভয় কীসের? আমাকে কিছু বলবে না। আমি ওর মনিব—মনিব—উঁ হু হু—শ্রীবিষ্ণু! সেবক—'

বলতে বলতে কাকা জিভ কাটলেন। কান মললেন নিজের। উঁহু, মনিব হব কেন, অপরাধ নিয়ো না প্রভু শ্বেতহস্তী! আমি তোমার ভক্ত—শ্রীচরণের দাসানুদাস। কি বলতে চাও বল, আমি কান বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার ভক্তকে তুমি কিছু বলবে না আমি জানি। হাতির মতো কৃতজ্ঞ জীব দুনিয়ায় দুটি নেই, আর তুমি তো সামান্য হাতি নও, তুমি হচ্ছ একজন হস্তী-সম্রাট।'

কাকা কান বাড়িয়ে দ্যান, হাতি শুঁড় বাড়িয়ে দ্যায়—আমরা রুদ্ধশ্বাসে উভয়ের উৎকর্ণ আলাপের অপেক্ষা করি।

হাতিটা কাকার সর্বাঙ্গে তার শুঁড় বোলায়, কিন্তু সত্যিই কিছু বলে না। কাকার সাহস আরো বেড়ে যায়, কাকা আরো এগিয়ে যান। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন, 'দেখছিস, কেমন আদর করছে আমায় দেখছিস?'

কিন্তু হাতিটা অকস্মাৎ শুঁড় দিয়ে কাকার কান পাকড়ে ধরে। কানে হস্তক্ষেপ করায় কাকা বিচলিত হন—'কেন বাবা হাতি! কি অপরাধ করেছি বাবা তোমার শ্রীচরণে যে এমন করে তুমি আমার কান মলছ?'

কিন্তু হস্তীরাজ কর্ণপাত করেন না। কাকার অবস্থা ক্রমশই করুণ হয়ে আসে; তিনি আমার উদ্দেশ্যে (চেষ্টা করেও আমার দিকে তাকাতে তিনি পারেন না) বলেন—'বাবা শিবু, কান গেল, বোধ হয় প্রাণও গেল। তোর কাকিমাকে বলিস—বলিস যে সজ্ঞানে আমার হস্তীপ্রাপ্তি ঘটে গেছে!'

আমরা ক্ষিপ্র হয়ে উঠি, কাকাকে গিয়ে ধরি। জলের মধ্যে একা হাতী, স্থলের মধ্যে আমরা সবাই।। হাতির চেষ্টা থাকে কাকার কান পাকড়ে জলে নামাতে—আর হাতির চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সেই দিকেই আমাদের প্রচেষ্টা। মিলনান্ত কানাকানি শেষে বিয়োগান্ত টানাটানিতে পরিণত হয়, কান নিয়ে এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানিতে!

কিছুক্ষণ এই টাগ-অফ-ওয়ার চলে। অবশেষে হাতি পরাজয় স্বীকার করে। কাকার কান শিকার করে তারপরে। আর হাতির হাতে কান সমর্পণ করে কাকা এ যাত্রা প্রাণরক্ষা করেন।

কাকার কানটি হাতি মুখের মধ্যে পুরে দেয়। কিন্তু খেতে বোধহয় তার ভালো লাগে না। সেইজন্যই সে এবার রসগোল্লার হাঁড়ির দিকে শুঁড় বাড়ায়।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে কাকা বকতে থাকেন—'দিসনে খবরদার, দিসনে ওকে রসগোল্লা। হাতি না আমার চোদ্দো পুরুষ! পাজি, ড্যাম, শুয়ার, রাসকেল, গাধা, ইস্টুপিট! উঃ, কিছু রাখেনি কানটার গো, সমস্তটাই উপড়ে নিয়েছে। উল্লুক, বেয়াদব, আহাম্মোক!'

কাকার কথা হাতিটা যেন বুঝতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে আসে। ও হরি, একি দৃশ্য! গলার নীচের থেকে যে অব্দি জলে ডোবানো ছিল হাতির সর্বাঙ্গ একেবারে কুচ কুচে কালো; যেমন হাতিদের হয়ে থাকে, কেবল গলার উপর থেকে সাদা। অ্যাঁ, এ আবার কী বাবা?

তাকিয়ে দেখি, পুকুরের কালো জল হাতির রঙে সাদা হয়ে গেছে। শ্বেতহস্তীর এ আবার কী লীলা?

কর্ণহারা হয়ে সে-শোকও কাকা কোনো মতে এ পর্যন্ত সামলে ছিলেন, কিন্তু হাতির এই চেহারা তাঁর অসহ্য হয়। অত সাধের তাঁর সাদা হাতি—!

মূর্ছিত কাকাকে ধরাধরি করে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই। হাতির দিকে কেউ ফিরেও তাকাই না। একটা বিশ্রী, কালো, ভূতের মতো চেহারা কদাকার কুৎসিত বুড়ো হাতি। উনি যে কোনো কালে লোহার সিংহাসনে বসে রাজপূজা লাভ করেছেন একথা ঘুণাক্ষরেও কখনো মনে করা কঠিন।

পরদিন একজন লোক জরুরি খবর নিয়ে আসে—অনুসন্ধানী উপগ্রহের প্রেরিত অগ্রদূত। উপগ্রহটি আরো পঞ্চাশটি শ্বেতহস্তী সংগ্রহ করে কাল সকালেই এসে পৌঁচচ্ছেন সেই খবর। কাকার আদেশে প্রাণ তুচ্ছ করে বহু কষ্ট স্বীকার করে দুশো ক্রোশ দূর থেকে চারপেয়ে হাতিদের সঙ্গে দুপায়ে হেঁটে তিনি—ইত্যাদি ইত্যাদি!

কিন্তু কে তুলবে এই খবর কাকার কানে?

মানে, কাকার অপর কানে?

কাহিনী শেষ করে আমি বললাম—'এবার তোরা একটা গল্প বল শুনি।'

'আমি এক কাকার গল্প বলতে পারি' বলল লুনা।—'আমাদের কাকার গল্প।'

তার সঙ্গে একটা কাকাতুয়াও জড়ানো আবার।' জানালো সলিল।

'সেই সঙ্গে ভূতও আছে তার উপর।' আলো বলে উঠল। বলতে গিয়ে যেন জ্বলে উঠল দপ করে।

'বাঃ বাঃ! তাহলে তো চমৎকার! আমি বললাম—'কাকার সঙ্গে কাকাতুয়া, তার সঙ্গে ভূতও রয়েছে আবার! সোনায় যাকে বলে সোহাগা।'

'ভূতটা কিন্তু মানুষের নয় দাদা।' জানালো আলো: 'বলে দিচ্ছি আগের থেকেই। একটা কাবুলি বেড়ালও ছিল কিনা এই সঙ্গে। এটা হচ্ছে তারই ভূত—বুঝেছ?' কাবুলি ভূত কিম্বা বেড়াল ভূত যাই বল!

'মানুষই তো মরে ভূত হয় জানি। বেড়াল মরলে কি ভূত হয় নাকি রে?' আমি শুধাই।

'হয় কিনা জানিনে। আমি তো কোনো বেড়াল ভূতের কথা শুনিনি কখনো। দেখিওনি দাদা! তবে এই বেড়ালটা হয়েছিল।' হলফ করে বলল সলিল।

তারপরে যে কাহিনী ওদের মুখে ব্যক্ত হল সেটা এখানে বিস্তৃত করি...

দুই

সকালে উঠেই কী একটা কাজে কাকাবাবু বেরিয়েছিলেন, বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গেল।

ড্রইংরুমে ঢুকেই, সলিলকে পেলেন সামনে। কুশনচেয়ারে এলিয়ে গল্পের বইয়ের মধ্যে সে তখন ডুবেছিল, কাকাবাবুর পদশব্দে সচকিত হয়ে ভেসে উঠল সেই মুহূর্তেই।

'এই যে সলিল! কাকাতুয়ার কথাটা মনে ছিল?'

সলিল ঘাড় নাড়ল—'হ্যাঁ, কাকাবাবু!'

ভাইদের মধ্যে সলিলই সবচেয়ে ভোরে ওঠে, কাকাবাবু তাই বেরুবার আগে, কাকাতুয়ার কথাটা বারবার তাকে মনে করিয়ে—মনে করে রাখবার জন্যে বলে গেছলেন।

'বাঃ, বাঃ। বেশ, বেশ! এইতো চাই!—' এই বলে কাকাবাবু সহাস্যবদনে পেল্লায় এক চকোলেট বার করলেন পকেটের থেকে। কাড্‌বারির বারো আনা দামেরই হবে হয়তো! তারপরে চকচকে কাগজের খোলা ছাড়িয়ে, সন্তর্পণে, তার থেকে একটুখানি গালে ফেলে, —সলিলের নয়, নিজের গালে ফেলে— অবশেষে সবটাই তিনি সলিলের হাতে সমর্পণ, করলেন।

'নে, তুই একাই খা! প্রণব, শ্যামল, আলো কাউকে তোর ভাগ দিতে হবে না। মিথ্যে কথার একেক কাঁড়ি ওরা। সবাই হোন্‌ড্রুফল্‌স্। কোনো কাজের না! তুই যে,

আমার কথাটা রেখেছিস এতেই আমি—কী আর বলব? ভয়ঙ্কর—ভয়ানকরকম—হৃদ্দমুদ্দ বাধিত। যেসব ছেলেরা মন দিয়ে কথা শোনে সেই সোনা ছেলেদের আমি বড্ড ভালোবাসি।"

এক গাল হাসির সঙ্গে তাঁর এক গাদা ভূয়সী প্রশংসা বেরয়।

'হ্যাঁ, ভালো কথা! জল দিয়েছিলিস তো ভুশুন্ডীকে?" কাকাবাবুর মনে পড়ে যায় হঠাৎ! —'ভারী ওদের জলতেষ্টা পায় কিনা! ভারী জল খায় ওই কাকাতুয়ারা। এক নম্বরের জলখোর—যেন একেকটা গোবি মরুভূমি—সাহারা ডেজার্ট।'

'না তো!' সলিল বলে। অম্লান বদনেই বলে।

'জল দিসনি? সে কি রে! কী সর্বনাশ!—' ভয়ানক দুশ্চিন্তা প্রকাশ পায় তাঁর চোখ-মুখে: 'ছোলা দিয়েছিলি? কবার দিয়েছিলিস্?'

'ছোলা? না তো—একবারও না।' এই বলে চকোলেটের একটা তাল সে আলগোছে মুখের মধ্যে ফ্যালে।

'খাবার-টাবার কিচ্ছু দিসনি ওকে?' উৎকণ্ঠায় কাকাবাবু প্রায় কণ্ঠাগত।

'খাবার আবার দিলাম কখন।' নিরুদ্বেগেই বলে সলিল। চর্বিত-চর্বণের সাথে সাথে জানায়।

'তবে কাকাতুয়ার কথা কি ছাই মনে রেখেছ তুমি?'

কাকাবাবু রাগে প্রায় ফাটেন আর কি! —'মিথ্যেবাদী ব্লাডিভস্টক! জাহান্নাম! য়্যাবিসিনিয়া কোথাকার!'

'মিথ্যেবাদী কেন?' সলিলের স্বরে প্রতিবাদের সুর; ব্লাডিভস্টক বা জাহান্নাম বলার জন্যে ততটা নয়, যতটা এই অযথা দোষারোপের জন্যেই সে বিক্ষুব্ধ হয়।

'আলবৎ মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী এবং বোরাবুদর্! এবং বুড়ো বাঁদর।—' রাগ হয়ে গেলে কাকাবাবুর মুখ দিয়ে যা তা সব বেরুতে থাকে—যা তাঁর মনে আসে, তই অনায়াসে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—হিস্টরি জিয়ো-গ্রাফি মানে না! 'কাকাতুয়ার কথা মনে রেখেচ তুমি! মনে রেখেচই বটে।'

'বাঃ! মনেই তো রেখেছি কথাটা! মনেই রেখেচি কেবল।' সলিলের প্রাঞ্জলতায় কাকাবাবুর প্রাণ জল হয় না, বলাই বাহুল্য।

'আহা, মাথা কিনে নিয়েছ আর কি! প্রাণে বাহ্যে করে দিয়েছ আমার। কী আমার হনলুলুরে!'

রাগের মুখে কথ্য অকথ্য কোনো কথাই আটকায় না কাকাবাবুর। এমনকি বঙ্গ ভাষার বরদাস্তের সীমানাও সহজেই তিনি বরখাস্ত করে যান:

'সাণ্ডোমিংগো! সত্যমূর্তি! পাজি ব্রাজিল কোথাকার!—'ইতিহাস এবং ভূগোলের বহির্ভূত (কিংবা অন্তর্গত হওয়াও সম্ভব) যত গাল আর অগাল, শোভাযাত্রা করে তাঁর ভেতর থেকে বেরুতে থাকে, ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়ে আসে:

'হোনডুরাস—মিসিসিপি—সিঙ্কি ফ্যাক্টরি!' বলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—'নিকারাগুয়া! নৈমিষারণ্য! নিকোলো হিঁয়াসে।'

'বারে, আমি কী করলুম?''

'—কী করলুম? নোভাস্কাটিয়া! উলুবেড়ে! হিপোপটেমাস্! ঘটোৎকচ! হেইল সালাশী! পুরুরবা! অরোরা বোয়ালিস্—!'

শোরগোল তুলে, পতাকা উড়িয়ে, গাদাগাদি, গা ঘেঁষে তারা চলে। সেই গালাগালরা। দেশকালের সীমা তছনছ করে যায়। ইন্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড—কিছুতেই থামানো যায় না তাদের।

সলিল শোনে। উৎফুল্ল মুখে শোনে এসব। আর জ্ঞান বাড়ে। আর একটু একটু করে চকোলেট চাখে। সম্বোধনের সমারোহের সঙ্গে এখন আরো যেন মিষ্টিই লাগে তার।

'যাঃ! আর চকোলেট খায় না! আমার দৌলতপুর একাডেমি!—'

চকোলেটের একটুখানিই সে নিজের তালুতে পাঠাতে পেরেছিল—বড়ো তালটাই হাতে ছিল তার—সাবাড় করতে পারেনি তখনো। কাকাবাবু আকস্মিক এক ঝটকায় সেটা হাতিয়ে নেন। ওকে সতর্ক হবার সুযোগটুকুও না দিয়ে।

খাবে কি, হাঁ করবারই ফুরসত পায় না সলিল। তারপরে, চকোলেট হারিয়ে হাঁ করে থাকে।

'চকোলেট খাবেন! সার জং বাহাদুর আমার! বাইটন-কাপ-জেতা ঝানসী হীরোজ এসেছেন!''

এই বলে চকোলেটের বাকীটুকু নিজের মুখের মধ্যে তৎক্ষণাৎ তিনি পাটিয়ে দান। তারপরে, মুখ এবং পা, সবেগে চালিয়ে, সতেজে তিনি চলে যান সেখান থেকে।

চকোলেটের প্রবেশ সত্বেও, তাঁর মুখের ভ্রূকুটি কিছুমাত্র কমতে দেখা যায় না, সেইটাই আরো আশ্চর্য ঠ্যাকে সলিলের।

'ঘাস—বিচালি! গোবর-গাদা! এঁঠো স্লিপার! ছ্যা! ছ্যা!--''

ইত্যাদি বকতে বকতে তিনি অন্তর্হিত হন। শেষের বিশেষণগুলি, চকোলেট বা তার নিজের সম্বন্ধে, কার প্রতি যে তিনি প্রয়োগ করে যান সলিল ঠিক ঠাওর পায় না। আর যাই হোক, কাডবারির চকোলেটকে, তার নিজের মতন অখাদ্য—না, তা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

কাকাবাবুর প্রস্থানের পর, সলিল আবার ডুব দায় তার কুশান্-এ—বইয়ের মধ্যে।

'কাকাতুয়া, না, হাতি!'

সলিল-সমাধির পর, শুধু এইটুকুন তার বুদবুদ ধ্বনি বেরিয়ে আসতে শোনা যায়।

অবশ্যি, এই ঔদাসীন্য একদিনের না। প্রথম যেদিন তাদের বাড়ি, ঝুঁটিবাঁধা, ল্যাজের ঝালর ঝোলানো, ওই রঙচঙে পাখিটির আবির্ভাব হয়েছিল সেদিন তাদের মোটেই এরূপ বিরূপতা ছিল না। বরং, সত্যি কথা বলতে গেলে, সেদিন তাদের উৎসাহ আতিশয্যের চূড়ান্ত-সীমাই স্পর্শ করেছিল! এবং সলিলের ফুর্তিই হয়েছিল সবার বেশি।

হ্যাঁ, সলিলই সবচেয়ে বেশি। এই অপূর্ব পাখিটিকে প্রথম দর্শনেই সে ভালোবেসে

ফেলেছিল। শ্যামল, প্রণব, আলো, সবার চেয়ে আর প্রশংসাবাণীই বেশি উন্মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিন—তার গলাবাজিই ঠেক্কা মেরেছিল সবাইকে।

এবং আজ যে তাদের বৈরাগ্য এই পর্বতপ্রমাণে এসে দাঁড়িয়েছে তারও একটা কারণ আছে বই কি। এই অলক্ষুণে পাখিটা কেবল কাকাবাবুর স্নেহেই তাদের বঞ্চিত করেনি—তাহলে খুব বেশি দুঃখ ছিল না। যদিও সে এ-বাড়িতে পদার্পণ করা মাত্রই কাকাবাবুর চোখের মণি, আসা অবধি তাঁর ভালোবাসা ভোগ-দখল করছে, কাকাবাবুর ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা; তবু সেজন্যে তাদের ঈর্ষা ছিলনা। কোনমা, কাকাবাবুর বিরল স্নেহের খুদ্‌কুঁড়া পাখিটা একাই চেটেপুটে নিঃশেষ করলেও কাকিমার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে মাথা গলাতে পারেনি সে। পাখিটা কাকিমার দুচোখের বিষ। কাকাবাবুর পছন্দ আর কাকিমার রাগের ছন্দ—যেন সমান তালেই বেড়ে চলেছিল। তাইতেই তাদের আপশোশ গেছে—সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে তাতেই। কাকিমাকে একচেটে করেই কাকাবাবুর দুঃখ তারা ভুলতে পেরেছে—পাখিটার সঙ্গে একচোটে। নাকের বদলে নরুন পেলে কোন্ মানুষ না খুশি হয়? এঁদো পুকুরের পানার বদলে মিছরির পানা পায় যদি? পানের বদলে যদি পান্তুয়া মেলে?

কিন্তু সেই তো কথা নয়, কথা আছে আরো। পাখিটা কেবল তাদের জীবনেই বিপর্যয় আনেনি, তাদের এক প্রিয়তম ব্যক্তির প্রাণ নিয়ে টানাটানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার আবির্ভাবের এই কদিনের মধ্যেই। আর সেইটাই হয়েছে সবচেয়ে বেশি ভাবনার ব্যাপার।

তাদের এই প্রিয়তম ব্যক্তিটি—আর কেউ না, একটি কাবুলি বেড়াল।

বেড়ালই বটে, কিন্তু বেড়াল বললে তার অপমান হয়, কাবুলি-আখ্যাতেও তার মর্যাদা তেমন বাড়ে না, তার রূপ-গুণ, হাবভাব চালচলন, সব কিছুর চমৎকারিতা খতিয়ে, চুলচেরাভাবে বিচার করলে, সামান্য চতুস্পদের মধ্যে তাকে গণ্য করতে—কিংবা নগণ্য করতে—প্রাণে লাগে সত্যিই!

বাস্তবিক, পৃথিবীতে এহেন প্রাণী দুর্লভ! মানুষের মধ্যে এমন বেড়াল পাওয়াই যায় না! বেড়ালের মধ্যে সে যেন মানুষের মতোই। এ-বিষয়ে শ্যামল, সলিল, আলোর মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ নেই। তাদের পাড়ার বন্ধুদের —সেই বন্ধুদের বোনদের পর্যন্ত মতের গরমিল দেখা যায়নি। এমনকি, কাকিমাও তাদের সঙ্গে একমত। বেড়াল নিজে যে এ-বিষয়ে ভিন্ন কিছু ধারণা পোষণ করে, এমনো কোনো আভাসও মেলেনি এ পর্যন্ত। ঘুণাক্ষরেও না।

কাকাতুয়ার মতটা জানা যায়নি অবিশ্যি, জানা সহজও নয়, কিন্তু কাকাবাবুর মতো সবার বিপক্ষে একেবারে। অবিলম্বে, অযথা কালহরণ না করে এক্ষুনিই, যাবজ্জীবনের জন্য ওটাকে নির্বাসনে পাঠাতে চান উনি। একই বাড়িতে বেড়ালের উপস্থিতি পাখির পক্ষে নাকি সুবিধের নয়, —এমনকি, বিশেষরকম মারাত্মকই, শাস্ত্রেই নাকি বলেছে, এর বহুবিধ দৃষ্টান্ত নিজের চোখেও তিনি দেখেছেন, তার অতিরিক্ত, আরেকটা উদাহরণ অধিকন্তু দেখতে যে তিনি শুধু অনিচ্ছুক তাই নন, একান্ত অপারগ।

অতএব, আজই হোক আর কালই হোক, আজ হলে কাল নয়, কাবুলিকে চিরনির্বাসনে যেতেই হবে। স্বদেশে—তার কাবুলেই—যেতে হয় কি না তাই কে জানে!

এই আসন্ন সমস্যাটাই সলিলদের বৈরাগ্যের অতল গর্ভে ঠেলে দিয়েছিল!

কিন্তু কাকাতুয়াব প্রথম দিনের সংবর্ধনাটাও তো ভুলবার নয় তাই বলে।

শ্যামল-প্রণবরা ড্রইংরুমে বসে পড়াশুনার ভান করে গুলতানি পাকাচ্ছিল—কদিন আগে আর? এমন সময়ে কাকাতুয়ার দাঁড় হাতে কাকাবাবুর প্রবেশ হলো।

এবং কাকাতুয়ার গুরুগম্ভীর হাবভাব দেখে মনে হল, সে-ই যেন স্বয়ং কাকাবাবুর হাল ধরে রয়েছে। অন্তত, দুজনের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশি, কে যে কার কর্ণধার, নির্ণয় করা দুষ্কর।

কাকাবাবু তো ঘরে ঢুকেই, কোথায় পাখিটাকে দাঁড় করাবেন—অর্থাৎ তার দাঁড় খাটাবেন—তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথম নম্বরেই, শ্যামলদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের সূত্রপাতেই দমিয়ে দিলেন তাদের ঃ

'থাম্! ভিড় করে দাঁড়াস্‌নে। পাখিটার আবহাওয়া কলুষিত হবে! এসব পাখি ভারি সেন্‌সিটিভ, —একটুতেই দূষিত হয়ে পড়ে।' তিনি আগে থেকেই তাদের সাবধান করে দ্যান ঃ 'আর তা ছাড়া—চাইকি—কাছে পেলে ঠুকরেও দিতে পারে। বলা কি যায়?'

পাখিটার ক্ষতির আশঙ্কায় ততটা নয়, যতটা নিজেদের বিক্ষতির ভয়েই তারা পিছিয়ে এসেছে অকস্মাৎ।

কিন্তু কতক্ষণ আর? আলো আবার অদম্য হয়ে উঠেছে ঃ 'দেখেছিস, কত বড়ো টিয়া পাখি! বাব্বা, কত বড়ো!' পক্ষীতত্ত্বে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারেনি সে।

'টিয়া না টিউনিসিয়া! মধ্যপ্রদেশ কোথাকার!' বেশ একটু ক্ষিপ্ত হয়েই মন্তব্য করেছেন কাকাবাবু।

'টিয়াপাখি কত সংক্ষিপ্ত! তাকে আর এত বড়ো হতে হয় না! ময়নাকেও না। তোর মুসোলিনি কিম্বা মস্‌লিপট্টনকেও নয়।'

'টিয়াপাখি না তো কী আবার! আমি বুঝি আর টিয়াপাখি দেখিনি কখনো?' আলোও নিজের গোঁ ছাড়ে না সহজে ঃ 'একটা বুড়ো টিয়াপাখি ধরে এনেছ? একটু বেশি বয়স্ক দেখে, এই আর কি! বয়সে বাড়লে পাখিরা মাথায় আর ল্যাজের দিকে বাড়ে। মানুষের মতো তাদেরো মাথা আর ল্যাজ মোটা হয়। হয় না, তুমি বলতে চাও?'

'টিয়াপাখির বাচ্চা বলা হচ্ছে না তো! তা কে বলেছে!" প্রণবও সায় দিয়েছে আলোর কথায় ঃ 'টিয়াপাখির ধাড়ি।'

টিয়াপাখিকে আর এত ভালো হতে হয় না! কী সুন্দর বল্ তো? কেমন চমৎকার! আহা, যেন একটি বন্য হরিণ। যেন হরিদ্বার। কন্‌খল্—নায়াগ্রা ফল্‌স্! অবিকল গাটাপার্চার! যেন—কী বলব? যেন আমার অবিমৃষ্যকারিতা! আহা!'

আহ্লাদে তিনি আই-ঢাই হন।

'কী ল্যাজের বাহার! ঝুঁটিই বা কেমন! রঙবেরঙের কারসাজিই বা কত না! যেন গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ের তত্ত্ব রে! মামার বাড়ি জামাইষষ্ঠী যেন! যেন ভীম নাগ কি আবার খাবো! সরস্বতী পুজোর দিন হোলি হায়—আহাহা!'

আনন্দের চোটে কাকার ভেতর থেকে পার্থিব-অপার্থিব সবরকম সার্টিফিকেট গড়গড় করে গড়িয়ে আসতে থাকে।

প্রণব বলে ঃ 'কি রকম পাখা দেখেছিস? পাখোয়াজ একেই বলে, জানিস তো? যদিও এর কোনো আওয়াজ নেই।'

শ্যামল যোগ দ্যায় ঃ 'আর কি রকম ল্যাজ একখান! যেন ল্যাজারাস! তাই না কাকাবাবু?'

'এর কী নাম দেবে কাকাবাবু? লাঙ্গুলসম্রাট? নাকি, এর নিজের কোনো নাম আছে, কাকাবাবু?' সলিলের উৎসাহ সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে।

'আমিও যা, ও-ও তাই!—' কাকাবাবু মুচকি মুচকি হাসেন, হাসেন আর বলেন, 'একই নাম, প্রায় একজাতীয়ই নাম—বলতে কি!'

'মিথ্যে বলছ না তো?' চোখ বড়ো করে বলে আলো—সেই সঙ্গে কাকার অপর পার্শ্বেও তাকিয়ে দ্যাখে এক ফাঁকে, ল্যাজট্যাজ কিছু গজিয়েছে কিনা দেখে নেয়। তারপর সন্দেহভরে ঘাড় নাড়তে থাকে ঃ 'উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না আর!'

'হ্যাঁ, কাকা বলেই ডাকতে পারিস ওকে—' সজোরেই সায় দ্যান কাকাবাবু। — 'তোদের দুনম্বরের কাকা! শুধু একটুখানি তুয়া যোগ হয়েছে কেবল। তুয়া হেন গুণনিধি—কাকাতুয়াই ওর নাম!'

পাখিটাকে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আলোর। ইস্কুলে গিয়েও তার স্বস্তি ছিল না, দুনম্বরী কাকাবাবুর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

কাকাতুয়ার প্রাদুর্ভাবের প্রথম দিনের টিফিনের ঘন্টাটাকে সে বরবাদ করতে পারল না। দারোয়ানকে বলে কয়ে বেরিয়ে পড়ল ইস্কুল থেকে। ভালো করে একাকী সকলের অগোচরে পাখিটার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় তার দরকার। এখন প্রণব, শ্যামল, সলিল সবাই ইস্কুলে, বাড়ি নেইকো কেউ, এবং দারোয়ান তাদের ছাড়ান দেবে কিনা সন্দেহ— আলোকেই ছাড়তে চাইছিল না— বাড়ি থেকে খেয়ে আসেনি বলে অনেক করে তবেই সে বেরুতে পেরেছে। পাখিটার সঙ্গে মুখোমুখি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় করবার এই দুর্লভ মুহূর্ত—আধঘন্টার টিফিনের এই অর্ধোদয় যোগ।

আলো আস্তে আস্তে ঢুকল বাড়ির মধ্যে। কেউ কোথাও নেই। কাকাবাবু আপিসে, একনম্বরের কাকাবাবু। কাকিমা ঘুমে অচেতন, এতখানি অচেতন যে, যে-বইখানি নিয়ে পড়তে শুয়েছিলেন তাতেই তাঁর পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে, ইতিমধ্যেই যৎপরোনাস্তি পড়ে গেছে, তবুও তাঁর হুঁশ হয়নি।

এবং, কাবুলি কোথায় কে জানে!

আলো পা টিপে টিপে গেল পাখিটার ঘরে!



ঢুকেছে কি ঢোকেনি, এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল কোত্থেকে ঃ

'কি হে! জল খাবে নাকি এক গেলাস?'

অ্যাঁ? চমকে উঠল আলো। আগাপাশতলা চমকে গেল। কেউ কোথাও নেই, সব নিস্তব্ধ, কেবল চোখের সামনে ঘরের মাঝখানে ঝোঝুল্যমান খাঁচা, এর ভেতর এরকম বেয়াড়া আওয়াজ বার করল কে?

দাঁড়ে দোদুল্যমান দুনম্বর কাকাবাবুই নয়তো?

কাকাতুয়ারা ডাক ছাড়ে, কাকাদের মতোই প্রায়—এবং তার অধিকাংশই ফাঁকা আওয়াজ, ঠিক কাকাদের মতনই; আলোর জানা ছিল। কাজেই সে ভয় খায়নি, ভড়কায়নি, —দমবার ছেলেই নয় সে—প্রথমেই যা-একটু ঘাবড়ে গেছল তাই—কিন্তু এখন সে মোটেই অপ্রস্তুত নয়—রীতিমতোই সামলে উঠেছে এতক্ষণে।

অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে অযাচিত অভ্যর্থনা লাভ করে তাকে উল্লসিতই দেখা যায়। সহাস্যমুখেই সে কাকাতুয়ার জবাব দিয়েছে ঃ

'খেলে তো হয়। কিন্তু খাওয়াচ্ছে কে?'

এবং কাকাতুয়াকে একেবারে পরাস্ত করার অভিপ্রায়ে সেই সঙ্গে আরো শোনালো ঃ

'গড়িয়ে দেবে নাকি তুমি?'

কাকাতুয়ার মুখে দ্বিতীয় কথাটি নেই। উচ্চবাচ্যই নেই কোনো। ভদ্রজন অপদস্থ হলে যেমনটা হয়। আলোর মনে আঘাত লাগে। খাঁচার বন্দী কোনো প্রাণীর কাছে, এহেন অসম্ভব দাবি উপস্থিত করে তাকে লাঞ্ছিত করা তার উচিত হয়নি। কাকাতুয়া যে অপমানিত বোধ করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে তখন সান্ত্বনা দিতে থাকে ঃ

'না না। তোমাকে গড়িয়ে দিতে হবে না। তুমি কেন দিতে যাবে? তুমি আমার আদুরে সোনা! সোনা মাণিক তুমি আমার! তুমি কেন গড়িয়ে দেবে? ছিঃ ছিঃ!—'

বলতে বলতে সে খাঁচাটাকে শিক থেকে খুলে এনে বড়ো টেবিলের উপরে বসায়, আর নিজেও চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার পাশেই। পাখিটার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে—

আর তার মুখ থেকে অনর্গল বেরুতে থাকে ঃ

'বাঃ বাঃ! কী চমৎকার তুমি! কেমন তোমার ল্যাজ! কিরকম তোমার রঙ! তুমি—তুমি কী সুন্দর!—'

আলো যতই ওকে দেখছে ততই যেন বিভোর হচ্ছে। ততই যেন ওর ভালোবাসায় পড়ে যাচ্ছে।

'তুমি—তুমি—তুমি—কী বলব? দু নম্বরের কাকা বললে তোমার অপমান করা হয়। তুমি আমাদের কাকাবাবুর চেয়ে ঢের ভালো! —ঢের ঢের ভালো। —'

এতখানি সমাদরের পর, কাকাতুয়াটা এতক্ষণে একটা কথা বলে। অপর পক্ষের এতখানি মুখরতার পর মুখ না খোলা তো ভালো দেখায় না।

'ঘাড় চুলকে দাও আমার!'

এই বলে সে ঘাড় নিচু করে অপেক্ষা করে। খাঁচার শিকের বাইরে গলা বাড়িয়ে ধৈর্য ধরে থাকে। এটা একটা খেলা, খেলাই মাত্র, মজার খেলা করা ছাড়া আর কিছু না, এই তার চিরদিনের ধারণা।

কিন্তু সে-ধারণা তার এবার টলে যায়—

আলো এগিয়ে গিয়ে পেনসিল দিয়ে ঘাড় চুলকে দ্যায় তার—

পাখা ছটপট করে পাখিটা পিছিয়ে যায় খাঁচার মধ্যে। এরকমটা ঘটবে, সত্যিই তার ঘাড়ে কেউ হাত দেবে, এ ধরনের কোনো আশঙ্কা কখনো তার ছিল না। খাঁচার আর এক কোণ থেকে, মুখ কালো করে সন্দিগ্ধচোখে সে তাকাতে থাকে আলোর দিকে।

'কেন? কী হল? ঘাড় চুলকে দিয়েছি তো? তবে?' আলোও যে একটু আশ্চর্য না হয় তা নয়।

পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে আলোর ভাবভঙ্গি দ্যাখে। সভয়েই দ্যাখে। খাঁচার সুদূর কোণ থেকে এক পাও আর সে এগোয় না। আলোর কথার কোনো উত্তরও দ্যায় না সে।

'ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ল! এইবার আমি যাই; কেমন?' আলো উঠে পড়ে হঠাৎ ঃ 'কালকে আবার তোমার ঘাড় চুলকে দেব। টিফিনের সময় কাল আসব আবার, কেমন?'

এই বলে কাকাতুয়াকে আশ্বস্ত করে শশব্যস্ত আলোক ছুট মারে ইস্কুলের দিকে।

আলোও গেছে আর কাবুলিও ঢুকেছে বাড়ির মধ্যে; আলোদের আদুরে বেড়াল

কাবুলি। কাকাবাবুর পরেই, বাড়ির মধ্যে সে সর্বেসর্বা —অন্তত কাকাতুয়ার আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তার আসন এখানে অটল ছিল।

দুপুরবেলা, আহারাদির পর, বাড়ির গিন্নি দিবানিদ্রায় ব্যাপৃত হলে কাবুলি পাড়া বেড়াতে বেরয়! দিবানিদ্রা কিছু খারাপ না, দিতে পারলে ভালোই; কাবুলিও, দিবারাত্রে, যখনই ফুরসত পায়, ঘুমিয়ে নেয় খানিক। কিন্তু, বলতে কি, পাড়া বেড়ানো তার চেয়ে আরো ভালো, পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে, অন্য সব বেড়ালদের সঙ্গে, অন্যান্য বেড়ালদের বিষয়ে পরচর্চা করা, অনেকটা চুরি করে দুধ খাওয়ার মতোই চমৎকার। গৃহিণী দিবানিদ্রায় নিমগ্ন হলে, কাবুলি বেড়াতে যায়—তার এই নিত্যকর্মে কোনো কামাই নেই—পর-চর্চার সঙ্গে পরস্মৈপদী মাছ ভাজা খেতেও সে কোনো কার্পণ্য করে না।

কাকাতুয়ার ঘরে সে পা দিয়েছে, কয়েক পা এগিয়েওছে—

'কী হে! জল খাবে নাকি এক গেলাস?'

শোনামাত্র কাবুলি থ! বেড়ালদের পিলে আছে কিনা কে জানে, থাকলে, সেখানে পর্যন্ত তার চমক গিয়ে পৌঁছেছিল নিঃসন্দেহ। সামান্য একটা পাখির মুখে এত বড়ো কথা—এমন অসামান্য বাণী তার গলায়—হিজ মাস্টারস ভয়েস শুনতে পাবে এতটা সে কোনোদিন প্রত্যাশা করেনি।

এক পা তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পা নামাতে, এমনকি ম্যাও করতেও ভুলে গেছে সে—

পাখিটা এবার গরাদের বাইরে মাথা গলিয়ে ঘাড় নিচু করে গলা ছাড়ে ঃ

'ঘাড় চুলকে দাও। ঘাড় চুলকে দাও তো আমার।'

এ রকম অবস্থায়। কাবুলির কী করা উচিত? কী করবে বেচারা? কিয়ৎক্ষণ সে ভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। তারপর সাত-পাঁচ ভেবে, এক লাফে টেবিলের উপর গিয়ে ওঠে—

কাকাতুয়াটার সনির্বন্ধ অনুরোধ সে এড়াতে পারে না—!

'ঘাড় চুলকে দ্যায়, বলাই বাহুল্য!.....

ছেলেরা বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে খেলাধুলা করতে বেরিয়েছে। তারপরে খেলাধুলা সেরে বাড়ি এসে পড়তে বসেছে, কাকাতুয়ার ইতরবিশেষ কিছু তাদের চোখে পড়েনি—

কাকাবাবু আফিস থেকে ফিরলেন সন্ধ্যার বেশ পরে। তারই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ল—

কাকাতুয়ার ঘাড়-চুলকানো কাবুলি-কাণ্ড তাঁরই চোখে পড়ল সর্বপ্রথম ধরা পড়ল—

'ব্লাডিভাস্ট্‌ক্‌রা সব যায় কোথায়? থাকে কোথায় সারাদিন?—'

আর্তনাদ আর উচ্চ নিনাদ একসঙ্গে মিক্‌চার করে তিনি আকাশ ফাটান ঃ

'হতভাগা কাব্‌লে আমার ভুশুণ্ডিকে এদিকে মেরে ফেলেছে একেবারে। কোথায় গেল হনলুলুরা সব? হনুমানরা বাঁদররা যত? অ্যাঁ—?'

কাকার চিৎকারে সবাই ছুটে এসে জুটল। ব্লাডিভাসটক্ সব কটাই। হনলুলুরাও বাদ গেল না! কাকিমাও হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়লেন। চর্চড়ির খুন্তি হাতে।

'কোথায় ছিলি সব তোরা? ব্লাডিভাস্টক্রা কোথাকার—?'

কাকাবাবুর ঝট্কায় শ্যামল-সলিলরা পিছিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ।

'হনলুলুদের সব এক টাকা করে জরিমানা! উহুঁ, দুটাকা করে বেতন কাটব সক্কলের!—'

শোনবামাত্র চাকর-দাসীরা মুষড়ে পড়লে সব।

'দ্যাখো দিকি গিন্নি! তোমাদের কাব্লের কাণ্ডটা একবার দ্যাখো! ঘাড়টা একেবারে খাব্লে নিয়েছে ভুশুণ্ডির! বাড়িতে এতগুলো জানোয়ার, ...একগন্ডা ডায়নোসেরাস্......নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল নাকি সবাই? এক্টা কাব্লেকে.....এক্টা মোটে রিসিপ্লাস্........তাই সামলাতে পারে না? সব ব্যাটা নরওয়ে! কোনো কম্মের নয়। কাজের বেলায় ভাগলপুর, আর খাবার বেলায় দেরাদুন! যা, যেখান থেকে পারিস, ধরে আন বেটা কাবলেকে! কান ধরে নিয়ে আয়। সেই হেল শালাসীকে একবার আমি দেখতে চাই! কুচি কুচি করে কাটব ব্যাটাকে! কোথায় গেল হিপোপটেমাস্টা? হুতোম্ প্যাঁচাটা গেল কোথায় শুনি? আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন!......'

—একমাত্রাও বলা চলে! ছোট্ট একটা গোলাপ-পাপড়ির মতো একটু খানি। কাকাবাবুর একমাত্র মেয়ে লুনা উপরের ঘরে মাস্টারের কাছে বসে পড়ছিল, ছাড়া পেয়ে ছুটে এল এতক্ষণে।

'কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে?'

'কাছে এসে দ্যাখো সে—' এই বলে লুনাকে তিনি কাকাতুযার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন: 'ঘাড়ের কাছটা কেমন ফেটে গ্যাছে দেখেছিস!'

লুনা ভালো করে খুঁটিয়ে দ্যাখে, দেখে ঘাড় নাড়ে।

'কী মনে হয় তোর?' লুনার বাবা মেয়ের অভিমতেরই যেন মুখাপেক্ষা করেন।

'খুব শক্ত খাবার, বাবা!' কাকাতুয়ার কাঁধের ক্ষতির সঙ্গে জড়িত সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে—সব কিছু পর্যালোচনা করে, গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিচালে, ভেবে-চিন্তেই জবাব দেয় লুনা। 'তাছাড়া আর কিছু না।'

'খুব শক্ত কী—? কী বললি?'

'খুব শক্ত খাবার।' লুনা পুনরুক্তি করে।

'কিসের শক্ত খাবার শুনি?'

'নরম খাবার খেতে পেলে কাকাতুয়ারা ভালো থাকে। শক্ত খাবার চিবুতে ওদের ভারী কষ্ট হয়। জানো বাবা, শক্ত জিনিস চিবুতে গেলে ঘাড় ফেটে যায় ওদের। শুকনো চিড়ে গিলতে গেলে আমাদের যেমন গলা চিরে যায় না? তেমনি ওদেরও। খুব বেশি শক্ত খাবার খেয়েই'—

'তুই থাম! আস্ত একটা ভিজাগাপটাম্! মরে যাই আরকি! কাকাতুয়ারা নরম খাবার খায়! তোকে বলেছে! এক নম্বরের কলম্বাস্! সান্ডোমিংগো কোথাকার! আমি

জানি কেন ওর ঘাড় ফেটেছে। ওর কারণ হচ্ছে, খুব বেশি রকমের শক্ত খাবার নয়, খুব বেশি রকমের বেড়াল! এই বাড়ির সেই এশিয়াটিক্ আরকিপ্লেগো—সেই কালো বেড়ালটাই হচ্ছে এর ঘাড় ফাটার মূল কারণ! আমাকে আর বেশি করে বোঝাতে হবে না!'

লুনা তবু অনেকবার ঘাড় নাড়ে ঃ 'কিন্তু যা গরম পড়েছে, দেখেছ, বাবা? এই গরমের জন্যেও কাকাতুয়ার ঘাড় গলতে পারে। গরমের চোটে কী না হতে পারে বাবা? কৌটোর মধ্যে মাখন পর্যন্ত গলে যাচ্ছে!—'

'ঘাড় গলবে তার আর বেশি কি!' সলিলও লুনার সমর্থন করে। বেড়ালের স্বপক্ষে, তাকে রক্ষা করতে, আসামি-তরফের উকিলের মতো, নিজেরও ঘাড় সে গলিয়ে দ্যায়—নিজের মক্কেলের সঙ্গে।

— 'ঘাড় তো গলার কাছেই থাকে। নিজেকে গলাবে সে আর বেশি কথা কি! ঘাড় আর গলা তো পিঠোপিঠি কাকাবাবু!'

'যা-যাঃ! ঘাড় গলা অত সস্তা নয়। কাকাতুয়াদের ঘাড় কদাচ গলে না! অন্তত গরমে গলে না কক্ষনো! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। তোদের আর সাউখুরি করতে হবে না! যেন সব কেপ্ অফ্ গুড্ হোপস্ এলেন! ফিলিপাইন্ আইল্যান্ডস্ কোথাকার! আর্জেনটিনা!'

লুনার মা অবশেষে বলেন ঃ 'তু কি তাহলে বলতে চাও যে বেড়ালেই—?'

লুনার বাবার বাধা দিতে দেরি হয় না ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ! বেড়ালেই। সেই হতভাগা কাবুলি বেড়ালটাই! তোমার সেই পুষ্যিপুত্তুরই ওর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করেছে। তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই! সে ছাড়া আর কার এত দায় পড়েছে ওর ঘাড় ভাঙবার?'

আলো আস্তে আস্তে উসকে ওঠে এক কোণ থেকে ঃ 'কিন্তু কাকাবাবু, কাকাতুয়াটা তো কোনো ধার ধারে না কাবুলির। কিচ্ছু তো ধারে না ওর কাছে, তবে কেন কাবুলি ওর ঘাড়ে হস্তক্ষেপ করতে যাবে? তুমিই বলো কাকাবাবু! তুমিই তো সেদিন বলছিলে, যে ধার না ধারিলে কাবুলিরা কক্ষনো কাহাকেও কিছু বলে না। তুমিই বলো!'

'নিশ্চয়! কাবুলিটা এর ধারে কাছে এসেছিল নিশ্চয়, তা না হলে ঘাড়ে হাত দেবে কি করে? ধারে আগে আসতেই হবে। আমি তো সেই কথাই বলেছি। এখনো তাই বলছি। এখনো তাই বলচি। এখনো আমার সেই কথাই!' এই বলে কাকাবাবু এক ফুঁ-য়ে আলোকে একেবারে নিবিয়ে দ্যান।

কাকিমা বলেন ঃ 'কক্ষনো আমাদের কাবুলি নয়। সে নিতান্ত অহিংস। তার হৃদয় অতি কোমল। তাকে আমি ভালোরকম জানি। কোনোদিন একটা মাছির গায়েও হাত দিতে দেখিনি। মাছের গায়েও নয়। এমন কাজ সে করতেই পারে না।'

'থামো! থামো! তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে? আমি তো ডেকেছি, হনলুলুদের—ব্লাডিভাস্ট্‌ক্‌দের। তোমাকে ডাকিনি তো! তুমি শুয়ে শুয়ে তোমার নভেল পড়োগে যাও! তোমাকে এখানে এসে গিন্নিপণা ফলাতে হবে না!—এই বলে

গিন্নিকেও তিনি আরেক ফুৎকারে নির্বাপিত করার চেষ্টা করেন ঃ লুনার মা তো! লুনার বেশি আর কী বুদ্ধি হবে তার? লুনাটিক্ য়্যাসাইলাম আমার!'

'কাবুলিকে ওর ঘাড়ে হাত দিতে দেখেছে কেউ?' লুনার মা তবুও নিজের গোঁ ছাড়েন না, 'কাবুলিরই যে কাণ্ড আর কি কোনো প্রমাণ আছে?'

লুনার বাবা কিছু না বলে ঝুঁকে পড়ে নীরবে মেজের থেকে কাকাতুয়ার লেজের একখানা পালক কুড়িয়ে নেন, সেই ছিন্ন পালকটি তুলে ধরে পুনরায় তার লেজে সন্নিবিষ্ট করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুন না কেন, খসা পালককে কিছুতেই আর যথাস্থানে বসানো যায় না। কাকাতুয়া নিজেই নিজের প্রিভিয়াস্ লেজের প্রিভিলেজ্ ফিরে পেতে চায় না কিম্বা পালকটাই তার পালিতের পিঠে পুনরায় চড়াও হতে গররাজি হয়, সঠিক বলা যায় না, কিন্তু কাকাবাবু তাঁর উদ্যমের ব্যর্থতায় ভারী ক্ষুব্ধ হন। সখেদে চেঁচিয়ে ওঠেন ঃ 'যত সব আহাম্মোক। ছোটোলোক কোথাকার!'

এই বলে কাকাতুয়া কিম্বা সেই পালক কিম্বা দুইজনকেই এক চোটে গালাগালি করে কাবুলির অন্বেষণে তিনি বহির্গত হন। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ওঘর থেকে সে-ঘরে যান, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা নেই। তাঁর পেছনে চলে কাকিমা, লুনা, তাঁর ভাইপোদের ফৌজ! এবং ধূরে ধূরে থাকে যত নরোয়েরা যারা কোনো কর্মের না, কাজের বেলায় ভাগলপুর, আর খাবার বেলায় দেরাদুন! বেল্লিক যত বেলিয়ারিক আইল্যান্ডস্! বেলগ্রেড যত! কাবুলির খোঁজে বক্কেশ্বরের বিরাট দলবল বেরিয়ে পড়ে।

হঠাৎ কাকাবাবুর খেয়াল হয়, খুঁজলেই খালি হবে না, ডাকাও চাই যে। তাকে যে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে, না জানলে, টের না পেলে, সে ব্যাটা বেরুবে কেন অমনি? আর কিছু থাক আর না থাক, কাবুলি হতভাগার মর্যাদা-জ্ঞান আছে। তাছাড়া, কারো আত্মসম্মানেই ঘা দেয়া উচিত নয়।

অতএব, অতীব মোলায়েম সুরে, কাকাবাবুর হাঁক ডাক শুরু হয়, অত্যন্ত খাতির করেই তিনি ডাকতে থাকেন ঃ

'মিঞা! মিঞাও! মিঞা আও!......

ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করতে করতে তিনি চলেন। কিন্তু মিঞার কোনো সাড়াশব্দই নেই।

কাকাবাবুর অনুসরণে. প্রথমে আলো, তারপরে প্রণব-সলিল-লুনা কেউ বাদ না, সবাই মিলে নিজেদের সরু-মোটা গলা বার করে। সবাই মিলে বারম্বার ডাকাডাকি শুরু করে দ্যায় ঃ

মিউ! মি-ইউ! মিঁউউ! ম্যাঁও! মেয়াও!........

'এই! কি করছিস তোরা! সবাই কেন ডাকছিস? সবাই মিলে ডাকলে ভড়কে যেতে পারে!'' কাকাবাবু কড়কে দ্যান ওদের ঃ 'এতগুলো বেড়াল একসঙ্গে বেরিয়েছে জানলে কি ও আর বেরুতে সাহস পাবে? ভয় খেয়ে যাবে না?'

'হ্যাঁ, তোরা আবার ডাকছিস কেন; তোদের গলা পেলে কাবুলি বেরিয়ে আসতে পারে, সে হুঁস আছে?' কাকিমাও ওদের হুঁশিয়ার করে দিতে চান।

কাকিমার কথায় সলিলরা সবাই চুপ মেরে যায়, কেবল কাকাবাবু নিজেই মনোমুগ্ধকর কণ্ঠের তানালাপে, নানান কায়দায়, অভ্যর্থনা জানাতে থাকেন, কিন্তু বেড়ালের তরফ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর আসে না। কোনো উচ্চবাচ্যই নেই! বিচক্ষণ প্রাণী, এত গোলমালে, বিপর্যয় কিছু একটা ঘটেছে বুঝতে পেরে কোথায় যে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে পড়ে, আন্দাজ করাই যায় না। অবশেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু কাকিমার দিকে ফেরেন ঃ

'গিন্নি! তুমি ডাকো তো। তুমি ডাকলে বেরুবে বোধহয়। তোমাকেই তো বেশি ভালোবাসে পাজিটা!'

'না বাপু, আমি ওসবের মধ্যে নেই—' কাকিমা স্পষ্টই বলে দ্যান ঃ 'ওর ভালোবাসার জন্যে না, —বেচারিকে আমি ভালোবাসি বলেও বলছিনে, বেড়াল মারার ব্যাপারেই আমি থাকব না। বেড়ালের গায়ে হাত তোলা ভারী খারাপ!'

'রাবিশ্‌!' বলেন কাকাবাবু ঃ 'বেড়াল মারলে ঢেঁকি হয়!'

'বেশ, তোমার ইচ্ছে হয় মারতে পার। বেড়াল মেরে একজন লোক পাগল হয়ে গেছল আমি জানি।'

'অ্যাঁ? বটে? আমাকে ভয় দেখানো? সন্ত্রাসবাদ? ওসব কুসংস্কার আমার নেই, ওসবে আমি ভয় খাইনে! ভড়কাইনে একদম। ওসব সেকেন্দ্রাবাদ তুমি শিকেয় তুলে রাখো গে!'

মুখে বলেন বটে কাকাবাবু, কিন্তু মনে মনে যে একটুখানি ঘাবড়েছেন সেটাও বেশ টের পাওয়া যায়।

'তাছাড়া আমি নিজে তো মারতে যাচ্ছিনে, নিজে হাতে মার নাতো, হনলুলুদের একজনকে বলব, সেই ও-কাজ হাঁসিল করবে! এই ব্যাটা বান্দারাব্বাস্‌!—'

এই বলে কাকাবাবু চাকরদের একজনকে সম্বোধন করেন ঃ 'একটা টাকা দেব, পারবিনে কাবলের গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে আসতে; জরিমানাও মাপ পাবি। জরিমানার দুটো টাকাও মাপ পেয়ে যাবি তাহলে।'

'আমি না কর্তা!' তথাকথিত বান্দারাব্বাস ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায় ঃ 'দু এক টাকা কি বলছেন কর্তা? একশটা মোহর পেলেও একাজ আমি পারব না। বেড়াল মারা? বাপ্‌রে!'

'মা ষষ্ঠীর বাহন! বংশলোপ হবে!' বলে আরেকজনও তার আপত্তি জানায়।

'কী আমার মেহেরুন্নিসা! মোহর পেলেও পারব না। কে যেন ওঁকে মোহর দিতে যাচ্ছে! মোহর আমার থাকলে তো!' তিনি যে কোনো মোহের বা মোহরের বশীভুত নন সেকথা স্পষ্টই সবাইকে তিনি জানিয়ে দেন।

এইসবের মাঝখানে আলো একফাঁকে কাকাতুয়াটার ইণ্টারভিউ নিতে সরে পড়েছিল। সে ফিরে এসে নতুন খবরের লেটেস্ট্‌ টেলিগ্রাম বার করে ঃ

'কাকাবাবু দ্যাখো, দ্যাখো এসে! কাকাতুয়াটার একটা চোখ খুলেছে। দেখে এলাম আমি, অনেকটা সেরে উঠেছে এখন।'

'বেশ, সেরে উঠে থাকে—যদি সেরে ওঠে, ভালো কথা—কোনো ক্ষতি নেই। কাবুলের কিছু হবে না তাহলে। অবিবেচক নই—অবিচার করব না। অন্যায়ভাবে কাউকে মারতে আমি চাইনে। ন্যায়-বিচারই করব কিন্তু একথাও বলছি, ভুশুণ্ডি যদি এই খাবলানিতে মারা পড়ে—মানে কালকেও মারা যায়—তাহলে কাবলেরও বারোটা বেজে গেছে। তাহলে ওর আর বাঁচন নেই।'

কাকাতুয়াটা কিন্তু আশাতীতভাবে বেঁচে গেল। প্রণব, শ্যামল, সলিল, এমনকি কাকাবাবু পর্যন্ত, সকলের আশঙ্কাকে কাঁচিয়ে বেঁচে বর্তে রইল। সবাই ভাবল, এযাত্রা টিকে গেল বুঝি।

কিন্তু না, কয়েকদিন যেতেই পাখিটা ভারী কাহিল হয়ে পড়ল আবার; দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল, এবং তার মেজাজটাও কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল কি রকম।

লুনা এসে খবর দিল, গতিক বিশেষ সুবিধের নয়।

পাছে বেড়ালের কুক্ষিগত হয়ে যায় সেই ভয়ে, কাকাবাবু, দু-নম্বরে আপনাকে, মানে, কাকাতুয়াটিকে নিজের কক্ষগত করে রেখেছিলেন। বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গে, বেড়ালের পৃষ্ঠ-পোষকদেরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। লুনাই কেবল সে ঘরে সেঁধুতে পেত।

লুনা এসে জানাল, হ্যাঁ, বেঁচে আছে বটে—এখনও—কিন্তু কাবু হয়ে পড়েছে বেজায়। ঘাড় তুলতে পারছে না বেচারা।

প্রণব, সলিল, শ্যামল, সবাই মুখ আঁধার করে পরামর্শ করতে বসে গেল কী করা যায় এখন? কাকাবাবু এক কথার মানুষ, কথার দিক দিয়ে নড়বড়ে নন, তাঁর কথার নড় চড় হবার জো নেই, পাখিটা মারা গেলে বেড়ালকে তিনি সহজে ছাড়বেন না, তাকেও নির্ঘাত সহমরণে যেতে হবে। অতএব, এহেন পরিস্থিতিতে.....?

উপরোক্ত অন্ধকার-মূর্তিদের জটলার মধ্যে আলো এসে সঞ্চারিত হল হঠাৎ। জিজ্ঞেস করল চুপি চুপি: 'কাকাবাবু কোথায় রে?'

আলোর হাবভাব দেখে মনে হয় সে যেন বাড়ির ভালো ছেলেটি না, সেই আলো নয়, কূটচক্রী কোনো রাজনৈতিক দলের পান্ডাদেরই একজন যেন সে।

বাজারের তরকারির থলেটা ওর দু-হাঁটুর-মধ্যে নিয়ে আলো আবার শুধোয়: 'কাকাবাবু এখানে নেই তো?'

লুনা বললে: 'বাবা নিজের ঘরে। দাড়ি কামাচ্ছিলেন এতক্ষণ। খানিকটা কামিয়েছেন এমন সময়ে কাকাতুয়াটা ঘাড় উলটেছে দেখে তিনিও উলটে পড়েছেন।'

সলিল তার বড়ো বড়ো চোখ আরো বড়ো বড়ো করে ফেলল: 'অ্যাঁ? তারপর আর কামাচ্ছেন না নাকি?'

'নাঃ, আধখানা গাল কামানো হয়েছে কেবল।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল লুনা।

'ভারী মুশকিল তো। ভারী মুশকিল তো।' প্রণব শ্যামল ঘাড় নাড়তে থাকে: 'ভারী বিচ্ছিরি ব্যাপার হল দেখছি।'

ভাবনার কথা তো বটেই। কম ভাবনার কথা নয়। কেননা এর সঙ্গে বহুবিধ সম্ভাবনার কথা জড়ানো। সবাই মুখখানা হাঁড়িপানা করে—যার যতদূর সাধ্য—এক জোট হয়ে ভাবতে লাগে।

'আহা, এত ভাবছিস কেন বল তো? এর ভেতর ভাবনার কী আছে বল দেখি?'

বাজারের থলেটার দিকে আলো ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'কী আছে বলত এর ভেতর?'

ও কথার স্বাভাবিক জবাব হচ্ছে তরকারি আনাজ, কাঁচকলা পেঁয়াজ, কচু ঘেঁচু ইত্যাদি! তাছাড়া আর কী থাকবে বাজারের থলেয়? কিন্তু আলো নিশ্চয়ই অতখানি সহজ উত্তরের প্রত্যাশায় ও-হেন প্রশ্ন পাড়েনি, কাজেই সবাই নিরুত্তর হয়ে রইল।

'তোরা তো করতে চাস না, করতে বললে তো ভারী ব্যাজার হোস। বাজার করার কতো মজা জানিস নে তো। বাজারে গেলে তাহলে বুঝতিস। ভাগ্যিস আজ আমি বাজারে গেছলাম তাই—না হলে তো আলোর ভণিতা শুরু হয়।

আলোর বিস্তারিত আলোচনায়, বাজারে না গিয়েও, ওরা ব্যাজার হয়ে ওঠে।

'কী বলতে চাস বল দেখি? আধখানা ঝুনো নারকোল ফাউ পেয়েছিস এই না—ঝাঁঝালো গলায় শ্যামল বলে।

'তা আমাদের তোর ভাগ দিতে হবে না! একাই খাগে। হ্যাঁ, আমরা এখন নারকোল খাচ্ছি কিনা! আমাদের বলে ভাবনায় ঘুম নেই!—' প্রণব ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

'লুনাটিক য়্যাসাইলাম্, মানে, মা পর্যন্ত ভাবতে লেগে গেছে—' লুনাও না জানিয়ে পারে না।

'তাই তো বাজারের কথা বলছিলাম বাপু! সব সমস্যার সমাধান তো এই থলের মধ্যেই! এই থলের ভেতরেই সব! শুনবে না তোমরা তো করব কী। তোমাদের কাবলের জন্যে আমি যে কী প্রাণপাত করেছি—' এই বলে আলো আবার শুরু করে ঃ '—না শুনলে আর বলব কি করে?'

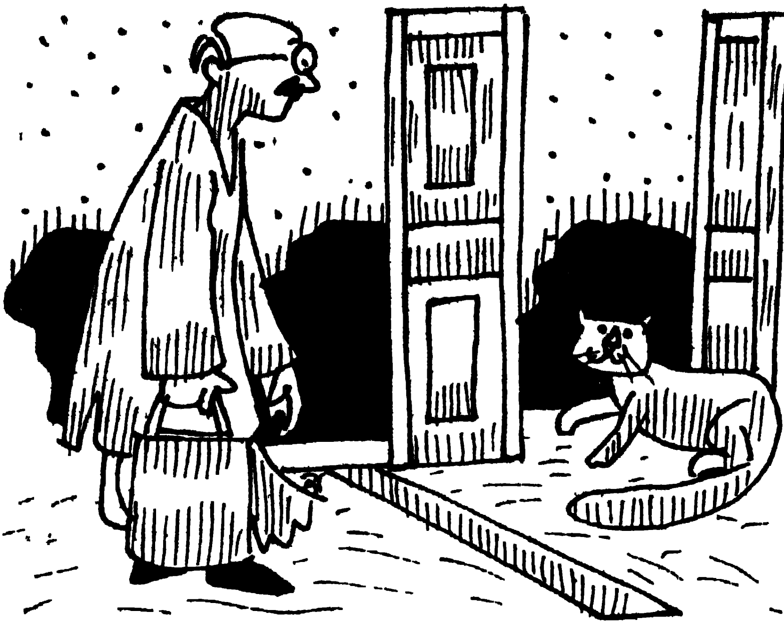
আলো প্রাণপাত করলেও থলের রহস্যে খুব সামান্যই আলোকপাত হচ্ছিল, সমস্ত ব্যাপারই কেমন যেন জটিল হয়ে উঠছিল আরো। প্রণব শ্যামল সবাই হাঁপিয়ে পড়ল এবার ঃ 'কী—কী—শুনি? বল না শুনি!'

'হঠাৎ আমার এসে গেল বুঝলি? কি করে এল বলি শোন।' আলোর কণ্ঠস্বর ক্রমশ রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে ঃ 'বাজার করে ফিরছি, এমন সময় দেখি, একজনের বাড়ির দোরগোড়ায় একটা কালো বেড়াল। ঠিক আমাদের কাবলের মতোই। এমনি নাদুস্নুদুস—একেবারে অবিকল। আমি নিচু হয়ে বেড়ালটার মাথায় হাত বুলুচ্ছি, এমন সময়ে—বুঝলি—এসে গেল।'

'অমন ওরা এসে যায়।' সলিল বলে ঃ 'ভারী ন্যাওটা ওরা—

'বেড়ালদের স্বভাবই ওই!' শ্যামল যোগ দ্যায় ঃ 'একটু আদর করেছ কি অমনি তোমার গায়ে এসে পড়েছে—পায়ে পায়ে জড়াচ্ছে।'

'আহা, বেড়াল নয়! আমি বেড়ালদের কথা বলছি না।' আলো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—



প্রতিভার অমর্যাদা হলে মানুষের পক্ষে যেমন ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক—তেমনি ক্ষোভার্ত কণ্ঠে সে বলে ঃ

'বেড়াল না, আইডিয়াটা এসে গেল। আমি ভাবলাম, বাঃ, এই তো বেড়ে! তুমি হয়তো আমাদের কাবলের যমজ ভাই কিংবা মাসতুতো বোন। কিংবা যাই হও, আমাদের কাকাবাবু একটা বেড়াল যখন মারবেনই, আদাজল খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন কাবলের বদলে তোমারই কেন বলি হোক না! তুমিই খতম হয়ে যাও না কেন? এই না বলে, চারধার তাকিয়ে, কেউ কোথাও দেখছে নাকি ভালো করে দেখে, বেড়ালটাকে আমি থলের মধ্যে পুরে ফেলেছি!'

'অ্যাঁ? ওই বাজারের থলেয়? ঐ সব খাবার জিনিসের সঙ্গে? লুনা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'করেছো কি ছোড়দা?'

'তাতে কি হয়েছে? তরকারি ধুয়ে নিলেই হবে। আলো, সত্যি তুই একটা জিনিয়াস!' প্রণব আলোর পিঠ চাপড়ে দ্যায়। 'দেখি, বের করত কাবলের মাসতুতো ভাইকে।'

'চিচিং ফাঁক!' বলে থলের মুখ খুলে দিতেই থলের বন্দী দুনম্বরের কাবুলিচন্দর বেরিয়ে পড়ে।

বেরিয়ে আগে হাত পা খেলিয়ে নেয়। তার পরে, সবার দিকে তাকিয়ে, হয়তো একটু অবাক হয়েই, ক্ষীণ একটা আর্তনাদ ছাড়ে ঃ মিঁয়াও।'

অর্থাৎ, এ আমি কোথায় এলাম গো। খোদা, তুমি আমায় এ কোথায় নিয়ে এলে?

শ্যামল বললে ঃ 'এবার আমাদের কাবুলিকে নিয়ে আসা যাক। পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখা যাক দুজনকে।'

'উহু। এমন কাজটি করনা।' আলো বাধা দেয়ঃ 'তাহলে কোনটা যে কে তারপরে আর চিনতে পারা যাবে না।'

অতএব দুজনকে, সযতনে দুজনের থেকে দূরে রেখে, অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

'হুবহু এক। আলাদা করবার জো নেই।' সলিল বলেঃ 'কাকিমাকে ডেকে আনিগে। কাকিমা ভারী খুশি হবে দেখলে।'

'কী লাভ হল আরেকটা বেড়াল বাড়ি এনে?' লুনা খুঁত খুঁত করতে থাকে ঃ 'কাকাতুয়াটা যদি না মরে,—ঘাড় উল্টে পড়েছে বলেই যে মরবে তার ঠিক কি? কাকাতুয়াটা যদি বেঁচে ওঠে তাহলে? অতগুলো তরকারি সব নষ্ট—তার উপর আবার একটা বাড়তি বেড়াল দাঁড়ালো বাড়িতে।

তরকারির শোক লুনা কিছুতেই ভুলতে পারে না! বেড়ালের বাহুল্যও তার কাছে খারাপ লাগে!

আলো ঝিলিক মারে ঃ 'শুনছ বড়দা, শুনছ? লুনা কী বলছে শোন! আমি কিনা কত বুদ্ধি খাটিয়ে, কাবুলিকে বাঁচাবার চমৎকার একটা ফন্দি বার করলাম, আর লুনা কিনা—!

'বারে! ঐ বেড়াল-ঘাঁটা নোংরা তরকারি খাবে কে?' লুনা ফোঁস করে ওঠে।

'লুনা! ছিঃ! তরকারি আবার খায় মানুষ? তরকারি খাবার নামটি কর না।'' প্রণব মুরুব্বি চালে মাথা চালতে থাকে ঃ

'কী হয় তরকারি খেয়ে? একদিন তরকারি না খেলে কী হয়? তরকারি এমনকি দরকারি জিনিস? তরকারি না খেয়েও জীবন ধারণ করা যায়। গোরুরা যে তরকারি খায় না, তা বলে কি তারা বাঁচে না। তারা কি মানুষ নয়? গাধারাও তো খায় না, তারাই কি সব মরে আছে? তরকারি কি আবার একটা খাবার জিনিস? তরকারি খেয়ে কে কবে বড়োলোক হয়েছে? শুনি?'

কাকাতুয়ার অবস্থা টালমাটাল, লুনার কাছে খবরটা শুনা মাত্রই, প্রণবরা সবাই শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

শ্যামলদের বই-খাতার একটা বাক্স ছিল, কাকাবাবুর বাতিলকরা কাঠের বাক্স। তাতেই ওদের বইপত্তর থাকত সব; সেই বাক্সের মধ্যেই, কাবুলিকে লুকিয়ে রাখা স্থির হল আপাতত। প্রণব বাক্সটায়, গোটাকতক ছ্যাঁদা করে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা বানাল, বাক্সটাকে বায়ুভূক নিশ্বাসজীবী প্রাণীর বাসোপযোগী করে তুলল সে। তারপর সমারোহ করে কাবুলিকে সসমাদরে তার ভেতরে অভ্যর্থনা করা হল।

কাবুলি কিছুতেই বাক্সের ভেতরে ভর্তি হতে রাজি হয় না। আরেকটা বেড়ালের আবির্ভাবেই তার মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছিল, এখন সেই সন্দেহ ঈর্ষায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সে বেশ বুঝতে পারে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পথ পরিষ্কার করার জন্যেই তাকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, সেই কারণেই যে তাকে বাক্সের মধ্যে বন্দী করে রাখা হচ্ছে, সেটা টের পেতে তার দেরি হয়না।

না, সে ছেলেই নয় কাবুলি। অপর কারো জন্য নিজের সিংহাসন কিংবা স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় অন্তরীণে যেতে কিছুতেই সে প্রস্তুত নয়। বাক্সের ভেতরে সেঁধুতে বেজায় সে আপত্তি জানায়, বাধা দেয় রীতিমতোই। এমনকি প্রণব-আলো প্রভৃতির হাতে পায়ে আঁচড়ে-খামছে দিতেও দ্বিধা করে না।

কিন্তু ওরাও সব নাছোড়বান্দা, বাক্সের ভেতরে ছেড়ে দিয়ে তবেই ওকে ছাড়ে।

'বাক্সর ডালাটার উপর এবার বইখাতাগুলো সব চাপিয়ে দাও।' সলিল বলে। 'ঠেলে উঠতে পারবে নাকো।

আলো বলে ঃ 'হুঁ, বইখাতাগুলো তালার কাজ করবে তাহলে। বেরুতে পারবেন না বাছাধন।'

প্রণব বাক্সটার গা-চাবি পরীক্ষা করে দেখে ঃ 'নাঃ, এটা লাগে না দেখছি। একদম ভাঙা! কিন্তু—কিন্তু'

শ্যামল বলে ঃ 'কিন্তু আবার কি? বই খাতাগুলো কি তোমার কম ভারী নাকি? বইটইসমেত ডালা ঠেলে তুলে ও বেরুতে পারবে নাকি?

লুনাও যোগ দেয়—'আমার ডিক্সনারিটা দেব? দেব ওর উপর চাপিয়ে?'

লুনার উপর-চাপটা আলো বিবেচনা করে দ্যাখে ঃ 'তাহলে আর বাছাধনকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে হবে না। সে একটা বেশ কাবুলিদাবাই হবে বাবা!'

'তাহলে হয় বটে। কিন্তু বই নিয়ে তো পড়তে হবে আমাদের, স্কুলেও যেতে হবে তো, তখন যদি ও হালকা পেয়ে বাক্সর ডালা তুলে—'

'তখন আর কি!' সলিল মুশকিল-আসান করে, 'তখন লুনাকে বাক্সের উপর বসিযে রেখে গেলেই হবে।'

'বারে!—'লুনা আপত্তি জানায় ঃ 'আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। নাইতে খেতে হবে না আমাকে? তোমাদের বেড়াল আগলাবো আমি বসে বসে—বেশ তো?'

শ্যামল বলে ঃ 'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কদিনের জন্যেই বা! এর ভেতর বুদ্ধি করে বইয়ের জমাখরচ হিসেব মতন করলেই হবে, যাতে কিছুতেই কম ভার না হয় কখনো।'

কাবুলিকে বাক্সজাত করে ছোট্ট একটা ঘরে লুকিয়ে রেখে কাকাতুয়ার ঘরে গিয়ে ওরা উঁকি মারে। কাকাতুয়াটা ঘাড় উলটে পড়েছে, যথার্থই! স্বচক্ষেই দেখতে পাওয়া যায়। লুনার চোখ ছলছল করে।

কাকাবাবু ডাকেন ঃ 'আয়, ভেতরে আয় সব। তোদের দুনম্বরের কাকাবাবুর আর দেরি নেইরে। হয়ে এসেছে প্রায়। অন্তিমকাল আসন্ন।'

আলোর কান্না পেতে থাকে। ওর মুখপত্রে অশ্রুর তালিকা দেখা দেয়।

কাকাবাবু বলেন ঃ 'কেঁদে কি হবে? কেঁদে কি কেউ কাউকে ফেরাতে পেরেছে? কান্নাকাটি করে কি কারুকে ধরে রাখা যায়? আটকান যায় কারুকে? জন্ম মৃত্যু সংসারের নিয়ম। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে, চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-

নদে! যে মাইকেল একথা লিখেছিল তিনিই কি অমর হয়ে আছেন? তিনিও মারা গেছেন কবে!"

কাকাবাবুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—পড়তে থাকে উপর্যুপরি।

সলিলের মুখও কাঁদ কাঁদ হয়ে আসে। আলো তো ভ্যা করে কেঁদেই ফ্যালে।

'যাক্, ওর আরেকটা শেষ ইচ্ছাও আমি পূরণ করব।' এই বলে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢালেন কাকাবাবু: 'ও আমাকে কতদিন বলছে ওর ঘাড় চুলকে দিতে। আর এক গেলাস জল খাবার জন্যে কতদিন না সাধাসাধি করেছে। এতদিন আমি ভয়ে ওর ঘাড়ে হাত দিইনি, কি জানি কি হয়, কাকাতুয়াদের ঘাড় চুলকে দিলে, রোঁয়া টোয়া উঠে যায় যদি। সেই রোঁয়া যদি গেলাসের জলের সঙ্গে মিশে পেটে চলে যায়! কিন্তু আজ একটু আগেই ওর ঘাড় চুলকে দিয়েছি। তারপর থেকেই কেন জানি না, সেই যে ও ঘাড় নামিয়েছে, তোলেনিক আর। বুঝতে পারছি আমার উপর অভিমানেই ও ঘাড় হেঁট করে রয়েছে! লজ্জায় ক্ষোভে একেবারে ঘাটশীলা হয়ে গেছে। মনের দুঃখেই হয়তো, হয়তো বলছে, মরণকালে ঘাড় চুলকে তোমার কী লাভ হল—যখন সময় ছিল তখন তো চুলকালে না? এত করে বলেছিলাম তোমায়! এখন বলে চুলকাতে? হায় হায়!—'

কাকাবাবুর দুঃখে সকলেই হায় হায় করে, মনে মনেই করে অবশ্যি।

'কিন্তু ওর দ্বিতীয় ইচ্ছাই বা কেন অপূর্ণ থাকে? ও যেমন ঘাটশীলা হয়েছে, আমিও তেমনি জলন্ধর হব। ও আমাকে এক গেলাস জল সেধেছিল, তিন দিন ধরে বলেছিল, আজ আমি তিন গেলাস জল খাব—ওর কোনো বাসনাই আমি আর অচরিতার্থ রাখব না। ওর অন্তিম দুঃখ আমাকে দূর করতে হবেই।'

এই বলে কাকাবাবু পর পর তিন গেলাস জল ঢক ঢক করে গিলে বিরাট এক জলীয় ঢক্কার বা ঢেঁকুর তোলেন।

'এইবার চল, সবাই মিলে হরিধ্বনি দিয়ে গঙ্গাযাত্রা করে ভুশুণ্ডিতে নিয়ে যাই, মরণকালে গঙ্গা বেচারা লাভ করুক। আত্মার সদগতি হোক্ ওর।'

মৃতপ্রায় কাকাতুয়াকে কাঁধে করে কাকাবাবু আগে আগে চলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোর দলবল অনুসরণ করে। নবাগত বেড়ালটাও পিছু-পিছু যায়, বেশ ভালোরকমের একটা ভোজ পেকেছে, ওর ববাতেই পেকেছে, এইরকম কিছু একটা ফলারের আন্দাজ করে আশান্বিত হৃদয়েই সে পেছনে পেছনে চলে।

বেড়ালটাকে সঙ্গে আসতে দেখে কাকাবাবু বলেন—'এই যে, কাবুলিটাও চলেছে গঙ্গাযাত্রায়। বেশ হয়েছে। তাহলে একটা থলে নেওয়া যাক।'

এই বলে তিনি একটা বস্তা খালি করে সেই অবস্থায়ই সেটা বগলে পোরেন।

বাড়ির কাছেই গঙ্গা। কিন্তু গঙ্গাতীরে পৌঁছবার আগেই কাকাতুয়াটা পরপারে গিয়ে পৌঁছয়।

ভুশুণ্ডিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে কাকাবাবু পেছনে ফেরেন: 'কোথায় গেল কাবুলিটা? সঙ্গে সঙ্গে আসছিল না?'

তথাকথিত কাবুলি তখন জলের কিনারায় গিয়ে, পাখিটা গেল কোথায়, সেই গবেষণাতেই নিমগ্ন ছিল, কাকাবাবু অবিলম্বে, বিনা বাক্যব্যয়ে, গিয়ে তার ঘাড় পাকড়ান্।

'আমার প্রতিজ্ঞাও আমি বজায় রাখব।'

এই বলে বেশ বড়ো একটা নুড়ি রুমালে জড়িয়ে নিরীহ্ ওর গলদেশে বেঁধে দ্যান কষে।

'ওকে নিয়ে কি করবে, কাকাবাবু?' সন্ত্রস্ত হয়ে আলো জিজ্ঞেস করে।

'দেখতেই পাবি। দেখতেই পাবি এখুনি', কাকাবাবু গম্ভীর মুখে ব্যক্ত করেন : 'ভুশুণ্ডির সহমরণে পাঠাব ওকে। জলজ্যান্তই পাঠিয়ে দেব দ্যাখ না।' কাকাবাবুর সুকঠিন মুখ।

'—এই বোরাটা তাহলে নিয়ে এলুম কেন? ওই বেড়াল তপস্বীর জন্যেই তো।' বলে বেড়ালটাকে ধরে থলের মধ্যে পুরে তার মুখ বেঁধে একটা ইস্টকখন্ড সেই সঙ্গে বাঁধেন।

প্রণবরা কি করবে ভেবে পায় না। কাকাতুয়ার শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে—কাকাবাবু সত্যি সত্যিই একটা জীবন্ত প্রাণীকে সলিল-সমাধিতে পাঠাবেন, সে কথা ওরা ভাবতে পারেনি।—তাহলে আলো হয়তো বেড়ালটাকে বাজার থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এভাবে মৃত্যুপথে টেনে আনত না। কিন্তু না এনেই বা উপায় ছিল কী? একটা বেড়ালকে তো মরতেই হত, কাকাবাবুর ক্রোধানলে প্রাণ দিতেই হত একটাকে। তাদের আদরের কাবুলিকেই দিতে হত হয়তো—সেই জায়গায় তার বদলে, অপরিচিত একজন নিজেকে আহুতি দিচ্ছে, কাবুলিকে বাঁচাতে গিয়ে আত্মবলি দিচ্ছে—দিয়ে শহিদ হচ্ছে বেমালুম, এইটুকুই যা ওদের সান্ত্বনা!

'কাকাবাবু, বেড়াল মেরো না, কাকিমা বলে বেড়াল মারা ভারী খারাপ।' আলো তথাপি একবার উচ্চারণ করে।

'বেড়ালরা মরে ভূত হয়।' সলিলও সেইসঙ্গে যোগ দেয় : 'ভারী বিচ্ছিরি রকমের ভূত হয়। আমি শুনেছি।'

'যা যাঃ! তোদের ওইসব আজগুবি গাঁজাখুরি আমি শুনতে চাইনে! আমার যে কথা সেই কাজ! ও যেমন আমার কাকাতুয়াকে খুন করেছে, ওকে তেমনি ফাঁসি দেব। জলে চুবিয়ে মারব! আইনের এক চুল এদিক-ওদিকে আমি নেই! কোনো বিসূচিকা কি ফিলাডেলফিয়ার বাজে কথায় আমি কর্ণপাত করিনে।'

এই বলে থলেটার মাথায় পাথর বেঁধে, সেটাকে পাঁজাকোলা করে ধরে সজোরে ছুঁড়ে সলিল-গর্ভে সুদূরে তিনি পরিত্যাগ করেন। সলিলের বাধা মানেন না।

টুপ করে ডুবে যায় থলেসমেত বেড়ালটা।

'তোমাদের কেউ যদি এখন কাবুলিকে বাঁচাতে চাও, যাও, গিয়ে নিয়ে আসতে পার। আমার আপত্তি নেই!'

কাকাবাবুর কঠিন মুখে কাষ্ঠহাসির নামমাত্র দেখা যায়।...'কিন্তু ডুবে মারা গেলে

আমি দায়ি হব না। কোনো গোঁয়ারতুমির গৌহাটিতে আমি নেই!' জলের উপর দুএকটা বুদ বুদ ভেসে ওঠে।...সেগুলি বেলুচিস্তান কি বুন্দেলখণ্ড, কাকাবাবু তা খুলে বলেন না।

সেদিন বিকেল না পেরুতেই টের পেলেন কাকাবাবু। ভর সন্ধের ঢের আগেই বেড়ালের ভূত যেন তাঁর উপর ভর করল। আচমকা কীসের ছায়া দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ।

শ্যামল আলো সলিলরা ছুটে এল—'কী হল, কী হয়েছে কাকাবাবু?'

'বেড়ালের ল্যাজের মতো কী যেন একটা দেখলাম রে! ওই দরজার গা ঘেঁষে চলে গেল যেন।'

'বেড়ালের ল্যাজ?'

'কালো বেড়ালের ল্যাজ। যেমন ল্যাজ সে কাবুলিটার ছিল।'

'কাবুলির ছিল। কিন্তু কাবুলি তো আর নেইকো কাকাবাবু? আপনি নিজেই তো তাকে স্বহস্তে—'

'জানি জানি। কিন্তু ল্যাজ যখন দেখা গেছে তখন ওই ল্যাজের পেছনে নিশ্চয়ই কোন বেড়াল আছে।'

'ল্যাজের পেছনে বেড়াল? শ্যামল বিস্ময় প্রকাশ করে: 'বেড়ালের পেছনেই তো ল্যাজরা থাকে আমরা জানি।'

'যা যা। দূর হ আমার সামনে থেকে। যত সব বজবজ জংশন! বাজে! কোনো কিছুর যদি খবর রাখে একটুও। ডানলপ ব্রিজ কোথাকার!''

কিন্তু খবর ওরা ঠিকই রাখছিল। কাবুলিটার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে! কাকাবাবুর নজরে পড়লে সর্বনাশ—সে খেয়াল কি আছে তার? কি করে ছাড়া পেতেই সোজা দোতলায় নেমে এসেছে। ভাগ্যিস, ল্যাজের বেশি আর কিছু কর্তার চোখে পড়েনি।

কাকাবাবুর ঘরের দোরগোড়াতেই ওকে দেখতে পেয়েই শ্যামল তাকে আলগোছে তুলে নিয়ে সরে পড়েছে। টুঁ শব্দটি করতে দেয়নি।

কিন্তু খানিক বাদেই শব্দটা যেন কাকাবাবুর কানে এল।

'আলো, শুনতে পাচ্ছিস? একটা বেড়াল ডাকছে না?'

'বেড়াল?' আলো যেন হতবুদ্ধি হয়: 'বেড়াল ডাকবে কেন?' —

'ডাকবে কেন তা কি করে বলব? কিন্তু আমার যেন মনে হল ডাকল একটু আগে। স্পষ্ট শুনলাম।'

'কী শুনলেন কাকাবাবু?'

'শুনলাম যে ম্যাও। বেড়ালরা যে ভাষায় কথা কয়। বেড়ালের ডাক কি কখনো শুনিসনি নাকি?'

'আপনার মনের ভুল কাকাবাবু।' আলো বলে, 'কানের ভ্রমও হতে পারে!'

'তুমি শুনতে পেয়েছিলে গিন্নি?' উপস্থিত কাকিমাকে তিনি সম্বোধন করেন।

'কী শুনতে পাব—শুনি?'

'না না, কিছু না।' কাকাবাবু নিজেকে সামলেছেন, 'ও কিছু না তবে।'

'আশ্চর্য তো! বেড়ালের ডাক শুনলে তুমি!' গিন্নি যেন হতভম্ব হন—'অদ্ভুত কাণ্ড তো!'

'সত্যি গিন্নি! ভাবতেও গায় কাঁটা দিচ্ছে আমার, নিজের কানে শুনলাম—একবার নয়! কানের ভ্রমও বলা যায় না, একেবারে হুবহু সেই—সেই অপয়া বেড়ালটার মতোই গলা। যেন সে জলে ডুবে মরেনি, এখনো জলজ্যান্ত রয়েছে!'

'ওঁরা থাকেন।' গিন্নি স্বর্গত বেড়ালের উদ্দেশে হাত জোড় করে কপালে ছোঁয়ান—'তখনি তোমাকে আমি মানা করেছিলাম, বেড়াল মের না, মারতে যেও না। বেড়াল মারা ভালো নয়, মা ষষ্ঠীর বাহন। তখন তুমি শুনলে না। এখন—এখন যদি—'

'থামলে কেন?' কাকাবাবু উসকে উঠেন : 'এখন কী?'

'এখন—এখন যদি সেই কাবুলিকেই দেখি এ ঘরে ও ঘরে ঘুর ঘুর করে বেড়চ্ছে—ঠিক আগের মতোই—একটুও আমি অবাক হব না।' গিন্নি শুধোন : 'ধরো, তাই যদি দেখা যায় তাহলে ভারী মজার হয়, নয় কি?

'মজা? এই যদি তোমার মজা হয় তাহলে সে তোমার মজা। আমার কাছে মজা নয়।' কাকাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানান।

বেড়ালটা করেছিল কি এর মধ্যে, নিজের পিঠের জোরে বাক্সের ডালাটা তুলে ফেলেছিল; তুলে ফেলেই না, এতদিনের বন্দীদশার পর একটু উন্মুক্ত বায়ুসেবনে বেরিয়েছিল। এ ঘরে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল একটু। তার সেই হাওয়া খাওয়ার ফাঁকেই কাকাবাবু তাকে দেখেছিলেন।

কিন্তু তার সলেজ ভ্রমণের বেশি কিছু তিনি দেখতে পাননি। নিজের লেজস্বিতা দেখিয়ে ঘর থেকে সে বেরুতেই না শ্যামল তাকে সামলে ফেলেছে সরিয়ে ফেলেছে নিরাপদ এলাকায়।

কাজেই তারপর অনেকক্ষণ কান খাড়া রেখেও কাকাবাবু বেড়ালের কোনো সাড়া পান না। চোখ কটমট করে থেকেও না। তখন তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন, না, তাঁর আগের ওই বেড়াল-দর্শনটা নিতান্তই মনের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু রাত একটু না বাড়তেই, তাঁর মনের ভ্রম ভাঙল। কিংবা আবার দেখা দিল ভ্রমটা, তাও বলা যায়।

'লুনা লুনা!' বলে তিনি এক হাঁক ছাড়লেন—এক হুঙ্কার!

'কী বাবা? ডাকছ আমায়?' লুনা দৌড়ে এল।

'তুই? তুই কি ম্যাও করলি নাকি?' বাবা তাকে শুধান।

'কী—কী করলাম?'

'ম্যাও!' বাবা যেন ক্ষেপে যান : 'ম্যাও। ম্যাও কাকে বলে জানিসনে? ম্যাও বলে বেড়ালের মতো ডাকছিলিস তুই?'

'আমি কেন ডাকতে যাব ওরকম?' লুনা আপত্তি করে।

'কেন ডাকতে যাবি জানিনে।' ভয়ার্ত চোখে তিনি চারিধারে তাকান : 'কিন্তু অমনি একটা আওয়াজ পেলাম যেন। ঘরটা কী যে অন্ধকার! আর আমার ঘরটাতেই যত রাজ্যের অন্ধকার!'

'অন্ধকার কই বাবা? বেশ তো আলো রয়েছে।'

'আলো না হাতি! আমার চৌকির তলাটা একবার দ্যাখ তো ভালো করে। আলো জ্বেলে দ্যাখ। দ্যাখতো, বেড়াল-টেরাল কিছু আছে কিনা...'

'তুমিই দ্যাখো না কেন বাবা!'

'না বাবা! আমি আর তাকাচ্ছিনে ওর তলায়! প্রাণ থাকতে নয়।'

'আমার কেমন ভয় করছে বাবা!'

'তা তো করবেই! বলে আমারই গা শিউরে উঠছে। যা তোর দাদাদের সব ডেকে নিয়ে আয়। সবাই মিলে দ্যাখ দিখি চৌকির তলাটা একবার!'

লুনা একটু পরে ফিরে এসে জানায়, দাদারা কেউ আসতে চাইছে না। ভয়ে কাঁপছে সবাই। কি জানি কাবুলিকে যদি দেখা যায়, সে যদি চৌকির তলা থেকে আবার তার সেই মারাত্মক বুলি ছাড়ে—

কাকাবাবু পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, তড়াক করে পা তুলে নিলেন চৌকির উপর।

'কী সর্বনাশ! কেউ ওরা আসতে চাইছে না! আমার বাড়িটা হয়েছে এক বান্দারাব্বাস! একটা কথাও কেউ যদি শোনে!'

এই বলেই, এক লাফে চৌকির উপর থেকে নেমে সটান তিনি বারান্দায় চলে যান।

কিন্তু সেখানে গিয়েই কি শান্তি আছে?



বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে সভয়ে নিজের ঘরের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন। ভূতপূর্ব কাবুলি এখন ভূত হয়ে তাঁর চৌকির তলার থেকে বেরিয়ে দরজা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে কিনা চেয়ে চেয়ে দেখেন!

কাবুলি কিন্তু এগিয়ে আসে ঠিকই, অন্যদিক থেকে। এতদিন ধরে ছেলেদের অত্যাচারে সে তিতবিরক্ত হয়েছে, তাকে একটা বাক্সের খুপরির মধ্যে বন্ধ হয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে, ম্যাও-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারেনি। বাক্সর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে আজ তার হাত পা একটু খেলিয়ে নিতে চায়।

আর জানাতে চায় নিজের ধন্যবাদ এই লোকটিকে। সারা বাড়িতে এই একটি লোক, একমাত্র মহাশয় ব্যক্তি, যে নাকি তার উপর কোনো অত্যাচার করেনি। তাকে বাক্সবন্দী করার ষড়যন্ত্রে ছিল না। এই লোকটির পায়ে গা ঘেঁষে গিয়ে নিজের প্রাণের প্রণাম জানাতে চায় সে।

কিন্তু জানাতেই সেই লোকটি না, এমন লাফিয়ে উঠেছেন যে কাবুলি কোনো বেড়ালকেও অমন লাফ মারতে কখনো দ্যাখেনি।। দেখেই না দ্বিতীয় আরেক লাফে তক্ষুনি সে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে।

লুনার মা যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে।

'গিন্নি, ও গিন্নি ! কী সর্বনাশ!!' কাকাবাবু থরথর করে কাঁপছেন।

'কী হল—কী হল কী তোমার?' তিনি এগিয়ে আসেন।

'আর কী হবে? যা হবার তাই হয়েছে! যা না হবার তাও হল... তোমার—তোমার সেই কাবুলি—' তাঁর কম্পিত কণ্ঠ থেকে বেরয়—'পেত্যয় কর আর না কর—যাকে আমি নিজের হাতে আজ স্বখাত সলিলে চুবিয়ে মেরেছি—মেরে কিন্তু ভালো কাজ করিনি বুঝছি এখন! সেই এসে—আমার পায়ে গা ঘষে দিয়ে গেল এই মাত্তর।'

'কোন পায়ে?' গিন্নি শুধোন।

'কোন পা, তাতে কি আসে যায়?' কর্তা খাপপা হন। 'ওই তো দাঁড়িয়ে আছে—বারান্দার ওই কোণটায়! দেখতে পাচ্ছ না?

'না তো?'—গিন্নি চোখ পাকিয়ে তাকিয়েও কিছুই যেন দেখতে পান না। 'কই, কিছুই দেখছি না তো? কোনখানে? কোথায় সে?'

'কোথায় আর দেখবে! সামনেই রয়েছে।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন কাকাবাবু: কিন্তু তুমি তো দেখতে পাবে না। আমাকেই দেখা দিতে এসেছে ও। শুধু আমাকেই...ওই...ওই চলে গেল ওধারে। ল্যাজ নাড়তে নাড়তে যাচ্ছে।'

'যাকগে, যেতে দাও। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না।' সান্ত্বনা দেন গৃহিণী: 'ওরকম মাঝে মাঝে ও দেখা দেবে—হয়তো ডাকও শুনতে পাবে কখনো সখনো—কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করবে না ও। তুমি কিচ্ছু ভেব না।

'না, ভাববে না। আজই আমি গয়ায় যাচ্ছি। এক্ষুনি। আজ রাত্রের ট্রেনেই। গয়ায় গিয়ে কাবুলির পিণ্ডি দিয়ে গোলোকে ওর গতি করে তবেই আমার নিস্তার। নইলে বেড়ালের ভূত নিয়ে এই ভুতুড়ে বাড়িতে এক দণ্ডও আমি তিষ্ঠতে পারব না। বুঝেচ?'

কারো মানা শুনলেন না কাকাবাবু! সেই রাত্রেই সুটকেস গুছিয়ে গয়ায় ধাওয়া হলেন।

যাবার আগে কেবল একবার শুধিয়েছিলেন—'ওর নাম গোত্রটা কী বলতে পার গিন্নী? পিণ্ডদানের আগে সেটা বলতে হয়।' তারপর নিজেই সে সমস্যার সমাধান করেছেন—'যথানামগোত্র বলেও দেওয়া যায়, আমি জানি।' বলে শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা করতে করতে চলে গেলেন।

তারপরে তিনি গয়া থেকে ফেরার আগেই কাবুলিকে আলোরা এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এল গিয়ে।

তিনি হাওড়া ইস্টিশনে পা দেবার আগেই কাবুলি হাওয়া!

সলিলদের গল্প শেষ হলে তারা ধরে বসল, 'এবার তোমার একটা গল্প শুনি! তোমার সেই কাকার আরেকটা গল্প বলো না!'

'তোমার সেই হাতিমার্কা কাকার।' আলোর আবদার।

'হাতির পর ঘোড়ায় ধরল তাঁকে।' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম—'ঘোড়ারোগে ধরল তাঁকে তারপর!'

'ঘোড়া রোগ? সে আবার কি? ঘোড়ায় তাকে কামড়েছিল নাকি?'

'আর তারপরেই বুঝি তিনি চিঁহি চিঁহি ডাক ছেড়ে... ...? লুনা কথাটা কেড়ে নেয়।

'না রে! কেউ কাউকে কামড়ায়নি। তবে সে যা হল তা আর কহতব্য না।' আমি জানাই, 'তবে তোরা যখন এত করে শুনতে চাইছিস, আমার কাকার কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করতে আমি দ্বিধা করব না। তবে...তবে সে...'

'বাজে কথা রাখো, শুরু করো তোমার গল্প।' তারা এক সাথে সুর ধরে।

'তবে সে ভারী বেদনার কথা রে।' আমার কেড়ে নেওয়া কথাটা শেষ করি অবশেষে—'শোন তাহলে সবাই...'

কিন্তু শুরুর আগে কীভাবে গল্পের খেই ধরব ভাবতে হয়।

'ঘোড়া একটা রীতিমতন রোগ, তা জানিস?' নিশ্বাস ফেলে আমি বললাম—'তা বাংলা বানানই কি আর ইংরেজি বানানেই কি।'

'ইংরিজি বানানেও রোগ?' আলো শুধল: 'সেটা আবার কি রকমের রোগ শুনি?'

'আর ও জি ইউ ই—রোগ—হয় নাকি? যার মানে হাড় বজ্জাত।' আমি ব্যাখ্যা করি। —'একেকটা ঘোড়ার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি থাকে।'

'বল কি দাদা?' সলিল হাঁদার মতো বলে। —'কি করে টের পেলে তুমি?'

'হাড়ে হাড়েই পেয়েছি আমার।' আমি জানাই।

'ঘোড়ায় চড়া একটা খুব ভালো ব্যায়াম, তা জানো?' শ্যামল আমায় জানাতে আসে।

'খুব জানি। গৌহাটির এক ডাক্তারও সেই কথা বুঝিয়েছিল আমাকে। তার পরে তার কথায় না...একটা ট্রায়ালেই ঘায়েল হয়ে আমি বুঝলাম, যে হ্যাঁ, ব্যায়াম বটে, তবে ওর অন্তস্থ্য 'য়' স্থলে 'র' আদেশ করলেই ঠিক হয়।'

'র আদেশ?'

'হ্যাঁ, ব্যায়াম নয়, ব্যারাম।' আমি বললাম।

'তোমার সেই গৌহাটির গল্পটাই বল আমাদের তাহলে। কাকার গল্প পরে হবে।' সুর ধরল আলো: 'তোমার সেই ট্রায়েল দিয়ে ঘায়েল হওয়ার কথাটাই শুনি আগে।' আলোচনায় যোগ দিল আর সবাই।

'শোন তাহলে।' শোনাতে আমি কসুর করি না...

আর কিছু না, একটু মোটা হতে শুরু করেছিলাম, অমনি মামা আমার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন—'সর্বনাশ! তোর খুড়তুত দাদামশাই মোটা হয়েই মারা পড়ল যে! তুইও আবার মোটা হচ্ছিস! তোর জ্যেঠতুতো দাদামশাই—কী সর্বনাশ!'

কথাটা শেষ করবার দরকার হয় না। আমার মাতুলের খুড়ো আর জ্যেঠা স্থূলকায়তায় সর্বনাশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। নামের উল্লেখেই আমি বুঝতে পেরে যাই।

খুড়তুতো দাদামশায়ের বুকে এত চর্বি জমে ছিল যে হঠাৎ হার্টফেল হয়েই তাঁকে মারা যেতে হল, ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হয়নি। জ্যেঠতুতো দাদামশাইয়ের বেলা অবশ্য ডাক্তার এসেছিলেন কিন্তু ইনজেকশন করতে গিয়ে মাংসের স্তর ভেদ করে শিরা খুঁজে না পেয়ে, গোটা তিনেক ছুঁচ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গচ্ছিত রেখে, রাগে-ক্ষোভে-হতাশায় ভিজিট না নিয়েই রেগে প্রস্থান করেছিলেন। রেগে এবং বেগে।

যে বংশের দাদামশায়ের এরূপ মর্মভেদী ইতিহাস, সে বংশের নাতিদের মোটা হওয়ার মতো ভয়াবহ আর কী হতে পারে? কাজেই আমার নাতিবৃহৎ হওয়ার লক্ষণ দেখে বড়োমামা বিচলিত হয়ে পড়েন।

প্রতিবাদের সুরে বলি—'কি করব! আমি কি ইচ্ছে করে হচ্ছি?'

'উহুঁ, আর কোনো অসুখে ভয় খাই না। কিন্তু মোটা হওয়া—বাপস! অমন মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। সব ব্যায়রামে পার আছে, চিকিচ্ছে চলে; কিন্তু ও রোগের চিকিচ্ছেই নেই। ডাক্তার কবরেজ হার মেনে যায়। হুঁ!'

অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, রোগা হবার জন্য। লোকে মোটা হবার জন্যেই চেঞ্জে যায়, আমার বেলায় উল্টো উৎপত্তি! গৌহাটিতে বড়ো মামার জানা একজন ভালো ডাক্তার থাকেন; তাঁর কাছেই যেতে হয়। তিনিই আমায় রোগারোগ্য—রোগা করে আরোগ্য করার ভার নেন।

প্রথমেই তাঁর প্রশ্ন হয়—'ব্যায়াম-ট্যায়াম কর?'

'আজ্ঞে দু বেলা হাঁটি। দু মাইল, দেড় মাইল, এমনকি আধ মাইল পর্যন্ত—যেদিন যতটা পারি। রাস্তায় বেরুলেই হাঁটতে হয়।'

'হ্যাঁঃ। হাঁটা আবার একটা ব্যায়াম নাকি! ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে?'

'না তো।' সসংকোচে কই।

'ঘোড়ায় চড়াই হল গিয়ে ব্যায়াম। পুরুষ মানুষের ব্যায়াম। ব্যায়ামের মতো

ব্যায়াম। একটা ঘোড়া কিনে ফেলে চড়তে শেখো—দুদিনে শুকিয়ে গিয়ে তোমার হাড়গোড় বেরিয়ে পড়বে।'

ডাক্তারের কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। গোরু থেকে ঘোড়ার পার্থক্য সহজেই আমি বুঝতে পারতাম, যদিও রচনা লিখতে বসে আমার 'এসে'-তে ঘোড়া-গোরু এক হয়ে এসে মিলে যেত, সেই একতার থেকে ওদের আলাদা করা ইস্কুলের পণ্ডিতের পক্ষে কষ্টকর ছিল। চতুষ্পদের দিক থেকে উভয়ে প্রায় এক জাতীয় হলেও, বিপদের দিক থেকে বিবেচনা করলে ঘোড়ার স্থানই কিছু উঁচুতে হবে বলতে হয়।

যাই হোক, ডাক্তার ভদ্রলোক গৌহাটির লোক হলেও, গৌ গাবৌ গাবঃ না করে, গোড়াতেই গোরুকে বাতিল করে ঘোড়াকেই তিনি প্রথম আসন দিতে চাইলেন—অবশ্য আমার নীচেই। আমিও, ঘোড়ার উপরেই চড়ব, এই স্থির সংকল্প করে ফেললাম। বাস্তবিক, ঘোড়ায় চড়া—সে কী দৃশ্য! সার্কাসে তো দেখেইছি, রাস্তাতেও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যায় বই কি।

আম্বালায় থাকতে ছোটোবেলায় দেখেছি পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়া। এখনও মনে পড়ে, সেই পাগড়ি উড়ছে, পারপেন্ডিকুলার থেকে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে সওয়ারের কেমন সহজ আর 'খাতির-নাদারৎ' ভাব আর তার দাড়িও উড়ছে সেই সঙ্গে! যেন দুনিয়ার কোনো কিচ্ছুর কেয়ারমাত্র নেই। তাবৎ পথচারীকে শশব্যস্ত করে শহরের বুকের উপর দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে যাওয়া। পরমুহূর্তে তুমি দেখবে কেবল ধুলোর ঝড়, তাছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।

হ্যাঁ, ঘোড়ায় আমায় চড়তে হবেই! ঠিক তেমনি করেই। তা না হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই, মোটা হয়ে তো নেই-ই।

আশ্চর্য যোগাযোগ। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের পর বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি সদর রাস্তায় নিলাম ডেকে ঘোড়া বিক্রি হচ্ছে। বেশ নাদুস-নুদুস কালোকোলো একটি ঘোড়া—পছন্দ করে সহচর করবার মতোই।

'বাইশ টাকা! বাইশ টাকায় যাচ্ছে—এক, দুই—'

'তেইশ' রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি হাঁকলাম।

'চব্বিশ টাকা।' ভিড়ের ভেতর থেকে একজন যেন আমার কথারই জবাব দিল।

'চব্বিশ টাকা।' নিলামওয়ালা ডাকতে থাকে, 'ঘোড়া, জিন, লাগাম মায় চাবুক—সব সমেত মাত্র চব্বিশে যায়। গেল গেল—এক দুই—'

বলে ফেলি একবার 'সাতাশ'।

'আটাশ!' ভিড়ের ভেতর থেকে আবার কোনো হতভাগার বাগড়া।

আমার পাশে একজন লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়—'আমি ঘোড়া চিনি', সে বলে, 'অদ্ভুত ঘোড়া মশাই! এত সস্তায় যাচ্ছে, আশ্চর্য! ওর জিনের দামই তো আটাশ টাকা!'

'বলেন কি!' আমার চোখ বড়ো হয়ে ওঠে, 'তা হলে আরো উঠতে পারি—কী বলেন?'

'নিশ্চয়! ভাবছেন বুঝি দিশি ঘোড়া? মোটেই তা নয়, আসল ভুটানি টাট্টু—যাকে বলে!'

ভুটানি বলতে কী বোঝায় তার কোনো পরিচয়ই আমার জানা ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের কথা ভঙ্গিতে এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে এ-হেন একটা জানোয়ারের মালিক না হতে পারলে ভূভারতে জীবনধারণই বৃথা।

অকুতোভয়ে ডাক ছাড়ি—'তেত্রিশ'।

'চৌৎ—' আমার পাশের এক ব্যক্তি ডাকার উদ্যম করে। উৎসাহের সূত্রপাতেই ওকে আমি দমিয়ে দিই—'সাইত্রিশ!' তারপর আমি হন্যে হয়ে উঠি—পর পর ডেকে যাই—'উনচল্লিশ, তেতাল্লিশ, সাতচল্লিশ, উনপঞ্চাশ।'

পর পর এতগুলো ডাক আমি একাই ডেকে যাই! উনপঞ্চাশে গিয়ে ক্ষান্ত হই।

'উনপঞ্চাশ—উনপঞ্চাশ! এমন খাসা ঘোড়া মাত্র উনপঞ্চাশে যায়! গেল—গেল—চলে গেল! এক দুই—'

তারপর আর কেউ ডাকে না! আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিরস্ত হয়ে পড়েছে। তখন।

'—এক, দুই তিন!'

নগদ উনপঞ্চাশ টাকা গুণে ঘোড়া দখল করে পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরি। সেই পার্শ্ববর্তী অশ্ব-সমঝদার ভদ্রলোক আমার এক উপকার করেন। একটা ভাড়াটে আস্তাবলে ঘোড়া রাখবার ব্যবস্থা করে দেন। তারাই ঘোড়ার খোরপোষের, সেবা-শুশ্রূষার যাবতীয় ভার নেবে। সময়ে-অসময়ে এক চড়া ছাড়া আর কোনো হাঙ্গামাই আমাকে পোহাতে হবে না! অবশ্য এই অশ্বসেবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে ওদের।

ভদ্রলোককে সন্দেশের দোকানে নেমন্তন্ন করে ফেলি তক্ষুনি তক্ষুনি।

পরের দিন প্রাতঃকালে আমার অশ্বারোহণের পালা। ভাড়াটে সহিসরা ঘোড়াটাকে নিয়ে আসে। জন কতক ধরেছে ওর মুখের দিকে, আর জন-কতক ওর লেজের দিকটায়। মুখের দিকের যারা, তারা লাগাম, ঘোড়ার কান, ঘাড়ের চুল অনেক কিছুর সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু লেজের দিকে লেজটাই কেবল সম্বল। ও ছাড়া আর ধর্তব্য কিছু ছিল না। আমি বিস্মিতই হই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করি না, পাছে আমায় আনাড়ি ভাবে। ঘোড়া আনার এ-ই নিয়ম হবে হয়তো, কে জানে!

সেই ডাক্তার ভদ্রলোক বাড়ির সামনে দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে থামেন। 'এই যে! একটা ঘোড়া বাগিয়েছ দেখছি! বেশ বেশ! কিনলে বুঝি? কতয়? উনপঞ্চাশে? বেশ সস্তাই তো! দিব্যি ঘোড়া! খাসা—বাঃ!'

ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে নিজের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনকেই রেকমেন্ড করেন—'হ্যাঁ, হাঁটা ছাড়ো। হাঁ-টা ছাড়ো। হাঁটা ব্যায়াম নাকি আবার! মানুষে হাঁটে? ঘোড়ায় চড়তে শেখো। অমন ব্যায়াম আর হয় না। দুদিনে চেহারা ফিরে যাবে। এত কাহিল হয়ে পড়বে যে তোমার মামারাই তোমাকে চিনতে পারবেন না। হুঁম্।'

তাঁর 'রুগি' দেখার তাগাদা, অপেক্ষা করার অবসর নেই। ঘাড় নেড়ে আমাকে

উৎসাহ দিয়েই তিনি চলে যান! দর্শকদের মধ্যে তাঁকে গণনা না করেই আমার অভিনব ব্যায়ামপর্ব, শুরু হয়।

সহিসরা বেশ কষে তাকে ধরে থাকে, আমি আস্তে আস্তে তার পিঠের উপর উঠে বসি; বেশ যুত্ করেই বসি; শ্রীযুত হয়ে।

কিন্তু যেমনি না তাদেব ছেড়ে দেওয়া, ঘোড়াটা চারটে পা একসঙ্গে জড়ো করে, পিঠটা দুমড়ে ব্যাখারীর মতন বেঁকিয়ে আনে। এবং করে কি, হঠাৎ পিঠটা একটু নামিয়েই না, উপরের দিকে এক দারুণ ঝাড়া দেয়—ধনুকে টঙ্কার দেওয়ার মতোই। আর তার সেই এক ঝাড়াতেই আমি একেবারে স্বর্গে—ঘোড়ার পিঠ ছাড়িয়ে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচুতে আকাশের বায়ুস্তরে বিরাজমান।

শূন্যমার্গে চলাচল আমার ন্যায় স্থূল জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়েই আমাকে নামতে হয়, ওই ঘোড়ার পিঠেই আবার। সেই মুহূর্তেই আবার যথাস্থানে আমি প্রেরিত হই, কিন্তু পুনরায় আমার অধঃপতন! এবার জিনের মাথায়। আবার আকস্মিক উন্নতি! এবার নেমে আসি ঘোড়ার ঘাড়ের উপর। আবার আমাকে উপরে ছুঁড়ে দেয়; এবার যেখানে নামি সেখানে ঘোড়ার চিহ্নমাত্রই নেই। অশ্ববর আমার আড়াই হাত পেছনে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন, আমাকে লুফে নেবার জন্যই কিনা কে জানে!

ঘোড়ার মতলব মনে মনে টের পেতেই, তার ধরবার আগেই আমি শুয়ে পড়ি। জানোয়ারটা ততক্ষণে আমাকে ফেলে, উন্মুক্ত গৌহাটি-পথ ধরে টেলিগ্রামের মতো দ্রুত ছুটে চলেছে।

আস্তে আস্তে উঠে বসি আমি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি, ঘোড়ায় চড়ার বিলাসিতা পোষাল না আমার। একটা হাত কপালে রাখি, আর একটা তলপেটে। মানুষের হাতের সংখ্যা যে প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা এর আগে এমন করে আমার ধারণাই হয়নি কখনও। কারণ তখনও আরো কয়েকটা হাতের বিলক্ষণ অভাব বোধ করি। ঘাড়ে পিঠে, কোমরে, পাঁজরায় এবং শরীরের আরো নানা স্থানে হাত বুলোবার দরকার ছিল আমার।

কেবল যে বেহাতই হয়েছি তাই নয়, বিপদ আরো; —উঠতে গিয়েই সেটা টের পাই। দাঁড়াবার এবং দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে দুটো পা-ও মোটেই যথেষ্ট নয়, বুঝি তখন। সহিসরা ধরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়, কিন্তু যেমনি না ছাড়ে অম্‌নি আমি সটান্! তখন সবাই মিলে, সহানুভূতিপরবশ হয়ে ধরাধরি করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারেও আমার নিজের হাত-পা নিজের কোনোই কাজে লাগে না, এক ওদের হ্যান্ডেল হওয়া ছাড়া.....নিজের চ্যাংদালায় নিজে চেপে আসি।

তারপর প্রায় এক মাস শয্যাশায়ী। সবাই বলে ডাক্তার দেখাতে, কিন্তু ডাক্তার ডাকার সাহস হয় না আমার। আমার মামার বন্ধু—তিনিই তো? এই অবস্থাতেই আবার ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা দিয়ে বসবেন কিনা কে জানে! অশ্ব-চিকিৎসা ছাড়া আর কিছু তো জানা নেইকো তাঁর। সেই পলাতক ভুটানি টাট্টুকে যদি খুঁজে না-ও

আর পাওয়া যায়, একটা নেপালি গাঁট্টার জোগাড় করে আনতে কতক্ষণ? ডাক্তার? নাঃ! মাতৃপুরুষানুক্রমে সে আমাদের ধাতে সয়না।

বিছানা ছেড়ে যেদিন প্রথম বেরুতে পারলাম সেদিন হোটেলের বড়ো আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলাম। অ্যাঁ! এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি নাকি? নিজেকে দেখে চেনাই যায় না যে! মুখের দিকে তাকাতেই ইচ্ছা করে না, —বিকৃতবদনে বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাস্তায় পা দিতেই আস্তাবলের বড়ো সহিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'হুজুর, আপনার কাছে আমাদের কিছু পাওনা আছে।'

'পাওনা?' আবার আমাকেচমকাতে হয়—'কীসের পাওনা?'

'আজ্ঞে, সেই ঘোড়ার দরুন।'

'কেন, তার দাম তো চুকিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, চাবুকের দরুন ক-আনা পাবে বটে তোমরা। তা চাবুক তো আমার কাজেই লাগেনি, ব্যবহারই করতে হয়নি আমায়! ও ক আনাও কি দিতেই হবে নেহাৎ?'

'আজ্ঞে কেবল ক-আনা নয় তো হুজুর! বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা মোট পাওনা যে! এই দেখুন বিল!

'বাহাত্তর টাকা সাড়ে বারো আনা!?' আমার চোখ কপালে উঠে। 'কেন, আমার অপরাধ?

'আজ্ঞে আপনার ঘোড়ায় খেয়েছে এই এক মাসে সাড়ে বাইশ টাকার ছোলা, সওয়া পাঁচ টাকার ঘাস—'

আমি বাধা দিয়ে বলি—'কেন, সে তো পালিয়ে গেছে গো!'

'আপনার ঘোড়া? মোটেই না। খাবার সময়েই ফিরে এসেছিল আর তার পর থেকে আস্তাবলে ঠিক রয়েছে।' সে-ই ছোটো সহিসকে হুকুম দেয়—'নিয়ে আয়তো ভুটানি টাট্টু হুজুরের সামনে।'

বলতে বলতে সহিসটা ঘোড়াকে এনে হাজির করে। ঘোড়াটা যে ভালো খেয়েছে দেয়েছে তার আর ভুল নেই, বেশ একটু মোটাসোটাই হয়েছে বলে আমার বোধ হল।

'আমরা তো তবু ওকে কম খেতে দিয়েছি, দিতে পারলে ওর ডবল, চার ডবল, আট ডবল খেতে পারত। কিন্তু সাহস করে খাওয়াতে পারিনি, হুজুর বেঁচে উঠবেন কিনা ঠিক ছিল না তো। এর আগের—' সহিসটা হঠাৎ থেমে যায়, আর কিছু বলতে চায় না।

পরবর্তী বাক্যটি প্রকাশ করার জন্য আমি পীড়াপীড়ি লাগাই। ছোটো সহিসটা বলে ফেলে—'ওতে চেপে এর আগে আর কেউ বাঁচেনি হুজুর।'

বড়ো সহিসটা বলে—'এই তো ঘাস আর ছোলাতেই গেল সওয়া পাঁচ আর সাড়ে বাইশ। একুনে সাতাশ টাকা বারো আনা। ভুট্টা খেয়েছে মোট দশ টাকার। ভুটানি টাট্টু কিনা, ভুট্টা ছাড়া ওদের চলে না। এই গেল সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা—দেখুন না বিল।'

'এর উপর আবার বজ্‌রা—' ছোটো সহিসটি বলতে যায়।

'থাম তুই।' বলে বড়ো সহিসটি তাকে বাধা দেওয়ায় আমাকে আর বজরাঘাতটা সইতে হয় না।

'বিল এনেছ, আমার খাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।' মনে মনে বলি। —'খাল বিল এক হয়ে যাক আমার!'

এবার ছোটো সহিসটা শুরু করে—'তারপর ঘোড়ার বাড়ি ভাড়া বাবদে গেল দশ টাকা—'

'ঘোড়ার জন্যে আবার একটা বাড়ি?' আমি অবাক হয়ে যাই।

'আজ্ঞে একটা গোটা বাড়ি নিয়ে একটা ঘোড়া করবেই বা কি? ওদের তো খাবার ঘর কি শোবার ঘর, বৈঠকখানা কি পায়খানা আলাদা আলাদা লাগে না। এক জায়গাতেই ওদের সব কাজ—কিন্তু হুজুর, ওই জায়গাটার ভাড়াই হচ্ছে মাসে দশ টাকা।'

আমার কথা বেরোয় না। সহিসটা সুর মোলায়েম করে বলে, 'তারপর হুজুরের ঘোড়ার খিদ্‌মৎ খেটেছি, আমাদের মজুরি আছে। আমরাই দশ পনেরো টাকা কি না আশা করি হুজুরের কাছে?'

হুজুরের অবস্থা তখন মজুরের চেয়েও কাহিল। তবু মনে মনে হিসাব করে অঙ্ক খাড়া করি—'তা হলেও সব মিলিয়ে বাষট্টি টাকা বারো আনা হয়। আর দশ টাকা দুপয়সা কিসের জন্য?'

ছোটো সহিসটা চটপট বলে—'আজ্ঞে ও দুপয়সা আমাকে দিবেন। খৈনির জন্য।'

'ঘোড়ায় খৈনি খায়? আশ্চর্য তো!'

'আজ্ঞে ঘোড়ায় খায়নি। আমিই খাবার জন্য ডলছিলাম, ওটার মুখের কাছেই। কিন্তু যেমনি না ফটফটিয়েছি অমনি হারামিটা হেঁচে দিয়েছে—বিলকুল খৈনিটাই বরবাদ।'

তখনই পকেট থেকে পয়সা দুটো বের করে ওকে দিয়ে দিই। যতটা পাতলা হওয়া যায়। দেনা আর শত্রু কখনও বাড়াতে নেই।

বড়ো সহিস বলে—'আর বাকি দশ টাকার হিসাব চান? জানোয়ার এমন পাজী আর বলব কি হুজুর! একদিন বাড়ির মালিকের পাকিটের মধ্যে নাক ডুবিয়ে একখানা দশ টাকার নোট বেমালুম মেরে দিয়েছে। একদম হজম।'

'অ্যাঁ, বল কি?' আমি বিচলিত হই—'একেবারে খেয়ে ফেলল নোট-খানা? করকরে দশ-দশটা টাকা?'

'একেবারে। আমরা আশা করলাম পরে বেরুবে, কিন্তু না, পরে অনেক আস্ত ছোলা পেলাম, সেগুলো ঘুগনিওয়ালাদের দিয়েছি, কিন্তু নোট বিলকুল গায়েব। এ টাকাটাও ঘোড়ার খোরাকির মধ্যেই ধরে নেবেন হুজুর।'

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। দশ দশটা টাকা ঘোড়ার নস্যি হয়ে গেল ভাবতেই আমার মাথা ঘুরতে থাকে।



সহিসটা আশ্বাস দেয়—'চাবুকের দামটা তো ধরা হয়নি হুজুর, যদি মর্জি করেন তা হলে ওটার কয় আনা জুড়ে পুরো তেয়াত্তর টাকাই দিয়ে দিবেন। আর আমাদের দুজনকে ওই দুটো টাকা,' বিনয়ের বাড়াবাড়িতে জড়ীভূত হয়ে বলে সে—'আপনাদের মতো আমির লোকের কাছেই তো আমাদের বকশিশের আশা প্রত্যাশা হুজুর!'

প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সহিস বিদায় করি। মামার দেওয়া যা উপসংহার থাকে তার থেকে হোটেলের দেনা চুকিয়ে, হয়তো মালগাড়িতে বামাল হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। যাই হোক, ঘোড়াকে আর আস্তাবলে ফিরিয়ে নিতে দিই না। সামনেই একটা খুঁটোয় বেঁধে রাখতে বলি, রাস্তাই আমার ঘোড়ার আস্তানা এখন থেকে। সেই উপকারী ভদ্রলোককে ডেকে দিতে বলি সহিসদের, যিনি কেবল ঘোড়া চিনিয়েই নিরস্ত হননি, আস্তাবলও দেখিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোককেই ঘোড়াটা উপহার দিয়ে তাঁর উপকারের ঋণ পরিশোধ করব।

অভিলাষ প্রকাশ করতেই বড়ো সহিসটা বলে—'ওঁকে কি দেবেন হুজুর! ওঁর ভগ্নীপতিরই তো ঘোড়া।'

আমার দম ফেলতে দেরি হয়। সেই নিলামওয়ালা ওর ভগ্নীপতি? সে ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ছোটোটা যোগ দেয়—'আর ওনারই তো আস্তাবল হুজুর!'

আমি আর কিছু বলি না, কেবল এই সংকল্প স্থির করি, যদি আমি গৌহাটিতে থাকতে থাকতেই সেই উপকারি ভদ্রলোকটি মারা যান, তাহলে আমার যাবতীয় কাজকর্ম—গল্পের বই পড়া, বায়োস্কোপ দেখা, চপকাটলেট খাওয়া এবং আর যা

কিছু সব স্থগিত রেখে ওঁর শবযাত্রায় যোগ দেব। সব আমোদ-প্রমোদ ফেলে প্রথমে ওই কাজ। সেদিনকার অ্যামিউজমেন্ট ওই।

সহিসরা চলে যায়। আমি ঘোড়ার দিকে তাকাই আর মাথা ঘামাই—কি গতি করব ওর ? কিংবা ও-ই আমার কি গতি করে ? এমন সময়ে ডাক্তারের আবির্ভাব হয় সেই পথে। আমাকে দেখে এক গাল হাসি নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন—'এই যে! বেশ জীর্ণশীর্ণ হয়ে এসেছ দেখছি! একমাসেই দেখলে তো ? তখনই বলেছিলাম! ঘোড়ায় চড়ার মতন ব্যায়াম আর হয় না। পায়ে হেঁটে কি এত হালকা হতে পারতে ? আরও মুটিয়ে যেতে বরং! যাক্, খুশি হলাম তোমার চেহারা দেখে! বাড়ি ফিরে মামাকে বল, মোটা রকম ভিজিট পাঠিয়ে দিতে আমায়।'

'মামা কেন, আমিই দিয়ে যাচ্ছি!' সবিনয়ে আমি বলি, 'এই ঘোড়াটাই আপনার ভিজিট।'

'খুশি হলাম, আরো খুশি হলাম।' ডাক্তারবাবু সত্যিই পুলকিত হয়ে ওঠেন, 'তা হলে এবার থেকে আমার রুগি দেখার সুবিধেই হল।'

ডাক্তারবাবু লাফিয়ে চাপেন ঘোড়ার পিঠে, ওঠার কায়দা দেখেই বুঝতে পারি এককালে ওই বদঅভ্যাস দস্তুরমতোই ছিল ওঁর। পর মুহূর্তেই তাঁকে আর দেখতে পাই না। বিকালে হোটেলের সামনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছি, তখন দেখি, মুহ্যমানের মতো তিনি ফিরছেন, হেঁটেই আসছেন সটান।

'আপনার ঘোড়া কি হল ?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি। আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃকপাত করেন তিনি।— 'এই হেঁটেই ফিরলাম। কতটুকুই বা পথ! চার মাইল তো মোটে। ঘোড়ায় চড়া ভালো ব্যায়াম বটে, কিন্তু বেশি ব্যায়াম কি ভালো ? অতিরিক্ত ব্যায়ামে অপকারই করে, মাঝে মাঝে হাঁটতেও হয় ভাই!' বলে তিনি আর দাঁড়ান না।

খানিক বাদে ডাক্তারবাবুর চাকর এসে বলে—'গিন্নিমা আপনার ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু ঘোড়া কই ? ঘোড়াকে তোমার সঙ্গে দেখছি না তো!'

ঘোড়া যে কোথায় তা চাকর জানে না, ডাক্তারবাবুও জানেন না, তবে তাঁর কাছ থেকে যা জানা গেছে তাই জেনেই কর্তার অজ্ঞাতসারেই গিন্নি এই মোটা ভিজিট প্রত্যর্পণ করতে দ্বিধা করছেন না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গিন্নিপক্ষ যা জেনেছেন আমি তা কর্মবাচ্যের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করি। যা পঙ্কোদ্ধার হয় সংক্ষেপে তা এই, —অশ্বপৃষ্ঠে যত সহজে ডাক্তারবাবু উঠতে পেরেছিলেন নামাটা ঠিক ততখানি সহজসাধ্য হয়নি, এবং যথাস্থানে তো নয়ই। দুচার মাইলের কথাই নয়, পাক্কা পনেরো মাইল গিয়ে ঘোড়াটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে। নামিয়ে দিয়েছে বললেও ভুল বলা হয়, ধরাশায়ী করে পালিয়েছে। কোথায় গেছে বলা কঠিন, এতক্ষণে একশো মাইল, দেড়শো মাইল, কি এক হাজার মাইল চলে যাওয়াও অসম্ভব না। কর্তা বলেন একশো, গিন্নীর মতে দেড়শো, এক হাজার হচ্ছে চাকরের ধারণায়।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, তৎক্ষণাৎ গাড়ি ধরে বাড়ি ফেরার জন্য। খাবার সময়

তো প্রায় হয়ে এল, যে-এক হাজার মাইল সে এক নিশ্বাসে গেছে, খিদের ঝোঁকে তা পেরিয়ে আসতে তার কতক্ষণ? ঘাড় থেকে ঘোড়া না নামিয়ে গৌহাটিতে বাস করা বিপজ্জনক।

গল্প শেষ করে আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লাম—'ঘোড়ার পাল্লায় পড়া যে কী পেল্লায় ব্যাপার দেখলি তো! আর সব পাল্লার দাঁড়ি আছে—থামা যায়। দাঁড়িপাল্লা বলে না কথায়? কিন্তু ঘোড়ার পাল্লায় কোনো দাঁড়ি নেই দাদা!'

'দাঁড়ি নেই?' আলো উসকে ওঠে।

'না। ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকার বস্তু নয়। তার পাল্লায় দাঁড়ি তো নেইই, কমা, সেমিকোলন, এমন কি ফুলস্টপ অব্দি নেই।'

'কেবল ড্যাশ?' সলিল একটা কথার মতো কথা কয় এতক্ষণে!

'আর শেষ পর্যন্ত সেই কোলন। দু আধখানা হয়ে মাটির কোলে ঢলে পড়ে অবশেষে। আমার হাতিমার্কা কাকাও শেষটায় সেই ঘোড়ার পাল্লাতেই গিয়ে পড়লেন।'

'তোমার সেই কাকার গল্পটাই বলো তাহলে এবার।' বলে উঠল তারা সবাই সমস্বরে।

তিন

বলেছি তো তোদের যে, একবার হাতি পোষার বাতিক হয়েছিল আমার কাকার। সেই হাতির সঙ্গেই একদিন তাঁর হাতাহাতি বেধে গেল। সে কথাও শুনেছিস। হাতির শুঁড় এবং কাকার কান খুব বেশি দূরে ছিল না— সুতরাং তার আসন্ন ফল কী দাঁড়াবে তা আমি এবং হাতি দুজনেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। কাকাও যে পারেননি তা নয়, কিন্তু দুর্ঘটনা আর বলে কাকে! সেই কর্ণবধ-পর্বের পর থেকে এই পালার শুরু।

কান গেলে মানুষের যত দুঃখ হয় অনেক সময় প্রাণ গেলেও ততটা হয় না বোধহয়। কান হারিয়ে কাকা ভারী মুষড়ে পড়েছিলেন দিনকতক।

কর্নের বিপদ পদে পদে, এই কথাটাই কাকাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। মহাভারত পড়েও জানা যায়, তা ছাড়া, পাঠশালায় পড়বার সময় ছেলেরাও হাড়ে হাড়ে টের পায়। হাড়ে হাড়ে না বলে কানে কানে বললেই সঠিক হবে, কেননা কানের মধ্যে বোধহয় হাড় নেই, থাকলে ওটা আদৌ অত সুখকর 'মলত্‌তব্য' ব্যাপার হত না।

কাকাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কাকা বোঝেন কিনা তিনিই জানেন। তত্ত্বকথা বোঝা সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া আমি তাঁকে বোঝাই মনে মনে, মুখ ফুটে কিছু বলবার আমার সাহস হয় না। কাকা যা বদরাগী, ক্ষেপে যেতে কতক্ষণ!

কাকাকে দেখলে আজকাল আমার ভয় হয়। কর্ণচ্যুত কাকা পদচ্যুত চেয়ারের চেয়েও ভয়াবহ। তার উপরে নির্ভর করা যায় না—করেছ কি কুপোকাৎ! আর আজকাল যে রকম কটমট্ করে তিনি তাকান আমার দিকে! মুখের পানে বড়ো একটা না, আমার কানের দিকে কেবল। ওই দিকেই তাঁর যত চোখ, যত ঝোঁক, আর যত রোখ। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার কর্ণ-সম্পদে তিনি বেশ ঈর্ষান্বিত। হাতির হাত থেকে

বাঁচিয়েছি, এখন কাকার কবল থেকে কি করে কান সামলাই তাই হয়েছে আমার সমস্যা। কাকা একবার ক্ষেপে গেলে আমাকে তাঁর নিজের দশায় আনতে কতক্ষণ?

তাই আমিও যতটা সম্ভব দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করি। নিতান্তই কাকার কাছাকাছি থাকতে হলে মর্মাহত হয়ে থাকি। এবং মনে মনেই তাঁকে সান্ত্বনা দিই।

অবশেষে একদিন সকালে কাকা অকস্মাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। 'শিবু— শিবু—' ডাক পড়ে আমার।

কাকার কাছে দৌড়োই কান হাতে করে। এত যখন হাঁকডাক কী সর্বনাশ হবে কে জানে! প্রাণে মরতে ভয় খাই না, মারা গেলে আবার জন্মাবো, কিন্তু কানে মারা যাবার আমার বড্ড ভয়।

'কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? হয়েছে, সব ঠিক হয়েছে। আর কোনো ভাবনা নেই।' উৎসাহের আতিশয্যে উথলে ওঠেন কাকা। আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি।

'বুঝেছিস কিছু?' কাকার প্রশ্ন হয়।

'উহুঁ—' আমি দুকান নাড়ি। ঘাড় নাড়লেই কানরা নড়ে যায়, কেন যে তা জানি না, তবে বরাবর দেখে আসছি আমি।

'রামপুরহাট যাব। টিকিট কিনে আনগে। একটা ফুল, একটা হাফ। তুই যাবি আমার সঙ্গে।'

'রামপুরহাট? হঠাৎ?' আমি বলে ফেলি।

'হঠাৎ আবার কি? সেইখানেই তো যেতে হবে।' আমার সবিস্ময় প্রশ্নে কাকা যে হতভম্ব হয়ে যান। —'বামাক্ষেপার জীবনী পড়িসনি? আর পড়বিই বা কি করে? বুড়োহাতি হতে চললি কিন্তু ধর্মশিক্ষা হল না তোর। যত বলি সাধু মহাত্মা যোগী-ঋষিদের জীবনীটিবনী পড়—তা না, কেবল ডান্ডাগুলি, লাট্টু আর লাটাই। যদি তা পড়তিস তাহলে আর একথা জিজ্ঞেস করতিস না।'

আমি আর জিজ্ঞাসা করি না। মৌনতা দ্বারা কেবল সম্মতি নয়, পাণ্ডিত্যের লক্ষণও প্রকাশ পায়, এই শিক্ষাটা আমার হয়ে যায়। না বলে কয়ে যদি সমঝদার হওয়া যায় তাহলে আর কথা বলে কোন্ মুখ্যু? কাকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমাকে সবিশেষ জ্ঞান দিতে উদ্যত হন। —'রামপুরহাটের কাছেই এক ঘোর মহাশ্মশান আছে, জানিস? এই দশ-বিশ মাইলের মধ্যেই। সেই শ্মশানে বসে কেউ যদি একটানা তিন লক্ষ বার কোনো দেবতার নাম জপ করতে পারে তাহলেই সিদ্ধি! নির্ঘাত! স্বয়ং বশিষ্ঠমুনি এই বর দিয়ে গেছেন। আমার ঠাকুর্দার কাছে শোনা। সেইখানেই আমি যাব।'

'সেখানে কেন কাকা?' আমি একটু বিস্মিতই হই। সিদ্ধির জন্য অত কষ্ট করে অতদূর যাবার কি দরকার? রামপুরহাট না গিয়ে, রামশরণ দুবেকে বললে এখুনি তো এক লোটা বানিয়ে দেয়? কোনো হাঙ্গামা নেই! হ্যাঁ, সবতাতেই কাকার যেন বাড়াবাড়ি।

আমার সিদ্ধি মেডইজির ভূমিকা পড়ার মুখেই কাকা উসকে ওঠেন— 'উঁ হুঁ-হু, সেই সিদ্ধি নয়। ও তো খেতে হয়, খেলে আবার মাথা ঘোরে। এ সিদ্ধি পেতে হয়। বামাক্ষেপা, বারদির ব্রহ্মচারী, আরো যেন কারা সব ওই শ্মশানে বসে সিদ্ধিলাভ

করেছিলেন। জানিস না? আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা এইরকম জপ করে যাব, যেমনি না তিনলক্ষ বার পুরবে অমনি মা দুর্গা হাসতে হাসতে দশ হাত নেড়ে এসে হাজির হবেন। বাবা গণেশও শুঁড় নাড়তে নাড়তে আসতে পারেন। তাঁরা এসে বলবেন—'বৎস, বর নাও—'

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠি।

'তখন আমি যা বর চাইব, বুঝেছিস কিনা, সঙ্গে সঙ্গে ফলবে। তাকেই বলে সিদ্ধিলাভ। আমি যদি চাই, আমার আরো দুটো হাত গজাক, তক্ষুনি গজাতে পারে। হুম! তৎক্ষণাৎ!'

শুনে আমার রোমাঞ্চ হয়। চতুর্ভুজ কাকার চেহারা কল্পনা করার আমি প্রয়াস পাই।

'কিন্তু কাকাবাবু! চার হাত হলে তুমি পাশ ফিরে শোবে কি করে?'

'কিন্তু আমি তো আর হাত চাইব না। হাত তো আমার আছেই। দুটো হাতই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই নিয়েই পেরে উঠি না। পায়েরও আমার আর দরকার নেই। দুটো পা-ই আমার মোর দ্যান এনাফ। আমি কেবল চাইব আর একটা কান। কান না হলে আমাকে মানায় না, আয়নার দিকে তাকানোই যায় না। তাই বুঝেছিস কিনা, অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম—রামপুরহাট! মন্ত্র বলে চারটে হাত কি চারটে পা যদি আমার গজাতে পারে তাহলে একটা মাত্র কান গজানো আর এমন কি?'

কাকা তাঁর কথায় পুনশ্চ যোগ করেন আবার—'ইচ্ছে করলেই যদি আমি চতুষ্পদ হতে পারি তাহলে এমন বিকর্ণ হয়ে থাকব কেন? কিসের তরে?'

আমারও—দারুণ বিশ্বাস হয়ে যায়। মন্ত্রবলে কত কী হয় শুনেছি, কান হওয়া আর কি কঠিন? কানেই যখন মন্ত্র দেয়, তখন মন্ত্রেও কান দিতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। তিনি লাখ বার কেবল দুর্গা কি কালী কি জগদ্ধাত্রী এর যে কোনো একটা নাম—উঁহু, জগদ্ধাত্রী বাদ—চার অক্ষরের মন্ত্র তার মধ্যে আবার দস্তুরমত দ্বিতীয় ভাগ! জগদ্ধাত্রীর তিনলক্ষ মানে কালীর ছলক্ষের ধাক্কা। শক্তির আরাধনাতেই না হোক শক্তির বরবাদ নেহাৎ সময়ের অপচয়! পয়সা না লাগুক, কিন্তু দেবতার নামের বাজে খরচ করতেও আমি নারাজ।

'কাকা, আমিও তাহলে বর চেয়ে নেব যাতে না পড়ে শুনে ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারি।' আমি একটু ভেবে নিই, 'কেবল পাস করাই বা কেন, স্কলারশিপটা নিতেই বা ক্ষতি কি? যে বরে পাস হয়, স্কলারশিপও তাতে হতে পারে, কী বল কাকা? মা দুর্গার পক্ষে কি খুব শক্ত হবে এমন?'

'আর, ম্যাট্রিকই বা কেন? না পড়ে একেবারে এম্-এ?' এম্-টা আমি আরো বড়ো করি।

'বারে! আমি মরব জপ করে আর তুমি পাস করবে না পড়ে? বাঃ-রে!' —কাকা খাপ্পা হয়ে ওঠেন।

'তা হলে আমার গিয়ে আর কি হবে!' আমি ক্ষুণ্ণ হই। 'তোমার সঙ্গে নাই গেলাম তবে, আমার তো আর কানের তেমন অভাব নেই!'

'পাগল! তা কি করে হয়? তোকে যেতেই হবে সঙ্গে। সিদ্ধিলাভ করা কি অতই সোজা নাকি? জপ করতে বসলেই তুলে দেয় যে—'

'কে? পুলিশে?'

'উহুঁ। পুলিশ সেখানে কোথা? শুনছিস মহাশ্মশান! বারো কোশের ভেতরে কোনো জনমানব নেই।'

'ও বুঝেছি! শেয়াল! বেশ তোমার বন্দুকটা নিয়ে যাব না হয়—কাছে এলেই দুম—দুড়ুম।'

'শেয়াল নয় রে পাগলা, শেয়াল নয়। ডাকিনী যোগিনী, ভূত পেরেত, তাল-বেতাল—এরা সব এসে তুলে দেয়। সিদ্ধিলাভ করতে দেয় না।'

ভূত-প্রেত শুনেই আমি হয়ে গেছি! তাল-বেতালের তাল আমাকেই সামলাতে হবে ভাবতেই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। 'কাকা—কাকা!' কম্পিত কণ্ঠ থেকে আমার কেবল কা কা ধ্বনি বেরোয়, তার বেশি বেরোয় না।

'আরে, ভয় কিসের তোর। আমি তো কাছেই থাকব। গতিক সুবিধের নয় দেখলে দুর্গা পালটে রাম নাম করতে লেগে যাব না হয়। রাম নামে ভূত পালায়। তবে রাম হচ্ছে খোট্টাদের দেবতা—তা হোক গে, রামও বর দিতে পারে। সীতা উদ্ধার করেছিলেন আর একটা কান উদ্ধার করতে পারবেন না? তবে কিনা দুর্গা—দুর্গাই হল গিয়ে মোক্ষম! রামকেও দুগার কাছে বর নিতে হয়েছিল।'

তথাপি আমি ইতস্তত করতে থাকি।

'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক! তুই না হয় রাম রাম জপিস—তাহলে তো আর ভয় নেই তোর? রামকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাশের ফিকিরও করে নিতে পারিস! আমার কোনো আপত্তি নেই। ভোলানো খুব শক্ত হবে না হয়তো। রামটা ভ্যাবা গঙ্গারাম। তা না হলে বাঁদরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে,......এত মানুষ থাকতে?' এতখানি বলে কাকাকে দম নিতে হয়—'তা ছাড়া, তোর দাঁত-ব্যথা, পেট-কামড়ানো, সর্দিকাশি, লঙ্কা খেলে হেঁচকি ওঠা—স্কুলের টাস্‌ক না হলে ডায়েরিয়া হওয়া—যত রাজ্যির ব্যায়াম তো তোর লেগেই আছে, এসবও তোর সেরে যাবে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমায়।'

পাশের কথায় আমার উৎসাহ সঞ্চার হয়। নতুন প্রস্তাবে কাকার সঙ্গে রফা করে ফেলতে দেরি হয় না একটুও। সেই দিনই আমরা রওনা দিই। সন্ধ্যার মুখে রামপুরহাটে পৌঁছানো; কাকার বন্ধু এক ডাক্তারের বাড়িতে আমাদের আবির্ভাব।

ডাক্তার ভদ্রলোক সে সময়ে একটা ঘোড়ার দর করছিলেন। একজন গেঁয়ো লোক ঘোড়া বেচতে এসেছিল, দিব্যি খাসা ঘোড়াটি—আকার প্রকারে তেজি বলেই সন্দেহ হয়। প্রাথমিক কুশলপ্রশ্ন আদান প্রদানের পরেই কাকা জিজ্ঞাসা করেন—'ঘোড়া কেন হে হারাধন?'

'আর বল কেন বন্ধু!' হারাধন ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করেন, 'দূর দূর যত গ্রাম থেকে ডাক আসে, সেখানে তো মোটর চলে না, গোরুর গাড়ির রাস্তাও নেই অনেক জায়গায়—সে স্থলে ঘোড়াই একমাত্র বাহন।' অদূরস্থিত সাইকেলের দিকে অঙ্গ

লিনির্দেশ করে—'ওতে চেপে আর পোষায় না ভাই! তাই দেখে শুনে একটা ঘোড়াই কিনছি এবার।'

'বেশ করছ, বেশ করছ।' কাকার সর্বান্তকরণ সমর্থন— 'আমাদের স্বদেশি ঘোড়া থাকতে বিদেশি সাইকেল কেন হে! ঠিকই বুঝেছ এতদিনে। তা, তোমার ঘোড়াটিকে তো বেশ শান্তশিষ্ট বলেই বোধ হচ্ছে।' কাছে গিয়ে কাকা ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে সার্টিফিকেট দেন।

'তোমার তো ছোটোবেলায় ঘোড়ায় চড়ার বাতিক ছিল হে! ঘোড়া দেখলেই চেপে বসতে,' ডাক্তার বলেন, 'কি রকম জানোয়ার কিনলাম, চড়ে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না? আমার তো ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করতেই কিছুদিন যাবে এখন!'

তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পরীক্ষায় সম্মত হন কাকা। হাতি-ঘোড়ার ব্যাপারে বেশি বেগ পেতে হয় না রাজি করাতে কাকাকে। চতুষ্পদের দিকে কাকার স্বভাবতই যেন টান। সে তুলনায় আমার দিকেই একটু কম বরং, পদ-গৌরব করার মতো কিছু আমার ছিল না বলেই বোধহয়।

'ঘোড়ায় চাপবার বয়েস কি আছে আর?' কাকা সন্দিগ্ধ সুরেই বলেন, 'দেখি তবু চেষ্টা করে।' তারপর ডাক্তারবাবু, আমি এবং অশ্ববিক্রেতা— সর্বোপরি স্বয়ং অশ্বের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় কষ্টে সৃষ্টে কোনোরকমে তো চেপে বসেন শেষটা।

কাকার দেহখানি তো কম নয়, ভারাক্রান্ত হয়ে ঘোড়াটা কেমন যেন ভড়কে যায়। নড়বার নামটিও করে না। কাকা যতই 'হেট হেট' করেন ততই সে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকে।

অশ্ব বিক্রয়ের আশা ক্রমশই সুদূরপরাহত হচ্ছে দেখে অশ্ববিক্রেতা বিচলিত হয়ে ওঠে; এবং তার হাতের ছিপটিও। কিন্তু যেই না ঘোড়ার পিঠে ছপাৎ করে এক ঘা বসিঁয়ে দেওয়া, অমনি ঘোড়াটা ঘুরপাক খেতে শুরু করে দেয়। এ আবার কি কাণ্ড! কাকা তো মরিয়া হয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরেন।

এদিকে ঘোড়ার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে ডাক্তারবাবুর সখের বাগানের দফারফা, নানাপ্রকার গোলাপ গাছের চারা লাগিয়েছিলেন, ঘোড়া কেনবার কাছাকাছিই লাগিয়েছিলেন—ঘোড়ার পায়ে তাদের অপঘাতের আশঙ্কা তো করেননি কোনোদিন! অতঃপর অশ্ববর মুহুর্মুহু এগোতে আর পেছোতে থাকে, যে পথে এগোয় সে পথে প্রায়ই পেছোয় না এবং এই বিদ্যুদ্বেগ অগ্রপশ্চাৎ গতির ধাক্কায় আর এক ধারের শাকসব্জির দফা সারে—অশ্বক্ষুরে মুড়িয়ে যায় সব। এ-সমস্তই কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরপর দুটি মহাদেশ এইভাবে বিধ্বস্ত করে অশ্বরত্ন নিদারুণ এক লাফ মারেন—সেই এক লাফেই কাকা-পৃষ্ঠে, বাগানের বেড়া টপকে সামনের একটা নালা ডিঙিয়ে, তাকে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। আমিও দেরি করি না, তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাইকেলটায় চেপে পশ্চাদ্ধাবন করি। ঘোড়ার এবং কাকার।

ধাবমান অশ্বকে সশরীরে খুব সামান্যই দেখা যায়, অল্পক্ষণ পরেই তিনি কেবল শ্রুতিগোচর হতে থাকেন। দূর থেকে কেবল খটাখট কানে আসে; কিছুক্ষণ পরে পদধ্বনিও না—শুধুই চিঁহি চিঁহি। চিঁহিরই অনুসরণ করি।

অনেকক্ষণ অনেক ঘোরাঘুরির পর এক ধূ-ধূ প্রান্তরে এসে পড়ি। সন্ধ্যা কখন পেরিয়ে গেছে। আধখানা চাঁদের ম্রিয়মাণ আলোয় কোনোরকমে সাইকেল চালিয়ে যাই। কিন্তু সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও চিহ্নমাত্র নেই—না ঘোড়ার না সওয়ারের।

ইতস্তত সাইকেল চালাতে থাকি, কী করব আর? ফাঁকা মাঠ আর পরের সাইকেল পেলে কে ছাড়ে? কাকাহারা হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে কাকির কাছে কী কৈফিয়ত দেব? মুখ দেখাব কি করে? সে ভাবনাও যে নেই তা নয়।

'কে-রে? শিবু নাকিরে? শিবুই তো!'

চমকে গিয়ে সাইকেল থামাই। দেখি কাকা এক উঁচু ঢিবির পাশে পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন।

'আঃ, এসেছিস তুই? বাঁচলুম।'

'তোমার ঘোড়া কোথায় কাকা?'

'আমায় ফেলে পালিয়েছে। কোথায় পালিয়েছে জানি না।' কাকার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—'আঃ, হতভাগার পিঠ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছি! কিন্তু এ কোথায় এনে ফেলেছে রে? এও কি রামপুরহাট?'

'উহুঁ, মনে তো হয় না। রামপুরহাট কত মাইল দূরে ত বলতে পারব না, তবে বেশ কয়েকঘন্টা দূরে।'

'তাহলে এ কোন জায়গা? তুই কি বলছিস তবে লক্ষ্মণপুরহাট?'

'লক্ষ্মণপুর হতে পারে, ভরতপুর হতে পারে, হনুমানপুর হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু হাটের চিহ্নমাত্র নেই কাকা। চারধারেই তো ধূ ধূ মাঠ! সাইকেল করে চারদিকে ঘুরলাম, জনমানবের পাত্তাই নেই কোথাও।'

'তবে....তবে এই কি সেই মহাশ্মশান?' কাকা নিজেই নিজের জবাব দেন, 'দুর্লক্ষণ দেখে তাই তো মনে হয়। দমকা হাওয়ায় মড়া-পোড়ানোর গন্ধও পেয়েছি খানিক আগে। আর, দু-একটা শেয়ালকেও যেতে দেখলাম যেন। তাহলে—তাহলে কি হবে?' কাকার কণ্ঠে অসহায়তার সুর।

কাকার বিচলিত হওয়ার কারণ আমি বুঝি না।—'কেন? এখানে আসবার জন্যেই তো আমাদের আসা? তাই নয় কি? তাহলে সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা শুরু করে দিলেই তো হয়।'

'আজই? আজ রাত্রেই? আজ যে সিদ্ধিলাভের জন্য মোটেই আমি প্রস্তুত নইরে। আজ কি করে হয়?'

'যখন হয়ে পড়েছে তখন আর কি করা?' আমি কাকার পাশে বসে পড়ি।—'তেমন ঝোপ-ঝাড় নেই, বেশ ফাঁকাই আছে কাকা! ভূতপ্রেত এলে টের পাওয়া যাবে তক্ষুনি।'

'সমস্ত দিন ট্রেনে—খাওয়া-দাওয়া হয়নি। খিদেয় নাড়ী চিঁচিঁ করছে, এই কি সিদ্ধিলাভের সময়? তোর কি কোনো আক্কেল নেই রে শিবু? এ রকম বিপদ হবে জানলে কে আসতে চাইত—এই আমি নিজের কান মলছি, যদি আজ উদ্ধার পাই—'।

তার একমাত্র কানকে কাকা একমাত্রা মলে দেন। কিন্তু উদ্ধারের কোনো ভরসাই মেলে না। তত্‌ক্ষণে চাঁদ ডুবে গিয়ে অন্ধকার ঘোরালো হয়ে আসে। দুহাত দূরেও দৃষ্টি অচল হয়। আমি কাকার কাছ ঘেঁষে বসি, আমার গা ছমছম করতে থাকে।

অবশেষে কাকা বলেন—'তাই করা যাক অগত্যা। তোর কথাই শুনি। আজ রাত্রে এখান থেকে বেরুবার যখন উপায় নেই, তখন কি আর করা? কাল সকালে একেবারে সিদ্ধি পকেটে করে হারাধনের বাড়ি ফিরলেই হবে। এই নে আমার কোট এইনে পিরাণ—' কাকা একে একে আমার হাতেতুলে দিতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করি—'তুমি কি খালি গা হচ্ছ কাকা?'

'বাঃ, হব না? সাধু সন্ন্যাসীরা কি কাপড় জামা পরে চাদর গায়ে দিয়ে তপস্যা করে নাকি? তাহলে কি সিদ্দি হয়রে মুখ্যু? এই নে চাদর—এই নে আমার গেঞ্জি—এই নে আমার—'

আমি সচকিত হয়ে উঠি। অতঃপর পরবর্তী বস্তুটি কী তা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় না। —'উহুঁ, কাপড়টা থাক কাকা। কাপড় পরাতে তত ক্ষতি হবে না—'

'তুই তো সব জানিস।' কাকা রাগান্বিত হন, 'হাঁ কাপড়টা থাক। তাহলেই আমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে! তবে এত কাণ্ড করে দর্জি ডাকিয়ে গেরুয়া রঙের কৌপীনই বা তৈরি করালাম কেন, আর অমন কষ্ট করে সেটা এঁটে পরতেই বা গেলাম কেন তবে?'

কাপড়ও আমার হাতে চলে আসে। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কৌপীনসম্বল কাকা কর্ণলাভের প্রত্যাশায় ঘোর তপস্যা লাগিয়ে দ্যান।

আমি আর কী করব? কাকার কাপড়টাকে মাটিতে বিছিয়ে পাতি, কোটকে করি বালিশ, গেঞ্জিটাকে পাশবালিশ। তারপর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে সটান হই। আমি দেখেছি, জেগে থাকলেই আমার যত ভয়, ঘুমিয়ে পড়লে আর আমার কোনো ভয় করে না।

অনেকক্ষণ অমনি কাটে। ঘুমেরও কোনো সাড়া নেই, কাকারও না। সহসা একটা আওয়াজ—চটাস।

আমি চমকে উঠি! কাঁপা গলায় ডাকি—'কাকা!'

কাকার কোনো সাড়া নেই। আরো বেশি করে আমি চাদর মুড়ি দিই।

আবার খানিক বাদে 'চটাস'। এবার আওয়াজটা আরো যেন জোরালো।

আবার আমার আর্তনাদ—'কাকা!'

অন্ধকার ভেদ করে উত্তর আসে—'উহুঁ হুঁ!'

কাকার চাপা হুঙ্কারে আমি নিরস্ত হই। আর উচ্চবাচ্য করি না। কাকার যোগভঙ্গ করে কি নিজের কানের বিঘ্ন ঘটাব? অন্ধকারের মধ্যেই ওঁর হাত বাড়াতে কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ কেটে যায়, আমার একটু তন্দ্রার মতো আসে। কিন্তু অকস্মাৎ ফের চটকা ভাঙে, চমকে উঠে বসি, শুনতে থাকি—চটাচট চচ্চড় চটাপট—চট। অন্ধকার চৌচির করে কেবল ওই শব্দ, আর কিছু না, এবং বেশ জোর জোর।

তবে কি—তবে কি........? ভয়ে আমার হাত পা গুটিয়ে আসে। তাহলে কি তাল বেতালেই আমার কাকাকে ধরে পিটতে শুরু করে দিয়েছে না কি? কিংবা ভূতপ্রেতরাই কাকাকে বেওয়ারিশ পেয়ে মজা করে হাতের সুখ করে নিচ্ছে? যাই হোক, কোনোটাই



ভালো কথা নয়।

আমি মরিয়া হয়ে ডাকতে শুরু করি—'কাকা কাকা কাকা—!'

'বসতে দিচ্ছে নারে—'

আওয়াজ পেয়ে আশ্বাস পাই। তবু যা হোক, আমার কাকান্ত ঘটেনি। —ও—ও—ও কি—কি—কীসের শব্দ?'

আমার গলা কাঁপে।

'আর বলিস না।' করুণ কণ্ঠের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে দারুণ দীর্ঘনিশ্বাস। —'একদম বসতে দিচ্ছে না।'

'কিসে বসতে দিচ্ছে না? ভূতে?'

'উহুঁ!'

'ডাকিনী-যোগিনী?'

'উহুঁ হুঁ।'

'তবে কি তাল-বেতাল?'

'নাঃ। মশায়। মশার ভারী উৎপাত রে।'

'ওঃ, তাই বল।' মশার কথা শুনে ভরসা পাই। তাহলে অন্য কিছু, মারাত্মক কিছু নয়। 'তোমার চাদর মুড়ি দিয়েছিলাম বলে বুঝতে পারিনি এতক্ষণ। তাইতো। কী রকম মশার ডাক শুনছ কাকা, —পন্-পন্- পন্—। কী ডাকরে বাবা। এরাই তোমার সেই ডাকিনি নয়তো?'

'কে জানে।' কাকার বিরক্তির তীক্ষ্ণতায় অন্ধকার বিদীর্ণ হয়, কিন্তু ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলক্ষণ টের পাই, আমার গায়ের সঙ্গে যোগ হওয়া মাত্রই।

আবার চটাপট শুরু হয়। মনের সুখে গালে মুখে হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে চড়াতে থাকেন কাকা।

চপেটাঘাত ছাড়া মশকবধের আর কী উপায় আছে? অতঃপর কেবল ওই চড় চাপড়ই চলতে থাকে। এবং বেশ সশব্দেই। তপস্যা ওঁর মাথায় উঠে যায়।

কিন্তু মশার সঙ্গে মারামারিতে পারবেন কেন কাকা? প্রাণী হিসেবে ওরা খেচর, কাকা নিতান্তই স্থলচর। ওদের হল আকাশ পথে লড়াই আর কাকার ভূমিষ্ঠ হয়ে। তাছাড়া কাকার একাধারে দুপক্ষকে আক্রমণ—মশাকে এবং কাকাকে। কাজেই, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেই—কাবু হয়ে পড়েন কাকাবাবু। রণে ক্ষান্ত হয় তাঁকে পরাজয়-স্বীকার করতে হয়। এই ঘোরতর সংগ্রামে, মশাদের মধ্যে নিহতদের তালিকা আমি দিতে পারব না—তবে আহতদের মধ্যে একজনের নাম আমি বলতে পারি—খোদ আমার খুড়োমশাই।

তাঁর বৈরাগ্য এসে যায় তপস্যায়। এমন অবস্থায় কার বা না আসে? তিনি বলেন—'দে আমার কাপড়জামা। গায়ের চাদরটাও দে। সিদ্ধিলাভ মাথায় থাক। কানে আমার কাজ নেই আর, ঘুমিয়ে বাঁচি।'

বিছানা, বালিশ, পাশ বালিশ, মশারি সবই ফিরিয়ে দিতে হয়। অবিলম্বেই লম্বা হন কাকা! মাটিতে শুয়ে পরনের কাপড়কেই লেপে পরিণত করি, কি আর করব? তারই তলায় গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয় আমায়। লেপের প্রলেপে—যতটুকু বাঁচোয়া!

অমন ভয়ঙ্কর রাতও প্রভাতহয়। আবার সূর্যের মুখ দেখি আমরা। ইতস্তত তাকাতেই চোখে পড়ে—সেই ঘোড়া! একটু দূরে উবু হয়ে বসে আছে। অদ্ভুত দৃশ্য! ঘোড়াকে এভাবে বসে থাকতে জীবনে কখনো দেখিনি। সারারাত তপস্যা করছিল না তো?

কাকা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন—'যাক বাঁচিয়েছে। এতখানি পথ আর হেঁটে ফিরতে হবে না। বর না হোক, অবর তো পাওয়া গেল আপাতত।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওঁর উৎসাহ নিভে আসে। গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা স্মরণ করে উনি দমে যান। আমি কাকাকে অভয় দিই—'সমস্ত রাত মশার কামড় খেয়ে সায়েস্তা হয়ে এসেছে ব্যাটা। দাঁড়াবার ওর খ্যামতা নেই, বসে পড়েছে দেখছ না?'

'তাই বটে!' কাকা ঈষৎ চাঙ্গা হন, 'তাহলে ঠুকঠুক করে বেশ নিয়ে যেতে পারবে। কি বলিস তুই?'

'নিশ্চয়। আর আমার তো সাইকেলই আছে'—আমি জানাই।

কাছে গিয়ে ওকে উঠতে বলি—ব্যাটার কোনো গ্রাহ্যই নেই। কাকা কান মলে দেন। নিজের নয়, ঘোড়ার; তবুও সে নট-নড়ন-চড়ন। গালে ওর আমি থাবড়া মারি, তথাপি নির্ভ্রুক্ষেপ। অগত্যা আমি আর কাকা দুজনে মিলে ল্যাজ ধরে ওকে টেনে তুলতে যাই। আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টায় অবশেষে ও খাড়া হয়।

'সারারাত চুপচাপ ছিল ঘোড়াটা। এত কাছেই ছিল অথচ! এর কারণ কিরে শিবু?' কাকা জিজ্ঞাসা করেন, 'এতো ভালো লক্ষণ নয়।'

'জপ করছিল বোধহয়।' আমি ব্যক্ত করি, 'সমাধি হয়ে গেছে দেখছ না।'

'তাই হবে। স্থানমাহাত্ম্য যাবে কোথায়?' কাকার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, —'এ তো সিদ্ধিলাভেরই জায়গা, তবে হ্যাঁ—যদি না তুলে দেয়—'

সিদ্ধিলাভের কথায় কাকার কানের দিকে তাকাই। কানটা যথাস্থানেই নেই। কাকার সিদ্ধিলাভ আর হল না এ-যাত্রা! আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

কাকা ঘোড়ার পিঠে চাপেন। ঘোড়ার চলবার উদ্যোগই নেই, সেই পুরোনো বদ-অভ্যাস। আমাদের ছিপটি মারার সাহস হয় না। কালকের অত ঘোরাঘুরির পর—আবার? অনেক করে ওকে বোঝাই। বাপু বাছা বলে ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিই ওর।

ও কেবল জবাব দেয় চিঁহিঁহিঁ।

এই ভাবে বহুক্ষণ আমাদের কথোপকথনের পর ও রাজি হয়। হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু এ আবার কি বদ খেয়াল? পেছন দিকে হাঁটতে থাকে! হ্যাঁ, সটান পেছনেই।

গতিক দেখে কাকা তো প্রায় কেঁদে ফেলেন। —'কান তো গেছেই, এবার কি ঘোড়ার পাল্লায় পড়ে প্রাণটাও বেঘোরে যাবে নাকিরে শিবু?'

আমিও ভাবিত হই কিন্তু ঘাবড়াতে দিই না কাকাকে। বলি—'ভয় খেয়ো না কাকা। বুঝতে পেরেছি কী হয়েছে। আর কিছু না, ঘোড়াটা সিদ্ধিলাভ করেছে। একে স্থানমাহাত্ম্য, তার উপরে কাল সারা রাত ধরে ঘোরতর তপস্যা—যাবে কোথায়? তার ফলেই তোমার ঘোড়ার এই কাণ্ড।'

'সিদ্ধিলাভ করেছে কি করে বুঝলি?' কাকার কণ্ঠ করুণতর হয়।

'এ আর বুঝছ না কাকা? যারা সিদ্ধিলাভ করে তারা কি আমাদের মতো হবে? তাহলে সিদ্ধ পুরুষে আর আমাদের মতো কাঁচা পুরুষে তফাত কি? আমরা সামনে দিয়ে হাঁটি, সিদ্ধপুরুষ হাঁটবেন পেছনের দিকে। সিদ্ধিলাভ করলে পেছনে হাঁটতেই হবে। সিদ্ধপুরুষদের চালচলনই আলাদা। সিদ্ধ ঘোড়ারও।'

আমার ব্যাখ্যা শুনে কাকার চোখ বড়ো হয়। তিনি তখন জাঁকিয়ে বসেন বাহনের পিঠে—'যাক বাঁচা গেছে, সিদ্ধিলাভের ফাঁড়াটা ঘোড়ার উপর দিয়েই গেছে। আমার হলে কি রক্ষা ছিল? এই বপু নিয়ে এতো বয়সে পেছনে হাঁটতে হলেই তো গেছলাম! অমন সিদ্ধি আমার পোষাত না বাপু!'

আমি আন্দাজী রামপুরহাটের দিকনির্ণয় করে নিয়ে সেইমুখো ঘোড়াটার পেছন ফেরাই। কাকাও ঘুরে বসেন। বলেন—'দে, ল্যাজটা তুলে দে আমার হাতে। ওর ল্যাজকেই লাগাম করব আজ। সিদ্ধপুরুষের আবার ল্যাজ কেন?'

ল্যাজ হস্তগত করে অনুরোধ করেন কাকা—'এবার হাঁটো প্রভু!' অনেকটা গানের সুরের মতো করে। ভজন গানের মতন।

আশ্চর্য, বলা মাত্রই ঘোড়াটা চলতে শুরু করে। বেশ ধীর চতুষ্পদক্ষেপে। রাগ-হিংসা-ক্ষোভ-দুঃখ—চালাকি চতুরতা কোনো কিছুর বালাই নেই ওর ব্যবহারে। শুধু সিদ্ধ নয়, এ সমস্তই সুসিদ্ধ হওয়ার লক্ষণ।

ঘোড়া চলতে থাকে। পেছন ফিরিয়ে সামনের দিকে, কিংবা মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে। যেটাই বল।

আমিও সাইকেল চালিয়ে যাই। ওর পেছন পেছন কিংবা ওর মুখোমুখিই।

বেতন-নিবারক বিছানা

এই নাটিকার পাত্ররা

মিহির	প্রাইভেট টিউটর
সুনীল	মিহিরের বন্ধু
মন্টু	মিহিরের ছাত্র

মন্টুর বাবা
মন্টুদের চাকর ছোট্টুলাল

প্রথম দৃশ্য

মিহিরের মেস

[মিহির এবং সুনীল চা-পান করিতেছে। সুনীলের হাতে একখানা দৈনিক আনন্দবাজার—চা-পান করিবার ফাঁকে ফাঁকে সুনীল পড়িতেছে। সকালবেলা।]

মিহির : দূর ভাই। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কবে থেকে বি-এ. পাস করে বসে আছি। অথচ চাকরির কোনো পাত্তাই নেই—।

সুনীল : কেন, আপাতত এই টুইশানিটা করনা কেন? ভালো টুইশানি বলেই তো বোধ হচ্ছে। আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে শুনবি? পড়ছি শোন—

কর্মখালি

কোনো সম্ভ্রান্ত-পরিবারে বনেদি গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্যে একজন বি-এ. পাস গৃহশিক্ষক আবশ্যক—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবেক। তাহা ছাড়া, বেতন মাসিক ত্রিশটাকা। আবেদন করুন।

মিহির : (শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল)। কাদের এই করুণ আবেদন? ঠিকানাটা বল তো সুনীল।

সুনীল : কাছেই রে। খুব বেশিদূর না। এই শ্যামবাজারেই। কাগজেই দিয়েছে ঠিকানা—পড়ে দ্যাখ। [কাগজখানা দিল।]

মিহির : (পড়িয়া তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল)। আমি চললাম এক্ষুনি।

সুনীল : এত ব্যস্ত কেন রে? এত তাড়াতাড়ি কীসের?

মিহির ঃ না ভাই, চট করে যাই। বাগিয়ে ফেলিগে আগেভাগেই। কি জানি, এতক্ষণে হয়তো দেড়হাজার টিউটর গিয়ে ভিড়ে গেছে! ভিড় ঠেলে ঢুকতেই পারব কিনা, কে জানে।

সুনীল ঃ তাহলে যা, আর দেরি করিসনে।

মিহির ঃ এইরকম একটা সুযোগ খুঁজছিলাম ভাই! আপাতত এরকম একটা জুটলেও তো বেঁচে যাই। খাওয়া-থাকাটাতো অমনি হবে। তাছাড়া মাস-মাস ত্রিশ টাকা —কিছু-কিছু বাড়িতেও পাঠাতে পারব। এম-এ. টাও পড়া চলবে; সেই সঙ্গে সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ—এসব দেখার মতো পকেট-খরচারও অভাব হবে না।

সুনীল ঃ মন্দ কি?

মিহির ঃ (ট্রাঙ্ক খুলিয়া বি-এ. পাসের সার্টিফিকেটখানা বাহির করিল)। এটাও নিয়ে যাই, কি বলিস? এটা আমার বি.এ. পাসের সার্টিফিকেট—দেখতে চায় যদি!

সুনীল ঃ না দেখতে চাইলেও গায়ে পড়ে দেখিয়ে দিবি, ছাড়িসনে। কিন্তু আমার একটা খটকা লাগছে ভাই! এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন আমি দেখেছিলাম। এই আনন্দবাজারেই দেখেছি যেন। প্রায়ই দেখি এই বিজ্ঞাপনটা, বেশ মনে পড়ছে আমার।

মিহির ঃ খুব সম্ভব ছেলেটি—ছাত্রটি একটি গবাকান্ত। প্রাইভেট টিউটর টিকতে পারে না তাই। বেতন ভারী দেখে এগোয় বটে, কিন্তু ছেলে আবার তার চেয়ে ভারী দেখে ভয় খেয়ে পেছিয়ে আসে।

সুনীল ঃ তাই হবে হয়তো।

মিহির ঃ আমি কিন্তু পেছোচ্ছি না বাবা! প্রাণপণে পড়াব ছেলেটাকে, পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয়, তবুও। ত্রিশটাকা খুব কম টাকা নয়, তার জন্যে গাধা পিটিয়ে মানুষ করা বেশি কথা কি, মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। যদি তাঁর গাধা ছেলেকে মানুষ কিংবা মানুষ ছেলেকে গাধা বানাতে না পারি—তাহলে অতগুলো টাকা ভদ্রলোক কি মাগনা দিচ্ছেন? [সুনীল এবং মিহির বাহির হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাহিরের ঘরে বসিয়া মন্টুর বাবা দৈনিক আনন্দবাজার দেখিতেছেন। মন্টু প্রবেশ করিল।]

মন্টু ঃ বাবা, আমার নতুন মাস্টারমশাই—

মন্টুর বাবা ঃ [সাগ্রহে] এসেছে? এসেছেন? নিয়ে আয়।

[মন্টুর প্রস্থান এবং মিহিরকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।]

মিহির ঃ আজকের আনন্দবাজারে আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমি আসছি।

মন্টুর বাবা ঃ বেশ তো! বেশ তো! আসবেই তো! এসে ভালোই করেছ। মন্দ কি!

মিহির ঃ বছর-তিনেক হল আমি বি.এ. পাস করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাটা দেখবেন না কি?

[সার্টিফিকেটখানা পকেট হইতে বাহির করিতে গেল।]

মন্টুর বাবা ঃ থাক থাক—সার্টিফিকেট দেখে আর কি হবে? ওসব তো মামুলি ব্যাপার! তার চেয়ে তোমার শরীরটাই দেখি আগে। স্বাস্থ্যই হল গিয়ে আসল। স্বাস্থ্যই যার নেই, সে আবার ছেলে পড়াবে কি? তোমাকেই আগে দেখা দরকার—তুমিই হচ্ছ তোমার সার্টিফিকেট।

মিহির ঃ (আপ্যায়িত হইয়া)। আজ্ঞে, যা বলেন আপনি—তা আজ্ঞে, বলতে কি, বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়!

মন্টুর বাবা ঃ তোমার জামাটা একবার খোল তাহলে।

মিহির ঃ (একটু ইতস্তত করে)—জামাটা—গায়ের এই জামাটা— এই জামাটা খুলতে বলছেন?

মন্টুর বাবা ঃ তোমার আপত্তি আছে?

মিহির ঃ না-না!— [খুলিতে লাগিল।]

মন্টুর বাবা ঃ দাঁড়াও, আমার চশমাটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

[প্রস্থান।]

মিহির ঃ তোমার বাবার খবর-কাগজ পড়তে চশমার দরকার হয় না, অথচ মাস্টার-দেখবার বেলায়—

মন্টু ঃ আপনি জামা খুলতে ভয় খাচ্ছেন নাকি স্যার?

মিহির ঃ না-না;ভয় কীসের? ত্রিশটাকার জন্যে জামা খোলা কেন, খোলাখুলি যদি জামাই হতে হয়, তাতেও আমি গররাজি নই।

[চশমা চোখে দিয়া মন্টুর বাবার প্রবেশ—তিনি গম্ভীরমুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিহিরকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

মন্টুর বাবা ঃ তুমি এক্সারসাইজ কর?

মিহির ঃ এক-আধটু।

মন্টুর বাবা ঃ বেশ-বেশ

[বেশ-একটু তাঁকে ভাবিত দেখা যায়।]

মিহির ঃ রীতিমতোই করতাম এককালে, কিন্তু এখন আর ততটা না।

মন্টুর বাবা ঃ আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়?

মিহির ঃ (সোৎসুক অপেক্ষায়) আমার সার্টিফিকেট দেখতে চাইছেন তো? তা দেখুন না! (নিজের পকেটে হাত পুরিয়া) বি-এ. তে আমি ডিস্টিংকশন্ পেয়েছি। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

মন্টুর বাবা ঃ না-না, সার্টিফিকেট নয়। সার্টিফিকেট থাক—তোমার ওজন কত?

মিহির ঃ ওজন? (আকাশ থেকে পড়ে) তা প্রায় দু'মণের কাছাকাছি।

মন্টুর বাবা : বেশ-বেশ। কিছুদিন তুমি টিকতে পারবে আশা হয়। কি বলিস মণ্টু, তোর এ-মাস্টারমশাই বেশ কিছুদিন টিকে যাবে, কি মনে হয় তোর?

মন্টু : হ্যাঁ বাবা! এ মাস্টারমশায়ের গায়ে অনেক রক্ত আছে।

মন্টুর বাবা : কিছুদিন টেকা ভালো, খুবই ভালো, বিশেষ আশার কথাই, কিন্তু বেশ-কিছুদিন টেকাটাই হলো গিয়ে আশঙ্কার। যাক, সবই তো ভগবানের হাত—

মন্টু : (বাধা দিয়া) ভগবানের হাত নয় বাবা, ভগবানের মার; ভগবান ওরফে ছারপোকার—

মন্টুর বাবা : চুপ! কথার উপর কথা কস কেন? কিচ্ছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না তোর? হ্যাঁ, দ্যাখো বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে একটু এটিকেটও শেখাতে হবে এটিকে, পিতামাতা গুরুজনদের কথার উপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এইসব মহৎ দোষ সারাতে হবে ওর। বেশ, আজ থেকেই ভর্তি হলে তুমি। ত্রিশটাকাই বেতন হল, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা শর্ত আছে। পুরো একমাস না পড়ালে, এমনকি একদিন কম হলেও একটা টাকাও তুমি পাবে না।

মিহির : যে আজ্ঞে।



মন্টুর ঃ পাঁচ-দশদিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটর চলে গেছে। সেরকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না; সেকথা আমি আগেই বলে রাখছি।

মন্টু ঃ একজন কেবল বাবা, উনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন—আরেকটা দিন যদি কোনোরকমে থাকতে পারতেন, কিন্তু—কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

মন্টুর বাবা ঃ থাম তুই! সবই ভগবানের লীলা!

মন্টু ঃ ভগবানের নয় বাবা—ছার—

মন্টুর বাবা ঃ চুপ কর। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসো গে। আজ সন্ধে থেকেই ওকে পড়াবে। মন্টু, ছোট্টুলালকে ডাক।

মন্টু ঃ ছোট্টু। ও ছোট্টুলাল। ওহে বাপু ছোট্টুলাল। [ছোট্টুলাল আসিল।]

ছোট্টুলাল ঃ হামাকে বোলাচ্ছেন মালিক?

মন্টুর বাবা ঃ তা একটু বোলাচ্ছি বইকি। তুমি এতক্ষণ কি করছিলে? বাজারের পয়সা ফাঁক করে আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছিলে বুঝি?

ছোট্টুলাল ঃ হামি কেন বোলতে যাব হুজুর! হামি কি হাপনাকে বোলাতে পারি? হাপনার মাথা বোলাতে পারি হামি?

মন্টুর বাবা ঃ তা কেন বলবে? তা না হয় বলনা। এখন যাও তো, মন্টুর এই নতুন মাস্টারবাবুকে তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দাও! শোবার ঘরটা। আর বুঝেছ, বেতন-নিবারকে—বেতন-নিবারক, বুঝেছ?

ছোট্টুলাল ঃ জানে, জানে, বৈতন-নির্বাক, বুঝছি, হুজুর। সমঝেছি আলবাৎ।

মন্টুর বাবা ঃ যাও, সেই বেতন-নিবারক মাস্টারমশায়ের বিছানাটা পেড়েদাওগে।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্টুদের বাড়িতে মিহিরের শোবার ঘর

[ঘরের একধারে একখানা খাট, তাতেই মিহিরের শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-ওলা, তার উপর তোষক, তার ওপরে ধবধব করছে সদ্য পাট-ভাঙা বোম্বাই-চাদর। ঘরের একধারে একটা ড্রেসিং-টেবিল—পুরোনো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটা ছোটো বুককেসও আছে এককোণে—তার উপরে বই-টই সব সাজানো। আরেক ধারে পড়াশোনার টেবিল, তার দু'পাশে দুটো চেয়ার—ঘরের মধ্যে মিহির একা। দেয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে আটটা।]

মিহির ঃ অদ্ভুত! অদ্ভুত! সত্যি ভারী অদ্ভুত! এই ত্রিশটাকা! এর চেয়ে অদ্ভুত আর নেই। মাস গেলেই এই ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা পাওয়া। মাসের পয়লা তারিখেই পেয়ে যাওয়া! সত্যি ভারী বিস্ময়কর! অ্যাদ্দিন তো মাস গেলে টাকা দিয়েই এসেছি—দিয়েই এসেছি চিরকাল—একগোছা করে টাকা—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজ-ওয়ালার টাকা, চায়ের দোকানের ধার-কাটা—মাস-কাবার মানে—আমি

সাবাড়। কিন্তু এবার, এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম আমি নিজে টাকা পাব। একেবারে পরের কাছ থেকে পাব। মাস গেলেই পেয়ে যাব। মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই— বাঃ। বাঃ।

[জিনিসপত্রের টুকিটাকি সমস্ত গোছাইতে লাগিল।]

ঘরখানিও ভালোই দিয়েছে আমায়! কেমন সাজানো-গোছানো পরিপাটি ঘর একখানা! চমৎকার! ড্রেসিং-টেবিলটা পুরোনো বটে, কিন্তু পরিষ্কার! একটা বুককেসও রয়েছে—এতেই আমার বই-টই সব থাকবে।

[সেই বুককেসে নিজের বইগুলি সাজাইতে লাগিল।]

আর এই টেবিলের ধারে, এই চেয়ারটিতে বসে—দিব্যি হেলান দিয়ে বসে আমার ছাত্র শ্রীমান মন্টুকে আমি পড়াব। বাঃ! বারে!

[টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারটায় একবার বসিয়া লইল, বসিয়া বসিয়া বুককেসের গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইতে লাগিল।]

আর ওই খাটখানাই বা কী খাসা! কী চমৎকার গদি! তার উপরে ঐ তোষক—তার ওপরে আবার ধবধবে বোম্বাই-চাদর বিছানো! কী তোফা বিছানা একখান। সোনায় সোহাগা—গোদের উপর বিষফোড়া যেন রে! হাতির গলায় গলগণ্ড! সত্যি, ভারী ভদ্রলোক এরা—অতিশয় ভদ্রলোক! না, ভদ্রলোক নয়, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়, এদের মহত্ত্বের মানহানি হয়ে যায়— এরা মহৎ—অতিশয় মহৎ—অত্যন্ত, অতীব মহৎ!

জীবনে কখনো গদিমোড়া খাটে গড়াইনি। এই ফাঁকে একটু শুয়ে নেয়া যাক না! সাড়ে আটটা বাজতে চলল, মন্টু এখনও পড়তে আসছে না কেন? এখনও কি খেলাধুলা করে ফেরেনি নাকি? না, আজ প্রথম দিনটায় সে পড়তে বসবে না? যাক, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কী দরকার—এমন খাটটায় একটু গড়িয়ে নিই এখন—গড়াগড়ি দিয়ে নিই খানিক! আরাম করে একটু লম্বা হওয়া যাক আগে!

[বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।]

আহা-হা! আহাঃ-হাঃ! হাঃ-হাঃ-আ! আহা-রে!

[সাঁতার কাটিতে লাগিল বিছানায়।]

আঃ, কী নরম! কী উপাদেয়! আজ খুব আরামে ঘুমোনো যাবে। খেয়ে-দেয়ে—খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম তো চুকিয়েই এসেছি—এখন মন্টুটা এলে হয়! আজ আর বেশি পড়ানো না, একটু নমো-নমো করে পড়িয়েই ভাগিয়ে দেব—তারপর ঘুম! তোফা একখানা একটানা ঘুম! সেই কাল সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত!

[মন্টু বই-পত্র লইয়া ঢুকিল।]

মিহির : এস, এই খাটে বসেই পড়াই তোমায়।

মন্টু : না স্যার, আমি ও খাটে বসব না।

মিহির : (বিস্মিত হইয়া) কেন? এমন নরম খাট! এতে বসবে না কেন? এমন—

মন্টু : (আমতা আমতা করিয়া) না, সেজন্যে নয়—আপনি মাস্টারমশাই, গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।

মিহির : ওঃ, তাই। তা চলো, চেয়ারেই বসিগে।

[ক্ষুন্নমনে খাট ছাড়িয়া চেয়ারে গিয়া বসিল।]

কিন্তু যাই বলো, বেশ বিছানাটি তোমাদের! ভারী নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে। কই দেখি, দেখি তোমার বই।

[বই লইয়া]

Beans! বিনস মানে জানো?

মন্টু : (ঘাড় নাড়িয়া) না।

মিহির : Beans মানে বরবটি। বরবটি একরকমের সবজি—তার তরকারি হয়। আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেনটেন্স বানাও দেখি। পারবে?

মন্টু : (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ। (তারপর অনেক ভাবিয়া এবং আপনমনে অনেক ঘাড় নাড়িয়া) I had been there!

মিহির : (অত্যন্ত অবাক) সে কি? সে আবার কি? উঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কেন তোমার মাস্টাররা টিকতে পারে না। কেন সবাই দুদ্দাড় করে পালিয়ে যায়। আচ্ছা, এই যে সেনটেন্সটা করলে, এর মানে কী হলো?

মন্টু : (সেও কম বিস্মিত নয়)। মানে? এর মানে তো খুব সোজা। বুঝতে পারছেন না আপনি। এর মানে হচ্ছে, সেখানে আমার বরবটি ছিল। আই হ্যাড বিন দেয়ার—আমার ছিল বরবটি সেখানে—সেইটাই গুরিয়ে ভালো বাংলায় হবে—'সেখানে আমার—'।

মিহির : থামো, থামো, আর বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না তোমায়। তোমার ওই ব্যাখ্যানাতেই টের পেয়েছি। 'আই হ্যাড বিন দেয়ার' মানে—'আমি সেখানে ছিলাম' বুঝেছ?

মন্টু : (আকাশ থেকে পড়িয়া) তবে যে আপনি বললেন—বিন্ মানে বরবটি? তাহলে—আমি সেখানে বরবটি ছিলাম বলুন।

মিহির : (সন্দিগ্ধভাবে) খুব সম্ভব তাই তুমি ছিলে। Been আর Bean কি এক জিনিস হল? একটা বি-ডবল ই-এন—আরেকটা বি ই-এ-এন! বানানের তফাত দেখছ না? এ-been হল গিয়ে be ধাতুর form—

মন্টু : (বাধা দিয়া) হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি; আর—আর বলতে হবে না আমাকে। অর্থাৎ কি না এ-been হল মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি, আর ফর্ম মানে চেহারা। এ আমি জানি আমায় বলতে হবে না, জানি আমি।

মিহির : জানো তুমি? (বিস্ময়ে হতবাক)।

মন্টু : এই আজ সকালেই তো জেনেছি। আপনি তখন চলে গেলে বাবা বললেন কিনা, 'তোর নতুন মাস্টারমশায়ের বেশ ফর্ম—তখনই জেনে নিলাম।

মিহির : আমার চেহারা মৌমাছির মতো? জানতাম না তো! কিন্তু সে কথা যাক, যে bean মানে বরবটি, তা দিয়ে সেনটেন্স হবে এইরকম— 'Peasants grow beans' অর্থাৎ 'চাষিরা বরবটি ফলায়'। অর্থাৎ, চাষিরা বরবটি উৎপন্ন করে, বরবটির চাষ করে। বুঝলে এবার?

মন্টু : (ভয়ানকভাবে ঘাড় নাড়ে)। বুঝেছি।

মিহির : অতটা নেড়ো না, ঘাড় ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মতো। বেশ, বুঝেছ যদি, এইরকম আর একটা সেনটেন্স বানাও দেখি বিনস দিয়ে।

[অনেকক্ষণ ধরে মন্টুর মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে বিশেষ কিছু বের হয় না।]

মিহির : (হতাশ হইয়া) পারলে না? এই ধরো, যেমন—Our cook cooks beans—আমাদের ঠাকুর বরবটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক কথাটার দুরকম ইউজ পাচ্ছ, একটা নাউন, আরেকটা ভার্ব। আচ্ছা আরেকটা সেনটেন্স করো দেখি।

মন্টু : By hook or crook।

মিহির : তার মানে?

মন্টু : তার মানে (একটু ভেবে) তার মানে আমি বলতে পারব না—আপনি কুক দিয়ে একটা সেনটেন্স করতে বললেন যে! তাই আমি করলাম! করে দিলাম তাই তো!

মিহির : করে দিলে? বাই হুক অর ক্রুক?—

মন্টু : যদি আপনি মানে জানতে চান, বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসতে পারি। বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। হুঁকো খাওয়ার কথা নয়তো স্যার? জেনে আসব?

মিহির : আমি তোমাকে বিনস দিয়ে সেনটেন্স করতে বললাম না?

মন্টু : ও। বিনস দিয়ে? বিনস? তা বললেই তো হয়। এ-তো খুব সোজা—কত সোজা আরো। বিনস দিয়ে? তাই তো? বিনস—বিনস—এই যে! এক্ষুনি বলে দিচ্ছি! 'We are all human beans'!

মিহির : অ্যাঁ, বলো কি? আমরা সবাই মানুষ বরবটি? তাই নাকি?

মন্টু : কেন, বাবাকে যে অনেকবার বলতে শুনেছি—যে হিউম্যান বিনস!

মিহির : ওঃ, এখন বুঝতে পারছি—

মন্টু : কী বুঝতে পারছেন স্যার?

মিহির : বুঝতে পারছি—কেন তোমার মাস্টাররা টেকে না—কেন তারা ফাঁক পেলেই উধাও হয়। বেতন ফেলে পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মন্টু : কেন স্যার? বলুন না স্যার, কেন?

মিহির : কেন আর? দিনের পর দিন—মাসের পর মাস তোমাকেই পড়াতে হবে তো? কি করে টিকবে? পড়াতেই আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়।

মন্টু : উঁহুঁ, সেজন্যে নয়—সেজন্যে তারা পালায় না।

মিহির : রোজই যদি দুবেলা এরকম ধস্তাধস্তি করে পড়াতে হয়, তাহলেই তো আমি গেছি। তাহলে—তাহলে আমাকেও পালাতে হবে দেখছি।

মন্টু : আপনিও পালাবেন?

মিহির : পালাব না তো কি করব? পড়ে পড়ে তোমার মার খাব নাকি? তাহলে আমিও টুইশানির মায়া ছেড়ে, মাসের পয়লা তারিখের প্রলোভন অতিক্রম করে, এমন কি, তোমাদের অমন নরম গদির মায়া কাটিয়ে—

মন্টু : নরম গদি! যা বলেছেন স্যার! মারাত্মক নরম। গদি না বলে গদাও বলতে পারেন! বাবা তো গদাই বলেন। বলেন—'এই গদাঘাত সওয়া সবার কম্মো না'।

মিহির : নাঃ, সেটি হচ্ছে না। কিছুতেই আমি পালাচ্ছিনে। সে তুমি দেখে নিয়ো। একজন অবিশ্যি ঊনত্রিশ দিন অব্দি টিকেছিল—আর একদিন টিকতে পারলেই ত্রিশটাকা পেয়ে যেত, ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা নগদ, কিন্তু একটা দিনের জন্যে একটা টাকাও পেলো না। আহা, বেচারি! তার বোধহয় শুধু পাগল হতেই বাকি ছিল, কেবল—

মন্টু : হ্যাঁ স্যার, পাগল হয়ে যাবার ভয়েই পালিয়েছে।

মিহির : আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত! কিংবা পাগল হয়েই পালিয়ে গেছে কিনা, তাই-বা কে জানে!

মন্টু : হ্যাঁ সার, তাও হতে পারে।

মিহির : তাই সম্ভব। নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোনো সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো?

মন্টু : আপনিই বলুন না!

মিহির : বলব কি? ভাবতেই আমার বুক কাঁপছে! হৃৎকম্প হচ্ছে আমার—কী সর্বনাশ!—

মন্টু : কেন পালায় জানেন? বলব? আমাকে পড়াবার জন্যে নয়, সেজন্যে নয় মোটেই। গদাঘাত সহ্য করতে পারে না বলেই পালায়।

মিহির : গদাঘাতই বটে। একখানি গদাই বইকি তুমি! পড়াশোনার গদাই-লস্কর! আমি কিন্তু বাপু, চাকরিও ছাড়ব না, আর পাগলও হব না, সে তুমি ঠিক জেনে রেখো। সে তুমি যতই বল, আর যাই বল, পালাচ্ছিনে

আমি। আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। যা খুশি পড়, পড় বল ছাই নাই বল, পড় ছাই নাই পড়—বোঝ ভাল, না বোঝ নাই বোঝ—আমি কেবল বই খুলে পড়িয়ে যাব—এইমাত্র। তোমাকে নিয়ে মোটেই আমি মাথা ঘামাব না। আর মাথাই যদি না ঘামাই, তবে পাগল হব কি করে?

মন্টু : হবেন স্যার, হবেন—ভয় নেই। হতেই হবে। যা এক-খানা বেতন-নিবারক রয়েছেন! বলব? না-না বলব না; কিছুতেই না—বললে বাবা মারবে! মেরে তক্তা করবে আমাকে—

[মন্টুর রহস্যময় হাসি।]

মিহির : নাঃ, আমার কোনো ভয় নেই। নির্বিকারভাবে আমি পড়িয়ে যাব।

মন্টু : (হঠাৎ জিজ্ঞেস করে) আচ্ছা, বলুন তো স্যার—বলব? একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

মিহির : কর, আমি তো নির্বিকার। নির্বিকার—নিরাসক্ত— নিস্পৃহ!

মন্টু : বেতন-নিবারক বিছানা—এর ইংরিজি কি হবে স্যার— জানেন?

মিহির : বেতন-নিবারক বিছানা! সে আবার কি?

মন্টু : সে একটা জিনিস বলুন না স্যার, ইংরিজিটা জেনে রাখা দরকার।

মিহির : ওরকম কোনো জিনিস হতেই পারে না।

মন্টু : হতে পারে না কি, হয়েই রয়েছে। আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরিজি। সেই কথাই বলুন!



মিহির : ওর ইংরিজি হবে 'পে-সেভিং বেড (pay-saving bed)।'

মন্টু : (সন্দিগ্ধভাবে)। উঁহুঁ, হল না তো। হল না বোধহয়। সেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টুলাল আমাদের চাকর, সে বেতন কামায়, বেতন-নিবারককে শোয় না তো সে। তাকে অনেকবার অনেক করে বলা হয়েছে, কিছুতেই সে শোয় না। সেইজন্যেই তো এ চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারী দুঃখ করেন তাই। আগে আমাদের কত চাকর আসত—যেত—

মিহির : কী সব হেঁয়ালি বকছ? তোমারও মাথা খারাপ নাকি? কেন, তোমাকে তো কাউকে পড়াতে হয় না—তোমার নিজেকেই তো নয়ই। তবে? তবে কেন?

মন্টু : আমার মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ! বেতন-নিবারক! হাঃ হাঃ হাঃ!

মিহির : নাঃ, কিচ্ছু ভাবব না। তোমার মাথা খারাপ হোক ছাই নাই হোক। প্রতিজ্ঞাই করেছি, মোটেই আর মাথা ঘামাব না তোমাদের ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারবো না—পাগল হয়ে যাবো নির্ঘাত। একজন ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল—আর একটা দিন টিকলেই——উঃ! কর্‌করে ত্রিশটা টাকা—

মন্টু : ঝন্‌ঝনে তিরিশ! ঠনাট্‌ঠন্ তিরিশ!

মিহির : যা, শুতে যাও। আজ আর পড়ানো নয়! অনেক পড়ানো গেল আজ। মাথা ধরে গেল। মাথা কেন, সারা গা-ই ধরে গেছে! আজ এই পর্যন্তই। যাও, খেয়ে দেয়ে ঘুমোওগে।

মন্টু : (বই-পত্র লইয়া উঠিল)। আপনি তো খাবেন না আজ? খেয়েই এসেছেন। আপনিও ঘুমোন স্যার, তাহলে। মন দিয়ে ঘুমোন।

[মন্টুর প্রস্থান।]

মিহির : হ্যাঁ, ঘুমোব বইকি! ঘুমোতেই তো হবে। তোফা একখানা ঘুম দিতে হবে এখন! চমৎকার এই নরম গদির বিছানায়! দু-দুবার আজ বৌবাজার আর বাগবাজার—কালীঘাট আর শ্যামবাজার করতে হয়েছে—অনেক হাঁটা-চলা গেছে—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে! যাই, শুইগে! [আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল।]

মিহির : আঃ, কি নরম! কী আরাম!

[একমিনিট চুপচাপ—তারপরেই ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ শোনা গেল মিহিরের—মিহির তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ঝটপট আলো জ্বালিল।]

মিহির : অ্যাঁ! কিসে কামড়ালো আমায়? সারাগায়ে হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিল যেন একসঙ্গে! কী—কী—কী ব্যাপার?

[টেবল ল্যাম্প্ লইয়া বিছানার নিকট গেল।]

মিহির : ও বাবা! এ যে ছারপোকা দেখছি! সর্বনাশ! এ যে কাতারে-কাতারে হাজারে-হাজারে ছারপোকা! সারা বিছানাতেই! একটি দুটি না, কোটি-কোটি, লাখ, লাখ—গুনে শেষ করা যায় না! ছারপোকাই যে কেবল!

[বিছানার চাদর তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল]

অ্যাঁ ঃ ধব্‌ধবে চাদরের তলায় একি! এসব কী? বাঃ, আলো দেখে যে পালাতে শুরু করেছে সব। কুচকাওয়াজ করে চলে যাচ্ছে সব—আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতো মার্চ করে যাচ্ছে। যুদ্ধের কায়দা-কানুন সব এদের জানা দেখছি।

[দু-একটা মারিল।]

মেরে কি হবে? একি আর মেরে শেষ করা যাবে? সমস্ত রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারব, তাহলে আর ঘুমোবো কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই কাটাতে হল আজ রাতটা। আলো? না, আলো জ্বালিয়েই রাখতে হবে। নিভোলে কী জানি, যদি চেয়ারে এসে আমাকে আক্রমণ করে? বলা যায় না তো।

[চেয়ারে গিয়া বসিয়া ভীতিবিহ্বলনেত্রে বিছানার দিকে চাহিয়া রহিল।]

উঃ, এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে বুঝলাম। গদি নয়, গদা কেন—বুঝলাম এতক্ষণে! বুঝতে পারছি, কেন মাস্টারেরা টেকে না। ও বাবা! কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও রয়েছে তার পেছনে। ঘরে-বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক পারবে কেন? সামান্য একজন গ্র্যাজুয়েট্ বইতো নয়। তবু সে-ভদ্রলোক ঊনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না—পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে পালাতে হল তাঁকে। এত এনিমির সঙ্গে লড়ে এনিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা, কে জানে। ত্রিশটাকা মাইনের মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে-পড়ানো—নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন. বেশ রসিক লোকও বটেন—দারুণ রসিকও দেখছি।

চতুর্থ দৃশ্য

পরদিন প্রাতঃকাল—মন্টুদের বৈঠকখানা

[মন্টুর বাবা আনন্দবাজার দেখিতেছেন, মন্টু বসিয়া আছে। মিহির প্রবেশ করিল।]

মন্টুর বাবা : এই যে! কেমন ঘুম হল রাত্রে?

মিহির : তোফা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?

মন্টুর বাবা : (অবাক হইয়া) বেশ-বেশ, ঘুম হলেই ভালো। জীবনের বিলাসই হল গিয়ে ঘুম। তা, ঘুম বোধহয় বেশ-একটু জমাট?

মিহির : আজ্ঞে, সেকথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছলাম কিন্তু, টের পাইনি আদপেই।

মন্টুর বাবা : বলো কি?

মিহির : আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি বর্ধমান কিনা! শুনেছেন বোধহয়, বেজায় মশা সেখানে—মশারি না খাটিয়ে শোবার জো নেই। একদিন পাশের

বাড়িতে কি খুব দরকারে ডেকেছিল আমায় কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা, যখন শুতে যাচ্ছি, তখন মনে পড়ল, তখন কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে, অত রাত্রে কে যায়, আর সদর দরজা বন্ধ করে তারা সব শুয়ে পড়েছে তখন। আমি করলুম কি, সেদিন আর মশারি খাটালুম না। পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন দেখি, পাশের বাড়িতেই আমি শুয়ে।

মন্টুর বাবা : (দারুণ বিস্মিত) কিরকম? সে আবার কিরকম?

মিহির : মশায় টেনে নিয়ে গেছল মশাই! সেইজন্যেই তো মশারি খাটাইনি রাত্রে! অনায়াসে পাশের বাড়ি যাবার ওইটেই সহজ উপায় কি না!

মন্টুর বাবা : (শুনে অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন)। মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি, তখন—তখন আর—কিসে আর কি করবে তোমার! তুমি দেখছি টিকেই গ্যালে এখানে।

মিহির : আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে মশাই! কয়েকটা টাকা, আমার বেতনের থেকে, আগাম দিতে হবে আমাকে। ছারপোকার অর্ডার দেব।

মন্টু : ছারপোকা?

মন্টুর বাবা : ছারপোকার অর্ডার? কেন? সে আবার কি?

মিহির : ও! আপনি জানেন না বুঝি? ছারপোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উপকারী, মেমারি-বাড়ানোর মহৌষধ আর দুটি নেই। বিলেতে রীতিমতো ছারপোকার চাষ হয় যে এইজন্যে! গাধা ছেলে সব দেশেই রয়েছে তো, কাজে লাগে তাদের।

মন্টুর বাবা : (সাগ্রহে) কিরকম—কিরকম? বিলেতে ছারপোকার চাষ হয়? দাম দিয়ে কেনে লোকে? আমদানি-রপ্তানি হয়, তুমি জান? আমি বেচতে পারি, হুম্—হাজার-হাজার, লাখ-লাখ, ক্রোর-ক্রোর-যত চাও!

মিহির : বেচুন না! আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজেই লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের পক্ষে ভারী উপকারী। একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এমনি করে কোথায় টিপে মারতে হয়, এই রকম হাজার-হাজার লাখ-লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক ব্রেন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন! বি. এ.-পাসের সময় আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি। সারাবছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল না হয়ে যাই কোথায়! এমন সময়ে বিলিতি এক কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়লাম।

মন্টুর বাবা : বিলিতি কাগজে?

মিহির : বিলিতি কাগজেই তো! অমনি সারা বাসা খুঁজে তন্ন তন্ন করে যার বিছানায় যা ছারপোকা ছিল, সব সদ্ব্যবহার করলুম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিনদিন বাকি, তারপর ফল যা পেলুম, নিজের চোখেই



দেখুন না! আমার কাছেই আছে—বি-এ, পাস করলুম উইথ ডিস্টিঙ্কশন্—

[বুক পকেট হইতে সার্টিফিকেটখানা বাহির করিয়া মন্টুর বাবার মুখের উপর মেলিয়া ধরিল।]

মন্টুর বাবা : (বিস্ময়ে মুহ্যমান)। তাই তো! সত্যিই তো! একটা কথাও তো মিথ্যে নয়—এইতো লেখাই রয়েছে এখানে —Passed with Distinction —লেখাই রয়েছে বটে! অ্যাঁ, এমন বস্তু ছারপোকা! কে জানতো! অ্যাঁ?

মহির : সব্বাই জানে! বড়ো বড়ো ডাক্তাররা পর্যন্ত! কে না জানে? যারাই বিলিতি কাগজ পড়ে, তারাই জানে।

মন্টুর বাবা : যাক, পয়সা খরচ করে তোমাকে ছারপোকা কিনতে হবে না। তোমার বিছানাতেই রয়েছে হাজার-হাজার, লাখ-লাখ—যত চাও! তোমার ভয়ানক ঘুম বলে জানতে পারোনি!

মিহির : এতক্ষণ তবে বলেননি কেন আমায়? অনেকখানি ব্রেন করে ফেলতুম তাহলে। কিন্তু এবেলা—এবেলা যে আমার নেমন্তন্ন রয়েছে ভবানীপুরে। এখনই বেরুতে হবে যে! আচ্ছা থাক, সন্ধের মুখে ফিরে আগে ওগুলোর সদ্ব্যবহার করব। তারপর পড়াবো মন্টুকে।

[মিহির বাহির হইয়া গেল। মিহির চলিয়া গেল পিতাপুত্র মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।]

মন্টুর বাবা : মন্টু!

মন্টু : কি বাবা!

মন্টুর বাবা : ছারপোকার সঙ্গে ব্রেনের যে একটা সম্পর্ক আছে নিকট-সম্পর্কই রয়েছে, অনেকদিন ধরেই কথাটা আমার মনে হয়েছে। ছারপোকার ব্রেনটাই একবার ভাব দেখি, সেটাই কি কিছু কম? ভাবলে অবাক হয়ে যাবি তুই।

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

মন্টুর বাবা : দ্যাখ্ না, ঘুচ্ করে এসে তোকে কামড়েছে, তক্ষুনি উঠে দেশলাই জ্বেলে দ্যাখ্, আর তাকে দেখতে পাবিনে—কোথায় যে পালিয়েছে, পাত্তা নেই তার। মানুষ যে দেশলাই পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে, এই বৈজ্ঞানিক খবর অব্দি ওদের জানা! ভেবে দ্যাখ তো ব্রেনটা একবার!

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

মন্টুর বাবা : এটা কি কম ব্রেন? তুইই বল! আর এ-ব্রেন তো ওদের রক্তেই—কেন না ওদের তো আর মাথা নেই—মাথা বলে কিচ্ছুই নেই। থাকলেও মাথা আর কটটুকু? —ওদের আগপাশতলা আর গায়েই ওদের ব্রেন। হাড়ে-হাড়ে, উঁহু—রক্তে-রক্তে ওদের বুদ্ধি। ঠিক বলেছে মিহির। তুই কি বলিস, মন্টু?

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

মন্টুর বাবা : তারপর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও বড়ো কম নয়। ছারপোকা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তারও বাড়ে। ট্রামে-বাসে-সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেমনি হু-হু করে খবরের কাগজের কাটতিও বেড়ে গেছে। এই আনন্দবাজারই দ্যাখ্ না! নীট বিক্রয়-সংখ্যা একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি!

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

মন্টুর বাবা : কেন, সেদিন দেখলিনে? বায়স্কোপে—আমাদের চোখের সামনেই—দশ আনার সিটে একটা কুলি বসেছিল, তোর মনে নেই মন্টু?

মন্টু : হ্যাঁ—বাবা!

মন্টুর বাবা : সে তো লেখাপড়া কিচ্ছুই জানে না। দুমিনিট বসতে না বসতেই দুআনা বের করে একখানা আনন্দবাজার কিনে বসল। এতে শিক্ষার বিস্তার হল নাকি? তুইই বল?

মন্টু : হ্যাঁ—বাবা!

মন্টুর বাবা : চল্ তবে, এক কাজ করিগে। তোর মাস্টারমশাই ফেরবার আগে

আমরাই ছারপোকাগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলিগে। ব্রেন তো তোরও দরকার—আমারও দরকার! আমার মেমারিটাও দ্দিনকতক থেকে কমে আসছে যেন। সেদিন শ্যামবাবুকে মনে হল গোবর্দ্ধনবাবু, আর গোবর্দ্ধনবাবুকে দেখে মনে হল শ্যামবাবু, এ-তো খুব ভালো কথা নয়, কি বলিস তুই?

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

পঞ্চম দৃশ্য

মন্টুর পড়বার ঘর—সেইদিনেরই সন্ধ্যা

[দেয়ালঘড়িতে আটটা। মন্টু একা-একা বসিয়া পড়াশোনা করিতেছে। মিহির প্রবেশ করিল।]

মন্টু : এত দেরি হল যে স্যার, আপনার?

মিহির : বন্ধুর বাড়িতে আটকে গেছলাম। সার দুপুরটা ঘুমিয়ে— কি বলে গিয়ে......যা খাটনি গেছে না আজ সারা দুপুর—

[জামা-কাপড় বদলাইল।]

মন্টু : সারা দুপুরটা ঘুমিয়েছেন বুঝি?

মিহির : না-না, ঘুমোব কেন? ঘুমিয়ে কি মানুষ ক্লান্ত হয়? কাল সমস্ত রাত অমন খাসা ঘুমোবার পর আবার ঘুম পায় না কি? কী যে বলো তুমি! বললুম না, ভারী খাটনি গেছে—বন্ধুর বাড়ি পেল্লায় এক ভোজ ছিল কিনা!

[চেয়ারে গিয়া বসিল]

মন্টু : ও, তাই বলুন!

মিহির : বিশ্রী একটা গন্ধ পাচ্ছি কি রকম (মুখ বিকৃত করিয়া শুঁকিতে লাগিল) । কোত্থেকে একটা, কেমন যেন একটা ভারী দুর্গন্ধ আসছে না? মনে হচ্ছে, খুব কাছেই যেন পাচ্ছি গন্ধটা.....অ্যাঁ? এই যে, তোমার কাছ থেকেই আসছে যেন? নতুন ধরনের এসেন্স টেসেন্স মেখেছ নাকি কিছু? তোমার গা থেকেই আসছে যেন গন্ধটা।

মন্টু : গা নয়, মাথা থেকে স্যার!

মিহির : কীসের গন্ধ?

মন্টু : ছারপোকার স্যার!

মিহির : ছারপোকার? সে কি আবার?

মন্টু : আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দুজনে মিলে 'বেতন-নিবারকের' সমস্ত ছারপোকা শেষ করেছি। মেরে মেরে শেষ করেছি, আমাদের মাথাতেই টিপে টিপে মেরেছি তাদের!

মিহির : বলো কি, অ্যাঁ?

মন্টু : হ্যাঁ স্যার! ছোট্টুলালকেও বলা হয়েছিল, কিন্তু সে ব্যাটা মোটেই ব্রেন চায় না। বলে যে, বিরেন্‌সে কিয়া কাম?........আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায়। হি হি হি—! (হাসিতে লাগিল)।

মিহির : অ্যাঁ?—

[সিংহনাদ করিয়া মিহির চেয়ার ছাড়িয়া একলাফে বিছানায় গিয়া সটান হইল।]

মন্টু : অ্যাঁ? (হতভম্ভ হইয়া গেল)। একি হল?

[মিহিরের চিৎকারে মন্টুর বাবা ছুটিয়া আসিলেন। ছোট্টুলালও।]

মন্টুর বাবা : কি হয়েছে রে মন্‌টে? কি হল?

মন্টু : ছারপোকা নেই শুনে মাস্টারমশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মন্টুর বাবা : তা তুই বলতে গেলি কেন? শোকের প্রথম ধাক্কায় ওরকম হয়। ওরকমটা হয়েই থাকে। বারণ করলুম না তোকে? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোক—পুত্রশোকের চেয়ে কম কি? কম কথা নয় তো!

মন্টু : আমি কি করে জানব যে, উনি অমন করবেন?

ছোট্টুলাল : মুখে জল ছিটাইলে উন্‌কার গেয়ান্‌ হোতে পারে। আভি—এখ্‌নোই গেয়ান্‌ হোয়ে যাবে।

মন্টু : জল ছিটাবো বাবা? আনবো এক বাল্‌তি জল?

মিহিব : (হতজ্ঞান-অবস্থাতেই)। উঁহু!

মন্টুর বাবা : কাজ নেই বাপু! জ্ঞান হলে যদি কাম্‌ড়ে দ্যায় রাগের মাথায়? প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে যাক আগে। এক-আধদিন অজ্ঞান হয়ে থাকলেই কেটে যাবে ওটা। সময়ই হচ্ছে শোকের একমাত্র দাবাই। কথায় বলে—টাইম ইজ দি বেস্‌ট্‌ হিলার—শুনিসনি মন্টু?

মন্টু : হ্যাঁ, বাবা!

যবনিকা

পীঠস্থান

বিশেষ কিছু না ভেবেই হেন্‌রি ডেপ্‌লিস লুকসেমবার্গে জন্মেছিল, তারপরে ভালো করে ভেবে সে একটা ক্যান্‌ভাসারি কাজ নিলে। ক্যান্‌ভাসারি হল ঘোরাঘুরির কাজ— কাজেই জন্মসূত্রে লুকসেমবার্গী হয়েও কর্মসূত্রে ডেপ্‌লিস্‌কে দেশে দেশে ভেসে বেড়াতে হত। এমনি এক কাজের তাগিদে যখন সে ইতালিতে, সেই সময়ে তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় হঠাৎ মারা গিয়ে মোটমাট কিছু টাকা দিয়ে গেলেন।

টাকাটা বেশি নয়, তাহলেও ক্যান্‌ভাসার-জীবনের নিত্য অভাবের মাঝে এই অভাবিত উপায় তার মাথা ঘুরিয়ে দিলে। তার সখ হল বড়মানুষি করবার। বড়লোকেরা টাকা দিয়ে শিল্পীদের উৎসাহ দেন, শিল্পচর্চার পোষকতা করে থাকেন, ডেপ্‌লিস্‌ জানত। তার সাধ হল সেও তাই করবে।

হেন্‌রি ডেপ্‌লিস্‌ কেবল টাকা নয়, নিজের পিঠ দিয়ে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষণ করল! সিনর আঁদ্রে পিন্‌সিনি সেইসময়ে উত্তর ইতালিতে উল্‌কি-শিল্পে খ্যাতনামা। উল্‌কি-রচনায় তাঁর মতন প্রতিভাবান সারা ইতালিতে কখনো জন্মায়নি। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিল্পের আদর না থাকায় শিল্পীদের যা চিরকেলে দুঃখ—পিন্‌সিনির সে সময়ে খুব কষ্টেসৃষ্টে কাটছিল। ডেপ্‌লিসের অনুরোধে মাত্র ছ'শো ফ্রাঁর বিনিময়ে তিনি সানন্দে তার পিঠ, ঘাড়ের কাছ থেকে কোমর তক্‌ আগাপাশতলা ভর্তি করে, আদম ইভের স্বর্গ থেকে পতনের পুরাকাহিনী উল্‌কি-বিচিত্র করে দিতে রাজি হলেন। খোদকারি শেষ হলে, আয়নার মধেয নিজের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে মঁসিয়ে ডেপ্‌লিসকে একটু ক্ষুণ্ণই দেখা গেল, কেননা খোদাই দেখে আদম ইভের অধঃপতন, কি ট্রয়ের ধ্বংস বা ব্যুয়র যুদ্ধের পরিণাম, তা বোঝা বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু তাহলেও উল্‌কির অলৌকিকতায় তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। এবং পিন্‌সিনির সেই অপূর্ব বাহাদুরি পেছনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তারাও মুক্তকণ্ঠে বাহবা না দিয়ে পারেনি।

সে-ই হলো পিন্‌সিনির শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সেই তাঁর শেষ কীর্তি! এই কারুকার্য খতম করেই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—তাঁর শেষ দীর্ঘনিশ্বাস। এমন কি, দক্ষিণার জন্যও তিনি আর সবুর করলেন না। তাঁর শিল্পসংগ্রাম আর জীবনসংগ্রাম এক নিশ্বাসে সমাধা করে তিনি চলে গেলেন। অবশ্যি, পাওনার ছশো ফ্রাঁ উশুল করার জন্য সদ্যবিধবা শ্রীমতী পিন্‌সিনিকে তিনি রেখেই গেলেন। এবং তারপর থেকেই ভ্রাম্যমাণ হেনরি ডেপলিসের জীবনে দারুণ সঙ্কট দেখা দিল।

আত্মীয়ের বিয়োগসূত্রে ডেপলিস যা পেয়েছিলেন, আগের ধার-দেনা আর দায়

মেটাতেই তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। শ্রীমতী পিন্‌সিনি যখন তাগাদায় এলেন তখন তাঁকে দেবার মতো ৪৩০ ফ্রাঁর বেশি আর ছিল না। ভদ্রমহিলা বেজায় চটে গেলেন— দাবির থেকে ১৭০ ফ্রাঁ বাদ দেবার জন্যে ততটা নয়, তিনি মনে করলেন এইভাবে দাম কমিয়ে তাঁর স্বামীর সর্ব্বাদিসমস্ত শ্রেষ্ঠ কীর্তির অবমাননা করা হচ্ছে। শিল্পীর মর্যাদাহানির ভয়েই টাকাটা নিতে তাঁর আপত্তি হল। এদিকে ডেপ্‌লিস একহপ্তার ভেতরেই টাকা পরিমাণটা ৪৩০ থেকে ৩০৫ ফ্রাঁয়ে নামাতে বাধ্য হলেন। মূল্যের অঙ্কটা ক্রমশই কমে গিয়ে সেই অপূর্ব সৃষ্টি অচিরেই যে অমূল্য হয়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা দেখা গেল। সাত দিন বাদে তিনশো পাঁচ শুনে তো শ্রীমতীর আঁচ বেড়ে গেল আরো। চটেমটে তিনি অবশেষে বলে দিলেন যে ও জিনিস ডেপ্‌লিসকে তিনি বেচতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং কোনো মিউজিয়মকে অমনি দিয়ে দেবেন, সেও ভালো। এই খোলনা কথার কয়েকদিন পরে ডেপ্‌লিস সভয়ে জানল যে শ্রীমতী পিন্‌সিনি তার খোল সমেত পিঠের শিল্প-রচনাটি বারগামোর মিউনিসি-প্যালিটিকে বিনামূল্যে উপহার দিয়েছেন এবং উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই দুর্লভ দান গ্রহণ করেছে।

এই খবর জানবার পর ডেপ্‌লিসের বিষম ভাবনা হল। পরে জিনিস যে নিজের পিঠে বহন করছে তার দায় কম নয়। নিজের পিঠ যেন তার নিজের না, তার উপর তাঁর চেয়ে অপরের জোর এখন ঢের বেশি বলে তাঁর মনে হতে লাগল। নিঃশব্দে সবার চোখ এড়িয়ে তিনি সরে পড়লেন। উত্তর ইতালি থেকে পিঠটান দিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন রোমে। যে করেই হোক এবং নিজের সঙ্গে ওই শিল্পপীঠকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে হবে।

কিন্তু সেটা সহজ ব্যাপার ছিল না—বিশেষত এক বিরাট প্রতিভা যে নিজের পিঠে করে বহন করছে তার পক্ষে। প্রতিভা স্বভাবতই দুর্বহ বস্তু। বাষ্পস্নান করতে একদিন তিনি সাধারণ স্নানাগারে গেছেন, সেখানকার কর্তা তো তাঁর অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ দেখেই আঁতকে উঠল; (উত্তর ইতালির লোক ছিল সে) এবং তৎক্ষণাৎ, ডেপ্‌লিস চান করবেন কি, তাঁকে জামা কাপড়ে মুড়ে ফেলে স্পষ্টবাক্যে জানিয়ে দিল যে বারগামো মিউনিসিপ্যালিটির বিনানুমতিতে আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতির ওই ছবি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করবার কোনো এক্তিয়ার তাঁর নেই।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। সরকারি কর্মচারীদের নজর পড়ল ডেপ্‌লিসের উপর। সাধারণ স্নানাগার তার পক্ষে আর নিরাপদ নয়, এমনকি, নদীতে কিংবা সমুদ্রে ডুব দেওয়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও, কোমর থেকে গলা পর্যন্ত আপাদমস্তক আঁট-সাঁট পোশাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত হয়ে জলে নামতে হলে স্নান করার আরাম থাকে না।

খবরটা ক্রমশ বারগামো মিউনিসিপ্যালিটির কানেও গিয়ে পৌঁছিল। পাছে ডেপ্‌লিসের স্নান করার অন্যায় শখে সমুদ্রের লোনা জল লেগে ছবির কোনো হানি হয় সেই ভয়ে তাঁরা আদালতে নালিশ জানালেন। যাতে স্নান করার ন্যায় অবৈধ



কাজ আর না করা হয় সেই মর্মে রোমের উচ্চ আদালত থেকে ডেপ্‌লিসের পিঠের উপর এক ইনজাংশন জারি হয়ে গেল।

আদালতের পিয়ন এসে এক পরোয়ানা সেঁটে দিয়ে গেল পিঠের উপর।

তার পিঠের উপর দিয়ে এতদূর গড়াবে তা ডেপ্‌লিস ভাবতে পারেনি। পিঠ নিয়ে এই টানাটানির সময়ে সে আবার পিঠটান দিল! এবার এক নতুন ক্যান্‌ভাসারির ভার নিয়ে বোরদোতে। বোরদো হচ্ছে ফ্রান্সের এক শহর, কাজেই সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে পিঠের ফাঁড়া তার কেটে যাবে বলেই মনে হল। ভগবানের নাম নিয়ে তো সে রওনা দিলে, কিন্তু তাকে আটকালো ইতালির সীমান্তে। জমকালো তকমা-আঁটা একদল সরকারি লোক এসে তাকে বাগড়া দিল। সে যেতে পারে, স্বচ্ছন্দেই, কিন্তু পিঠের জিনিসটি তাকে সীমান্তের এ-পিঠে রেখে যেতে হবে। ইতালীর কোনো শিল্পসৃষ্টি ইতালীর বাইরে নিয়ে যাবার কিম্বা রপ্তানি করবার অধিকার কারো নেই, দেশের আইনে নিষেধ।

লুক্সেমবার্গের নাগরিককে, পাসপোর্ট সত্ত্বেও, এইভাবে আটক করার জন্য লুক্সেমবার্গের গভর্নমেন্ট চটে গেলেন। এই নিয়ে লুক্সেমবার্গ এই ইতালির গভর্নমেন্টের মধ্যে কূটনৈতিক পত্র বিনিময় চলল। চলতে চলতে সমস্যাটা এক সময়ে এমন জটিল আকার নিল যে কেবল ডেপ্‌লিসের এই পৃষ্ঠদেশ নিয়েই সারা ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু ইতালির গভর্নমেন্ট অটল রইলেন, তাঁরা

স্পষ্টই জানালেন, লুক্সেম্‌বার্গী ডেপ্‌লিসকে নিয়ে মোটেই তাঁদের মাথাব্যথা নেই, উক্ত বাউন্ডুলে ক্যানভাসার তার যে চুলোয় খুশি যাক, ইচ্ছে করলে মারাও যেতে পারে, তাঁদের মানা নেই, বিন্দুমাত্রও তাঁরা বাধা দেবেন না, কিন্তু আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতি নামক প্রসিদ্ধ শিল্পরচনা (স্বর্গত আঁদ্রে পিন্‌সিনি-কৃত, সম্প্রতি বারগামো মিউনিসিপ্যালিটির জাতীয় সম্পত্তি) কিছুতেই দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না, এ বিষয়ে তাঁদের আদেশ একেবারে অমোঘ।

একদিকে পিঠ নিয়ে এই উত্তেজনা, তার পিঠোপিঠি ডেপ্‌লিসের উপর আরেক অত্যাচার শুরু। তাকে নিয়ে—তার পীঠস্থান নিয়ে আবার এক নতুন ফ্যাসাদ! তার পিঠকে কেন্দ্র করে দারুণ এক বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেছে। জনৈক জার্মান কলাবিদ্‌ বারগামো মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে উক্ত চিত্র পরিদর্শনের অনুমতি চেয়ে নিয়ে, দেখে শুনে পরীক্ষা করে ঘোষণা করেছেন, ওই ছবি আসলে পিনসিনিরই নয়—আসল পিনসিনির খোদাই কর্মই না আদৌ। আরেক হৈ চৈ!

উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে, জিনিসটা হয় কোনো জাল পিনসিনির কান্ড, নয়তো, পিনসিনি শেষ বয়সে বার্ধক্যের অক্ষমতাবশত যেসব শিষ্যকে নিয়ে কাজে লাগাতেন তাদেরই কারু ভ্যাজাল। এ বিষয়ে ডেপলিসের অবশ্যি কিছু বলবার ছিল। কিন্তু তার নিজস্ব মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হল না। কেননা কাজটা তার উপরে হলেও তার সাক্ষাতে হয়নি। তার পিঠে যে খোদ পিন্‌সিনিরই স্বাক্ষর তার কী প্রমাণ? কাজেই তার সাক্ষ্যের কোনোই দাম দেওয়া যায় না। খোদ্‌কারির সময়ে সে নিজের পিঠ ফিরিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল. আসলে কে যে তাকে খুদ্‌ছে তা স্বচক্ষে দেখার তার সুযোগ হয়নি।

এমনি ব্যাপার, এই সময়ে ইতালির এক শিল্পসম্পর্কিত মাসিক পত্রের সম্পাদক এই জার্মান কলাবিদকে কাঁচকলাবিদ বলে উড়িয়ে দিলেন। বললেন যে পিনসিনির আর্ট বোঝা আনাড়ির কর্ম না। এর ফলে সারা ইতালির সঙ্গে গোটা জার্মানির খ্যাঁচাখেচি বেধে গেল—এবং এই বিবাদ ছড়িয়ে পড়ল দেশবিদেশে। কলা নিয়ে এই কলহ ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল। বিলাতের লর্ড সভায় এই নিয়ে একজন প্রশ্ন তুললেন, পার্লামেন্টে দারুণ ঝড় বয়ে গেল। সেই ধাক্কায় স্পেনের গভর্নমেন্ট টলমল করতে লাগল; কোপেনহেগেনের বিশ্ববিদ্যালয় জার্মান শিল্পরসিকটিকে স্বর্ণপদক দান করলেন; পোলান্ডের দুটি ছাত্র, এবিষয়ে তাদেরও একটা মতামত ছিল, তা জাহির করবার জন্য প্যারি শহরে একদিন আত্মহত্যা করে বসল। লাও ঠ্যালা!

ইতিমধ্যে যার পিঠ নিয়ে এত খিট্‌কাল, তার অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। ফলত, ডেপ্‌লিস যে শেষটায় ইতালীয় বিপ্লবীদের দলে ভিড়ে যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। লুক্সেমবার্গের লোক হয়ে ইতালির বিপ্লবে মাথা গলানো, ইতালির গভর্নমেন্ট মোটেই খুশির চক্ষে দেখলেন না। চার চার বার তাকে গ্রেপ্তার করে বাইরে ছেড়ে দেবার নিমিত্ত নিয়ে গিয়ে, 'আদম-ইভের মর্ত্যলাভের' কাতিরে (আঁদ্রে পিনসিনি

কর্তৃক রচিত বলে পরিচিত, রনাকাল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) আরেক আইনের বলে আবার ধরে বেঁধে ফিরিয়ে আনতে হল।

চলছিল এমনি, এই টানাপোড়েনের মধ্যে পোড়েনের দিকটায় একটু টান দেখা গেল হঠাৎ। জেনোয়ার এক বৈপ্লবিক সভায় একদিন এক সহকর্মী তর্কাতর্কির মুখে, খুব সম্ভব নিজের অকাট্যতা প্রমাণ করার প্রয়াসেই, এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড্ কমরেড ডেপলিসের পিঠের ওপর ভাঙলেন। ভাগ্যিস, ডেপিলিসের পরনে ছিল পুরু লালকোর্তা, তাতেই বাঁচোয়া—সে যাত্রা ডেপলিস কোনো গতিকে টিকে গেলেন। কিন্তু আদম ইভ আর টিকলেন না। তাঁদের ধরাতলে অধোগতির কিছু কিছু পরিচয় সেই পীঠস্থলে তখনো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকলেও অ্যাসিডের সৌজন্যে, স্বর্গচ্যুতদের ভালো করে চেনার উপায় রইল না। সহযোগীকে মারাত্মকভাবে আহত করার অভিযোগে ডেপলিসের আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই গুরু অপরাধের জন্য গুরুতরভাবে তাকে বকে বেকসুর খালাস দেয়া হল, কিন্তু জাতীয় কলা-সম্পদ বিনষ্ট করার দায়ে বেচারার জেল হয়ে গেল সাত বচ্ছর।

এর পরে, ডেপ্লিস হাসপাতাল থেকে অব্যাহতি পাবা মাত্রই অবাঞ্ছিত বিদেশি বলে অবিলম্বে তাকে দেশের সীমানার বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হল। তাকে বিদায় দেবার কোনো মানা—পিঠতুত আর কোনোই বাধা তখন ছিল না।

ডেপ্লিস এখন কোথায়? প্যারির নির্জন রাস্তায় জাতীয় কলাভবনের কাছাকাছি গেলে ভয়ঙ্কর ভাবিত শীর্ণ চেহারা এক লোককে দেখা যায়—কথায় তার লুক্সেমবর্গী টান এবং সারা মুখে কেমন যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। ভেনাস্ ডি মিলোর নিরুদ্দিষ্ট বাহুদুটির সে হচ্ছে অন্যতম, এই রকমের একটা ধারণা তার জন্মেছে—ফরাসি গভর্নমেন্টকে বলে কয়ে হয়তো তাকে বেচানা যেতে পারে, এই ধরনের একটা আশা সে পোষণ করে। মনে হয় সে-ই আমাদের ডেপ্লিস।

এক ভুতুড়ে কাণ্ড

ভূত বলে কি কিছু আছে? যদি থাকে তো তিনি আমাকে কখনো দেখা দেননি। তাঁর করুণা, এবং আমার ধন্যবাদ। কৃপা করে দর্শন দিলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে পারতাম কিনা সন্দেহ। ভূতদের রূপগুণে আমার কোনো মোহ নেই। তা ছাড়া আমার হার্ট খুব উইক। আর শুনেছি যে ওরা ভারী উইকেড্—

তবে ভূত কিনা ঠিক জানি না, একটা অদ্ভুত কিছু একবার কিন্তু দেখেছিলাম। দেখেছিলাম রাঁচিতে। না, পাগলাগারদে নয়, তার বাইরে—সরকারি রাস্তায়। রাঁচির রাজপথ না হলেও সেটা বেশ দরাজ পথ।

কি করে দেখলাম, বলি।

এক পরস্মৈপদী সাইকেল হাতে পেয়ে হুনড্রুর দিকে পাড়ি জমিয়ে ছিলাম। কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল!

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়—একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সেইখানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ! জায়গাটাও জংলি। আরো মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মতো একটা পাওয়া যেত—কিন্তু এই সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে! এমনকি, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কিনা আমার সন্দেহ। হাঁটতে হবে আগেভাগে জানলে হাতে পেয়েও সাইকেলেই আমি পা দিতাম না নিশ্চয়।

তখনো সন্ধে হয়নি। এই হব-হব। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত—দুদিকেই প্রায় সমান পাল্লা! কোন দিকে হাঁটন দেব হাঁ করে ভাবছি।

শেষ পর্যন্ত কি হাঁটতেই হবে? এই একই প্রশ্ন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পুনঃ পুনঃ আমার মানসপটে উদিত হয়েছে। আর একমাত্র উত্তর আমি দিয়েছি—না বাবা, প্রাণ থাকতে নয়!

অবিশ্যি, এরকম স্থানে আর এহেন অবস্থায় প্রাণ বেশিক্ষণ থাকবে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয় ছিল। সন্ধে উতরে গিয়ে ফাঁকা আকাশে বাঁকা চাঁদের ফিকে আলো দেখা দিয়েছে। সেদিন পর্যন্ত এধারে বাঘের উপদ্রব শোনা গেছল। কখন হালুম শুনর কে জানে!

তবু, চিরদিনই আমি আশাবাদী। সমস্যার সমাধান কিছু না কিছু একটা ঘটবেই। অচিরেই ঘটল বলে। দু এক মিনিটের অপেক্ষা কেবল। এবং সেই অভাবনীয়ের সুযোগ নিয়ে সহজেই আমি উদ্ধার লাভ করব।

এ রকমটা ঘটেই থাকে, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কত গল্পের বইয়েই এরূপ ঘটতে দেখা গেছে, আমার নিজেরই কত গল্পে এরকম দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। আর স্বয়ং লেখক হয়ে আমি নিজে আজ বিপদের মুখে পড়েছি বলে সেইসব অঘটনগুলো ঘটবে না? কোনো গল্পের নায়ক কি কখনো বাঘের পেটে গেছে? তবে একজন গল্পলেখকই বা কোন দুঃখে যাবে শুনি?

সেই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের অপেক্ষায় আরো আধঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে একটা ঘটনার মতো দেখা দিল বটে। একখানা লরি। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচীর দিকেই যাচ্ছিল লরিটা।

আমার টর্চ বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার উপর কুয়াশার পর্দা পড়েছে—এই ঘোরালো আবহাওয়ার মধ্যে আমার আলোর ঘূর্ণিপাক লরির ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়!

লরিটা এসে পৌঁছল—এল একেবারে সামনাসামনি। মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামলে না। যেমন এল তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা! আলোর আন্দোলন করতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছল।



ছ্যা ছ্যা! লরিওয়ালারা কি কানা হয়ে লরি চালায় নাকি? (যেরকম তারা মানুষ চাপা দেয়, তাতে বিচিত্র নয়।)

শেষটা কি হাঁটাই আছে বরাতে? এই ঝাপ্সা আলো আর কুয়াশার রাতে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা!—ভাবতেই আমার বুক দুর দুর করতে থাকে। তার চেয়ে বাঘের পেটের ভেতর দিয়ে স্বর্গে যাওয়া ঢের সোজা—অনেক শর্টকাট্।

না-না! কোথ্থাও যেতে হবে না—বাঘের পেটেও নয়। কিছু না কিছু একটা হতে বাধ্য—অনতিবিলম্বেই হচ্ছে। আর এক আধ মিনিটের ওয়াস্তা কেবল!

এর মধ্যে কুয়াশা আরো জমেছে, চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরো। আমি নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি, এমন সময়ে দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াশা ভেদ করে আসতে দেখা গেল।

বাঘ?.........না বাঘ নয়—দুই চোখের অতখানি ফারাক থেকেই বোঝা যায়। বাঘের দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম উদার হতে পারে না।

আবার আমি বাহুবলে টর্চ ঘোরাতে লাগলাম।

ছোট্ট একটা বেবি অস্টিন্—তারই কটাক্ষ! আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা—এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধহয় ওর চেয়ে জোরে চলতে পারে। ·

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

আমি হাঁকলাম—এই!

কিন্তু গাড়িটার থামবার কোনো লক্ষণ নেই! তেমনি মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলতে লাগল গাড়িটা।

আমার পাশ কাটিয়ে যাবার দুর্লক্ষণ দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

না, আর দেরি করা চলে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এস্পার ওস্পার যা হোক! গাড়ির মালিকের না হয় ভদ্রতারক্ষা করার বালাই নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে!

অগত্যা, আগায়মান গাড়ির গায় গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ না, নিরাপদও নয়, কি করব, এক মিনিটও নষ্ট করার ছিল না। কায়দা করে উঠতে হল কোনো গতিকে। কে জানে, এ-ই হয়তো সশরীরে রাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ!

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে রইল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্তিরে বাঘের পেটে না যায়,— (বাঘরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?—) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে। সাইকেলের মালিককে আগামীকাল একসময়ে জানালেই হবে—বেশি বলতে হবে না—খবর দেবামাত্র আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে তিনি নিজেই এসে নিয়ে যাবেন।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেছি। বসে ড্রাইভারকে লক্ষ করে বলতে গেছি—

"আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। ডাঃ যাদুগোপালের বাড়ির কাছাকাছি"—

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উপে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হল না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম—আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

আমার শার্টের কলারটা মনে হল যেন আমার গলার চারধারে চেপে বসেছে। হাত তুলে যে গলার কাছটা আলগা করব সে ক্ষমতা নেই। আঙ্গুলগুলো অব্দি অবশ। সেই শীতের রাত্রেও সারাগায়ে আমার ঘাম দিয়েছে।

যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখানে কেউ ছিল না।.....বিলকুল ফাঁকা, আমি তাকিয়ে দেখলাম।

জিভ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাক্‌শক্তি ফিরে পেলাম। "ভূত! ভূত ছাড়া কিছু না!" আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করল তা মনে হল না। বে-ড্রাইভার গাড়ী যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

প্রথমে আমার মনে হল, নেমে পড়ি গাড়ির থেকে! কিন্তু তারপর, সমস্ত পথটা হেঁটে মরতে হবে এইকথা ভাবতেই ভূতের মারও তার চেয়ে ঢের শ্রেয় বলে আমার বোধ হল। আমার নামের প্রথমার্ধ ভূতভাবন, আর বাকি অর্ধেক ভূতধাবন্; কাজেই ভূতের ভয় আমার থাকলেও, ভাবনা তেমন ছিল না। ভূতের হাতে মরলেও শিবলোক কিম্বা রামরাজ্য একটা কিছু আমি পাবই। সেটা একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু তাহলেও এমন অভূতপূর্ব দশায় আমায় পড়তে হবে ভাবিনি কখনো।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল, এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এইকথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ার আরাম বেশি বিবেচনা করে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভুতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম। আলস্যের সঙ্গে আমি কোনোদিনই পারি না; চেষ্টা করলে হয়তো বা কায়ক্লেশে পারা যায়; কিন্তু পেরে লাভ? লাভটার প্লাভ তো ডিমের! চিরকালের মতো এবারও আমার আলস্যই জয়ী হল শেষটায়।

ঘন্টা দুয়েক বাদ গাড়িটা একটা লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে এসে পৌঁছেচে। ক্রসিং-এর গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁশ হল আমার। হুশ হুশ করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ। রেলগাড়ির আগমনী কানে আসতেই আমি চমকে উঠলাম। আপ কিম্বা ডাউন—একটি গাড়ি এসে পড়ল বলে—অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে—কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো লক্ষণ নেই!.....বিনে ভাড়ায় গাড়ি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি?

নিঃশব্দ রাত্রির শান্তিভঙ্গ করে গম গম করতে করতে ছুটে আসছিল ট্রেনটা। তার জ্বলন্ত চোখে মৃত্যুদূতের হাতছানি!

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায়?—এক্ষুনি এই যমালয়ের রথ থেকে নেমে পড়া দরকার—আরেক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে!

কোনোরকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়ি থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটাও গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুস্ হুস্ করে ট্রেন্‌টা চলে যাবার পর আমার হুঁশ হল।

নাঃ, মারা যাইনি—হুঁশিয়ার হয়ে দেখলাম। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনো —এবং মোটর গাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই—ছবির মতন দাঁড়িয়ে—আমার এবং মোটরটার টিকে থাকা একটা চূড়ান্ত রহস্য বলেই মনে হচ্ছে......

এমন সময়ে চোখে চশমা লাগানো একটা লোক বেরিয়ে এল মোটরের পিছন থেকে। "আমাকে একটু সাহায্য করবেন?" এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক—"যদি দয়া করে আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দ্যান, মশাই! আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সেখান থেকে একলাই এটাকে ঠেলতে ঠেলতে আস্‌ছি। সারা পথে একজনকেও পেলাম না যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সাথে যোগ দেন—লাইনটা পেরিয়ে আরেকটু গেলেই আমার বাড়ি। ওই যে- -দেখা যাচ্ছে—আর এক মিনিটের ওয়াস্তা।"

গ্যাস-মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম

খুব ভোরে ওঠার একটা উপকারিতা আছে, হাইজিনের বইয়ে পড়েছিলাম। সেই থেকে আমার ভোরে ওঠার বদ্ অভ্যাস।

তখন বাড়ির সবাই ঘুমন্ত। কাক চিল পর্যন্ত নিঃসাড়। একবার বাথ্-রুমে যাই, একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। শুকতারার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বাড়ির কেউ আমার আগে ভোরে উঠতে পারে না।

হ্যাঁ, খুব ভোরে আমি উঠি। উঠেই একটু ঘুমিয়ে নিই।

তারপর, প্রাতঃ-নিদ্রাটা সেরে উঠতে আটটা বেজে যায়। বাজবেই তো, না-ওঠা খুব সহজসাধ্য নয়! প্রথমে তো ময়লা ফেলা গাড়িগুলোর ঘড়র্ ঘড়র্, তারপরে রামাবতার সিং-এর রাম ভজন, তারপরেই বাড়ির বাচ্চা-কাচ্চাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ, পাড়ার উজ্বুক ছোঁড়াদের চেঁচিয়ে রিডিং পড়া—এই সব শুরু হয়, এর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে আরামে একটু গড়াগড়ি দেব জো কি!

সটান চলে এলাম মেজোমামার বাড়ি। সেই জন্যই।

কিন্তু এখানে এসে আরেক উৎপাত। না, আমার ভোরে ওঠার অভ্যাস বজায় আছে ঠিকই, তাতে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। তবে—

মামার বাড়ি কয়লা-উনুনের কারবার। খুব ভোরেই উনুনে আঁচ দেওয়া হয়। রান্নাঘর আবার একতলায়। কাজে আগুন দেবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়া একতলা, দোতলা, তেতলা ভেদ করে বাড়ির চিলকোঠা পর্যন্ত ছাপিয়ে ওঠে। আঁচ দেয়ার সাথে সাথে বাড়িময় তার হামলা ওই ধোঁয়ার ছোঁয়াচ।

কোনো ঘর বাকি থাকে না। দরজা ভালো করে ভেজিয়ে, হুড়কো দিয়ে কিছুতেই নিস্তার নেই। ধোঁয়া ঢুকবেই। আর সে কি ধোঁয়া রে বাবা! চোখে কানে দেখতে দ্যায় না, দম বন্ধ হবার জোগাড় বাপস!

সকাল সন্ধ্যায় রোজ এই উপদ্রব। সন্ধ্যায় ধোঁয়া খাওয়ার চেয়ে হাওয়া খাওয়াটাই আমি বেশি পছন্দ করতাম, কাজেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে কোনোদিন দ্বিধা করিনি। কিন্তু সকাল বেলার দিকটায়—!

বিছানা আঁকড়ে কদিন তো খুব যুঝলাম। কিন্তু নাঃ, আর পারা যায় না। পরাজয় স্বীকার করতেই হল। তারপর থেকে, ভোরে ওঠার পরই, ধূম্রলোচনের প্রাদুর্ভাব হতে না হতেই, তিরবেগে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। পাশবালিশের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই!

দিন কতক মুখ বুজে প্রাতর্ভ্রমণে করলাম। কিন্তু কাঁহাতক আর পারা যায়? হলই বা ভোরের হাওয়া! ভোরাই গাওয়ার মতোই উপাদেয় হল না হয়। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে তো? সইতে না পেরে একদিন মেজোমামাকে মুখ ফুটে বলেই ফেলি—"জানেন কয়লার উনুন ভারী অস্বাস্থ্যকর? সেদিন এক বইয়ে পড়ছিলাম—"

"কেন? হজম হয় না বুঝি?"

"না, হজম নয়, সেকথা বলছি না। ভারী ধোঁয়া হয় কিনা!"

মেজোমামা অবাক হয়ে যান— "কোন বইয়ে লিখেছে এ কথা?'

"কোন বই?" আমি আমতা আমতা করি—"বইটা? বইটা হচ্ছে হাইজিন। আমাদের ইস্কুলের বই।"

"বইয়ে লিখেছে এমন কথা! আশ্চর্য! আমি তো জানতাম কাঠের উনুনেই খুব ধোঁয়া হয়।"

"কাঠের উনুনে হয় হরদম ধোঁয়া আর কয়লার উনুনে বেদম ধোঁয়া। অবশ্য প্রথম দিকটাতেই কেবল। কিন্তু তাতেই যা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তা আর পূরণ হবার নয়। বইয়ের দরকার কি, চোখেই দেখতে পাওয়া যায় ধোঁয়া। নাকেই টের পাওয়া যায় বেশ। চোখে লাগে নাকে লাগে।"

এতগুলো কথা এক নিশ্বাসে বলে যাই। মেজোমামা যেন একটু কাবু হন।

"কেন দেখতে পাচ্ছেন না?" আমি বলেই চলি, "কড়িকাঠগুলোর পর্যন্ত কী অবস্থা হয়েছে। দেয়ালের চেহারার দিকে তো তাকানো যায় না। কালিঝুলি একাক্কার! বাড়িঘরগুলোর তো হাড় কালি হয়ে গেল! দেরাজ টেবিল আয়না আলমারীর হাল দেখলে কান্না পায়। আর কাপড়-চোপড়গুলো তো দুদিন যেতে না যেতেই ময়লা মেরে যাচ্ছে। কোনোদিকেই চোখ ফেরানোর উপায় নেই—এ সব কেন, কি জন্য?"

"ওই কয়লার উনুন।" মেজ মামাই ঘাড় নেড়ে উত্তর দেন।

"এসব তো বাইরের দশা—কিন্তু ভেতরের? ভেতরের কথাটা কি ভেবেছেন একবার?"

"না, ভাবিনি তো। কীসের ভেতরের?"

"আমাদের ভেতরের। আমাদের নিজেদের ভেতরের। বাইরে যেমন দেয়ালে কালি-ঝুলি দেখছেন, তেমনি আমাদের হার্টের লাংসের ভেতরেও অমনি ঝুল-কালি পড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার অত্যাচারে। এই কথাই হাইজিনে লিখেছে।"

এইবার মেজো মামা সত্যিই বড়ো কাহিল হয়ে পড়েন—"অ্যাঁ? বলিস কি? এই কথা লিখেছে তোর হাইজিনে? তা লিখবেই বা না কেন? এ তো কিছু আশ্চর্য কথা নয়। বাইরেও যেমন ভেতরেও তেমনি—কালি-ঝুলি পড়তে বাধ্য।"

ঘাড় হেঁট করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন। "যাক, একটা উপায় হয়েছে। এর প্রতিকার বের করা গেছে।"

আমি মাতুলের দিকে তাকাই।

"কাল সকালেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে বাড়ি ঘরে চুনকামের ব্যবস্থা করছি আমি। তাহলেই আর কালি-ঝুল থাকবে না। সব পরিষ্কার!"

"সে তো বাইরের করলেন, কিন্তু ভেতরের?"

"ভেতরের?" মেজোমামা আবার ভাবিত হয়ে পড়েন, "ভেতরের কি করা যাবে? ভেতরে তো চুনকাম করা যায় না! তা হলে? তুই কি বলিস তবে চুনের জল খেতে? না সেই লাইমজুস যেটা তোর মামি চুলে দ্যায়—?"

"আমি কি তাই বলেছি?"

"আহা, তুই কেন বলবি? তোর হাইজিনে কী বলে?" মেজোমামা উৎসুকভাবে আমার প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা!

"লাইমজুসটুস খাবার—অত কাণ্ড কববার কি দরকার মামা, তার চেয়ে এক কাজ করলেই তো হয়। আমাদের বাড়ির মতো আপনারা গ্যাসের ব্যবস্থা করলেই তো পারেন।"

'গ্যাস?" মেজোমামার চোখ জ্বলে ওঠে, "ঠিক বলেছিস! আঃ, এতদিন মাথাতেই আসেনি এই কথাটা! তাইতো! তাই করলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়! ঠিক বলেছিস! মানে, তুই না, তুই আর কি বলবি, তোর কি বিদ্যে! তবে তোর ওই হাইজীনের কথাই ঠিক!"

মেজোমামা তৎক্ষণাৎ গ্যাস কোম্পানিকে টেলিফোন করে দেন, বাড়িতে গ্যাসের কনেকশন দেবার জন্য। আমিও পরদিন সকালের সুখস্বপ্ন দেখতে শুরু করি।

গ্যাসের আমদানির পর দিনকতক খুব সুখেই কাটল। গ্যাসে সব রান্নাবান্না হয়—ধুমধাড়াক্কা একেবারে নেই। তাছাড়া আরো কতরকমের সুবিধা। স্নানের ঘরে গরম জল পাওয়া যেতে লাগল। শীতও পড়ে এসেছিল—ফুলকপির ডালনার সঙ্গে গরম জলে চান—এমন সুখকর স্নানাহারের যোগাযোগ কপালে খুব কমই লেখে।

কেরোসিনের হ্যারিকেন তুলে দিয়ে গ্যাসের বাতির বন্দোবস্ত হল। প্রচুর ঠান্ডা আলোয় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। আমরা সকলেই গ্যাসের দারুণ ভক্ত হয়ে পড়লাম। আমি তো বলেই ফেলাম—"হ্যারিকেনের আলোয় এতদিন কেবল কানা হতেই বাকি ছিল। কি খাসা আলো দেখছেন মামা? ইলেকট্রিক কোথায় লাগে!"

মেজোমামা ঘাড় নাড়েন—"হুঁ। গ্যাস মানুষ নয়রে দেবতা, আসল দেবতা! দ্বাপরে ছিলেন ব্যাসদেব আর কলিতে এই গ্যাসদেব।"

গ্যাসের মিটারটি মামার ভারী প্রিয়। দিনরাত তার দিকে মামার নজর। একটা স্পেশ্যাল চাকরই বহাল করে দিয়েছেন, সে সদা-সর্বদা ওটার তোয়াজ করছে। মিটারের একটু অযত্ন, ঝাড়পোঁছে ঈষৎ অবহেলা হয়েছে কি অমনি বেচারার জরিমানা হয়ে যাচ্ছে।

মামা বলেন—"বুঝলি, ওই মিটারটিই হচ্ছে গ্যাসের মালিক। ওইটিই আসল। ওইখান থেকেই গ্যাস তৈরি হচ্ছে—'

"উঁহু"—আমি প্রতিবাদ করতে যাই।

"আহা, তৈরি না হোক, তৈরি যেখানে খুশি হোক না, ওই মিটারই সেই গ্যাস আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে আসছে আমাদের বাড়ি। আর কী রকম ওর মাথা! কত গ্যাস খরচ হচ্ছে তার ঠিক ঠিক হিসাব রাখছে সেই সঙ্গে। কম কথা নয়।"

মাস কাবারে গ্যাসের বিল এল। এমন কিছু নয়, কয়লা ও কেরোসিনে যা খরচ হত তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশিই হয়তো। কিন্তু তেমনি আরামের দিকটাও তো বিবেচনা করবার। মামার ভয় ছিল কত টাকাই জানি দিতে হবে, কিন্তু সামান্য কয়েকটা টাকা দেখে তিনি প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন প্রকাণ্ড একটা বোঝা তাঁর মাথা থেকে নেমে গেল। পিয়নের বিল চুকিয়ে তাকে বকশিশ দিয়ে ফেললেন, আনন্দের আতিশয্যে।

আমাকে একটা টাকা দিয়ে বললেন, "যা বায়োস্কোপ দেখগে যা। ভাগনেরা প্রায়ই হাঁদা হয়, তুই সে রকম নোস। তোর বুদ্ধিতেই—না, তোর আবার বুদ্ধি কীসের! তোর হাইজিনের বুদ্ধি বলতে হবে। তা সে যাই হোক, গ্যাসটা নিয়ে আসা মন্দ হয়নি নেহাত। খাসাই হয়েছে।"

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে দেখি, মিটারের গলায় গোড়ের মালা ঝুলছে। জানা গেল ওর জয়মাল্যের জন্য মামাই দায়ি। মালাটা হস্তগত করব কি না ভাবছি, এমন সময়ে মামা নেমে এলেন। যেন আমার আগমনের অপেক্ষাই করছিলেন।

"কি রকম মানিয়েছে দ্যাখ দিকি। মালা পরে যেন হাসছেন আবার। ওর আমি আজ নতুন নামকরণ করেছি।" আমি চুপ করে শুনি।

"মিটার মানে তো মিত্র? যেমন তাদের প্রেমেন মিত্র হচ্ছে প্রেমেন মিটার, তাই আজ থেকে ওর নাম দিলাম আমি গ্যাস মিত্র। তুই কি বলিস?"

আমি কি বলব? মামার কথায় সায় দিতেই হয় আমায়।

"হ্যাঁ, তবে ঠিক হয়েছে। বলতেই হবে। না বলে উপায় কি!" মেজো-মামা আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করেন, "দ্যাখ, এই ফুলের মালায় হাত দিসনে যেন। তোর জন্য একটা ফুল আমি রেখে এসেছি তোর টেবিলে।"

কদিন থেকে শীতটা একটু জোর পড়েছিল। মেজোমামা আপিস থেকে ফিরে হঠাৎ গ্যাস মিত্রের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন দারুণ ঠাণ্ডায় তিনি কনকন করছেন। তৎক্ষণাৎ মিত্রবরের খাস খানসামার তলব হল।

মামা, তো বাড়ি মাথায় তুললেন—"অ্যাঁ, ও কি না গ্যাস চালিয়ে আমাদের সকলকে গরম রাখছে আর ওর নিজেরই এই দুর্দশা? এই প্রচণ্ড শীতে বেচারা একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। অ্যাঁ?"

খুব করে মাসাজ করা হল। খানসামা, আমি এবং মামা, তিনজনে মিলেই হাত লাগালাম। কিন্তু শৈত্য কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

মামা মিটারের গায়ে কান পেতে শোনেন—"কোনো আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। চলছে কিনা কে জানে। হায় হায়, এমন মিত্র আমাদের বেঘোরে মারা পড়ল, কেবল তোদের অবহেলায় অমনোযোগে।"

তারপর মামা মাথা ঘামাতে লাগলেন।

মামারা মাথা ঘামালেই কিনারা হয়। কেমন করে যেন হ'য়ে যায়, আমি বরাবর দেখে আসছি।

তিনি হুকুম করলেন—"গরম জল কর। করে ঢাল ওর মাথায়।"

বালতি বালতি গরম জল মিটারের মাথায় পড়তে লাগল। অল্পক্ষণেই মিত্র মহাশয়ের দেহ তেতে উঠল। মামা তখন একটা পোকার নিয়ে, এক জায়গায় একটু গর্তের মতো ছিল, তারই সুযোগ দিয়ে ভালো করে ভেতরটা খুঁচিয়ে দিলেন, তারপর আরেকটা ছ্যাঁদার মধ্যে একটা শিক চালালেন—চালিয়ে মিটারের ভেতরটা খুব কসে ঘুরিয়ে নিলেন—গায়ে যত বল ছিল সব দিয়ে। মুহূর্ত মধ্যেই মিস্টার মিটারের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আগেও তিনি চলতেন, কিন্তু তাঁর চালচলন কেমন নিঃশব্দ ছিল। এখন তাঁর ভেতরের কলকব্জা যেন সজোরে আর সশব্দে চলতে শুরু করেছে। আগে এমনটা ছিল না। মিত্র দেহে নবজীবনের সঞ্চার দেখে মেজোমামা খুব উল্লসিত হয়ে উপরে গেলেন। আমরা চিত্রপুত্তলিকা।

মিটারের উৎসাহের লক্ষণ আমরা সকলেই লক্ষ করছি কদিন থেকে। তার ভেতরের যন্ত্রপাতি প্রবল উদ্যমে চলছে। বাড়ির সব জায়গা থেকেই মিটারের আওয়াজ শোনা যায়। মেজোমামা ভারী খুশি। মিত্র মহাশয়ের ব্যায়রাম তিনিই চিকিৎসা করে আরাম করেছেন।

মাসকাবারে যথারীতি গ্যাসের বিল এল! গ্যাসের বিল দেখে মামার চক্ষুস্থির! আমাদেরও চোখ ছানাবড়া সবাইকার; মেজোমামা নাকি এই মাসে পনেরো লক্ষ ফিট গ্যাস পুড়িয়েছেন, এবং সেজন্য তাঁর কাছে গ্যাস কোম্পানির পাওনা হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। বিলের টাকাটা অবিলম্বে দিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মেজোমামার মাথার চুল সব খাড়া হয়ে উঠল, এবং তার মাথার চুল নামার আগেই মেজমামি ফিট হয়ে পড়লেন। পনেরো লক্ষ ফিটের পর আরেক ফিট বাড়ল। মানসাঙ্ক কষে আমি হিসাব করলাম।

"অ্যা? দেড় লক্ষ টাকা!" এই বলতে বলতে মামা বেরিয়ে পড়লেন। সোজা গ্যাস কোম্পানির আপিসের উদ্দেশে। এই প্রথম তিনি বেরুবার মুখে মিত্রবরের প্রতি দৃকপাত করতে ভুলে গেলেন।

গিয়ে কেরানিদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ মাসে কত গ্যাস তোমরা তৈরি করেছ?"



"ঠিক বলতে পারব না। তবে দশ লক্ষ ফিট এই রকম আন্দাজ।"

"কিন্তু আমার বিলে দেখছি তোমরা যা তৈরি করেছ, তার চেয়েও পাঁচ লক্ষ ফিট বেশি চার্জ করেছ তোমরা। এই ভুলটা শোধরানো দরকার।"

"কই বিল দেখি। হুম-ম-ম। ও ঠিকই আছে। মিটার দেখেই ওই বিল করা হয়েছে কিনা। মানে ও হচ্ছে আপনারই মিটারের হিসাব।"

"তা বলে তো যা গ্যাস তৈরি হয়েছে তার বেশি আমি কখনও খরচ করতে পারি না?"

"তার আমরা কি করব? মিটারের হিসাব কখনো ভুল হতে পারে কি?" কেরানিটি সবিনয়ে জবাব দেয়।— "বৈজ্ঞানিকসত্যের উপরে তো আমরা কলম চালাতে পারি না মশাই! আমরা মিটারের উপরই নির্ভর করি। মিটার যদি বলে আপনি ষাট লক্ষ ফিট গ্যাস পুড়িয়েছেন তবে আপনি তাই পুড়িয়েছেন নিশ্চয়। এমনকি যদি আমাদের সে মাসে এক ফিট গ্যাসও না তৈরি হয় তবুও।"

মেজোমামা বলেন—"বেশ, আমিও সোজা পাত্র নই। আমারও নাম অবিনাশ মিটার। যা তোমাদের ন্যায্য পাওনা তাই আমি দেব, তার বেশি কানাকড়িও না। হ্যাঁ, বাড়তির জন্য আমি এক পয়সাও দেব না, তবে ওই দশ লক্ষ ফিট যা তৈরি হয়েছে আর আমার পক্ষে খরচ করা সম্ভব, তার জন্যে এক লক্ষ টাকা দিতে আমি প্রস্তুত,

আমার বাড়ি ঘর বেচে ফতুর হয়েও আমি তা দেব,—কিন্তু ওই বাড়তি পাঁচ লক্ষ কি পঞ্চাশ লক্ষ কি পঞ্চাশ হাজারের জন্য একটি পয়সাও না।"

কেরানি বলে,—"পুরো বিলই আপনাকে মিটাতে হবে, তা না হলে আমরা গ্যাস বন্ধ করে দেব।"

"বেশ, তাই দাও তাহলে।" বলে মেজোমামা রেগে বাড়ি চলে এলেন।

ইতিমধ্যে মিত্র মহাশয়, মেজোমামা এসেই লক্ষ করে দেখেন, বিল হওয়ার পর থেকে আরো দশ লক্ষ ফিটের হিসাব তৈরি করে রেখেছেন এবং প্রতি মুহূর্তেই ফিটের পর ফিট হয়েই চলেছে। ঠিক আমার মেজোমামির মতোই। যে রকম মিনিটে মিনিটে হাজার হাজার টাকার অঙ্ক বাড়ছে তাতে আর কিছুদিন চললে গ্যাস কোম্পানির কাছে তাঁর দেনা, বিগত মহাযুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিরা সবাই মিলে আমেরিকার কাছে যা ঋণ করেছিল তার সীমা ছাড়িয়ে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা হতে থাকে।

মেজোমামার মেজাজ গেল ক্ষেপে। তিনি এক লোহার ডান্ডা নিয়ে এসে, বলা কওয়া নেই, দুদ্দাড় করে মিটারকে পিটতে শুরু করে দিলেন। যতক্ষণ ওই পদার্থ নিতান্ত অপদার্থে পরিণত না হল ততক্ষণ ওকে রেহাই দিলেন না। তারপরে ওই জড়পিণ্ড, ভূতপূর্ব গ্যাসমিত্রের খানসামাকে দিয়েই বাড়ি থেকে বহু দূরে চৌমাথার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। তারপরে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

পরের দিন থেকে আবার সেই ধূম্রলোচনের প্রাদুর্ভাব!

শরীর গরম রাখো !

কী করে শরীর গরম রাখা যায়, সেই এক সমস্যা। গ্রীষ্মকালের কথা নয়, শীতের দিনের কথাই আমি বলছি।

যখন শীতকাল জাঁকিয়ে আসে, সারা রাত হিম পড়ে, সব সময়েই হাড়-কনকনানো বেধড়ক ঠান্ডা—কী করে শরীর গরম রাখা যায় এ-সমস্যা সেই সময়েরই। এবং, এই বিষয়ে, এই বিষয়টিতেও অনেকের চেয়েই আমি যে একটু বেশিই জানি, আমার স্বভাব-সুলভ বিনয় সত্ত্বেও সেকথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

অবশ্যি ইচ্ছে করলে আমি একেবারে গোড়া থেকে, রক্ত থেকেই শুরু করতে পারতাম। না, রক্তপাত নয়, রক্তারক্তির কাণ্ড নয় কোনো, কেবল আমাদের রক্তের ভেতরকার লোহিত কণিকারা কোনগুলি, তাদের সংখ্যা কত, স্বভাবত কী তারা এবং কার্যকারিতাই বা কোথায়—শরীর গরম রাখার পক্ষে এদের কোনো উপযোগিতা আছে কি না—সেইসব নিয়েও শুরু করা যায়। তা ছাড়া, মিষ্টি জিনিসই বা আমাদের কী কাজে লাগে, চিনির সঙ্গেই বা দৈহিক উত্তাপের কী যোগাযোগ, তা নিয়েও আরম্ভ করা যেতে পারে।

কিন্তু তা আমি করব না। কারণ, তাহলে আর আমি নিজেকে থামাতে পারব না। এ প্রবন্ধ শেষ করে উঠতে পারব না কোনোকালেই।

এ-বই ও-বই সে বই থেকে এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত সংগ্রহ করে স্বয়ং আমি যে মৌলিক সিদ্ধান্তে এসেছি, সেইটাই আমি সংক্ষেপে তোমাদের জানাব কেবল।

প্রথমেই, আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল কুসংস্কার রয়েছে, সেগুলি দূর করে ফেলা উচিত। আমাদের ধারণা যে, ঘরের দরজা-জানালা চেপে বন্ধ করে রাখলেই ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মোটেই তা নয়। নির্মল বাতাস সেবন করতে না পারলে গরম থেকেই বা কী লাভ? খুব খুঁটিয়ে ভেবে দেখলে, আসলে তা গরম থাকাই নয়। চিরকালের মতো ঠান্ডা হবার পথ পরিষ্কার করাই বলতে গেলে। ধরো, চোদ্দো ফুট বাই চোদ্দো ফুট একটা ঘর, তার সব দরজা জানালা যদি চেপে বন্ধ করে দাও একটুও ফুটো বা ফাঁক না রাখো, তার ফল কী হবে? খানিক বাদেই সে-ঘরের বাতাসে থাকবে খালি নাইট্রোজেন—কিংবা হাইড্রোজেনও থাকতে পারে—সঠিক আমি বলতে পারব না। তবে অক্সিজেন যে একেবারেই নয়, সে কথা জোর গলাতেই বলতে পারি। আর অক্সিজেনই হচ্ছে আমাদের নিশ্বাসের প্রধান উপজীবিকা, তা নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। অন্তত অধিকাংশ পণ্ডিতের এই মত।

অতএব, যদি সত্যি-সত্যিই গরম থাকতে চাও, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়দের লঙ্ঘন না করেই, তাহলে দরজা জানালা সব অবাধে উন্মুক্ত কর। আগাপাশতলা ফাঁক করে দাও ওদের। এধার-ওধার দু-ধারেই। ঢুকুক ঠান্ডা হিম, ছুটুক হিমেল হাওয়া—একধার দিয়ে ঢুকে আরেক ধার দিয়ে বেরিয়ে যাবে; ভয় কীসের?

শীতকালের দিনে গরম পোশাক পরাও আরেক হাস্যকর বদভ্যাস। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, গরম থাকবার জন্যে গায়ে গুচ্ছের কাপড় জড়ানো কোনো কাজের কথাই না। কোট, ওয়েস্ট-কোট, সোয়েটার পুলওভার, ওভারকোট, আলোয়ান, কম্বল, বালাপোশ—এসব জড়িয়ে কী হয়? এত কি সত্যি-সত্যিই আমরা গরম থাকি? উঁহু! ও তো গরম থাকার ছলনা মাত্র। আসল উষ্ণতা আসে রক্তের চলাচল থেকে, সেইদিকেই আমাদের লক্ষ দেওয়া দরকার।

এমনকি উনুনের কাছে বসে আগুন তাপিয়েও কোনো লাভ নেই। ওতে যেমন শরীরের একধারটা একটু তাতে, তাততে থাকে, অন্যধারে তেমনি আবাব শীত-শীত লাগায় আরো। কোন ফল নেই, খালি পণ্ডশ্রম।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রক্তের চলাচল—সেইদিকেই আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। নিজের দেহে উষ্ণতা সঞ্চার করতে হলে নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকে তা লাভ কবাই যথার্থ লাভ। সেজন্যে রক্তের চালচলনকে দ্রুতগামী করা চাই এবং রক্তকে



আরও বেশি সচল, আরো সক্রিয়, আরো ধাবমান করবার জন্যে দরকার হচ্ছে ব্যায়ামের।

আমি বলবার আগেই, না-বলতেই, তোমরা তা ধরতে পেরেছ, আমার বিশ্বাস। ব্যায়ামের কথা কে না জানে? তার উপকারিতাই বা আজ কার অজানা?

কী কী ব্যায়াম করা চলতে পারে, তারই একটা ফিরিস্তি আমি এখানে দিচ্ছি। শরীর গরম রাখবার জন্যেই এসব ব্যায়াম:

(ক) শীতকালের দিনে, খুব সকালে উঠেই—এই ভোর পাঁচটা নাগাদ—সবপ্রথমেই ভর্তি এক গেলাস ঠান্ডা জল। তার মধ্যে বরফের কুচি ফেলে খেতে পারলে আরো ভালো।

(খ) তারপর লম্বা এক হাঁটন দাও—পাক্কা দশ মাইলের। একটা হাফ প্যান্ট আর আধখানা ঢিলে শার্ট গায়ে দিয়ে। দশ মাইলের আগে থামবার কোনো কথা নেই, তবে ইচ্ছে করলে মাঝে মাঝে ছুট লাগাতে পার।

এর ফলে, সেই শীতের দিনেও, তোমার দেহে বেশ উষ্ণতা যাতায়াত করছে, দেখতে পাবে। এমনকি ঘেমে ওঠাও অসম্ভব নয়।

(গ) তারপর ফিরেই, এক গেলাস ঠাণ্ডা ঘোলের শরবত—বরফ তার মধ্যে রয়েছেই। এই হল গিয়ে ব্রেকফাস্ট। তারপর খোলা মাঠে গিয়ে, খোলা গায়ে, শিশির-বিস্তীর্ণ ঘেসো জমির উপর আধঘণ্টাটাক, আর কিছু না, খালি ডিগবাজি খাও। অল্পক্ষণেই দেখবে সর্বশরীর যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

(ঘ) তারপরের কাজ হচ্ছে, কাছাকাছি কুস্তির আখড়ায় গিয়ে ঢুঁ মারা। একজন পেশাদার কুস্তিগীর ভাড়া করে তার সঙ্গে খানিকক্ষণ দলাই-মলাই চালানো শরীরের গরম চালু রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ সদুপায়। তার চটকানো, তার ঘুঁষি, তাঁর রঁ্যাদা, তার দ্বারা দলিত মথিত হওয়া, কী যে আরামদায়ক! এক কথায়, কুস্তির মতো উপাদেয় ব্যায়ামই আর নেই। কুস্তির ধাক্কায় যদি একেবারেই ঠান্ডা মেরে না যাও, তাহলে কুস্তি সেরে তুমি নবজীবন লাভ করেছ বলেই তোমার সন্দেহ হবে। মনে হবে সে-তুমি আর নেই। একেবারে নতুন মানুষ, এমনকি এত নতুন, যে আয়নায় নিজেকে দেখে তুমি চিনতেই পারবে না। যেমন নতুন তেমনি টাটকা, যেমন টাটকা তেমনি গরম। সেইরকম সরগরম।

(ঙ) তারপরে? তারপরে আর কী? বাগানে গিয়ে মাটি কোপাও। মাটি পড়েই রয়েছে, এতেও শরীর গরম থাকে। এবং মাটি কোপানোটা লাভজনক কাজেও লাগানো যেতে পারে। এখানে ওখানে আজে-বাজে যা-তা কুপিয়ে কোনো ফল নেই। বরং একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষে একগুঁয়ে হয়ে মাটি কোপাতে কোপাতে, সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সটান চলে যাও—না, ঠিক ট্যাকশালের দিকে নয়, ব্যায়ামকে অতটা সার্থক করা হয়তো সমীচীন হবে না—তবে যদৃচ্ছাক্রমে যদ্দুর ইচ্ছে চলে যেতে পার। এই ধরো, সিঙ্গাপুর অব্দি? কিংবা অস্ট্রেলিয়া? অস্ট্রেলিয়াই বা মন্দ কী?

যখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছবে, তখন দেখবে, তোমার শরীরে অদ্ভুত একটা উষ্ণতার সঞ্চার হয়েছে। আশ্চর্য নয়।

গরম থাকার আরো অনেক চমৎকার চমৎকার উপায় তোমাদের আমি বাতলাতে পারি, কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, স্বাস্থ্যমূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তাবৎ বই রয়েছে আমার পাশের ঘরে। সেখানে যাবার একটু অসুবিধেই আছে। না, ঘরটা তেমন ড্যাম্পো নয়, এবং জানালা-টানলাও আছে, আঁট-সাঁট করে আঁটা রয়েছে সব; তবে কিনা, সব জড়িয়ে, জানলাগুলোর তিনটে খড়খড়ি ভাঙা। একেবারে নেইই বলতে গেলে—তার ভেতরে দিয়ে হুড়মুড় করে যা হাড়-জমানো বাতাস—বাব বাঃ! ভাবতেই আমি ভিরমি খাচ্ছি!

আর যা সর্দি লেগেছে ভাই, কী বলব! হাঁচতে হাঁচতেই প্রাণটা গেল! আমার হাঁচির আবার অদ্ভুত ধরন; আরম্ভ হলে আর থামতেই চায় না চলছে তে চলেইছে, একটানা ধাপা-মেলের মতন এক নাগাড়ে। প্রায় পাঁচশো হাঁচি হেঁচে তারপর থামবে। তার আগে নয়।

আমি নিজে ঠান্ডায় কাতর বলে তো তোমাদের উপদেশ দিতে বাধা নেই! পৃথিবীর উপকার তো করতেই হয়! প্রাণ দিয়েই করতে হয়। তবে কিনা, আপনি বাঁচলে তারপরে পৃথিবী। আমায় খুব পীড়াপীড়ি করলেও, ওরে বাবা, ওই ভাঙা-খড়খড়িওলা পাশের ঘরে কিছুতেই আমি পা বাড়াব না।

ব্যায়াম? ব্যায়ামের কথা বলছ? ব্যায়াম করব কি, এপাশ ওপাশ করাই আমার পক্ষে অস্থির কাণ্ড! ব্যায়াম আর ব্যারাম আমার কাছে এখন অভিন্ন বানান।

গায়ে সোয়েটার এঁটে, বিছানায় শুয়ে, কোটরে কোটরে, বালাপোশ জড়িয়ে, তার উপরে আলোয়ান মুড়ে—সবার উপরে লেপে প্রলেপ তো রয়েছেই—শীতে কাঁপতে কাঁপতে, তোমাদের জন্যে এই প্রবন্ধটা লিখছি।

শীতকালটা, ভাবছি, এইভাবে, এমনি করেই কাটাতে হবে। কায়ক্লেশেই কাটাতে হবে। কী করব?

কলকাতার হালচাল

❖ প্রথম ধাক্কা ❖

হর্ষবর্ধনের বাস-লীলা

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনবাবু দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড়ো মানুষ। কর্ম-সূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন; এবার ওঁদের শখ হল কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয়নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামি নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেননি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটর গাড়ির কথা শুনেছেন, বড়ো বড়ো বাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমনকি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি তেমনি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না। রাস্তায় বেরুলে খালি মানুষ আর মানুষ —কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পরমুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হালকা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোনোদিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্রাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বইকি। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে ওস্তাদ—চেনা, অচেনা, অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের এমন ভালো লাগে—সেজন্যে কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বলবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত পরোয়া নেইকো। কিন্তু কলকাতার লোকরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারী দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে!

বড়ো ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে ভবে এসে করলাম কী? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে?'

কাঠের প্রতি নেহাৎ অবিচার হচ্ছে দেখে ছোটো ভাই মৃদু আপত্তি তুলেছিল—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে ঠিক না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগে।'

বড়ো ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি না হয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব—না দেখে ছাড়ছি না।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোটো ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল বলে এক্ষেত্রে সে চেপে যায়। অতএব একদা অতি প্রত্যূষে গৌহাটির বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড়ো কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল।

গোটা প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু-দুবার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তাঁরা যাচ্ছেন তবু হতভাগা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সারা রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়ব এজন্যে হয়তো সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন—'উঁহু।'

গোবর্ধন ভ্রু কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন সে হাওড়া দিয়ে সটকে পড়েছে?'

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'উঁহুঃ।'

বড়ো বড়ো গবেষণা এইভাবে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ হওয়ার মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে, 'তবে তুমি কী ভাবছ শুনি?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাৎ মিথ্যা কথা লেখেনি!'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তাই বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এমন কখনও হতে পারে?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক হন—'কেন স্পষ্টই তো লোকটাকে না মিশতে দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতেনাতেই প্রমাণ। চল, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করিগে।'

দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠিখানা তোর কাছে আছে তো? বাড়ির ঠিকানা ছিল তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩/১২ রসা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়তো এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে বিগড়ে যায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে তেড়ে মারতে আসে।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না।'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে—'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে? গোবরা, ওই যে ভারী গাড়িখানা বেজায় ধুমধাড়াক্কা করেআসছে ওটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার ডবল ডেকারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড়ো গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো? কলকাতায় ফুর্তি করতে আসা টাকার মায়া করলে চলবে কেন?'

শীতের প্রত্যূষে জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র খাড়া হল। হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তোমার তেরোর বারো রসা রোড। কোথায় জানা আছে তো?'

কন্ডাক্টর জবাব দেয়—'আমাদের তিন নম্বর বাস ওইদিকেই তো যায়।'



মানিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নোট বার করে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কন্ডাক্টর জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; পুরোটাই ওর ভাড়া ধরে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা।'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসৎ পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখছ কতগুলো সিট, তার ওপরে গদিমোড়া! আবার হাওয়া খেলবার জন্যে এতগুলো জানলা! একটা বড়ো আয়নাও রয়েছে সামনে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা? মোটরগাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বইকি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী হল?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি গাড়িখানায় চাপা যাবে, কী বল দাদা?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কথা বলতে? সাত দিনের জন্যে এটাকে ভাড়া করে ফেলছি এক্ষুনি।'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিসফিস করে গোবর্ধনকে বললেন— 'উঠেছে উঠুক, কিছু বলিস নে। মেয়েটা যদি খানিকটা মোটরের হাওয়া খেতে চায় ঘুরে—খাক না, ক্ষতি কি; জায়গা যথেষ্টই আছে।

তরুণীটি একটি সিকি বের করে কন্ডাক্টরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হতে দিচ্ছি না! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্যে কোনো পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।' বলে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরাম করে হাওয়া খান—কিন্তু তার জন্যে ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্যে দাদার গোঁফ ধার নেবে কি না ভাবল একবার।

দুমিনিটের মধ্যে আরো গোটা তিন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটা সোটা মেয়েছেলে এবং আধ ডজন ফচকে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রু কুঞ্চিত হল; বড়ো ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করল—'কে বলছিল গো কলকাতার লোকরা মিশুক নয়?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতেও তাঁর কম বেগ পেতে হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে নিজের অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারী খরচে কিন্তু দাদা!'

'চলে আসুন! জায়গা যথেষ্ট রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সাও দিতে হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়িতে আসছেন।' হর্ষবর্ধন থামবার ফুরসৎ পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দুধারের সিট ভর্তি হয়ে গেল, এমনকি মাঝামাঝি দুথাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভর্তি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে—'দাদা, দাদা, দেখ দেখ, এক চীনাম্যান!'

দাদা অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাস-বিশ্রুত হুয়েন-সাং ফা-হিয়েনের বংশধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গুরুগম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন—'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে!'

গোবর্ধন যোগ করে—'হ্যাঁ দাদা! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই এ জগতে সুখী!'

এমন সময়ে কন্ডাক্টর জানাল যে রসা রোড এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোনো রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন---'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান নিয়ে যাও এঁদের। আরও যা টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন সারা দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি! কারুর একটি পাই পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা?'

'হ্যাঁঃ! কে বলে কলকাতার লোকরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যা কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা! মেশামেশির ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার জোগাড় হয়েছিল! শেষকালে একটা চীনাম্যান পর্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত! এমনকি মেমরাও। বাপরে বাপ! এ রকম গায়ে পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—'

গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী? কী? পকেট মেরেছে নাকি?'

'উঁহু! আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের। ভারী মুশকিল করেছি! খপ করে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভালো। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি!'

❖ দ্বিতীয় ধাক্কা ❖

গোবর্ধনের গৃহারোহণ

চওড়া ফুটপাথে উঠেই হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?'

এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাকতব্য' জায়গার খোঁজ করা কী কষ্টসাধ্য—কী ভীষণ ঝকমারি! এই সমস্ত নিদারুণ মিশুক লোকদের মাঝখানে শেষে কি ফুটপাথেই দিনরাত কাটাতে হবে?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

'বাড়ির ঠিকানা বাগাবার কী হবে রে?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ির ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল!'

'ওই একই কথা, একই কথা হল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'নিরাপদও তো নয় জিজ্ঞাসা করা! যদি এখন খুঁড়ো, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ি? যে রকম সব মিশুক দাদা।'

'হুঁ!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারী গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা সমস্ত ভাড়াটা গুনে শেষে চৌকির তলাতেও শোবার ঠাঁই পাব কি না সন্দেহ!'

'তবে?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব?'

'নিরাপদ তো?'

'না-হয় যত রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই তো? তা আনুক গে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালোবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয়—তারপর গড়ের মাঠ বলে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায়? তুমিই তো বলছিলে গো?'

'সনাতনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোনদিকে জানি নে তো।'

'সেটা জেনে নিয়ে একটা কোনো খেলার ছুতো করে ছেলেদের সব ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল তাহলে।'

দুজনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে—'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে!'

খোকার দিক থেকে তীক্ষ্ণ জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না!' না তাকিয়েই সে জবাব দেয়।

গোবর্ধন ভড়কে যায়, কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কী আছে, এই ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে, তার কম্পিত কণ্ঠ শোনা যায়—'তবে কী বললে তুমি সাড়া দাও শুনি?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন? আমি কি খোকা? খোকা তো যারা দুধ খায়।' ছেলেটির স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ পায়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা করে এবার হর্ষবর্ধন নিজে আগুয়ান হন—'ওহে বালক! খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো এখানে এত সব বাড়ির ভেতরে তেরোর বারো কোনটি?'

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টুশীলতা' তৎক্ষণাৎ থেমে যায়—'কী বললেন, তেরোর বারো?'

'হ্যাঁ, তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ—যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে জানলেন? আমিই তো! আমারই বয়স তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে!'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্ত মধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তেই বালক ও সাইকেল-চালক দুজনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দেবার কোনো সঙ্গত কারণ হর্ষবধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু?'

'উঁহু!'

'তোর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি!'

গোবর্ধন এবার চটে—'বুঝব না কেন? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো? যে-কোনো ছেলে যখন খুশি চাপলেই হল।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো—তা কিছু বুঝেছিস? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর আছে—মার্কামারা ছেলে সব!'

বলে হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সমান পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর। কেন, কলকাতায় ছেলের কি কিছু কমতি? এই যত লোক দেখছ তাদের প্রত্যেকের গড়-পড়তা চারটে-পাঁচটা করে ছেলে—আবার কারু-কারু চোদ্দো পনেরোটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে যায়—বাপ মা-রা না খুঁজে পায় সেইজন্যেই এই নম্বর দেওয়া! এ আর আমি বুঝিনি? তোমার ঢের আগেই বুঝেছি।

''আমার আগেই বুঝেছিস?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস, তাই বল্? আরে মুখ্যু, আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায়? তাহ'লে আমার এই ইয়া গোঁফ—তোর কোনো গোঁফ নেই কেন?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাক্‌বিতণ্ডা অগ্রসর হবার পথ পায় না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার। 'বড়ো শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোনোদিন তুই মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোকেও নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর সে ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে—'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—সাইকেলে চেপে সটান চোখের উপর সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বলেন—তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি হত পয়সা খরচ করে বালকদের সঙ্গে মিশবার জন্যেই কলকাতায় এসেছি নাকি? এ রকম ভয় দেখাবার মানে? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব! আমরা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক লোক—বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন? দূর দূর!'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ওই যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

হর্ষবর্ধন পাশ ফিরে দেখেন, সত্যিই তো, তোরোর বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখ বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার করে নম্বর দাগা—১৩।১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই মাঝে দাঁড়ি দিয়ে দু ভাগ করে দিয়েছ তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থাকে না। হঠাৎ তাঁর মনে এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা করে দেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা! এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দুজনে এতগুলো ঘরে শোবই বা কী করে?'

'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন সমস্যার সমাধান করে—'সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে। তুমি একটায় শুয়ো, আমি একটায় শোব।'



'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করেন—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড়ো বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না!'

দুঃসাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়। 'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি । কিন্তু তুমি আমায় যখন-তখন বোকা বলতে পারবে না—তা বলে দিচ্ছি।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন ? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেন—ছেলেটা যেমন খোকা নয়, তুইও তেমনই বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন 'হ্যাঁ. মনে থাকে যেন। পের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কণ্ঠ করুণ হয়—'বিদেশে বিভুঁয়ে এসে অমন করিসনে গোবরা। ভূতের তাড়ায় কোনোদিন হয়তো জানলা টপকে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে! আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি একগুণ বোকা হোস আমি একশো গুণ বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তাহলে হাজার গুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ, তাই।' হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার ম্রিয়মাণতায় গোবর্ধনের দুঃখ পায়—'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি একগুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

মিনিটের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায় দুই ভাইয়ের।

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকান্ড ভারী তালা লাগানো। এত কষ্ট করে কলকাতায় এসে গৃহদ্বারে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশঙ্কা কোনোদিন করেননি। ঘরে না ঢুকতে দোরগোড়াতেই এই তালাক—এ কী! তিনি ভারী মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদার কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয়—'কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়; 'তিনতালা বাড়ির যদি ভাড়া গুনতে পারি তাহলে সামান্য একতালা ভাঙার দাম দিতে পারি না নাকি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল্!' হর্ষবর্ধন হুকুম দিয়ে দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে কিন্তু অল্পক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে। মোটা তালাটা যে দুটি কড়াকে করায়ত্ত করে রয়েছে সে-দুটি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধরেই কাড়াকড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে বসে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার উপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভকরেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এক ইঞ্চি পিছু হটে না—হটবার কোনো মতলবই দেখায় না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার!

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতায় ভালো কাঠ রপ্তানি করার ফল দ্যাখ্ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবরা গুম হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুণ ধরিয়ে পাঠাব তেমনি। আমাদের ম্যানেজার কি আর সাধে বার-বার করে লিখে পাঠায় যে কলকাতায় ভালো কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই; খেলো কাঠ পাঠালে ভালো হয়! এখন তার মানে বুঝছি! হুঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝছি!' দরজার পরাকাষ্ঠার সামনে তিনি পাদচারণা শুরু করেন।— 'প্রতি পদক্ষেপে টের পেয়েছি।'

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশায় সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখলাম না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?' জানলা খুলে দেব, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'তালগাছে ওঠা আমার অভ্যাস, নারকোল গাছেও উঠেছি। খেজুর গাছেই কেবল উঠিনি কখনো।' সে কয়ঃ 'খেজুর কাউকে গায় পড়তে দেয় না তো। গায়ে যা কাঁটা।'

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেন—'হ্যাঁ ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা রে? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর-সরিয়ে নেমে পড়লেই হল।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে?'

'তাই করি, কী বল দাদা? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন? বেশ মজা হবে।'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। ডবল হয়ে যাবি। দুসাইজ হয়ে যাবে তোর। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট করে জানালাটা খুলে দে বরং। কেবল রেলে চেপে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্-ঝিম্ করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস, সাবধান, পা ফস্‌কে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখেন।

ছোঁড়াটা আবার গড়িয়ে পড়ে গড়বড়িয়ে না যায়।

❖ তৃতীয় ধাক্কা ❖

গৃহপ্রবেশ ও শেষরক্ষা

পাইপ-পথে গোবর্ধন উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন জানালা-যোগে গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অত বড়ো বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো ছোকরা! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ! ওই প্রকান্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কি সোজা কথা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! এত বড়ো ভুঁড়ি নিয়ে ওই খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা হর্ষবর্ধনের কম্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামির মতোই তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে নাকি! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরে একতলার একটা জানলার ছিটকিনি খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি বহিষ্কৃত করে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে, কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল একথা তাঁর মনে হয় না,—মুহূর্তের মস্তিষ্ক-চালনায় যে বিপজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্তলোকে চমকে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি-কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতাহাতি করাই সার, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার বলে এতদিন যাদের ঘৃণা করে এসেছেন, মনুষ্য-পদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হন—হাতকে পায়ের মতো ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে।

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের ভেতর তুমুল পাল্লা চলে —হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভুঁড়ি বোধহয় বাঁচে না এ-যাত্রা আর! এ রকম অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে কুটো জ্ঞান করে ঝুলে পড়লেন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন, —'পড়লি তো? এই ভয়ই করছিলাম আমি! গায়ে যদি হতভাগার একটুখানিও জোর থাকে!'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়েই উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে, 'আচ্ছা, আমি না হয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর। আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে উঠে পড় না!'

'পারবি তো?' হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন, 'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায়। বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না।' হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারী হয়ে আসে।

'তুমি ওঠ না দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো সে কুঁজো নয়। একি সহজে ভাঙবার? এ তোমার সেই মাটির কুঁজো না!'

'তাহলে উঠছি কিন্তু! উঠি?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন—গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোনো উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই ফের নামিয়ে নেন; আবার পদক্ষেপ করেন, কেমন মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

মাটির কুঁজো নয় কিন্তু ধপাস হলেই সব মাটি!

'তাড়াতাড়ি কর দাদা!' গোবর্ধন ফিসফিস করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে!'

'ওদের মতলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্ছে!'

উঁহু, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, বলছি তারপর।'

'দাদা, ভারী দেরি করছ তুমি! লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষটায়!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বড় দেরি হয় না—জানালাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়তো না-মাটির কুঁজো ভাঙবার মতো হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুগে ওঠবার তরফে তার চেষ্টা থাকায় কোনো রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানালার অন্তরালে দাদার মহাপ্রস্থানের পথে গোবর্ধন একটা বঙ্কুল্য-মান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়েই ওঠেন, মানে, অগত্যা তাঁকে উঠতে হয়, তখন আর অন্য উপায় কী! গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে কেমন দু'জনারই ওঠা হল!' গোবরা বলে। 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবর্ধন সে কথার কোনো জবাব দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের

শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়—'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস? বন্ধ করে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানালা বন্ধ করে। 'কেন? লাফিয়ে আসবার ভয় করছ ওদের?

'করছিই তো! ওরা কারা, এখনো বুঝতে পারিসনি বুঝি?'

'না তো!' গোবর্ধন মূঢ়ের মতো তাকায়।

'সেই বাসের যত লোক!'

'অ্যাঁ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক করে দৃষ্টিতে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত রয়েছে দাদা! দলে বেশ ভারী হয়ে এসেছে এখন!'

'এখানে থাকবার মতলবে!' হর্ষবর্ধন রহস্যটা ফাঁস করে দেন 'বুঝেছিস? বিলকুল বিনে ভাড়ায়'।

গোবর্ধন অসন্তোষ উন্মুক্ত করে—'গাড়ি চড়লি—অমনি অমনি হাওয়া খেলি—হল। তার উপর আবার বাড়ি চড়াও? আবদার তো কম না এদের!'

হর্ষবর্ধন জানলায় খিল এঁটে দেন– 'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে সব। কতক্ষণ আর থাকবে?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো?' হর্ষবর্ধনের আশঙ্কা হয়। 'কী মনে করিস তুই?'

'উঠুক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়, 'চল আগে থেকে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক গে ছাদে। বাড়ি ঢুকতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ!'

দুই ভাই তড়িৎগতিতে সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত করে তবে দুজনের দুশ্চিন্তা দূর হয়।

গোবরা বলে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নাম! বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখিনি বাপু! চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের! বটে? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে সব।'

হর্ষবর্ধন কিছু বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দুই ভাই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শনে বহির্গত হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেক্স, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামি দামি কাঠ কিনে এনে ভেঙে চুরে ট্যারা বাঁকা করে কী সব করেছে দেখেছিস?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের অভিমত জানতে চান।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কাঠের শ্রাদ্ধ কেবল!'

'সোজাসুজি চৌকি করলি, টুল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফুরিয়ে গেল—কাঠ নিয়ে এত মারপ্যাঁচ কেন রে বাপু!'

'দরকার তো শোবার, বসবার, আর কখনও কদাচ দু-এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হল।'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়ে কথা। কিন্তু এসব কী।' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায়। 'কাঠগুলোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা! ওই দ্যাখ একটা গোল টেবিল— মোটে তিনখানা পা!'

গোবরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'তিন পায়া তো পদে আছে, ওই কোণেরটা দেখেছ দাদা?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা—তাও আবার ঠিক মাঝখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোনো রকমে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে, 'ও টেবিল কোন কাজে লাগবে? ওতে কি বসা যাবে?'

হর্ষবর্ধনও সহানুভূতি জানান—'হুঁ, বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি—কেমন পদ্য হয়ে গেল! বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!

হর্ষবর্ধন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে পদ্যটাকে আবৃত্তি করেন।

গোবর্ধনও করে। তারপর দুই ভায়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

গোবর্ধন বলে, 'আবার মিলেও গেছে কেমন! কোনো খবরকাগজে ছাপতে দিয়ে দাও দাদা। বেশ পদ্য!'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সূচনা হয়—বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

তারপর দুভাই একটা বড়ো ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন, 'একটু বসা যাক।'

দুটো চার-পায়া টেবিল—যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই— পাশাপাশি এখন টানা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটায় গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা কি আমাদের পোষায় বাপু? ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম!'

'নিশ্চয়ই তো! এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও যায়। আসনের সঙ্গে বিলাস-ব্যসন।'

'খাবার দরকারের মতো ঘুমোনোর দরকারও তো মানুষের প্রতি মুহূর্তে! গোবরা, ওই গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ার দুটো নিয়ে আয় তো! পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্যে চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনেরা পরস্পরের প্রতি তাকায় আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেয়। গোবর্ধন দাদাদের কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশ থেকে জুতোর আওয়াজ আসে। হর্ষবর্ধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন— 'তারাই! বুঝতে পেরেছিস?'

'তালা ভেঙে ঢুকেছে তাহলে! কী হবে এখন?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে। তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তাই তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! এমন কথাও বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল' থাকতে এমন জায়গায় আবার আসে মানুষ! ছ্যা ছ্যা!' গোবর্ধন যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্র। তার সাহস হয়, হাঁক ছাড়ে—'কে?'

লোকটা চমকে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় করে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা কী আছে? কলকাতার লোক ভারী অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয় অদ্ভুত-কিছু এইরকম একটা আঁচ করে এতক্ষণে লোকটার ভয় ভাঙে, তার কম্পিত অভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয়—'কেআপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানির বড়ো কর্তা আর ছোটো কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু, তুমি কে? কড়িকাঠ থেকে নেমেছ বলেই মনে হচ্ছে যে! ভূত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে—'না, আমি কর্মচারী।' আমতা আমতা করে বটে, কিন্তু হাওড়া হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন, 'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল তোমার? শিয়ালদয়ে সকালে যাওয়া হয় নি কেন? মনিব আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না এতদূর তোমার আস্পর্ধা—তারপরে তুমি নাকি তবিল মেরে সটকেছ—'

'হুঁ, আমরা যখন শিয়ালদয়ে নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সটকানো হয়েছে!' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়। —'হাওয়া হয়ে গেছ হাওড়া দিয়ে!'

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম!' হর্ষবর্ধন হুকুম পাশ করেন,— 'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। টাকা ওড়াবার জন্যেই আমাদের কলকাতায় আসা—ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে রাখলুম।'

'হ্যাঁ, মেরে থাকো ভালোই করেছ, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। ব্যস, খতম।' গোবর্ধনও রায় দিয়ে দেয়।

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়— 'আজ্ঞে আপনারা ভুল করছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।'

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হয়ে যান, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক কর্মচারী রাখে— এও কি সম্ভব; কিন্তু ক্রমশ এ কথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে

নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না— 'তাহলেও বলি বাপু, তোমার এ কী রকম আক্কেল! আমরা হলুম ভাড়াটে—আর আমাদের তালা বন্ধ করে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরারও কৈফিয়ত তলব।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বুঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উহুঁ, নন্দী নই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামি, কিন্তু ফৌজদারির আসামি নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

'আসলে বাঙ্গালি।' দাদার অনুযোগ।

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ বাড়ি ভাড়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার মিস্টার নন্দী তো?' একটু থেমে, —'কিংবা আপনিই বাবু গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝুলি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা।' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবৎ ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা বললেই হবে?' হর্ষবর্ধন কন।

'তুমি তো ভারী মিথ্যেবাদী হে!' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ দেব কি, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়। কী রকম যে মিশুক নয় তা হাড়ে হাড়ে জেনেছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করিনি, বেশ ভাড়া করিনি। তার কী হয়েছে! এখনই করে ফেলছি, এই দণ্ডেই। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো। কত ভাড়া তোমার?'

'কী করে আপনাকে এ বাড়ি দেব মশাই? মিঃ সিং যে বায়না করে গেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মিঃ সিং দাঁড়াশের জমিদার, শুনেছি খুব বুড়ো মানুষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে থাকে শুনে আসছি চিরদিন—কলকাতার বুড়ো মানুষেরাও আবার, —অ্যাঁ এ বলে কীরে গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বুড়ো মানুষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও না হয় দাদন দিচ্ছি। ডবল দাদন। দিয়ে দে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুনে গুনে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন। আবার আসছে মাসে

দেব—আবার দাদন...অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদন!'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে 'বেশ, মিঃ সিং-এর জন্যে অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা! কাল এখানে এসে পৌঁছনোর কথা।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কর না। তোমাদের এই শহরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা কি রকম? একটা ব্যবস্থা আছেই, নইলে শহরে অ্যাতো লোক! না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই।

গোবর্ধন বলে, 'না খেয়ে আবার বাঁচা যায় নাকি! তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বই কি! ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সার ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্ত, পলতা, মাছের ঘণ্ট, কপির তরকারি—সব পয়সা পয়সা! যা চাই সব এক এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোকেরা সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ বেশ তো!'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!



'যার যেমন খুশি', লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূর সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন।

'একটু দূর আছে, সেই জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—গোবরাকে তার উপরে আবার বাড়িতে চড়তেও হয়েছে। এত চড়াই উতরাইয়ের পর আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। উৎসাহও নেইকো। তুমি যদি বাপু দয়া করে এখানে আমাদের কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়োই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যত রকম খাবার সব এক-এক পয়সার এনো—দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারী খিদেও পেয়েছে দাদা!'

'গোটা পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে? দে তো গোবরা টাকাটা!'

'খুচরো তো নেই দাদা! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ওইখানেই আটটা আছে।' হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন, 'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময়ে এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে হয়ে যায়!'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয়; এত হাঙ্গামার পর যদি ঐ বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার! তার উপর আবার এই খিদে পেটে!

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট করেই আনো গে। টাকা পাঁচেকের সব পাইস খাবার, আর যে তিন টাকা বাঁচল তুমি নিয়ো। নিজে খেয়ো কিছু। কেমন?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণ নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।' সে চলে যায়—তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত, একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজি হয়ে রয়েছে, পা বাড়িয়ে তৈরি। শুধু একটু হাঁ করার অপেক্ষা!'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে একফোঁটাও নেই পেটে। নাইস হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল! নাইস মানে ফাস্‌কেলাস, —জান তো দাদা?'

'তোর জন্মাবার আগের থেকে জানি!' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের উপর লম্বা হন—তাঁর হাই উঠতে থাকে।

❖ চতুর্থ ধাক্কা ❖

বাইশকোপে—মানে, বাইশজনের কোপে শ্রীহর্ষবর্ধন!

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায়? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবাব, যাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কী করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হালচাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন! আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির বড়ো দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফুর্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন এই ওঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্যে কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন, যাবেন এবং চাপবেন—সেজন্যে যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওঁদের স্থির সঙ্কল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চিজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে উড়ে যায় কি না—কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মতো জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারী কঠিন, হর্ষবর্ধন তাঁর ভাইকে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'দেখলি না সকালে, আমরা একশো টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া করে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে পড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—হুঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ কিন্তু ওড়ানোই দেখছি কঠিন!'

'বিশেষত কলকাতার মতো জায়গায়। এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে বেশ দুপয়সা

করা যায়। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাত মিথ্যে নয়!'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হুঁ, হঠাৎ কোনো গতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়োলোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে, আর কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোটো ভাই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছে—'এ জন্মে তো নয়!'

হতাশ হয়ে বড়ো ভাই চুপ করে থাকেন, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেন — 'তা বলে কি এমনি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? দ্যাখ আজ কলকাতায় এসেছি—সারা দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত! এত কম খরচ হলে চলবে কেন? এই জন্যেই কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মনিব্যাগটায় দু পাঁচশো যা ধরে নিয়ে নে, চল্ বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এমনি এমনি নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মানিব্যাগ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত, —হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! এক হাজার—দুহাজার—যা বেতন চায় নিক না!

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড়ো একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নিচে জাম্বুবানের বগলের মধ্যে—'কিঙ্কঙ্—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনক্-মহলে।'

'হুঁ, যা বলেছে! এটি যে চমকদার জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই।'

গোবর্ধন সায় দেয় —'খুব রোমাঞ্চকরও আবার! কী বল দাদা?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবিটি তোমার। ভারী খুশি হলাম। একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়োস্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ করা তার এক্তিয়ার নেই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন—'না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হল —কী বলিস? বেশ ছবিখানা! কত বড়ো হাঁ করেছে দ্যাখ্! একটা বড়ো কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব আমরা।'

গোবর্ধন কানে কানে জবাব দেয়—হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড়ো কাচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানাতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিলদরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না, কত টাকা লাগবে! কোথায় বৈঠকখানা রোড জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপর গোঁফ মুচড়ে নেন—'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস? তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি না তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানি বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুশি হবে না কি?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙকঙের দিকে তাকায়, তুলনা করে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তারপর ঘাড় নেড়ে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বড়ো—গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করেনি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়োলোক কিনা, চিত্রকলার সমঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়োলোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হে? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা, ছবিখানা আমাদের বাড়ি লাগিয়েছ তার জন্যে কত দিতে হবে তোমাকে? যা চাও বল, লজ্জা কর না--কোনো দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা। চাপা গলায় গোবর্ধনের মত নেন--'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, দ্যাখ্! কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না ভাই!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে, 'তাহলে দু-খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হল আমাদের কাজ।'

দুই ভাই যে মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা-গোছের—সান্ অব কঙ্।'

হর্ষবর্ধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে—'বেশ বেশ! সেই ভালো। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা ব্রাদার অব কঙ্-ও আনতে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয়নি তো, তবে শ্রীমান....' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে কথাটা তিনি সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে অপারগ। তিনি কিঙ কঙ নিয়ে অম্লান বদনে বাড়ি ফিরবেন রাজার মতোই, আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণ বদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা, পুছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব্ কঙ্ও বেরিয়ে থাকবে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু!'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—'হ্যাঁ, সেদিন আর "না" বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন— 'ছবিটার মধ্যে ছোটো ছোটো অক্ষরে কী সব লিখেছে পড়ে দ্যাখ তো—ব্যাপারটা কী বলে!'

গোবর্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাক-মহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে, —সেখানে যেতে ডাকছে সবাইকে।'

'চল্, যাই সেখানে অমনি নাকি?'

'উঁহু! ওই যে লিখেছে—"বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না!" টিকিট লাগবে।"

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো! বলছে যখন তখন আর বিলম্ব করে কাজ নেই, চল।'

'হনুমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড়নি দাদা? তারই সব কীর্তি-কলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্কৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? ওইসব অং বং। কিং কং, ততঃ কিং—এসবই হচ্ছে সমস্কৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'রামায়ণ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে দাদা। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশকোপ! তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চয়।'

'মনে আছে বইকি। সে ছিল হনুমানের লঙ্কাকান্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড-টান্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর্ না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটর চাপবার শখ কম নয়। 'সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস্ করে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতালা, কাল বিকেলে চারতালা—কত কি দেখবি, দু-দিন থাক না, আস্তে

আস্তে বেরুবে সব। ভাড়াও হবে তেমনি ডবল, তিনগুণ, চারগুণ—তা চল্লিশ কেন, একশো টাকা হোক না, আমরা বাপু কিছুতেই পিছ-পা নই।'

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার অব্ হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হল।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের দৈবাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি সহসা পিছলে দুশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণত লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তিরবেগে অগ্রসর হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়তো কোনো অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দন্ডায়মান অবস্থাতেই রইলেন তখন তাঁর মনে হল, এ তো বেশ মজাই!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হল। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এক মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উতরে এসেছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চলতি ব্যাপার তাহলে! যানবাহনের একজন। রীতিমতন চ্যপ্তব্যই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ করিনি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস? চলবার সুবিধের জন্যে। দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না-লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম! এক লহমায় দুশো হাত আনাগোনা কম কথা নয় নেহাত!'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মোটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই রেখেছে বোধহয়। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!'

'আমার ভারী চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসা চেপেই বেড়াব, কী বলিস! কেন অনর্থক হেঁটে মরি! দেরিও হয় তাতে!'

'না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ!' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও! কখনও পড়তে দেখেছিস আমায়? কোনোও জন্মে?'

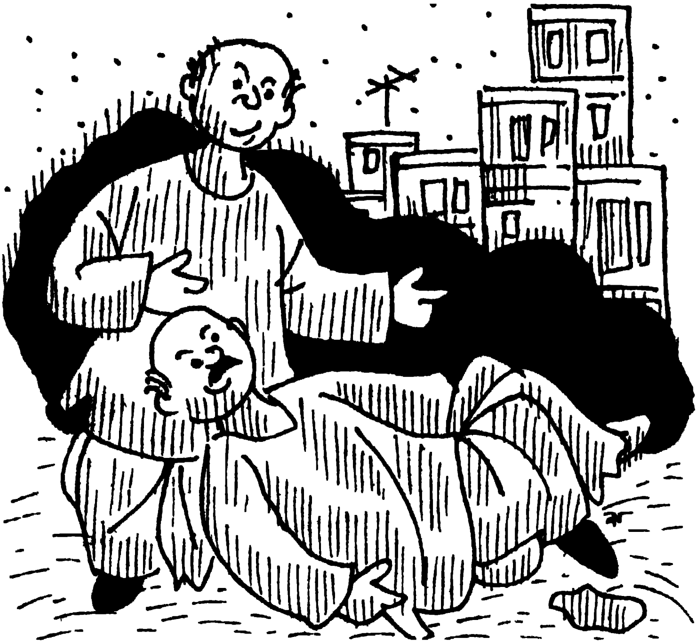
'আমি তা বলে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে!'

'সেই কথা বল!' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন দিকে যাব? চারদিকেই তো রাস্তা!'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়—'উঁহু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়েছিল, হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ওইটায় চেপে যাই খানিক!'



বলে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েননি এমনিভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গাটার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—'ধরমতল্লা—জানতা নেহি?'

'ধড়াম্‌তলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিকই হয়েছে তবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

'সবাই এখানে ধড়াম্ করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়ামতলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দূর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশ্‌কোপ। হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল!' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাপাও নিরাপদ নয়কো।'

'এখানে এত ভিড় কীসের দাদা?'

'আরে, এই যে রওনক্-মহল! দেখছিস না লেখাই রয়েছে—ওই যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড়ো সাইজের রঙচঙে সেঁটেছে!'

গোবর্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে প্রশ্ন করে বসে—'ওই ঘুলঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?'

'এখুনি টিকিট কাটা শুরু হবে কিনা!'—উত্তর দেয় লোকটা।

'ক' টাকার টিকিট কাটবে দাদা?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সিট, তা যত টাকাই লাগুক।'

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মতো মুখভঙ্গি করেন—'সেবার সনাতনখুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব-আগের সিটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। "ঠ্যাটর" কী বুঝেছিস?'

'না তো!'

'ঠ্যাটর হচ্ছে থিয়েটার—বুঝলি! খুড়ো কী মুখ্যু দ্যাখ্! তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী? ইংরিজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা!'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—'মশাই, সব-সামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—'দেখছেন না?' ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ওই তো ফোর্থ ক্লাশের টিকিট ঘর।'

হর্ষবর্ধন দুখানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেয়—'ধর্ এটা, টিকিট কেটে আনি গে। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশ-কোপের না-হয় দশ টাকাই হোক! এর বেশি আর কী হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুব যে, উপায় কী? সবথেকে দামি সিটের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবর্ধন বলে— 'হুঁ! কলকাতার লোকের টাকার অভাব নেইতো!'

নোটদুখানা দাঁতে চেপে দুহাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কান্ড! কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল! হঠাৎ হর্ষবর্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন-দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোকে আশ্রয় করে তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট দু'খানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কি জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দু'বার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাত হলেন, অবশেষে চারবার ঘুরপাক খেয়ে। নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন; তখন তাঁর খেয়াল হল, নোট দু-খানা গোলমালে গিলে ফেলেছেন কখন।

'দেখেছিস গোবরা, জামার দশা! ফর্দাফাঁই! আরো দুখানা নোট দে তো—সে দুখানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। এই দুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে

পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হল দাদা?'

তাই তো! এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন? তাঁর ছিল লাল-পেড়ে ধোপ-দুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড়! কখন বদলে গেছে কে জানে!

'আজ আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা! কাপড় বদলেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদলে যায়?'

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল্ বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচ করা গেল না আজ! সারা দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি—হজমের এই কুড়ি ধরে?' তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজে।

গোবর্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, রাস্তার কোণে আর একটা কার মনিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারী, নোটে-টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু। যাক, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসেব করে, পাঁচশো যদি গিয়েই থাকে তবে সাতশো নির্ঘাত ফিরে এসেছে। টাকা-কড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে বলে যে, তা মিথ্যে নয়। সত্যিই এসব কথা! গোবর্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চায়—'দে তো ব্যাগটা!'

প্রসন্ন মুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে!......দেখছ কেমন পেট মোটা ব্যাগ!.....একি! ব্যাগের আবার হাত-পা কেন? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মানিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া চ্যাপ্টা একটা কোলা ব্যাঙ!'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে! পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ!'

❖ পঞ্চম ধাক্কা ❖

ইঁদুর-চরিতামৃত

সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায় কি না, কিংবা যদি এমন হত—রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্ল্যাটফর্মটাই চলতে শুরু করত তা হলে কী মজাই না হত যে! কেমন প্ল্যাটফর্মটায় চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিব্যি হিল্লি-দিল্লি বেড়ানো যেত! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার সয় না!) সহসা হর্ষবর্ধনের মনে হল, তাঁর ভুঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই ডাকলেন—গোবরা এই গোবরা!'

'উঁ!'

'দ্যাখ্‌তো আমার পেটে কী?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের বোধ হতে লাগল। ব্যাপার কি? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে? কিংবা খবরের কাগজের বড়ো বড়ো হরফে যাকে বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা!' —তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্ না, নড়ছে যে রে—আমার পেটে!'

'পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হয়তো!' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলে নি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বেটা কী? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করেছে—এমন আশ্চর্য কিছু নয়! আকস্মিক ভুঁমিকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিন্ত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। ভুঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই যখন, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং

হর্ষবর্ধন ভুঁড়তুত বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করলেন। তাঁর নাকডাকতে লাগল।

বর্ধনেরা নিশ্চিন্ত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না; হঠাৎ গোবর্ধন অনুভব করল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। ভয়ে তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব? সে ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেল —মিঁয়াও!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পিলে চমকে গেল; সে ধড়মড় করে উঠল—'এ যে বেড়াল, ও দাদা!' তার কণ্ঠে ও চোখে বিভীষিকা, বেড়ালকে তার ভারী ভয়। হর্ষবর্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সজোরে বেদখল করে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। 'বেড়াল? বেড়াল এল কোত্থেকে! কী বি-পদ!'

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ ফের লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই ভাই দেখলেন, ঘরের কোণে তিনটে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রে ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহারে নিরত। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।



ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায়নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলি হচ্ছে তাই। তারই ভায়রাভাই নিঃসন্দেহই। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালি বেড়ালকে যে এরা আদপেই আমল দেয় না তা তো স্পষ্টই। মানুষদের এরা কদ্দূর খাতির করবে তাও জানা নেই, হর্ষবর্ধন নিতান্ত ভাবিত হন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তো তিনজন।

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় দেখলি না। কী রকম পালাতে ওস্তাদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্! আস্ত একটা কাপুরুষ!'

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্ধনের মনে আসে—'হুঁ, যাকে ইংরিজিতে বলে 'কাউহার্ড'; আস্ত গোরু! গোরুর পাল। যা বলেছ!'

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—'যদি এক-একজন করে আসে আমি ওদের ভয় খাই না। কিন্তু তা তো আসবে না, একসঙ্গে সব তাড়া করবে।'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারটাই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিউরে ওঠে। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কিট সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ চিজ দেখলে গণেশ বাবাজিও পালাতেন, এমন কি, তোমার ওই ঐরাবতও! আমরা তো ছার!'

'হুঁ', হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায়?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে!' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছে আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচে থেকে ইঁদুরের ভয়ানক লম্ফ ঝম্ফ—এই দৃশ্য কল্পনা করে গোবরার হাসি পেল। 'তাই তো, তাহলে তো ভারী মুশকিল হল দাদা! তুমি কি ওই ভারী দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর লক্ষ করল, তার মুখভাব দেখে মনে হল গোবর্ধনের মতন সেও এ বিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের হৃদয় স্পর্শ করল।

'যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকে বাগিয়ে ধরব! বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের মেরে খতম করব।'

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি জানায়—'মিউ'।

অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরারও ক্রমশ ভালো লাগছিল। ভালো লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই ঘরের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে

চলেছে অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন কোথায়?)। যাই হোক, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোবরা ভাব করে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে!'

'হয় হোক গে। কথায় বলে, যাক শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—ওদের কাউকেই চাই নে।'

''আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?'

'কেন, তা আসবে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য নাকি?'

'হ্যাঁ, গদি কাটে বলে শুনেছি। নিশ্চয় তুলো খায়। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে?'

'অ্যাঁ; বলিস কী?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'তা পারে তাড়া করতে—যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে! কী হবে তাহলে?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প হয়।

'তাই তো ভাবছি।'

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক। ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের মতলব টের পেয়েছিল, এমনভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য! বেড়ালের সঙ্গে টাগ অব ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্মাক্ত-কলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনজনের কেউই এদিকে দৃকপাত করেননি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে পরিষ্কার গলায় উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল— 'ম্যাঁও!'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়—কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!

শহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গি দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা করে না, তো বেড়াল! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ!'

'কিন্তু'—খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

'হুঁ।' গোবর্ধন কি যেন ভাবতে থাকে।

'তুই কী ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল তা হয়তো নয়।'

'তা নয় তো আবার কী! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল? কলকাতার হালচালই এই। মেশামেশির তত বেশি পক্ষপাতী নয় এরা। এমনকি এই বেড়ালেরাও।'

'উঁহু, তা নয়; পিলেগের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, কী তাতে?'

'শহর জায়গায় ভারী হয়।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—'ব্যায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে—তাই পিলেগ। লেগ কাকে বলে জান তো?'

হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন—'যা-যাঃ, তোকে আর বিদ্যে ফলতে হবে না! তোর মাথা!'

'উঁহু, লেগ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উলটো। যাকে বলে গিয়ে পা।'

'জানি জানি, তোকে আর বলতে হবে না! ফিট মানেও পা হয়—আবার ফিট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হল গিয়ে আর-এক ফিট।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফিট হয়, সে আবার আরেকটা ফিট। কিন্তু তাতে গিয়ে তোমার লেগ হয় না—লেগে আর ফিটে এইখানেই তফাত।'

হর্ষবর্ধন চটে যান—'বুঝেছি রে বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা ক'।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ। বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, বুঝলে এখন? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে।'

'অ্যাঁ, বলিস কীরে? হর্ষবর্ধন এবারে চমকে ওঠেন সত্যিই!

'শহুরে বেড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথাবার্তা শোনে, রোগ-ব্যায়রামের ব্যাপার সব ওর জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই বলে কিনা!'

'তুই ঠিক বলেছিস।' হর্ষবর্ধন সোজা হয়ে বসেন। 'আজ কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন যে কামড়ে দেয় কে জানে! কামড়ে দিলেই হল!'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—'

'—আগাগোড়া পিলেগ!' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ করে মুখখানা প্যাঁচার মতো বানিয়ে তোলেন। গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

❖ ষষ্ঠধাক্কা ❖

অথ শ্রীভিক্ষুক দর্শন

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হন, তাঁদেরই বাড়ির সদর দুয়ারে খঞ্জনী বাজিয়ে কে সঙ্কীর্তন শুরু করেছে।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে বললেন, 'আহা, কে এমন হরিগুণ গান করে! গোবরা, ডেকে আন উপরে, কোনো মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে! দর্শন করা যাক!'

নীচে থেকে গোবরার গলা শোনা যায়—'কোনো মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসতে অনেক কষ্ট, অনেক কসরত করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পান—'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সে জন্যে দুঃখ ক'রো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মতো পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ার—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে—'তুমি একজন সেরা ফুটবল-প্লেয়ার হবে।'

ভিখারির মুখ বিকৃত হয়—'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বলবেননি, দয়ার জন্যেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পরজন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমায়!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—'তুমি বোধহয় পদ্যপাঠ পড়নি, সেই পদ্যটা—'একটা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা'ছিল না জুতা—তার পরে কী ছিলরে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বলছেন; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে দেয়—'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন—'উঁহুঁ! মনে আসছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর-

একজনের পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেইকো আর একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই। তাই দেখে তখন তার দুঃখ দূর হল।'

গোবরা যোগ করে—'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দুজনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ করে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারিটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করল সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হন—'দ্যাখো! তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হলে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারি বাধা দেয়—'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল আমাকে অচল পয়সা চালাত। সিসের সিকি দুয়ানি যত! বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হল—কী করি? লোকে ভারী ঠকায়।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি কি আগে অন্ধ ছিলে নাকি?'

'তা, চোখ পেলে কী করে?' গোবরাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারি আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা! তা ছাড়া আর কী বলব মশাই!'

'তাই বল!' গোবরা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন – 'সেই কথাই তো বলছিলাম হে! ভগবানের দয়ার কী না হয়?

ভিখারি তাগাদা লাগায় —'পয়সা দিন বাবু, যাই এবার। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে আমাকে, বেলা হল।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই বাপু, নোট আছে কেবল। গোবরা - বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের করে আনে।

ভিখারি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ দশ টাকার নোট! তা আপনারা দুজনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন' টাকা সাড়ে পনেরো আনা ফেরত দিচ্ছি--' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশীকৃত পয়সা বের করে গুনতে শুরু করে সে।

'উহুঁহুঁ—' হর্ষবর্ধন বাধা দেন--'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর বদল দিতে হবে না; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারি চোখদুটো ডাগর হয়ে ওঠে, সে অবাক হয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি নকল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। জাল নোটের ভ্যাজাল নয়তো? দেখে টেকে শেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিশের টিকটিকি?'

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কীরে? আমি টিকটিকি! কলকাতায়



এসে কি টিকটিকির মতো চেহারা হল নাকি আমার? আয়নাখানা আনতো দেখি একবার।

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়য়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারিও সেই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলছিলে বটে, যেয়ো না বাপু কলকাতায়, চামচিকের মতন চেহারা হবে। কিন্তু চামচিকে না হয়ে হয়ে গেলাম টিকটিকি! আশ্চর্য!'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'না, এখনও অদ্দুর গড়াইনি!' গোবর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে -- যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরিটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই রয়েছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে দ্বিমত নয়—'হ্যাঁ, এখন চোখ সারেনি সম্পূর্ণ। তা নইলে তোমার মতন ইয়া লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি! ছ্যাঃ!' ভিখারির উপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ

টাকার চেঞ্জ বার করে দিচ্ছিল! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড়োমানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়তো কিনতে পারে।'

'যা বলেছ দাদা, হাতে-হাতে ন টাকা সাড়ে পনেরো আনা নগদ—চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনেরো আনাও বের করতে পারত হয়তো!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচরো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার পড়ে বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? আরো অদ্ভুত ব্যাপার!'

'কী—কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, কত কষ্টেসৃষ্টে এল যে! কিন্তু যাবার সময় সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারী আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না—'আশ্চর্য আর কি, এ কি আমাদের আসাম? এ হল গিয়ে শহর কলকাতা। এখানকার হালচালই আলাদা।'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

❖ সপ্তম ধাক্কা ❖

বে-দন্তবাগীশের বিবরে

সাজ-সজ্জা করে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্যে বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—'কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনও বেরুলো না তো!'

'বেরুবে বই কি, সবুর কর! না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে! তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা ঠিক বলতে পারি না।'

'পাঁচতালা মোটর বোধহয় নেই।'

'কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতনখুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?'

'ধুত্তোর তোমার সনাতনখুড়ো।'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ বেলা না-ই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়ব কেন? আমি কখনও পড়ি? তবে ধড়ামতলার কাছটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড়ো খারাপ। আর পড়বই বা কেন? মাথার উপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখছিস না?'

'দেখছি তো!'

'কেন বল্ দেখি? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, ব্যস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তাদের লাইন চলে গেছে আর তারই তলা দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো হুলুস্থুল হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মতো দাদা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, চটপট একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ-রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক তো!'

উভয়ে দাঁত বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। 'বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখলে পিলে চমকায়! এটা কিসের দোকান হ্যা?

একজন সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমি ডেন্টিস্ট।'

'গোবরা তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের উপর তো বরাত দিয়ে বসে থাকা যায় না।'

'হ্যাঁ তুলেই ফ্যাল। পরের উপর নির্ভর করা ভালো নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে?'

ডেন্টিস্ট বলেন—'কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরটিও পাবেন না।'

'কত মজুরি?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। দিতে হবে কত?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ-শ টাকা! আপনি কি ডাকাত? চলে আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়, তোর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা রোজকার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে! আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও নয়; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত না, আধখানা।'

হর্ষবর্ধন আরো রুষ্ট হন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে রাজি নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও, দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ একটি পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের, হুঁ!'

মেজাজ আর ধরন-ধারণেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাত-ছাড়া করা ঠিক না; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না-হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তাহলেই তো আর ওদের ঠকা হবে না।

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান জ্ঞান করেন, না-হয় দুজনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ওই এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধনকে দলের পান্ডা বিবেচনা করে ডেন্টিস্ট তাঁকেই হাত করবার তাল করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কমপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে। বরং আপনার একটা দাঁত না-হয় অমনি তুলে দিতে রাজি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন?'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও?'

'ক্ষতি কী?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি; কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ করে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না।'

গোবরা বলে—'হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মতো দাঁত নেই আমাদের।

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়তো ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা আমরা নই! আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের পোঁ ধরে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কাঠের উপর করাত চালাই, তা ঠিক, কিন্তু গলায় কারো ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেন্টিস্ট কথা বলার ফুরসত পান—'আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান—'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পাননি আমাদের।'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান চাই কি!'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা, না-হয় এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন; 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস তুই গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয়—'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না—সে কী কথা।

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ করেন—'নিন, বসে পড়ুন তো ওই চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন গোড়ায়, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াশুদ্ধ সবাই টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে।'

গোবর্ধনের ভারী আনন্দ হয়—'হুঁ, পোকারাও যেন টের পায়! ভারী বজ্জাত ব্যাটারা; এমন যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে!' তাকে জিঘাংসাপরায়ণ দেখা যায়।



হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই! দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পাবে না—সে কী কথা! পাড়াশুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের দাঁতের মতো দাঁত তোলা হচ্ছে! নইলে দাঁত তুলে লাভ কী? কথায় বলে, হাতিকা বাৎ, মরদকা দাঁত।'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উঁহু, ভুল হল কথাটা। মরদকা বাৎ হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'দুইই হয়। হাতিকা বাৎ তো শোনেন নি! কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, আমরা জানি। দিনরাত শুনতে পাই।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হল এই যে হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে ঘাবড়ায়—তাতেই খতম হবে নির্ঘাত। কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—কি হাইডো না ফাইডো—

'হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা!' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ করে দেন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে, ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্যে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উপর উত্তপ্ত হন—'কিন্তু তাই বলে পা কিছু অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বলতে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু' ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেয় কিম্বা বাহন বলে বেগে বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে!'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো একঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে আসব। কী বল দাদা!'

'সেই ভাল। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কী হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে আমার? এ তো দুধে-দাঁত নয়!' গোবরা সন্দেহ প্রকাশ করে।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে, কর্মফল তোর যাবে কোথায়!'

'তাহলে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা!'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী!'

ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা, আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার! কোনো সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে!'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেনটিশ মেনটিশ কখনও বাঙালির নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না! ডেনটিশ—বাব্বাঃ! কী নাম!

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধে ঝাঁকি দেন—'কোথাকার আমদানি কে জানে! বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা!'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়ঃ

'দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র।

নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ।

আমরা দাঁত বাঁধাই।'

ততক্ষণে দুভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—'নাঃ, কোনো আশা নেই! বেশিতালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস!'

গোবরার মোটরে চাপা শখ, সে তেমন উৎসাহ পায় না—দূর! ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে!'

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন—'কেন চাপবে না? ঘোড়ায় চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি। তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক—আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে ক'রে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি নয়? আমি ডাকছি ওই গাড়িটাকে—এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

ক্যোচম্যান গাড়ি এনে খাড়া করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে— 'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে ক্যোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে! কোন নাপিতের কাছে ছেঁটেছে?'

'নাপিত নয় বাবু, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁটছে? কালে কালে হল কী! তা, কোথায় কিনতে মেলে এই সব সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোনো কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল না আমাদের। আমরা তোমার মতো করে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকশিশ বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে! নাও, আগাম নাও।' গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফূর্তি হয়, 'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম! কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ কইতে পারে? কলকাতার মতো চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।'

গোবর্ধন গুম হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'তাই মাথায় করে নিয়ে যাব কলকাতাকে। সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মতো করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন এবার জবাব দেয়—'এক যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছল না?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে; ক্যোচম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি।'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে, 'কড়কড়ে দশটা টাকা গুনে দিয়েছি নগদ!'

ক্যোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয়, ওই দেখুন দোকানের সাইনবোর্ট।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই , অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, 'সাইনবোর্টে' স্পষ্ট করে বড়ো বড়ো হরফে লেখা--

"এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামানো হয়।"

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন—'এত শিগগির এলে! তোমার গাড়ি যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি! গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজি হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

ক্যোচম্যান বলে—'তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি। কিন্তু আলিপুর গেলে একটু মুশকিল আছে।'

'কী? কী মুশকিল? কীসের মুশকিল?' দুই ভাইয়ের যুগপৎ জিজ্ঞাসা।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়!' ক্যোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? আটকাবে কেটা? কার অ্যাদ্দূর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি।'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উঁহু, দরকার নেই গিয়ে! জায়গাটা বোধহয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেবে পড় গোবরা!' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ি গো! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানিনি এই-ই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন, 'বলিস কী!' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ওই যে ও ফুটপাথে আমাদের বাড়ি! আর তার পাশেই সেই ডেন্টিস্টের দোকান!'

এমন সময়ে একটি বছর পনেরো ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন দেখেছি হে! তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'কোন্ বাড়িটা আপনাদের?'

'ওই যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন—'উঁহু, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে ওই আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ওই বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটা দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেন্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী গো? দেখি, হাঁ কর তো! একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে ঠিকঠাক রয়েছে! একটাও তোলেননি তো!' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে তেমন ভালোবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধহয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটা ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'বাঃ, তা কেন হবে? কখনই নয়!'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে?'

'এই যে আমি নিজেই টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দুহাতে দুপাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—'উহুঁ, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দুপাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই। তুমি ডেন্টিস্টের ছেলে, তোমার কখনও আসল দাঁত হয় নাকি?'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'না, দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকুন ছেলে, তোমার দাড়ি কই হে!' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মাণ হয়ে যায়—''দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হল।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—'কী রকম বুঝছো দাদা এই কলকাতার হালচাল?'

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো দেখছি!'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না-গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল!'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—'চল, সেলুনে ঢুকি!'

❖ অষ্টম ধাক্কা ❖

কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে— সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনোদিন তার জীবনে হবে, এ প্রত্যাশা তার ছিল না। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ওই বাড়ির বাসিন্দা নাকি! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ওই রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই দশা।

যবনিকা অপসৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি ঘর মাত্র। তার ভেতরেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার মুখোমুখি; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির বেজায় জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন কী আশ্চর্য, এইটুকুন ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুরই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! কামিয়ে দিয়ে বেশ কামিয়ে নিচ্ছে। বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে দুজনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়ামাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে যা দেরি! আর, তার পরেই তাঁদের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভে হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমতো বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্যলোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন-কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও তেমন শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার

ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোটো হয়ে হয়ে যেন দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এক কুড়ি বড়ো বড়ো আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাদের ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর-একটি গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিনুত এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে এক-সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা দুই নিয়ে যুগপত! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস-ফিস করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব খুব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি, গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এ-ই বা কী কথা?'

তবে তিনি এটাও ভাববেন, এক চুল ইদিক উদিক হলে কত মানুষের মন মেজাজ বিগড়ে যায়, এখানে এখন কত তুল এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে— সেদিকটাও তো ভেবে দেখবার।

আর, তা ভাবতে গেলে হাসি পাবার কথা কি?

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মনে হয়!'

হর্ষবর্ধন সায় দেয়—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস নে?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও বেশ ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোনো কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটরে চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়; 'বেশ, তুই না-হয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ, গোবরার দাদৃ-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে

তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার ক'রে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদৃভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভালো ছিল। আসামের গাছপালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন—'দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বডডো লাগছে', অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতি পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারী ভোঁতা বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হল তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তাহলে।' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভালো। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘন্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আমার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠেন; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাধে দু'ঘা দেন কসিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে নেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সেসব নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়তো রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী হয় না। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো, বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটবার মতন হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—এমনকি বমি করে বসেন। ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার আগে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে) দস্তুরমতো আরাম। ঘন্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও

নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মতোই। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোনোরকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম খাতির করেছে। ঢোকবামাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি হাসি করে তোলার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মতো দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি! হর্ষবর্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি'। নাপিতকে প্রশ্ন করেন—'অদ্ভুত কাঁচি তো!'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ।' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা হবে তো?'

'যেমন কলকাতার দুস্তর তাই কর।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরামপ্রদ নয়। যেন ঘোড়ার চামড়া একবারে চেঁছেপুছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড়ে কোঁচকান, কখনও টান করেন, কখনও কাত করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরিয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন, —'থামাও তোমার কিলিপ! ঘাড় গেল আমার! এ যে দেখছি আসামি কাঁচির বাবা!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোনো উচ্চবাচ্য না করেই। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এইরকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বকশিশ দিয়ে ফেলে। ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে! তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়, —'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ! তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে না! পরের ছেলের মাথায় কেন বাপু?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটাই শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন জায়গায় হল খুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয়নি, আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-মুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, খোলাখুলি সেই সাদা চামড়া ঢাকতে পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে! গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়।— 'সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়তো কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কামাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন, —'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোশও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, —'কিলিপের ব্যাপার স্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারী জ্বলছিল, জল পড়লে হয়তো ঠান্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হন, বলেন, 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটলে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর? বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহলে চুল ছাঁটতে আগাতো কোন হতভাগা!'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো হয়ে ওঠে যেন লৌহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির উপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন, —'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস-হেয়ার? এ তো ভালো নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে, —'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চটকে-মটকে দিচ্ছ?'

নাপিত এ সব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও রগ্ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দু'ধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপটা করার চেষ্টা পায়, কখনও ঘাড় ধরে

ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতল-গত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়, —'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি।' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায় —'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে; নইলে ভালো হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তচালনা থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, এর মানে কী?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো আর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল কোথায় আর?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর খাটায়, —'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?'



হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন, — গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহলে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক। .....মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারী আবদার আমার!'

গোবরা বলে, —'না. দরকার নেই ঝগড়াঝাটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশি তো না? দাদা, আর দেরি করো না, উঠে এস! চল পালাই! পালিয়ে যাই এখেন থেকে এক দৌড়ে।'

দুই ভাই নাপিতকে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! একেবারে মাথায় মাথায়! আরেকটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে, —'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুলগুলো দেয় উপড়ে—একেই কি বলে চুলছাঁটা? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল!....অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারী হতে থাকে। হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন, —'দু' জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয়?'

'উঁহু', গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, 'তোমার বোরখাটা খুলে ফেলনি এতক্ষণেও?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, কিন্তু সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতক্ষণে খেয়াল হল। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন, —'এই দ্যাখ্!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। 'আমি ইচ্ছে করে আনিনি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কী করব? ফেরত দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়—'আবার যদি শুরু করে দেয়?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহু লোক তোমাকে চার পা তুলে আশীর্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়ে,—'যা বলেছিস তুই! একখানা মানুষমারা কল। ক্লিপটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এই দেখিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যাবে তাহলে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বল দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বলছে যে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে লোকটা? ইসকুলের সেই যে কি ইসপোর্ট হয় জানিস না...সেই যেরে..ওই কাছি ধরে টানাটানি। প্রায় তার কাছাকাছি।'

'হুঁ' ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন, ওয়ার মানে যুদ্ধ,—বালিশের ওয়াড়ও হয় আবার,—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়,—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটোবেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করিনি? কত বালিশের তুলো বের করে দিলাম!'

'দুর মুখ্য, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? ওয়ার অব টাগ,—অব মানে হল 'র' আর টাগ? টাগ মানে কী?'

'কী জানি! টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেছে আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে,—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই না দেখছি রাস্তায়! কলকাতার লোকের এত টাক কেন বোঝা গেল এখন!'

'কেন!'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটিয়ে—এই ছাঁটার জন্যেই। দু-বার ছাঁটলেই টাক—চাঁদি চকচকে। বিলকুল সব পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল গিয়ে কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কী! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটিনি! তাহলে কী সর্বনাশই না হত!' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ মুচরান। গোঁফ তাঁর ভারী আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিল না।

❖ নবম ধাক্কা ❖

আনন্দবাজারের আনন্দ-সংবাদ

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুল তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই হর্ষবর্ধন ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপতব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন—মোটর গাড়ি থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে কিছুই আর বাকি রইল না—এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও দূর-গোচর ছিল এমন ভয়াবহ সেই ছাঁটতব্য কাজটাও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। অতঃপর আর কী করা যায়?

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিল তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল,—'কেন? চাপতব্য তো কতই এখনও বাকি রয়ে গেল! টেরাম আর গোরুর গাড়ি তো চাপিইনি এখনো। রিকশো না কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা দু'চাকার—ওর রসও তো এখনও টের পেলুম না। তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইস্টিশনে সেই যে ট্যাক্সি না টাশকি কি বলছিল তাও চাপা হয়নি। দাদা এস, ওই রকম একটা পুঁচকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক ততক্ষণ।'

'থাম থাম! তোর কেবল মোটর আর মোটর!' হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন,—'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপিনি!'

'কে বারণ করেছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হল! কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোরে যায়—হ্যাঁ! চোখে-কানে দেখতে দেয় না! হুঁ!'

'তা বেশ, কেনো না কেন? ওই তো ওখানে ঝুড়িতে বসে বিক্রি করছে। আমি টাশকি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে ফেলতে ফেলতে যাই, আর তুমি পেছনে পেছনে খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন,—'উঁহু!' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোনটা হয় না, টাশকি চাপা কি কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই

দুরূহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা কাগজওয়ালা।

'কাগজে কী হবে আর?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলে, 'চুলছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে,—'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ওই হতভাগার শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভালো! হ্যাঁ, ঢের ভালো!' এই বলে হর্ষবর্ধন হকারের দিকে ঝোঁক দেন,—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখান কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন আশা করে—কেন একখান।'

কাগজওয়ালা সেদিনকার একখানা বাংলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোটো কেন? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড়ো একখানা দাও—হিতবাদীই দাও কিংবা হিতবাদীর মতন। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই। টুকরো-টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে?'

'পেতে বসা যাবে অন্তত!' গোবরা আর-একটা সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—'যদি টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে দাদা?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন করে একটা টাকা ফেলে দেন।

কোন কোন কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন হয়।

'যা' যা' আছে দাও না কেন তোমার। এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি কিনতে পারব না এখন।' লোকটার বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার তাকে কাবু করে দেন—'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি—তাই না-হয় দাও এক টাকার। ঘর তো একখান নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে,—'আর যদি থেকে থাকে তাহলে ছারপোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের সমস্ত কাগজ গুনতে থাকে, হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন,—'কী কাগজ পড়ে দ্যাখতো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি—বাচ্চা হিতবাদীর মতোই দেখতে দাদা!' গোবর্ধন নামটা পড়বার চেষ্টা করে,—'বলেছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর রয়েছে এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মতো বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ,—বুঝতে পেরেছিস গোবরা?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে; অনর্থক না ঠকে যায়—বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবই তো। বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালে ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না,—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না!'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আব দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন,—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে 'জগুবাবুর বাজার' বলে কোনো কাগজ আছে? নেই? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়।--খবর থাকলেই হল, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই পড়তে হবে তার কোনো মানে নেই। ওই আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে; অ্যাঁ? কি বলছ? ও নামে কোনো কাগজই নেই? একদম নেই? উঁহু—অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে? জগুবাবুর বাজার যখন আছে তখন কাগজও নিশ্চয় আছে ওখানকার—না, জগুবাবুর বাজারই নেই তুমি বলতে চাও? বাজার আছে? বাজার আছে তো কাগজ নেই কেন হে! আশ্চর্য! থাকলে ভালো হত। সেই কর্মচারীটা জগুবাবুর বাজারের কাছে কাল নাইস হোটেলের কথা বলেছিল, তার সমস্ত খবর বিশদে জানা যেত তাহলে।'

হকারটা ঘাড় নেড়ে জবাব দিচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলার ফুরসুত পেল —'সাড়ে দশ আনার কেবল হল বাবু! আর সাড়ে পাঁচ আনার আনন্দবাজার আমি একটু পরেই দিয়ে আসব আপনার ওই বাসায়—দিয়ে যাব ঠিক, ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন কাগজের তাড়া গোবরার কাঁধে চাপিয়ে দেন, দিয়ে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় বাড়ির অভিমুখে রওনা হন। তখনকার মতো ভাইয়ের প্রতি তাঁর আর চিত্ত নেই। তাঁর মনের মধ্যে গজগজ হতে থাকে, 'আমি বললাম বলে তাই জানল, আর বলে কিনা জানি, অনেক আগেই জানতাম! কী ভয়ানক মিথ্যেবাদী দেখেছ! ইস, এমন জানোয়ার নিয়ে মানুষ কলকাতায় আসে!'

তাড়া-স্কন্ধে গোবর্ধন দাদার অনুসরণ করে— সেও কোনো কথা বলে না। কোনখানে যে তার দোষ হল যে-অপরাধে দাদা চটে গেলেন, তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে অনেক আন্দোলিত করেও সে তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। তার অন্তঃকরণেও ফোঁস ফোঁসানি শুরু হয়,—'তা যাবে তো যাও না বাপু কলার খোসা চেপে! আমি কি বারণ করেছি, না, বাধা দিচ্ছি? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর তোমার দৌড় ওই ধড়ামতলা! ওইখানে পৌঁছেছ কি অমনি আর-একটি ধড়াম! ব্যস! ধড় এবার আস্ত থাকলে হয়! ধড় তো নয়, যেন ভূধর!'

বাড়ির ভেতরে গিয়েও রফার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না, নিঃশব্দে যত টেবিল চেয়ারের উপর কাগজ পেতে চলে। সমস্ত ঘর নিঃশেষ করে বসবার কামরায় এসে দেখে ডেন্টিস্টের সম্পর্কিত দাড়ি ইচ্ছুক সেই ছেলেটি চেয়ারের একখানা অপসারিত করে একমনে পড়ে চলেছে।

দাঁত তুলবার জন্যে বোধহয় ডাকতে এসেছে—গোবরার এইরকম আশঙ্কা হয়, সে ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হর্ষবর্ধন স্মিতমুখে ওকে অভ্যর্থনা করেন,—'কী, কদ্দুর এগুলো তোমার দাড়ি?

ছেলেটি অপ্রতিভের মতো একটু হাসে,—'আজকের কাগজটা একবার দেখতে এলাম। গোরা বলছিল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—কে একজন পৃথ্বীশ রায় নাকি অমনি-অমনি উড়োজাহাজে করে ইটালি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা দেখছি সত্যিই বটে!'

'উড়োজাহাজ করে! অ্যাঁ—তাই বললে না তুমি?' হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে যায়—'জাহাজ আজকাল উড়ছে নাকি?'

গোবরা বলে,—'আমি তো জানতাম ওরা কেবল ডুবে যায়। কথায় বলে, জাহাজডুবি!'

'তুই থাম্! তুই তো সব জানতিস!' গোবর্ধনকে ধমক দিয়ে হর্ষবধন ছেলেটির অভিমতের অপেক্ষা করেন, —'খবরের-কাগজে লিখেছে? ছাপার অক্ষরে? কই দেখি! যখন ছেপে দিয়েছে তখন সত্যিই হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তিন-জোড়া বিস্মিত দৃষ্টি একত্র হয়। হ্যাঁ, সত্যিই বটে! স্পষ্ট অক্ষরেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আটাশ বছর থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স এমন দু-জন দুঃসাহসিক সহযাত্রী চেয়েছেন পৃথ্বীশ রায়। তাঁদের তিনি ইটালি নিয়ে যাবেন, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—ইত্যাদি, এইরকম অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেই কাগজে।

'প্রায় মাসখানেক থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, গোরা অনেক আগেই আমায় বলেছিল। কিন্তু আমাকে কি নিয়ে যাবে?' ছেলেটি হর্ষবর্ধনের সম্মতির অপেক্ষা করে,—'আমাকে কি আটাশ বছরের মতো দেখতে? ঠিক বলুন তো ভালো করে তাকিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন দারুণ ঘাড় নাড়েন, 'মোটেই না। একদম না, বরং আট বছরের মতোই অনেকটা। আমাদের আসামের অনেক আট বছরের ছেলে তোমার মতো দেখতে হয়।'

'সেইজন্যেই তো মাসখানেক থেকে, মানে যেদিন গোরার কাছে শুনেছি সেদিন থেকেই দাড়ি কামাতে লেগেছি। কিন্তু কই, এতদিনেও দাড়ি বেরুল না তো!' হতাশভাবে বার-দুয়েক সে গালে হাত বুলোয়—'দাড়ি বেরুলেও না-হয় আটাশ বলে নিজেকে চালাতে পারতাম। কিংবা যদি আগে থেকে আসামে জন্মাতাম তাহলেও হতে পারত হয়তো। আপনি বললেন না যে আট বছরের ছেলেও সেখানে প্রায় ডবল হয় দেখতে—'

গোবর্ধন বলে,—'নিশ্চয়! আবার আট বছরেই অনেকের গোঁফ দাড়ি বেরিয়ে যায়।'

আসামি বালকের সৌভাগ্যে ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়,—'তাহলে এমনিতেই তো



আমি আটাশ বছরের মতো দেখতে হতুম! আর দাড়িও হত সেই সঙ্গে! মায় গোঁফ পর্যন্ত বেরিয়ে যেত আমার। তাহলে ইটালি যাবার তবে বাধা ছিল কী!'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'কিছু না।'

'মাসখানেকের জন্যে আসামে চেঞ্জে গেলেও তো হয়! হয় না?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে খুব কষে আসামি দুধ ঘি খেলেও তোমার চেহারা ডবল হয়ে যাবে এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে ওই দাড়ি কথাটা—'

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়,—'দাড়ি গজায় জলবায়ু গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কী করছি বল? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার বাতাস করি তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি গজাবে না?' সে গোবর্ধনকে জিজ্ঞাসা করে এবার। —'হবে না দাড়ি?'

'হবে না? আলবত হবে! হতেই হবে দাড়িকে—জল হাওয়ার গুণ তবে কী?' গোবর্ধন সজোরে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে বলে কয়ে দেখি গে। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা?' গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করে।

'কোথায় আবার! বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি?'

'নিশ্চয়! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিলেতের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে,—'নেপালের ইংরিজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হন,—'কিন্তু সে কথা তো নয় আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে,—'বল না দাদা কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।' গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়,—'হ্যাঁ! ভারী চমৎকার হয় দাদা! এই জন্যেই তো তোমাকে দাদা বলি! তোমায় গড় করি এইজন্যই।' তারপর একটু দম নেয়,—'তাহলে উড়োজাহাজেও চড়া হয়—জাহাজেই চাপিনি তো উড়োজাহাজ!'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে! আমাকে কত দিক ভাবতে হয়! ছেলেমানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার উপরে বিদেশ থেকে আরো বিদেশে—। আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড! উড়োজাহাজ উলটে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোকে? হাওয়ার চোটে কোন মুলুকে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে! অত উঁচু আকাশে হাওয়ার জোর কি কম!'

'পড়ব কেন? আমি তোমাকে ধরে থাকব দেখো।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি বেশ ভারী আছি, সহজে আমাকে ওলটাতে পারবে না।'

'তবে আর ইটালি যেতে বাধা কী আমাদের? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিন কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা একটু দেখে আসা যাক বরং।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন,—'বিলেতের হালচাল আবার কী রকম কে জানে!'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, তত দুঃখ থাকে না আর। তবে চল দাদা, বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাতলে নিয়ে এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে অন্য সকলে আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওলার তো আর অভাব নেই!'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলি?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মতো একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম যে আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে বসে আর কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে চেপে যায় সে। গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন, —'তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি, দ্যাখ।'

গোবর্ধন মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।



❖ দশম ধাক্কা ❖

হর্ষবর্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন—একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট, কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে ফিরে ফের কলকাতা।

বাঙালিদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনেরো ষোলো হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনেরো ষোলো বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

তিনি চেয়েছিলেন দু'জন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট করে সে কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বয়সের কোনো লোক যে সম্প্রতি বাংলাদেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের ভেতরে তার কোনো প্রমাণ তিনি পাচ্ছেন না।

না, সেরূপ কোনো অবদানের আবেদন নেই।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোনো আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাসুট রয়েছে। কিন্তু বয়স্ক বাঙালিরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয়। স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজনও না।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড়ো হবে সেদিন আমাদের দেশ বড়ো হবে, কিন্তু ততদিন—! নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আর অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

একটি ছেলে লিখেছে,—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে। আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন বিকল করতে হবে, যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চলবে; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন, তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কেবল আমাকে প্যারাসুটে নামবার সুযোগ দিতে হবে।

অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে ভারী মজা হয় কিন্তু—!'

আর একটা চিঠির বক্তব্য,—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটা মুশকিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে ভারী ছোটো দেখায়। দেখলে আপনার মনে হবে বারো কী চোদ্দো—এই হয়েছে গণ্ডগোল। এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ বছর বয়স—সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি না হয় আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন,—'কে আপনারা?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

দু-নম্বর বললেন,—'আর ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিল,—উঁহু। শ্রীমান গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন,—'তা, কী চাই আপনাদের?'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে, 'উহুঁ! উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়ো-জাহাজে ইটালি যাবেন? বেশ তো, বেশ তো! তা আপনাদের বয়েস?'

হর্ষবর্ধন ভালো করে গোঁফ চুমরে নেন,—'আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন-মতো গম্ভীর গলায় সায় দেয়,—'হুঁ, তার থেকে এক দিনও কম নয়।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না; পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'তবে কাল সকাল দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমে। দমদম এরোড্রাম, বুঝলেন?'

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'তা, ভাড়া কত পড়বে? খুব বেশি নয় তো?'

গোবর্ধন বলে,—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয়নি!'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেত যাওয়ার মতলব ছিল না তো আগে! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মাঝখানে বাধা দেয়,—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক না!'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য। এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের!'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে,—'অ্যাঁ, বলেন কী দাদা! বিনে পয়সায় বিলেত!'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না,—'ওমনি-ওমনি নিয়ে যাবেন?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব—একদম মুফৎ! বরং আপনারা দাবি করলে কিছু ধরে দিতে রাজি আছি এর উপরে।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না,—'না, আমরা কিছুই চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসিনি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে!' গোবর্ধন যোগ করে,—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়!'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন, 'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, ওমনিই যাব বিলেত। তার কী হয়েছে?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'একটু ভুল করেছেন। বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটালি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটিলিই কি আর আন্দামানই কি?'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে বসাতে থাকে,—'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করলেন,—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোনো ভয় নেই, তবু—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন,—'আমি জানি। আকাশে আবার ভয় কীসের? এ তো রেলগাড়ি নয় যে কলিশন হবে! আর আকাশে এনতার ফাঁকা, কোথায় কার সাথে বা ধাক্কা লাগবে বলুন! তুই কী বলিস রে গোবরা?'

গোবরা জবাব দেয়,—'তুমিই বল না, কোনো পাখিকে কি কখনো মরতে দেখা গেছে? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির সগোত্রই। এখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়ো-বড়ো দুই পাখা!'

পৃথ্বীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন,—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইনসিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদিই একটা বিপদ আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—হ্যাঁ, লাইফ ইনসিওর জানি বই-কি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তবে আমার নামেই করুন, ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি ম'লে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যা, যা বলেছেন, যদি দৈবাৎ উড়ো কল

বেগড়ায়, বলা যায় না তো! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু। তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে!'

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—'ওঃ, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে?'

নিশ্চয়ই যাচ্ছে! যাচ্ছে না কে বললে? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ি যেতেও রাজি নই', হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন,—'বিলেত তো বিলেত!'

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রামে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালিরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা সাঙ্গ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন,—'দেখছিস গোবর, বাংলা ভাষাটা কী রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল!'

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি।'

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালি, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা পড়াশুনোর ব্যাপারেই এঁদের এই বিদেশে বাস; বাঙালি বলেই বাঙালিকে সংবর্ধনা করতেই সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমতো অবাক হয়ে যায়। 'বটে? বুঝেছি তাহলে কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে!' গোবর্ধন যোগদান করে,—'কাঠের জন্যে আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে যে আর বেশি কী!'



পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন; এঞ্জিনের অবস্থা ভালো নয়, এইজন্যে সারাটা দিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে, হর্ষবর্ধন বলেন,—'তাহলে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা দেখে নেওয়া যাক না কেন?'

গোবর্ধন সায় দেয়,—''হুঁ, পুরো একটা দিন পাওয়া যাচ্ছে যখন!'

মুকুল বলে একটি বছর পনেরো ষোলোর ছেলে এগিয়ে আসে,—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন,—'অ্যাঁ, এইটুকুন ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ? এই বয়সেই?'

মুকুল বলে,—'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখ্যা করে,—'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ!'

হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন,—'বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার; এর চেয়ে আর লাভের কী আছে? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ। আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন,—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর বলে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে। সব অন্ধকার! এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয়!'

গোবর্ধন মিনতি জানায়,—'দোহাই, তা যেন যাবেন না! দেখছেন তো, দাদা যা মোটা, একটু হাঁটলেই ওঁর হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবেন না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে,—'হুঁ! দাদা পারবে না! নিশ্চয় পারবে, আলবত পারবে, দাদার ঘাড় পারবে! হেঁটে দেখিয়ে দেব?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপনারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়,—'ওই যে আমার বেবি কার ওইখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয়তো একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা শান্ত হবেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্ধন সটান গিয়ে মোটরে পৌঁছেই গ্যাট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চটে গেছেন, তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধরে যায়—দেশে হলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, যত বাঙালি সাহেবদের সামনে; ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড়ো আর্টিস্ট।'

'অ্যাঁ, বল কী? আমাদের মাইকেল? বিলেতে এসে ছবি আঁকত সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না।

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'মাইকেলকে জানি না! তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড়নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে,—'না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা, দেশে তো যাইনি কখনো!'

'বল না গোবরা, বল না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধন সহজে দমবার নয়,—'হুররে হুররে হুররে করি গর্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হয়ে বাধা দেন,—''উঁহু, উঁহু! ও যে মিলে গেল! মাইকেলের মেলে না। তোর কিচ্ছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একেবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না!''

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন,—'তুমি মাইকেল পড়নি তো? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে,—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়া চাট্টিখানি নয়। দস্তুরমতন শক্ত। দাঁতভাঙা ব্যাপার!'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'পড়লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস মাইকেলের! বল দেখি ''হস্তী নিনাদিল''—এর মানে কী?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়,—''তুমি বল দেখি?''

'আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি? হর্ষবর্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন,—''এমন কী শক্ত মানেটা শুনি? ''হস্তী নিনাদিল'' ? এ তো জলের মতো সোজা! ''নিনদিল''র ''নি'' বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা ''হস্তিনী নাদিল'' তাও করা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন, —'হুঁঃ, এই তো তোর বিদ্যে! তবু ''হ্রেষাধ্বনি'' এখনো তোকে জিজ্ঞাসাই করিনি!'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, 'হ্রেষাধ্বনি' চাপা দেবার জন্যে বলে,— 'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ঢের ভালো!

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়, মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরও কত কি কারুকার্য! মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না! বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে পিটে গেছে সেই মাইকেল।

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন, —'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা?'

'যশোরে কি খুলনায় যেন।'

'উঁহুঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামি ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে নাকি? কী রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে দ্যাখ!'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামি!' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। 'ফাঁসির আসামির মতো প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ?'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায়; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন,— 'এও আমাদের মাইকেলের তো?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরি।'

'ওঃ!' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন, —'মাইকেলের?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু'হাজার বছর আগেকার।'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, —'ওটা কার মূর্তি জানেন?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান, —মাইকেলের বোধহয়?'

'উঁহু। ভাস্কো ডা গামা; নাম শোনেননি?'

'গামা, গামা—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি করে বেড়ত লোকটা না?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়িনি কখনো!'

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল! তুমি অবাক করলে বাপু! এইমাত্র আমরা তো 'ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এ-রকম কথা তো শুনিনি! অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না!'

গোবর্ধন বলে, —'তুমি ভুল পড়েছ, ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভালোরকম জানি।'

'কি গামা বললে? ভাস্কো ডা গামা? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে?'

'অনেক দিন! চারশো বচ্ছরেরও আগে!'

'চারশো বচ্ছর! বল কী হে! তা কীসে মারা গেল সে?'

'তা কী জানি!' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয়?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়ি নি, জানি না।' মুকুল আরও জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে, —'হামও হতে পারে!'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোনো কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে?'

'অসম্—ভব!' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলেপুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা!'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোনো এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখছেন?—মামি! মামি।'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষকরেন, —'কি বললে? কী নাম ভদ্রলোকের?'

'নাম? ওর কোনো নাম নেই—জিপ্‌সিয়ান মামি!'

'মাইকেলের মতো কোনো নামজাদা লোক বোধহয়? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম?'

'না—জিপ্‌সিয়ান যামি!'

'আমাদের বাংলাদেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে?'

'না, না, বলছি তো, জিপ্‌সিয়ান!' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল! এঁতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ!'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসি নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমনকি বাঙালিও না—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম! ইজিপ্টা বলে কোনো দেশের নাম তো কখনো শুনিনি!' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন।

'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে? তুমি ঠিক জান?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোনো বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে দ্যাখ তো!'

'এফ্-আর্-ও-এম্—ফ্রম্; ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম—ফ্রম মানে হইতে আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি?'

'এগ্ওয়াইপ্ট্। এগ্ওয়াইপ্ট্ হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধহয় কোনো ডিমের আড়তদার-টাড়তদার।'

'মামি—মামি!' গোবর্ধন প্রশ্ন করে, —'তা এর মামা কোথায় গো?'

মুকুলের ঘাড় টন্‌-টন্‌ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব।'

গোবর্ধন মুকুলের মুখের দিকে তাকায়, —'একি—অ্যাঁ—এ কি মাবা গেছে নাকি?'

'নিশ্চয়! তিন হাজার বছর!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'অ্যাঁ, বল কি? তিন হাজার বছর ধরে এমনি মরে পড়ে রয়েছে?

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না,—'তিন হাজার বছর! হতেই পারে না! তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়, —'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও কও দেখি? বাংলাদেশ থেকে এসেছি বলে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি; তা বিলেতের ছেলে বলে কি তোমাকে ভয় করে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা! তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভালো!'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়, —হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা। আমরা ভয় খাই না! নিশ্চয় ভালো, হাজার হাজার গুণ ভালো! অত বোকা পাও নি আমাদের, যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে! তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে? টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস—টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ! গোঁফ দাড়ি সমেত তোফা! আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'মশাই, চলুন! আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না! এই আপনার বিলেত। দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মতো কিচ্ছু নেই! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ভালো! ঢের ঢের ভালো! হ্যাঁ ঢের ঢের ভালো!''

মামা ভাগ্নে

[মামা আর ভাগ্নে। ভাগ্নে একটা মোটা বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। মামা প্রকাণ্ড একটা ভাঁড় হাতে ঘরে ঢুকলেন। ভাঁড়টা তাকের উপর রেখে তাকালেন ভাগ্নের দিকে।]

মামা : এই, এদিকে যেন নজর দিসনি। বুঝেছিস? [তাকালও না ভাগ্নে। তার নজর ছিল তখন ওই বইয়েই।]

মামা : এই, সাড়া দিচ্ছিস না যে? এই বড়ো ভাঁড়টায় বাগবাজারের রসগোল্লা রইল—দেখেছিস ভাঁড়টা?

ভাগ্নে : (এক পলকে তাকিয়ে) তোমার ভাঁড়ে মা ভবানীই থাকুন, আর বাবা বাগবাজারই থাক, তাতে আমার কী?

মামা : তাই বলছি যে ভুল করে যেন পেটে পুরিসনি। আমার বিকেলের জলখাবার। বুঝলি? অবিশ্যি, আমার খাবার পরে তুইও পাবি। তোকেও একটুখানি পেসাদ দেব।

ভাগ্নে : তোমার পেসাদ আরাম মাথায় থাক।

মামা : (প্রীত হয়ে) তা বটে, তা বটে! পেসাদ তো মাথায় করেই রাখার জিনিস। তা না হয় রাখলি, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু চাখলিও না হয়।

ভাগ্নে : বয়ে গেছে আমার।

মামা : বয়ে যে গেছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাজে বয়েই গেছিস, চোখের সামনেই দেখছি। বইটা কী শুনি।

ভাগ্নে : অভিধান।

মামা : অভিধান? অভিধান কি কেউ পড়ে নাকি আবার? অভিধান কি কোনো গল্পের বই?

ভাগ্নে : অভিধান পড়লে কত শিক্ষা হয় তা জানো? কত কথা শেখা যায়। আবার, একটা কথার কত রকম মানে, কত কথার একরকমের মানে—জানা যায় সে-সব। লেখাপড়া শিখতে হলে অভিধান তোমার চাইই।

মামা : তোকে বলেছে! তবে হ্যাঁ, শুনেছি বটে, সেকালে লোকে ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখত—

ভাগ্নে : এখন শেখে অভিধান দিয়ে।

মামা ঃ তা শিখুকগে। মরুক গে। অভিধান নিয়েই থাক তুই। কথার মানে নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খা। যত ইচ্ছা গেল্, কিন্তু কথার মানে খুঁজতে গিয়ে আমার গোল্লা যেন গিলিস-নে বাপু। হ্যাঁ, ভালো কথা, পাটনা থেকে আমার একটা ট্রাঙ্ককল্ আসবে—জানিস? এলেই আমায় বলবি, বুঝেছিস?

ভাগ্নে ঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

মামা ঃ আমি ততক্ষণ ইজি-চেয়ারটায় একটু গড়িয়ে নিগে, কেমন? যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আর কলটা তখন আসে তো আমায় জাগিয়ে দিবি। কেমন—বুঝেছিস?

ভাগ্নে ঃ দেব গো দেব। তুমি ভেব না।

মামা ঃ ভাবতে হচ্ছে বই কি। সেই কোন সকালে কনেকশন চেয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রাঙ্ক-কলের পাত্তা নেই। [ইজি-চেয়ারে গা গড়িয়ে] এই, দরজাটা একটু ভেজা না? যা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাড় কাঁপিয়ে দিল বাপু। দরজাটা ভেজা।

ভাগ্নে [একটুও নড়ে না, বইয়েই মশগুল।]

মামা (গলা চড়িয়ে) কানে যাচ্ছে না বুঝি কথাটা? বলছি না দরজাটা ভেজাতে?

[ভাগ্নে বই রেখে উঠে যায়। এক বালতি জল এনে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দরজা ভেজাতে লাগে।]

মামা ঃ এই, ও কী হচ্ছে ও? হচ্ছেটা কি?

ভাগ্নে ঃ দরজা ভেজাচ্ছি। তুমি যে ভেজাতে বললে?

মামা ঃ এই দ্যাখো, বললুম কী আর বুঝল কী! আরে মুখ্যু, আমি কি তোকে জল দিয়ে দরজা ভেজাতে বলেছি? তাই বললুম নাকি দরজাটাকে লাগাতেই তো বলেছি।

ভাগ্নে। তাই বলো! তা—বললেই হয়!

[কোণের থেকে মামার বেড়াবার লাঠিটা নিয়ে দরজায় সে কসে এক ঘা লাগায়]

মামা ঃ আরে—আরে—করছিস কী?

ভাগ্নে ঃ লাগাচ্ছি দরজাটাকে। তুমি যে বললে লাগাতে। ক ঘা লাগাবো?

[দমাদ্দম পিটতে থাকে]

মামা ঃ ভাঙলি? ভাঙলি তো লাঠিখানা? আমার সেগুন কাঠের শখের লাঠিটা! হায় হায়!

ভাগ্নে ঃ চন্দন কাঠেরটা আছে এখনো। তাই দিয়ে লাগাবো নাকি? বলছ তুমি?

মামা ঃ কী সব্বোনাশ! সেটা যে আরো দামি রে! ওসব লাঠি কি পাওয়া যায় আজকাল? এখানে তো নয়, ব্যাঙ্গালোর থেকে আনানো। রক্ষে কর বাবা! তোর আর দরজা লাগিয়ে কাজ নেই।

ভাগ্নে : তুমিই বলছ লাগাতে আবার তুমিই বলছ—

মামা : আমি কি এমনি লাগান্ লাগাতে বলেছি? আমি তো বলেছিলাম—

ভাগ্নে : কী বলছ, খোলোসা করেই বলো না? লাগাতে বলছ না ভেজাতে বলছ? একসঙ্গে দুটো কাজ তো হয় না। কোনটা করতে বলছ শুনি?

মামা : কিচ্ছু বলছিনে। বললেও তুই বুঝতে পারবিনে। ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখলে যদি বা বুঝতিস, অভিধান দিয়ে—অভিধান যখন তোর মাথায় ঢুকেছে, এক কথার পাঁচ রকম মানে, পাঁচ কথার একরকম মানে—এসব কথার প্যাঁচে গিয়ে পড়েছিস তখন তোর মাথার ঘিলু বিলকুল ঘুলিয়ে গেছে। কথার মান-মর্যাদা কিছুই আর তোর কাছে নেই। মানে-অপমানে একাকার।

ভাগ্নে : বললেই হল! নিজেই সোজা করে বোঝাতে পারো না—কথা পাড়লেই হয় না।

মামা : আর পেড়ে কাজ নেই। কথার ডিম খালি অভিধানেই পাড়ে। পাড়তে পারে। আমার কম্মো নয়।

ভাগ্নে : এই দ্যাখো! তোমার ঘাড়েও অভিধানের ভূত চেপেছে মামা! সোজা কথার মধ্যে গোঁজামিল দিচ্ছ! কী পারতে কী পাড়ছ।

মামা : সঙ্গদোষেই বাপু সঙ্গদোষে। তোর কুসঙ্গে পড়ে আমিও দেখছি বয়ে গেলাম। এইজন্যেই বলে কারো কোনো কথার মধ্যে থাকতে নেই। নাঃ, আমি আর তোর কথায় নেই—তোর কোনো কথাতেই না—এই আমি কানে আঙুল দিলুম।

ভাগ্নে : তাতে আরো বেশি শোনা যায়, বুঝলে মামা? আমি বলছি কী, তুমি যদি সোজা করে তোমার বক্তব্যটা বল—দরজাটাকে তুমি কী করতে বলেছিলে?

মামা : কিচ্ছু করতে বলিনি—

ভাগ্নে : তাই বল! আমিও তো সেই কথাই বলছি। দরজা তো কোনো কর্তব্যের মধ্যে নয়, দ্রষ্টব্যের মধ্যে। ঘরের শোভা! গোড়াতেই যদি এই সোজা কথাটা বলতে—সোজাসুজি বলতে—তাহলে আর এত গোল হত না!

মামা : হতই গোল। আমি যত সোজা করেই বলি না, তুই উলটো বুঝতিস। অভিধান গিলে খেতে গিয়ে অভিধানই তোকে গিলে খেয়েছে। কিছু আর বাকি রাখেনি তোর মগজের। এখন আমি যদি তোকে বলি যে, মন্টু, দরজাটা দে। তাহলে তো অমনি তুই দরজাটা খুলে এনে আমায় দিবি। তুলে দিবি আমার হাতে!

ভাগ্নে : আমার দায় পড়েছে! আমি কি ছুতোর মিস্তিরি? দরজা দেয়া কি আমার কম্মো? ইস্কু-ডাইভার পাব কোথায়? ছুতোরের যন্ত্রপাতি কই আমার?



মামা ঃ নেই ভাগ্যিস! থাকলে তো তুই দরজাটা খুলে এনে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতিস। এই ছুতোয়! তাই না?

ভাগ্নে ঃ অত সোজা নয়! দাও বললেই দেয়া যায় না দরজা। গায়ে অত জোর কই আমার। উৎসাহ নেই অমন। গরজ থাকে তুমি নিজেই গিয়ে নাও না। দরজা তো ওই দাঁড়িয়েই আছে, পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও।

মামা ঃ থাক, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। থার্মোফ্লাস্ক থেকে একটু চা ঢাল দেখি। কনকনে হাওয়ায় জমে কুলপি বরফ হলুম। দরজা ভেজিয়ে কাজ নেই আর, গলা ভেজানো যাক। ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে দিতে পারবি এক পেয়ালা? না—কি—

ভাগ্নে ঃ কেন পারব না? নাও না, খাও না!

[ফ্লাস্ক থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিল মামাকে।]

মামা ঃ আঃ, বাঁচলাম! [চা খেতে খেতে]

এই, আমি একটু ওঘর থেকে আসছি। তুই ততক্ষণ টেলিফোন আপিসে আমার ট্রাঙ্কের কী হল, খবরটা নে দেখি! [মামার প্রস্থান]

ভাগ্নে ঃ হ্যালো। টেলিফোন আপিস? ট্রাঙ্কের খবর কী?—জানতে চাইছেন আমার মামা। [একটুক্ষণ ফোন ধরে থাকার পর]

অ্যা, কী? হ্যালো? কী বললেন? সে কি, কোনো ট্রাঙ্কওয়ালার খবর আপনাদের জানা নেই? অ্যাঁ, কী বলছেন? আপনাদের টেলিফোন গাইডের ক্লাসিফায়েড লিস্টে পাওয়া যাবে? কিম্বা, কোনো বড়ো স্টোরে ফোন করলেও পেতে পারি—তাই বলছেন? তা, স্টোরে কি কোথাও ট্রাঙ্কওয়ালাদের দয়া করে যদি আপনারাই একটু জানান।—জানাবেন? জানাচ্ছেন? ধন্যবাদ! প্রচুর ধন্যবাদ। আমাদের ঠিকানা? আমাদের ঠিকানা হচ্ছে নয়ের ছয় হাতিবাগান—[টেলিফোনের রিসিভার রাখতেই চায়ের পেয়ালা হাতে মামা এলেন।]

মামা ঃ বেশ লাগল চা-টা। আরেক পেয়ালা দে তো।

[ভাগ্নে আরেক পেয়ালা এগিয়ে দিল।]

মামা ঃ অ্যাঁ? আমি কি আরেকটা পেয়ালা চেয়েছি? খালি একটা পেয়ালা? চা চাইলাম না?

ভাগ্নে ঃ চা চাচ্ছো তো চেঁচাচ্ছো কেন? পেয়ালা চেয়েছ—দিলাম। চা চাও তা অকপটে বললেই হয়। বলতে হয়—আমায় চা-ভর্তি পেয়ালা দাও, কি পেয়ালা-ভর্তি চা দাও। তা না, আধখানা কথা পেটে আধখানা মুখে—

মামা ঃ ইচ্ছে করছে এই পেয়ালা ছুঁড়ে মারি এক ঘা তোর মাথায়। মাথাটা দু'ফাক করে দেখি, সেখানে ঘিলু অছে, না, ঘুঁটে হয়ে গেছে সব এর মধ্যেই!

ভাগ্নে ঃ (থার্মোফ্লাস্ক আর সবগুলি পেয়ালা এনে মামার সামনে রাখে)। এই নাও, খাও। ঢালো আর খাও। খাও আর ঢালো। যত তোমার প্রাণ চায়। যেমন খুশি।

মামা ঃ যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

[ভাগ্নের প্রস্থান। নেপথ্যে মোটর গাড়ি থামার আওয়াজ। ফিটফাট পোশাকে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

লোকটি ঃ আপনিই কি ট্রাঙ্ক চেয়েছিলেন? টেলিফোন আপিস থেকে খবর দিয়েছে—

মামা ঃ হ্যাঁ, আমিই। আপনি টেলিফোন আপিস থেকে আসছেন বুঝি? সেই কখন চেয়েছি ট্রাঙ্কটা! কতক্ষণ হল! খুব জরুরি দরকার আমার—

লোকটি ঃ তাই শুনেই তো ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম। তা, আপনার কি রকমের ট্রাঙ্ক চাই বলুন দেখি?

মামা ঃ কি রকমের ট্রাঙ্ক—মানে? (একটু হতবাক)

ভদ্রলোক ঃ মানে, কী সাইজের, কত নম্বরের? কী রকম রঙ আপনার পছন্দ?

মামা ঃ না, রঙ নম্বর আমার পছন্দ নয়। কোথাও না, কোনোখানেই না—কোনো সময়েই নয়। —না, কলকাতার কল-এ, না ট্রাঙ্ক কল-এ—

ভদ্রলোক ঃ তাহলেও কেমন ধারা ট্রাঙ্ক আপনার চাই? বলবেন তো?

মামা ঃ আমি তো গৌহাটির চেয়েছিলাম। তবে দিল্লির থেকেও একটা ট্রাঙ্ক আসার কথা আছে বটে।

ভদ্রলোক ঃ স্টিল ট্রাঙ্ক ? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে। তাও পাবেন। কত বড়ো, কি সাইজের, কেমনটি ডিজাইনের চাই আপনার তাই বলুন ?

মামা ঃ ইস্‌টিল ট্রাঙ্ক ? সে আবার কি ?

ভদ্রলোক ঃ মানে, কীরকমের—কত সাইজের কেমনটি চাচ্ছেন—দয়া করে যদি জানান—কত লম্বা—ক' ইঞ্চি চওড়া—

মামা ঃ ভারী যে লম্ব-চওড়া কথা শোনাচ্ছেন দেখি ? আপনারা কে মশাই, জানতে পারি একটু ?

ভদ্রলোক ঃ কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা স্টিল-ট্রাঙ্কওয়ালা আমরা, তা কি আপনি জানেন না ? বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে আমাদের বিরাট স্টিল-ট্র্যাঙ্কের আড়ত। আমাদের কারখানার ট্রাঙ্ক যদি আপনি দেখেন—

মামা ঃ ট্রাঙ্ক জাহান্নাম! ইসটিল ট্রাঙ্ক নিকুচি করেছে! (চিৎকারে ফাটিয়া) কে চেয়েছে আপনাদের ওই ইসটি ট্রাঙ্ক ?

ভদ্রলোক ঃ কেন, আপনিই তো ? একটু আগেই তো টেলিফোনে ডাকা হয়েছে আমাদের। আমাদের ট্রাঙ্ক নিয়ে পরখ করে দেখুন না একবার। যদি পছন্দ না হয় ফেরত দেবেন। এমন মজবুত ট্রঙ্ক আর হয় না। সে বিষয়ে আমাদের গ্যারান্টি। আমাদের শোরুমে যদি দয়া করে একবারটি পায়ের ধুলো দেন তো আপনাকে আমরা দেখাতে পারি—

মামা ঃ দেখতে চাইনি আপনাদের ট্রাঙ্ক। গোল্লায় যাক আপনাদের ট্রাঙ্ক—জাহান্নামে যান আপনারা। যেখানে খুশি যান —

ভদ্রলোক ঃ নাকি সুটকেসই দরকার আপনার ? তাও আছে আমাদের—হরেব রকমের—নানান সাইজের। দেখতে অতি সুদৃশ্য—সুচারু—

মামা ঃ কোনো দৃশ্যই দেখতে চাইনে আমি। আপনার নিজের দৃশ্যও নয়! দয়া করে আপনি আমায় একটু রেহাই দেবেন এখন ?

[ভদ্রলোককে বিদায় দিয়া]

মন্টু—মন্টে—এই হতভাগা মন্টে! (ভাগ্নের প্রবেশ,—তুই—তুই—তুইও দূর হয়ে যা—ভাগ আমার সামনে থেকে!

ভাগ্নে ঃ সাধ করে এমন ডাকাই কেন, আবার দূর দূর করাই বা কেন ? দিনদুপুরে এমন ডাকাতির মানে ?

মামা ঃ ডাকাতি! ডাকাতির মানে! ডাকাত কাঁহাকা! ইস্টুপিট—রাসকেল—বাঁদর! হতভাগা ভাগ হিঁয়াসে। নইলে এক্ষুনি—এক্ষুনি তোকে আমি খুন করব। গুমখুন করে বসব। উজবুক, উল্লুক, বেল্লিক! হিপোপটেমাস। গোল্লায় যা তুই!

ভাগ্নে ঃ কী বললে ? কী বললে তুমি ? আমায় গোল্লায় যেতে বললে ? বেশ, তাই

আমি যাচ্ছি। কিন্তু তারপর আর আমায় কোনো দোষ দিতে পারবে না। বলে রাখছি কিন্তু (বলেই না সে একলাফে তাকের দিকে এগিয়ে রসগোল্লার ভাঁড়টি হাতে নেয়)।

মামা ঃ এই—এই কী হচ্ছে ও কী হচ্ছে? করছিস কী?

ভাগ্নে ঃ তুমি যা বললে তাই করছি। তোমার গোল্লার ভাঁড়—গোল্লার ভাঁড়ার ফাঁক করছি (টপাটপ মুখে পুরতে থাকে)।

মামা ঃ (হতভম্ব হয়ে) ফাঁক করছিস! আরে, আরে—সত্যিই তো! সাবড়ে দিলি যে সব!

ভাগ্নে ঃ তুমি গোল্লায় যেতে বললে যে! কী করব? কিন্তু গোল্লার মধ্যে তো যাওয়া যায় না! তাই—তাই গোল্লাই আমার মধ্যে যাক! আহা, গোল্লায় যাওয়া—মানে, গোল্লাকে যাওয়ানো—কী ভালো! কী মিষ্টিই যে, আহা! আহা রে!

[গানের সুর]

গোল্লা ছাড়া কিছু আমার রোচে নাকো আহারে!

[য ব নি কা]

ভোজবাজি

সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-বাড়ির একটি ঘর। কর্তা ও গিন্নি। কর্তা পথ পার্শ্ববর্তী জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কর্তা : আজ কালীপুজোর দিনটিতেই আকাশ মেঘলা করে এল। বৃষ্টি-ফিষ্টি না হয় আবার! তাহলে তো পুজোর মজাই মাটি।

গিন্নি : তুমি কি এখন বেরুবে নাকি আবার?

কর্তা : জমিদার বাড়ির ঠাকুর দেখে—গাঁয়ের পুজো মন্ডপ হয়ে ঘুরে আসতাম একবার। দেখি গিয়ে কেমন সব সাজিয়েছে—

গিন্নি : এই ঝড়বৃষ্টির মুখে তুমি বেরুবে?

কর্তা : ঝড় কোথায়? আকাশে একটু মেঘ করেছে মাত্র—যদি হয় তো পরে বৃষ্টি হতে পারে। এখন তো সবে সন্ধে। সাতটা বেজেছে কেবল। আটটার মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।

গিন্নি : (জানালা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে) ও বাবা, বেশ মেঘ করেছে। নামল বলে বৃষ্টি। আর বৃষ্টি এলেই ঝড় আসবে—ঝড়—বৃষ্টি—বিদ্যুৎ। না, তোমার আর এখন বেরিয়ে কাজ নেই গো।

কর্তা : কোথায় বৃষ্টি, কোথায় ঝড়, কোথায় বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ করেই চিরদিন তুমি গেলে। তোমার এই বজ্রাঘাতের ভয় কি কোনোদিন ঘুচবে না? বিদ্যুৎকে এত ভয় কেন তোমার? বিদ্যুৎচমককে ডরাবার কী আছে? বিশেষ করে তোমাদের মতো মেয়েদের? (সুর করে আওড়ান) যে তড়িৎ খেলে ওই আঁখিতে...প্রাণে মরি বুঝি প্রাণ থাকিতে—

গিন্নি : ইয়ার্কি রাখো। সব সময় ভালো লাগে না—

(নেপথ্যে আওয়াজ কড়—কড়—কড়াৎ—) বন্ধ করো বন্ধ করো জানালা, দেখছ কি? কাছেই কোথাও বজ্রপাত হয়েছে নিশ্চয়।

কর্তা : মেঘ না চাইতেই জল। জল না আসতেই ঝড়। ঝড় না হতেই বজ্রপাত!

গিন্নি : বন্ধ করলে না? দাঁড়িয়ে রয়েছ এখনো?

(নিজেই তড়িৎগতিতে গিয়ে দরজা জানালাগুলি বন্ধ করতে লাগল)।

গিন্নি : কী সর্বনেশে লোক বাবু তুমি। একটুও প্রাণের যদি ভয় থাকে।

কর্তা : প্রাণ-ভয়ে রয়েছি একটু সত্যিই। কিন্তু সে ভয় আমার বিদ্যুৎকে নয়—তোমাকে।

গিন্নি ঃ ইস! রস যে একেবারে উথলে উঠেছে। এই কি তোমার মশকরার সময়।

কর্তা ঃ একি, আলো কমাচ্ছো কেন, উসকে দাও। ঘর যে অন্ধকার করে ফেললে একেবারে! একি! নিবিয়ে দিলে যে বাতিটা?

গিনি ঃ বজ্রপাতের সময় কি কেউ আলো জ্বালিয়ে রাখে? আকাশের বিদ্যুৎ যদি আলোর ইশারা পায়, সেই টানে নেমে আসে যদি—রক্ষে আছে তাহলে? লণ্ঠনের আলো সে বিদ্যুৎ টানে তা কি তুমি জানো না?

কর্তা ঃ কি বিপদ! অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে!

গিন্নি ঃ দেখবে কী আবার? দেখবার কী আছে? যেখানে আছো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, নোড়ো না—নড়োচোড়ো না। (কড়—কড়—কড়—কড়াৎ) ওগো, কোথায়? তুমি আছো কোথায়?

কর্তা ঃ যেখানে ছিলাম। কোথায় ঘরের মধ্যিখানে লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছি।

গিন্নি ঃ ভাঙা খড়খড়িটার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের চমকানি দেখলে? কদ্দিন বলেছি তোমায়, জানালাটা সারাতে—তা ছুতোর ডাকার ফুরসত হল না বাবুর! এখন বিদ্যুৎ যদি ফাঁক পেয়ে ওই খড়খড়ি দিয়ে গলে আসে? হে মা কালী, হে মা দুর্গা, পুজো দেব মা, আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দাও। হে মা রক্ষেকালী! হে মা জগদম্বা!

কর্তা ঃ তোমার বকুনি থামাবে?

গিন্নি ঃ হে মা জগদ্ধাত্রী! হে মা বিন্ধ্যবাসিনী! (কড়—কড়—কড়াৎ) শুনছ শুনছ, ওগো? হে মা আন্নাকালী!

কর্তা ঃ হে মা কাজলকালি-হে মা দোয়াতের কালি-হে মা সুলেখা—

গিন্নি ঃ হে মা রক্ষাকালী, বাঁচাও মা! ওর কথায় অপরাধ নিয়ো না! ওর হয়ে আমি ঘাট মানছি। দোহাই মা! ওর যদি কোনো আক্কেল থাকে! হে মা—হে বাবা মধুসূদন। (খড়খড়ির ফাঁকে আলোর ঝলকানি) ওগো, কোথায় তুমি রয়েছ?

কর্তা ঃ কোথাও নেই!

গিন্নি ঃ এই বাজ ডাকার সময় ঘরের মধ্যিখানে থাকা ঠিক নয়। তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না। তোমার পায় পড়ি, তক্তপোশের তলায় গিয়ে সেঁধোও।

কর্তা ঃ তক্তপোশের তলায়?

গিন্নি ঃ দাঁড়িয়ে আছ এখনো? এখনো সেঁধোওনি। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো—

কর্তা ঃ ভালো জ্বালা! (হঠাৎ আর্তনাদ) উঃ—

গিন্নি ঃ ওগো, কী হল গো?

কর্তা ঃ কী আবার হবে! মাথায় লাগল। তক্তপোশের কোনোটা লাগল মাথার খুলিতে।

গিন্নি ঃ লাগতে দাও—সেঁধিয়েছ তো ওর তলায়—

কর্তা ঃ চেষ্টায় আছি...ইস! এর মধ্যে আবার তোরঙ্গটা ঢুকিয়েছ দেখছি। কোণের খোঁচা লেগে কনুইটা ছ্যাঁদা হয়ে গেল বোধহয়।

গিন্নি ঃ যাক গে কনুই, প্রাণে বাঁচো আগে। বেঁচে থাকলে অনেক কনুই হবে। অনেক পাবে। যত কনুই চাও তুমি। যাক্, তোরঙ্গর পাশটিতে বসেছ তো?

কর্তা ঃ বসিনি ঠিক। বসতে পারিনি। হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছি।

গিন্নি ঃ হামাগুড়ি দিয়ে। কেন, হামাগুড়ি দিয়ে কেন? ঝড়বৃষ্টির সময়ে কেউ হামাগুড়ি দেয়? অমন করে থাকাটা কি ঠিক?

কর্তা ঃ কে জানে। কিন্তু করব কি, তক্তপোশের তলায় যে বাবু হয়ে বসা যায় না।

গিন্নি ঃ বসা যায় না? কী সর্ব্বনাশ! বিদ্যুৎ চমকের সময় কি কেউ হামাগুড়ি দেয় নকি? কেন, আসন পিঁড়ি হয়ে বসতে কী হয়েছে?

কর্তা ঃ কি করে বসি, মাথায় লাগে যে। চৌকির ছাদটা লাগছে যে মাথায়।

গিন্নি ঃ ভারী বিপদ বাধালে তো। এইসময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায়। এই কি তোমার মাথায় চৌকি লাগবার সময় নাকি? বাজ পড়ার সময় যে ঘাড় সোজা করে রাখতে হয়—(খড়খড়ির পথে আলোর ঝলকানি—কড়-কড়-কড়াৎ-বুম্-বুম্) হে মা মনসা, হে মা শেতলা—কর্তার সুবুদ্ধি দাও মা—মাথা সোজা করে দাও ওর! হামাগুড়ি দিয়ে কী সর্বনাশ যে ডেকে আনছেন—

কর্তা ঃ চৌকি মাথায় করে বসে থাকব আমার ঘাড়ের অত জোর নেই বাপু! আমি ভীম ভবানী নই। আমার দুগ্ধপোষ্য ঘাড়। তাই লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে আছি।

গিন্নি ঃ ঘাড় হেঁট করে আছো? তবেই মারা গিয়েছ আর আমাকেও মেরেছ। এই সময়ে মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম যে। চৌকির তলাতেই থাকতে হবে কিন্তু ঘাড় তুলে থাকা চাই—হায়, কি করি অমি এখন?

(কড়—কড়াৎ—বুম—বুম) দেখলে দেখলে তো। তোমার ঘাড় হেঁট করে থাকার এজন্যে কী সর্বনাশটা হচ্ছে! নিজেও মরবে—আর আমাকেও মারবে। (কড়—কড়াৎ—ববম্ বম্) হ্যাঁগো, উঠোনে ঘটিবাটি কিছু পড়ে নেই তো? পেতল কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—

কর্তা ঃ দেখে আসব গিয়ে? এখেনে এমন অধোবদনে বসে থাকার চেয়ে বাইরে গিয়ে বরং—

গিন্নি ঃ বাইরে যাবে তুমি—এই বিপদের মুখে? কী আক্কেল তোমার বলো দেখি?

তোমার চেয়ে ঘটিবাটি আমার বেশি আপনার? পেতল কাঁসার দামটাই বেশি হল? বলি, সেজো করেছ ঘাড়?

কর্তা : (চৌকির বাইরে এসে) করেছি। এতক্ষণে করতে পেরেছি। আহা, ঘাড়ের বোঝা নামল, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচলাম।

গিন্নি : একি, এখন ফের ফস ফস করে কি ঘষতে শুরু করলে?

কর্তা : ফসফরাস। দেশলাই জ্বালছি, সিগ্রেট ধরাব।

গিন্নি : কী সর্বনাশ। এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে? সিগ্রেট ধরায়? সিগ্রেট খাবার সময় কি এই? আলোয় যেমন বিদ্যুৎ টেনে টেনে আনে এমন আর কিছুতেই না। এই প্রাণ নিয়ে টানাটানির সময় তোমার কি সিগ্রেট না টানলেই নয়? (কড়—কড়াৎ—বম বম—আলোয় ঝলকানি) দেখলে—দেখলে তো, কী করলে তুমি।

কর্তা : আমি কি করব। ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কি না তুমিই জানো। হয়তো টানে, কিন্তু পয়দা করতে পারে না বোধহয়।

গিন্নি : এই কি তোমার গবেষণা করার সময়? এখন কোথায় সেই সপ্তবজ্র নিবারণের মন্তর আওড়াবে, না, তক্কো করতে লেগেছ। বলি, সেই মন্তরটা আওড়াবে একবার?

কর্তা : কী মন্তর? কিসের মন্তর?

গিন্নি : সপ্ত বজ্র নিবারণের। অশ্বত্থামা বলিব্যাস হনুমন্ত বিভীষণো। কৃপাচার্য— দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্র নিবারণো।

কর্তা : হনুমান—জাম্বুবান—বলিব্যাস বিভীষণো। কৃপাচার্য—দ্রোণাচার্য— ওবাবা, এখানে আবার কী এটা? কার যেন ল্যাজে পা পড়ল। দেখি হাত দিয়ে, ওমা, ল্যাজই তো।

গিন্নি : ল্যাজ?

কর্তা : হনুমানের কিনা কে জানে। অন্ধকারে তো ঠাওরাবার জো নেই কো। পা ছড়াতে গিয়ে ঠেকেছে। মনে হচ্ছে তোমার মন্তরের চোটে হয়তো বাবা হনুমানের আবির্ভাব হয়েছে।

(ল্যাজটার আওয়াজ : ম্যাও—ম্যাও—মিয়াও)

গিন্নি। এই কি তোমার আমোদের সময় গো? ফুর্তি করে বেড়াল ডাকা হচ্ছে আবার?

কর্তা : আমি কোথায় ডাকলাম।

গিন্নি : তবে কে ডাকল, কে ডাকতে গেল শখ করে? ওপাড়ার বটঠাকুর?

কর্তা : ম্যাও যার ভাষা, সেই বেড়াল নিজেই।

গিন্নি : অ্যাঁ? বেড়াল? বেড়াল রয়েছে নাকি ঘরে? তাহলে আর আমাদের রক্ষে নেই। বেড়াল ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ টানে। বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ,



বইয়েতেই লিখে দিয়েছে। কী সর্বনাশ! হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে মা অশ্বত্থামা—বলিব্যাস—

কর্তা ঃ মা নয়, বাবা। বাবারা। পুংলিঙ্গে বহুবচন হবে যে! ব্যাকরণে ভুল কোরো না গিন্নি! এই দুঃসময়ে দেবতারা চটতে পারেন!

গিন্নি ঃ এই সময়ে তোমার ইয়ার্কি! দেবতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা? হে হনুমন্ত বাবা, হে বাবা বিভীষণ। কর্তাকে রক্ষা করো! তোমাদের অবোধ সন্তানের অপরাধ নিয়ো না বাবারা!

(কড় কড় কড়াৎ বমবম ববম বম) তুমি কি এখনো বেড়ালের ল্যাজ ধরে বসে আছো নাকি? দাও দাও হটিয়ে দাও—হটিয়ে দাও ওটাকে।

কর্তা ঃ কি করে হটাবো? খুঁজে পাচ্ছি না যে। নিজের ল্যাজ নিয়ে কোথায় যে সটকালো হতভাগা।

গিন্নি ঃ আশেপাশেই কোথাও আছে নিশ্চয়। তুমি আর তাহলে মেজেয় বসে থেকো না। বেড়ালের আওতার বাইরে থাকতে হবে। এক কাজ করো তুমি! তক্তপোশের পাশে যে তেপায়াটা আছে, তার উপরে উঠে দাঁড়াও। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না। চেয়ার কিম্বা টেবিলের উপরে দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছ?

কর্তা ঃ উঁহু।

(ফ্যাশ—কড় কড়াৎ—কড়াক্কড় ববম—বম বম বম)

গিন্নি ঃ কী সর্বনেশে মানুষ বাবা তুমি! দাঁড়াওনি? এখনো দাঁড়াওনি? তুমি কি আমায় পাগল করবে? সবংশে না মেরে ছাড়বে না আমাদের? ওগো তোমার দুটি পায় পড়ি গো—

কর্তা ঃ দাঁড়িয়েছি বাপু দাঁড়িয়েছি। হোল? হয়েছে?

গিন্নি ঃ এই দুর্যোগের রাত কাটলে হয়। দোহাই মা কালী। ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দাও মা। যদি বেঁচে থাকি তো কাল সকালেই তোমায় পাঁচ সিকের পুজো দেব মা।

[নেপথ্য থেকে জানালায় করাঘাত।] কর্তা মশাই বাড়ি আছেন?

কর্তা ঃ তারিণীবাবুর গলা না? এই দুর্যোগেও উনি বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি। ঝড়বিষ্টি বিদ্যুতের পরোয়া না করেই। বাড়িতে বৌ নেই তো, তাই খোদার খাসির মতো খাসা চরে বেড়াচ্ছেন।

তারিণীবাবু ঃ (নেপথ্যে থেকে) জানালাটা একবার খুলুন না মশাই, একটা কথা বলে যাই।

গিন্নি ঃ তোমায় যেতে হবে না—এই দুর্যোগে জানালা খুলতে। যেমন আছ, চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। ওঁর কি? ওঁর তো বিধবা হবার কেউ নেই (বাহির থেকে একটু টানতেই আলগা জানালা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে তারিণীবাবুর লণ্ঠনের আলো পড়তেই কর্তাকে টিপয়ের উপর আর গিন্নিকে ঘরের কোনে খাড়া দেখা গেল।)

তারিণীবাবু ঃ এ কি, আপনি ওইভাবে দাঁড়িয়ে কেন? কী হয়েছে? তেপায়ার উপর অমন ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে দাঁড়িয়ে যে? কী ব্যাপার?

কর্তা ঃ আকাশে বিদ্যুৎ হানছে কিনা! দারুণ ঝড় বিষ্টি—তাই বাজ পড়ার হাত থেকে বাঁচতে—

তারিণী। কোথায় ঝড় বিষ্টি? একটুখানি মেঘ করেছিল—সে তো কেটে গেছে অনেকক্ষণ।

কর্তা ঃ তবে যে ওই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বাজ ডাকছিল যে?

তারিণী ঃ ওহো, সে আমাদের জমিদারবাবুর বাড়ি কালীপুজো কিনা, তাই। ফি বছরই তো সেখানে জোড়া পাঁঠা বলি হয়, পাড়াশুদ্ধ সবাই পেসাদ পায়। কিন্তু তাঁদের পাঁঠাবলি বন্ধ যে এবার!

কর্তা ঃ কেন? বন্ধ কেন?

তারিণী ঃ জমিদারবাবুর সবগুলো দাঁতই পড়ে গেছে তো! এ বছর তাই বুড়ো কর্তা বললেন যে এবারে আর পাঁঠা বলি দিয়ে কী হবে, জীব হত্যায় কাজ নেই। তার চেয়ে বরং ঐ টাকায় কলকাতার থেকে বাজি কিনে আনা যাক। এতক্ষণ সেই বাজি পোড়ানো হচ্ছিল কিনা।

কর্তা ঃ তারই এই ধূমধড়াক্কা? বটে? আর আমরা এখানে ভয়ে মরছি। যাক গে, তা পাড়ার লোকের পেসাদ পাওয়ার কী হবে! ভোজের ব্যাপারটা তাহলে?

তারিণী ঃ ওই যে বাজি হল। তাতেই ভোজবাজি হয়ে গেল সব।

[যবনিকা]

তোতলামি সারানোর ইস্কুল

হিরণ্ময় ঃ শুনেচিস, আমাদের নিরঞ্জন নাকি বিয়ে করেছে?

হিরণ্যাক্ষ ঃ পরোপকারী নিরঞ্জন?

হিরণ্ময় ঃ শ্বশুর খুব বড়োলোক। শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাবে নাকি?

হিরণ্যাক্ষ ঃ বলিস কিরে? নিরঞ্জন তাহলে অ্যাদ্দিনে কি নিজেকে পর বলে বিবেচনা করতে পেরেচে? তা না হলে নিজেকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে? নিজেকে পর বলে ভাবতে না পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হিরণ্ময় ঃ বাঁচা যায় তাহলে। ওর পরোপকারের খর্পর থেকে আমরা বাঁচি।

হিরণ্যাক্ষ ঃ ইস্কুলে পড়ার সময় কী জ্বালানটাই না জ্বালিয়েছে! তোর মনে আছে, সেইবার—সেই ফুটবল ম্যাচ জিতে ফেরার সময়। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, সামনে লেমনেডের ঝুড়ি, ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে। বলচে এত দৌড়ঝাপের পর জল খেলে সর্দিগর্মি হবে। হার্ট ফেল করতেও পারে।

হিরণ্ময় ঃ মনে নেই আর! আমরা যত বলি 'করে করুক, আমাদের হার্ট, তোমার কি।' ও ততই বলে 'আহা মারা যাবে যে।'

হিরণ্যাক্ষ ঃ যতই বলি যে জল না খেলেও যে মারা যাব, তা দেখচ না? ও ততই বলে সেও ভালো। তা বলে হার্ট ফেল করে কি সর্দিগর্মি হয়ে তোমাদের মরতে দিতে পারি না। দিলই না জল খেতে।

হিরণ্ময় ঃ সেদিন কি ইচ্ছে হয়েছিল জানিস? ইচ্ছে হয়েছিল যে আরেকবার ম্যাচ খেলা শুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল বানিয়ে। কিংবা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমনেডের বোতলগুলোকে ব্যাটের মতন কাজে লাগাই। (নিরঞ্জনের প্রবেশ)

হিরণ্যাক্ষ ঃ এই যে নিরঞ্জন! তোমার কথাই হচ্ছিল। বলি, চুপি চুপি বিয়েটা সারলে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের? জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি। অনেক কিছু ভাল মন্দ খেয়ে পাছে পেটের অসুখে মারা পড়ি—সেই কারণেই জানাওনি কাউকে। কিন্তু না হয় কিছু নাই খেতাম আমরা, বিয়েটাই দেখতাম কেবল। বৌ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না নিশ্চয়?

নিরঞ্জন ঃ কী যে বলো তোমরা। বিয়েই হল না তো বিয়ের...?

হিরণ্ময় ঃ তবে যে শুনলাম বিয়ে করে বড়োলোক শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাচ্ছ?.

নিরঞ্জন ঃ বাজে কথা। ভুলেও নিজের উপকার করব তোমরা তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাবছি তোতলাদের জন্যে একটা ইস্কুল খুলব।

মূক-বধির বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোতলাদের জন্যে তোর কিছু নেই। অথচ কী সম্ভাবনাই না রয়েছে তাদের মধ্যে।

হিরণ্যাক্ষ ঃ কি রকম?

নিরঞ্জন ঃ জানো না? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমনিস্থিস আসলে কী ছিলেন? তোতলাই একজন। মুখে মার্বেল গুলি রাখার প্র্যাকটিস করে নিজের তোতলামি সারিয়ে ফেললেন। অবশেষে, তিনি এত বড়ো বক্তা হলেন যে, অমন বক্তা পৃথিবীতে কখনো জন্মায়নি। সেই সেই মার্বেল গুলির কল্যাণেই কিংবা তোতলা ছিলেন বলেই—কি-সে যে হল তা আমি সঠিক বলতে পারব না।

হিরণ্যাক্ষ ঃ বোধহয়—ওই দুই কারণেই।

নিরঞ্জন ঃ আমারো তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস বানাবো। তোতলা তো তারা রয়েছেই; এখন দরকার খালি মার্বেল গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস বানাবার আর বাকি কী রইল?

হিরণ্যাক্ষ ঃ তা বটে। কিন্তু...কিন্তু ডিমস্থিনিসের কি এদেশে খুব দরকার?

নিরঞ্জন ঃ নেই আবার। বক্তার অভাবেই তো দেশটা মাটি হচ্ছে। দেশের এত দুর্গতি। লোককে কাজে প্রেরণা দিতে তো বলতে হবে, বলে বোঝাতে হবে। বক্তা চাই আগে, শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ জাগবে কি করে? কেন, বক্তৃতা ভালো লাগে না তোমার?

হিরণ্ময় ঃ খুব ভালো লাগে—থেমে যাবার পর। কিন্তু যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় কালারাই এই দুনিয়ায় সুখী।

নিরঞ্জন ঃ কালারাই? তাহলে আমি এমন বক্তা তৈরি করব যারা শুধু মানুষের চোখ ফোটাবে না, কালাদেরও কান ফুটিয়ে দেবে।

হিরণ্যাক্ষ ঃ কি বল্লে? কান ফুটো করে দেবে?

নিরঞ্জন ঃ নিশ্চয়, তা নইলে বক্তা কীসের! বক্তৃতা কী! তাহলেই ভেবে দেখো, দেশের জন্য চাই বক্তা আর বক্তার জন্যে চাই তোতলা। কেন না ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোতলাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব; যেহেতু ডিমস্থিনিস নিজে একজন তোতলা ছিলেন। অতএব ভেবে দেখলে, তোতলারাই আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ। কী, কি ভাবচ কি?

হিরণ্যাক্ষ : ভাবছি কি করে তোতলা হওয়া যায়।

নিরঞ্জন : তোতলাদের একটা ইস্কুল খুলব। সবই ঠিক। বিস্তর তোতলাকে রাজিও করিয়েছি। এখন ইস্কুলের একটা পছন্দসই নাম পেলেই হয়। ভালো নামের অভাবে ইস্কুটা খোলা হচ্ছে না।

হিরণ্ময় : নামের আবার অভাব কি?

নিরঞ্জন : যুতসই একটা নাম ঠিক করে দাও না ভাই। নাম না হলে কি চলে?

হিরণ্ময় : কেন, নাম তো পড়েই আছে। নিস্বভারতী খাসা নাম। চমৎকার।

নিরঞ্জন : নিস্বভারতী? তার মানে—?

হিরণ্ময় : ভারতী মানে বাক্য। বাক্য যাদের নিস্ব, কিনা, থেকে নেই—তারাই হল গিয়ে নিস্বভারতী।

নিরঞ্জন : উঁহু, ও নাম দেওয়া চলবে না। বিশ্বভারতী ভাববে তাদের দেখে তাদের থেকেই নামটা চুরি করেছি। তারা আপত্তি করতে পারে।

হিরণ্ময় : কিন্তু এটা কেবল যুতসই নয়, বেশ মজবুতসই নাম।

হিরণ্যাক্ষ : বেশ ও নাম যদি তোমার না-পছন্দ, তাহলে রাখো— স্যানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংস।



নিরঞ্জন : কিন্তু বড্ডো লম্বা হল না?

হিরণ্যাক্ষ : তাতো হলই। যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা অবলীলায় উচ্চারণ করছে—গড়গড় করে গড়িয়ে দিচ্ছে, আটকাচ্ছে না কোথাও—সেদিনই বুঝবে তারা পাশ হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে, কিম্বা জিভ দেখিয়ে।

হিরণ্ময় : নামকে নাম, কোশ্চেন পেপারকে কোশ্চেন পেপার!

নিরঞ্জন : ঠিক বলেছ, এই নামটাই থাকল তবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

তোতলামি সারানোর স্কুলে হিরণ্ময় ও হিরণ্যাক্ষ।

হিরণ্ময় : অনেক দিন থেকেই ইস্কুলটা দেখতে আসব আসব ভাবি—কিন্তু সময়াভাবে আর আসা হয়ে ওঠে না।

হিরণ্যাক্ষ : আমারো তাই। আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু অবকাশ পাই না, তারপরে সঙ্গী না পেলে কোথাও যাবার উৎসাহ হয় না আজকাল।

হিরণ্ময় : আমারো ভাই! আজ তোমাকে পেলাম বলেই এধারে আসা হল। কিন্তু অনেকদিন ধরেই নিরঞ্জনের ইস্কুলের খবরটা কানে আসছিল—

হিরণ্যাক্ষ : নিরঞ্জন এদিকে দেশের আর দশের উপকার করে মরছে; আর আমরা যে এখানে এসে ওকে একটু উৎসাহ দেব একটুকুও আমাদের ফুরসত হয় না। ধিক্ আমাদের।

হিরণ্ময়। মার্বেল গুলির কল্যাণে নিশ্চয় অনেকের তোতলামি সেরেছে এতদিনে। ডিমনিস্থিসের মতন বক্তা বানাতে মার্বেলের গুলি অব্যর্থ।

হিরণ্যাক্ষ : তাছাড়া মার্বেল গুলির আরও উপকারিতা আছে—যেমন দাঁত শক্ত করা, মুখের হাঁ বড়ো করা—আনুষাঙ্গিক ভাবে এসবও তো হয়ে যায়। এসব লাভও নেহাত কম নয়।

(কয়েকটি ছেলে এসে ঢুকল)

একটা ছেলে : কা—কা—কা—কা—কাকে চান?

দ্বিতীয়টি : মা—মা—মা—মা—মা—মা—মা...?

তৃতীয়জন : মাষ্টার বা—বা—বা—

হিরণ্যাক্ষ : কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কারুক্কে আমরা চাইনে। নিরঞ্জন আছে?

(ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। জনৈক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্রলোক : মাষ্টার বা—বাবুকে খুঁ—খুঁজছেন আপনারা? ডে—ডেকে দিচ্ছি! আমিই এই ই—ইস্কুলের কে—কে—কে কেলার্ক।

(ভদ্রলোকের প্রস্থান। ছেলেদেরো।)

হিরণ্যাক্ষ ঃ বাঃ, নিরঞ্জনের বেশ রুচি আছে। তোতলামির ইস্কুলে ক্লার্কও তোতলা দেখে রেখেছে। মন্দ নয়!

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন ঃ এই যে অ—অনেক দিন প—পরে।

হিরণ্ময় ঃ (হিরণ্যাক্ষকে জনান্তিকে) হ্যাঁরে, তোতলাদের পাল্লায় পড়ে নিরঞ্জনও তোতলা হয়ে গেল না-কি?

হিরণ্যাক্ষ ঃ বোধহয় ঠাট্টা করছে আমাদের সঙ্গে।

নিরঞ্জন ঃ তা খ—খবর সব ভা—ভালো তো?

হিরণ্ময় ঃ মন্দ কি—কিন্তু তোমার খবর তো ভালো বোধ হচ্ছে না। তোতলামি প্রাকটিস করছ নাকি? কবে থেকে?

নিরঞ্জন ঃ প্যা—প্যা—প্যা—প্যারাক—প্রাকটিস করব কেন! তো—তো—তোতলামি কি কে—কেউ প্রা-প্রাকটিস করে!

হিরণ্যাক্ষ ঃ তাহলে তোতলামিতে প্রোমোশন পেয়েছ বলো!

নিরঞ্জন ঃ ভাই হি—হি—হির—হিরণ্—না ণ্ণা—ণ্ণা ন্না—ণ্ণা—ণ্ণা

হিরণ্যাক্ষ ঃ হিরণ্যাক্ষ বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়, মুখে বাধে, না হয় তুমি আমায় হিরণ্যকশিপুই বোলো। 'কশিপু'র মধ্যে কোনো 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।

নিরঞ্জন ঃ ভাই-হি—হিরণ্যকশিপু, আমার এই স্যানাটো—টো—টো—টো...

হিরণ্ময় ঃ বুঝেছি, তোমার এই স্যনাটোজেন, তারপর?

নিরঞ্জন ঃ (চটে গিয়ে) স্যানাটোজেন? আমার ইস্কুল হো—হো— হল গিয়ে স্যা—স্যানাটোজেন? স্যানাটোজেন তো এ—একটা ও—ও—ওষুধ।

হিরণ্যাক্ষ ঃ আহা, ধরেই নাও না গে! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ। তোতলামি সারানোর একটা ওষুধ নয় কি?

নিরঞ্জন ঃ (খুশি হয়ে একটু হাসল) তা—তা—বটে!

হিরণ্ময় ঃ তা, তোমার ছাত্ররা অ্যাদ্দিনে কদ্দূর ডিমস্থিনিস হলো?

নিরঞ্জন ঃ ডি-ডিম—ডিম হয়েছে।

হিরণ্যাক ঃ বলো কি! তা আদ্দেক যখন এগিয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কী?

হিরণ্ময় ঃ বাকিটাও হয়ে যাবে। ঘাবড়ো না। লেগে থাকো।

নিরঞ্জন ঃ আ—আরে হবে না। মা—মা—মা— মা—মার্বেলই মুখে রাখতে পারে না তে কি-কি—করে হবে?

হিরণ্যাক্ষ ঃ মুখে রাখতে পারে না! কেন পারে না?

নিরঞ্জন ঃ স—স—সব গি—গিলে ফ্যালে।

হিরণ্ময় ঃ গিলে ফ্যালে! তা...হলে আর তোতলামি সারবে কি করে।

হিরণ্যাক্ষ ঃ সত্যিই তো। তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল। যেমন করে হোক মার্বেল-টার্বেল মুখে রেখে—যা করে হয়। রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার—দেরি করা ঠিক নয়।

নিরঞ্জন ঃ (হতাশভাবে মাথা নাড়ে) আ—আমার যে ডি—ডি—ডি—ডিস পে—পে—পেপসিয়া আছে। হ—হ—হজম করতে পারব কেন?

হিরণ্ময় ঃ ও, ডিসপেপসিয়া থাকলে তোতলামি সারে না বুঝি?

নিরঞ্জন ঃ না ভাই, আমার কি আর পা—পা—পা পাথর হজম করার ব—ব—বয়েস আছে।

হিরণ্ময়। কেন, পাথর হজম করতে হবে কেন!

নিরঞ্জন ঃ আ—আমিও যে গি—গিলে ফেলি।

হিরণ্যাক্ষ ঃ তাইত! ভারী মুশকিল তো! তাহলে তোমার চলছে কি করে?

হিরণ্ময় ঃ ছেলেরা সব নিয়মমতো বেতন দেয় তো?

নিরঞ্জন ঃ উঁহু, স—সব ফি ফ্রি যে! অ—অনেক সা—সাধাসাধি করে আনতে হয়েছে।

হিরণ্যাক্ষ ঃ তবে তোমার চলছে কি করে!

নিরঞ্জন ঃ কে—কেন! মা—মা—মার্বেল বেচে! এক একজন দ—দ—দশটা বারোটা করে খায় রোজ। ওগুলো মু—মুখে রাখা ভ—ভা—ভারী শক্ত!

হিরণ্ময় ঃ ব—ব—ব—বটে!

হিরণ্যাক্ষ ঃ ব—ব—ব—ব—ব বলো কি?

হিরণ্ময় ঃ (হিরণ্যাক্ষের দিকে সভয়ে তাকিয়ে) আঁ! আ—আমরাও কি তো—তোতলা হয়ে গেলাম নাকি রে!

হিরণ্যাক্ষ ঃ ভা—ভা—ভারি মা—মা—মা—মা—রাত্মক জায়গা! এখানে আর একদণ্ড থাকে না...পা—পা—পা—পালাও!

[য ব নি কা]

কবিতা



বাড়িওলার বাড়াবাড়ি

বটুবাবু বাড়ি ছাড়বেন, ধরবেন সোজা সড়ক,—
এমন সময় চিঠি পেয়ে চক্ষু হল চড়ক।
চিঠি তো নয়, রীতিমতোই বাড়িওলার বায়না!
রইল পড়ে বাঁধা-ছাঁদা টুথব্রাশ আর আয়না,
বাসন-কোসন, ব্যাগ, বিছানা, বাক্স, বালিস, পেঁটরা।
বাড়িওলার পত্র পেলেন, —কড়া-রকম ঢেঁডরা।
লিখেছেন যা বাড়ির মালিক, —শুনবেন কি মশায়?
লিখতে সোজা—করতে গেলে দারুণ অধ্যবসায়।
মালপত্তর রইল পড়ে—যা ঘটবার ঘটুক,
পত্রপাঠ পাঠান ছেলে, নিজেও ছোটেন বটুক।
চ্যাংড়া চলে খ্যাংরাপটি—আপনি চলেন পোস্তায়—
দরকারমাফিক জিনিসগুলি কোথায় মেলে শস্তায়।
পাত্তা কোথাও না পেয়ে আর গোঁত্তা খেয়ে হাজার,
অবশেষে এলেন ভেসে হগ্ সাহেবের বাজার

ভারতচন্দ্র আড়তদারের সাইনবোর্ডের সামনে—
সেথায় লেখা : জোগাই মোরা সবই সুলভ দাম নে'।
সর্বরকম সরবরাহ্ করাই মোদের কার্য।
উচিতমতো মূল্য নেব, যেটি যেমন ধার্য;
আসুন হেথায়। বলুন কী চাই? ছুঁচের থেকে হাতির?
যেমন মোদের খ্যাতি, মোরা তেমনি করি খাতির।
ভারতচন্দ্রের কাছে গিয়ে বলেন বটুকচন্দর—
দু-চারখানা নয়কো জিনিস, নেব দু-চার হন্দর।
ভালো দেখে বেছে এবং মিলিয়ে এক-এক করে—
ন্যায্য দামে দিন তো এসব ভালোরকম প্যাক্ করে।
কী চাই বলুন? বলে ভারত। যখন কৃপাদৃষ্টি
লাভ করেছি, আজ্ঞা করুন।
ধরুন তবে লিস্টি :
হাজার ত্রিশেক আর্সোলা চাই, নেংটি ইঁদুর তিনশো,
গোটা-বিশেক কাঁকড়া-বিছে—চটপট আমায় দিন তো!
ঘন্টাখানেক সময় পেলে পারব দিতে, —নেই কী?
কিন্তু কেন? শুধান ভারত।
পড়ে দেখুন এইটি :
যেমন ছিল আমার বাড়ি
রেখে যাবেন তদ্রূপ।
যেটি ছিল যেথায়, কিছু
করবেন না তছরূপ।



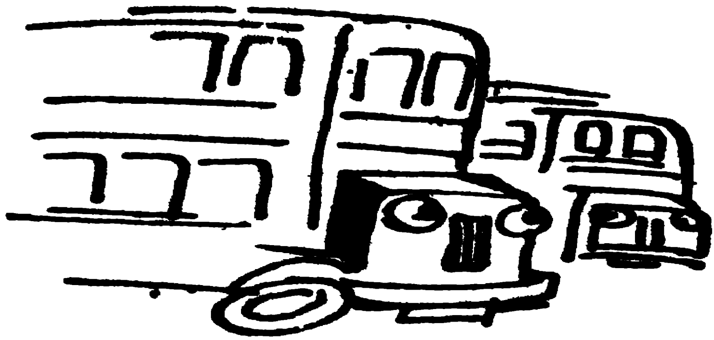
নাম বিভ্রাট

আমাদের হারাধন ভারী ভার-ভার মন
বসে আছে সারাখন বেবাক উদাসী!
পাড়ার সবাই আসি বলে যায় উপহাসি—
'ছেলেমেয়েদের নাম হল এ কেমন!
আজকের কালে ঐ মাধব ও মৃন্ময়ী?
শুনে হেসে সারা হই! চলে কি গো কভু?
তার চেয়ে ভালো তবু রামা, শামা, পচা, গবু,
পাঁচি, বিনি, প্রাণকেষ্ট, সিংহল-বিজয়ী!—
এ সব রাখাও ভালো; কিম্বা হোরো, নোরো, কালো।
সৌদামিনী? জ্যোৎস্না? আলো তবু অন্ধকারে।
তা না কিনা, কী হাঁদা রে, কী নাম রেখেছে হা রে!
হারাধন পাড়াটারে নরকে ডোবালো!
এরা সব বড়ো হলে ডাকবে কি বাবা বলে?
বিশ্বাস হয় না মলে! হেন বদ্ নাম
দিতে পারে যে-পিতায় জম্মাবার পরে হায়,
তারে ক্ষমা করা যায়? আরে রাম রাম!

এ যুগে চলে না ঐ মাধব ও মৃন্ময়ী—
আজকের দিন-কালে ও-নাম? হাঁ, বল্!
মান্ধাতার আমলের— ঘুচিবে না না-মলে
ছেলেমেয়েদের গলে ও নাম-শাবল!
চটেছে পাড়ার লোকে গিন্নিও দিয়েছে বকে—
না-মরা সন্তান-শোকে ভগ্ন হারাধন।
সেই থেকে হারাধন ভেবে ভেবে সারা হন—
অতি-আধুনিক নাম পেতে হবে ওকে।
হারাধন ভেবে হাবা পাড়াটেরা মারে থাবা,
পুলিশে বগলদাবা করে কি না করে!
এ-ছাড়াও ওর কাছে আরো চিন্তার আছে—
ছেলেমেয়ে পাছে বাবা বলে কি না পরে।
যত নামাবলী-খোল খুলে যায় বাড়ে গোল—
হারাধন ভোম্বোল ভেবে হয় কাত,
হেনকালে যে হঠাৎ বিজলী চমকপাত!—
পুরাতন নাম ধরে আধুনিক ভোল!
হারাধন মৃদু হাসে,. আবিষ্কার করে যা সে!
বেচারা কি অকস্মাৎ হয়ে গেল কবি?
ঈষৎ স্বর-বদল করলেই চোকে গোল।—
ছেলের 'মৃন্ময়' থাক—মেয়ের? 'মাধবী'!

জন্মদিনের রিহার্সাল

'কবে আমার জন্মদিন মা, বলবে
তুমি আমায়?'
খোকা গিয়ে শুধায় যে তার মাকে।
'আছে রে, তার দেরি আছে অনেক।'
'পায়ে পড়ি মা গো তোমার,
বলো না আমাকে!'
'এখনো মাসখানেক, এবার
গজর গজর থামা।'
খবর পেয়ে ছোট্ট খোকা বড়্ডো
মাথা ঘামায়।
ভারী মুখে ভবল সে ক্ষণেক।—
'কে জানে মা কখন আমার
আসে যে কোন্ মামা!
এখন থেকে লক্ষ্মী ছেলে হতে হবে আমায়।
হতে হবে না মা?'



শাবাশ দৌড়

ভালোবাসবার মতো ভালো বাস্ বার
কটা হয় রাস্তায়? বড়ো রাস্তার
মাঝখান দিয়ে ছোটে—হৈ হাল্লায়
দু-খানা দোতলা বাস দৌড়-পাল্লায়—?
দেখি যদি কখনো তা এই চক্ষে,
ভালোবেসে ফেলবই, নেই রক্ষে।
দেখেছি তো ঘোড়-দৌড়, আর অস্থির
ছেলেদের ছুট ভাই, ফোর-ফর্টির।
সে-সব দেখার জানো সুখ তোমরা।
কিন্তু দেখেছ কেউ—মুখ গোমড়া
দু-খানা দোতলা বাস—ভোঁ ভোঁ ভোঁরর্......
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি ভোঁদড়ের দৌড়?
দু-খানা বাসের যেন ষোলই আগস্ট্!
ভরপুর স্বাধীনতা। ভাঙে ল্যামপোস্ট—
ছেঁড়ে বিদ্যুৎ-তার, ছাড়ে তল্লাট—
লাল-নীল নিশানার মচকায় ঠাট।
পুলিশের ট্র্যাফিকের নিয়ম কানুন
দলে যায়। সে-চলায় কে খামখা খুন?
পড়েছে যে সামনেই, সে-ই অক্কা—

হয় সে মোক্ষ পেল নয় মক্কা!
দু-খানা দোতলা বাস্ হাঁস্-ফাঁস্ ধায়—
কে কাটাবে কার পাশ মাঝ রাস্তায়—
কে কারে টেক্কা মারে, সেই চেষ্টায়
পড়ি মরি! পারি মারি! নেই রেস্ট হায়!
শাবাশ সে বাস-দৌড়! এই বিশ্বয়,
কে দেখেছে কবে ভাই সেই দৃশ্যয়?
সে-দেখার সাধ মোর। হও হেসে খুন?
আহা, সেই ভালো বাস ভালোবেসে খুন
হতে চাই—যদি পাই এই বক্ষে—
মরবই আমি ভাই, নেই রক্ষে!



অমার্জনীয়

আপিস পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মাজন গছাত সে।
লম্বা চৌড়া ক্লাইব-স্ট্রিটের অভ্রভেদী আশা—
বিরাট কোঠার খোপে খোপে কত আপিস ঠাসা।
কর্তা, সাড়ে দশটা তখন, খাসকামরায় বসে
ভাবছেন আর কাজ করছেন। সামনে টেবিল-ভরা
সাজানো আর স্তূপীকৃত ফাইল পরম্পরা।
লিখছেন আর ঠিক দিচ্ছেন। আজকে কাজের যা ভিড়!
একটু কাশির খুকনি ছেড়ে এমন কালে হাজির
আধময়লা পরিচ্ছদে একটি যুবক।
'কী চাই?'
'জীবন-বিমা করাবেন স্যর?' 'এসেছ যে মিছাই।
করা আছে বহুৎ বিমা—লক্ষ লক্ষ টাকায়!'
'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বলল যুবক: 'ফাঁকায়
বালির ধারে খালি জায়গা কেনার আছে শখ কি?
বাগান করে আম লাগাবেন?'
'এমন আহাম্মক কি

এই বাজারে রয়েছে কেউ মাঠ কেনবার? মানে?
সবার হবে আম বাগানো আমার সে বাগানে?
কষ্টে আমি আম ফলাবো বোম্বাই আর ল্যাংড়া ঃ
আমদানিতে লিপ্ত রবে পাড়ার যত চ্যাংড়া?'
'খুশি প্রভুর। কিনবেন কি ভুসি মালের আড়ত?'
'একদম না।' 'কালী সিংহির আসল মহাভারত?
অস্টাদশম পর্বে বিরাট, বাঁধাই ভালো চামড়া—
এবং সুখপাঠ্য তা—সস্তায় দেব আমরা।
হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চিজ,—চাঙ্গা হবেন রাখলে।
দাঙ্গা বাধলে লাগবে কাজে হাতের কাছে থাকলে।
আপত্তি কী আছে কেনার?'
'আছে দস্তুর-মাফিক!'
'থাকার কথাই। আমি হলেও কিনতুম না, তা ঠিক!
থাকগে সেটা। কিনবেন কি—বিকট আওয়াজ ছাড়ে—
সেকেন্ড হ্যান্ড হারমোনিয়ম এক কিস্তিবন্দী হারে?
সঙ্গে পাবেন বাঁয়া তবলাও সুবিধেয় মশয় হে!
অমনি একটা বাঁশিও ফাউ।'
'বাঁশ দিলেও নয় হে!'
'নিশ্চয় নন, হচ্ছে মালুম, ধূম্রপানের বৈরী?
নেবেন খাঁটি বর্মা চুরুট? খ্যাংরাপটির তৈরি?'
চেঁচিয়ে ওঠেন কর্তা তখন—পারেন না আর সইতে—
'চুরুট আমি খাইনে, তুমি যাবে এখান হইতে?'
'বাঁচতে তবে আমার হাতে, দেখুন ভেবেচিন্তে—'
বলল যুবক অবশেষে ঃ 'রাজি আছেন কিনতে
চিন্তামণির দাঁতের মাজন? নির্ভেজাল স্বদেশি।
একটি প্যাকেট একটি আনায়। দামও তো নয় যে বেশি?'
'চিন্তামণি?' মুহূর্তকাল চিন্তাসূত্রে লটকান
কর্তা, এবং বলেন—'দাও। দিয়েই মারো সটকান।'
'ডিটো' দিলেন টিট, খেয়ে বাইশ ইঞ্চি ইট।
ক্লাইভ স্ট্রিটের ফেরিওলার দন্ত ক্লাইভ স্ট্রিট!
বলল হেসে ঃ 'নিন তাহলে। করুন দন্ত-সংস্কার।
মার্জনা করবেন স্যার। দুবেলাই।.....নমস্কার।'

পৃথিবী বানানো

বাবার কি এক খেয়াল হল, ডেকে বললেন, 'শিবি,
বান্‌ান করতে শিখেছিস কি? কর দেখি পৃথিবী?'

পৃথিবী? তা এমন কী আর! শক্ত কী আর তত?
হ্রস্ব ই? না দীর্ঘ ঈ? ইস্‌, ইকার আছে কত!
সেইখানেতেই মুশকিল যে, মাথা ঘামায় শিবি—
তিন-তিনটে ইকার নিয়ে নির্বিকার পৃথিবী।

'প-য়ে র-ফলা হ্রস্ব ই-কার?' 'অ্যাঁ, কী বললি হাবা!'
'প-য়ে র-ফলা দীর্ঘ ঈ-কার?' চমকে গেলেন বাবা।
'প-য়ে র-ফলা দীর্ঘ ঈকার? তারপরে কী দিবি?'
'থ-য়ে হ্রস্বই, ব-য়ে হ্রস্বই— বসিয়ে দেব থিবি।'

বানান শুনে বাবার হল আক্কেল গুড়ুম!
হেন শব্দ ভাবেন নিকো শব্দকল্পদ্রুম!...
'হয়নি বুঝি? দাঁড়াও, আমার কাছে আরো নানান—'
এক পৃথিবী করল শিবি সাত রকমের বানান!'
শব্দরা সব জব্দ ভারী তার বানানের ভিড়ে—
বানানোর যে কত কী প্ল্যান শিবির শিবিরে!

চোট সামলে বলেন, বাবা,—'ব্যাটা, বিদ্যের ঢিবি!
তোমার খেয়াল-খুশি মতো চলবে কি পৃথিবী?
পৃথিবীর যে ধরা-বাঁধা সাবেক কালের চাল—
নতুন বানান সয় না ধাতে, হয় তাতে গোলমাল!
অভিধানের বন্দোবস্ত চিরস্থায়িত্বের—
বিরাট দায়িত্বের!
একটু এদিক-ওদিক হলেই মানের হানি ফের।'
বললে শিবি ঘাড়টি নেড়ে,—'তুমি তো সব জানো!
পৃথিবীকে নতুন করে যায় না কি বানানো?
কেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ যিশু গাঁধি
রামকৃষ্ণ কার্ল মার্ক্স লেনিন ইত্যাদি
নিত্য নতুন বানান করে বানাচ্ছে পৃথিবী—
আমিও যদি তেমনি বানাই?'
প্রশ্ন করে শিবি।

মার চিঠি

আশা করি তুমি ভালো আছ সেথাতে,
খাওয়ার কষ্ট কোনো নাই।
যে-সব গরম জামা দিয়েছি সাথে
গায়ে তা দিচ্ছ সর্বদাই।
ঠান্ডা লাগাও নাকো, বেড়াও না হিমে, রাতে দিনে
কড্‌লিভার খাচ্ছ রুটিনে।
অসুখ-বিসুখ হলে, হওয়া-মাত্তর
ভুলবে না সংবাদ দিতে,
তার করলেই ভালো হয়, যা খবর
দেরি করে আসতে চিঠিতে!
টাকার ঘটলে দরকার
জানাতে নেইকো লজ্জার।
কারো সাথে মারামারি হুড়োহুড়ি নয়;
পথঘাট চোলো সাবধানে;
ট্রাম থামলেই ওঠো নামো নিশ্চয়?
গোল যেথা যাও না সেখানে?
হুঁস নেই গাড়ি ও ঘোড়ার—
খেয়াল রাখিয়ো তুমি তার।
কবিজনে এইসব লেখেন না ঠিক,
জানি, তাঁহাদের কাব্যে।
তাঁরা তো জানেন না কো মাকে কত দিক
ভাবতে যে হয়। কে তা ভাববে?
আসলে তাহলে বলি তা,
মার তো তুমিই কবিতা।

কাঁচা সোনার রোদ

কাঁচা সোনার রোদ!
ঐ এল রে বন্যা—ভেঙে মেঘের-অবরোধ।
আকাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে,
মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে,
গাছের মাথায় জড়িয়ে পড়ে,
সোনালি পাড় খোদ।
কাঁচা সোনার রোদ!

কাঁচা সোনার রোদ!
আকাশ-থলি উজাড় হয়ে কার ঝরে সম্পদ!
যা ছিল রে চোখের কোণায়
ভোরের আলোর রুপোর বোনা—
হয়ে গেল সোনায় সোনা!
কুড়িয়ে নে নগদ।
কাঁচা সোনার রোদ!

কাঁচা সোনার রোদ!
মাটির দুর্গ-জয়ে নামে আলোক-সেনার ক্রোধ।
ফুলের কাছে অলি আনার,
অলির পাখায় গান জাগানার,
ধূলার কুলায় ফুল ফুটোনের—
আলোক-বোনার রোদ।
কাঁচা সোনার রোদ!

কাঁচা সোনার রোদ!
মার চুমু কি সূর্য পেল, তাই অত আমোদ?
আলোয় আলো সুখের হাসি
ছড়িয়ে পড়ে রাশি রাশি,
তাই বুঝি ও ভালোবাসি

মায়ের চুমার শোধ—
দিচ্ছে সোনার রোদ?

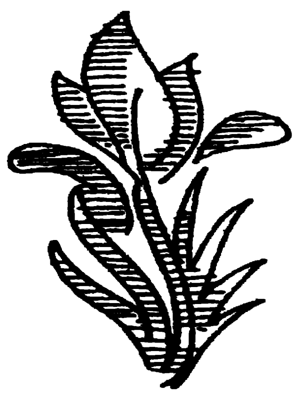
কাঁচা সোনার রোদ!
তাই বুঝি তার ভাইবোনদের সেই চুমোটির বোধ
দেবার লাগি, মনের সুখে
ছড়ায় ধরায় সকৌতুকে
তোমার মুখে আমার মুখে
মার মত দরদ—
কাঁচা সোনার রোদ!



জমাখরচ

'বাবা গো, ট্রামের তুমি দিলে পয়সা না?
ট্রামে আমি তবু চাপি নাই।
ছুটি যেই হল ইস্কুলে,
ছুটতে লেগেছি বাঁই-বাঁই!
এতটা কি এলাম বৃথাই?—
ট্রামের সঙ্গে একটানা
পিছু পিছু দৌড়ে এলাম।
তাড়াতাড়ি এলাম তো তাই!
বাবা, যা দিলাম দৌড়টাই—
এখনো ঝরছে গায়ে ঘাম।
এই নাও টিকিটের দাম—
বাঁচানো গিয়েছে এক আনা।'
খোকা বলে এই কথা না,
রোজগার করে সেই আনা
একটি আনার নজরানা
বাবার হস্তে দিল তুলে।

বাবার চোয়াল পড়ে ঝুলে ঃ
'ট্যাক্সি কি ছিলই সেথা না ?—'
বাবা শুধু বললেন—'হায়,
তার পিছু পিছু দৌড়ুলে
হ্ত আরো কত যে মজাই!
আরো কত পেতিস আরাম।
বুদ্ধি কি ছিল না মাথায় ?
তাহলে যে—ভেবে দেখলাম—
আরো বেশি যেত রে বাঁচানা—
বাঁচাতিস একটা টাকাই!'



মশার মুশকিল

ছিল চার বৌ এক যে মশার। চার বৌকে নিয়ে
মনের সুখে গাইত সে গান ইনিয়ে-বিনিয়ে।
গুন্ গুন্ গুন্, গুন্ গুন্ গুন্, গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জে
বৌদের গুণ গাইত সে আর খাইত সবার
খুন যে।
গুণ গাইলেও বলি তবে, এমনি মশাই,
প্রাণ তার-
সবার চেয়ে ছোটো বৌয়ের পরেই ছিল
টান তার,।
তার চেয়ে কম সেজো বৌয়ে, মেজোয় আরো
কম যে;
বড়ো বৌকে হরদম সে রাখত কেবল ধমকে।
মশার ফেরার দেরি দেখে বলল ছোটো বৌটি—
'এতখানি রাত হল যে, গেলেন প্রভু কৌটি?'
'নরম কচি গাল পেয়ে কার'—বলল মেজো
বৌ যে,
'ঘাল করতে লেগে গেছেন মজা করে মৌজে।
উলকি কেটে ফুলকি গালে হুলটি বিঁধে
তার না—
হাড় খাচ্ছেন, মাস খাচ্ছেন আর ভাঙছেন ঘাড় না!
রক্ত খেয়ে শক্ত হয়ে ফিরবেন এইবার না!'
'তা নয় বাছা, তা নয়!' তখন বলল বড়ো বৌ যে—
'কে জানে বা নাম লেখালেন কোন্ ফেরারি
ফৌজে!'
'না গো দিদি!' বলল মেজয়ঃ 'প্রভুর আঁচানা
সারা হল ভোজটি সেরে। এবার কাছা না
গুটিয়ে, ছাঁদা হাতে প্রভু পথ ধরেছেন বা।'
বড় বৌটি বলল তখন: 'না গো, বাছা, না।

মশারিতে লটকে পড়ে আটকে গিয়ে শেষে
হাঁউ মাঁউ খাঁউ সুরে প্রভু গৎ ধরেছেন বা।'
বলল সেজো বৌ, 'হায় রে, বেরিয়ে নিরুদ্দেশে
গেছেন কোথায়! প্রাণ যে সেথায় শক্ত
বাঁচানা—
হয়তো কোনো মশানীকে মন দিয়েছেন বা।'
বড়ো বৌটি বলল তখন, 'না গো বাছা, না।
রান্নাঘরে আঁচ দিয়েছে কয়লা উনুন ঠেসে
দিচ্ছে ধোঁয়া, প্রভু আমার কোণ নিয়েছেন বা।'
বলল ছোটো বৌটি, 'প্রভু তেমন কাঁচা না,
ফুর্তি করে উড়তে গিয়ে রান্নাঘরের ছাদে,
লটকে যাবেন, আটকে যাবেন কোন মশারির ফাঁদে।
দুনিয়া জুড়ে নওজোয়ানের নয়া জামানা—
বয়াটে এই দখিন হাওয়ায় উড়তে তো মানা
নেইকো, প্রভু এই হাওয়ায় বয়ে গেছেন বা।'
বলল বড়ো বৌটি আবার, 'না গো বাছা, না।
কটাস কামড়—চটাস চাপড়, ছাড়ল খাঁচা না
আত্মারামটি! হয়তো প্রভু হয়ে গেছেন বা!'

কচি মুখ

সূর্য কোথায় পায়
ওর ওই আলো?
কোত্থেকে পায়?
অনন্তকালে শূন্য
পথে যা ছড়ালো,
তবু না ফুরায়।
এত যে সুষমা রূপ
পায় কোত্থেকে
ওই কচি মুখ?
ফুরায় না দেখা মোর
দেখে আর দেখে—
জুড়োয় না বুক।।

